বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

বরগুনা

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

বরগুনা

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মুস্তাফা পান্না

সংগ্রাহক
চিত্তরঞ্জন শীল
এম জসীম উদ্দীন

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
বরগুনা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩৪০

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত দশ টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRANTHAMALA BARGUNA : (Present state of Folklore in Barguna District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managaing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 310.00 only. US$: 5

ISBN-984-07-5349-5

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার

www.pathagar.com

জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্‌ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ :

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই ।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা) ।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ি), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল, উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি এবং বিন্নি, কদমা, বাতাসা, কুলখানি, চেহলাম, জিয়ারত, মেজমানী ইত্যাদি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ির শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলা ভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি :

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম :বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),
২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন

www.pathagar.com

এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রণয়ন সমন্বয়কারী এবং বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান বরগুনা জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বরগুনার সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৬৬
- ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
- খ. ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা
- গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- ঘ. জনজাতির পরিচয়
- ঙ. নদ-নদী ও খাল
- চ. বনজ সম্পদ
- ছ. জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ
- জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
- ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
- ঞ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
- ট. লোকশিল্পী ও সাধক
- ঠ. রাখাইন সংস্কৃতি
- ড. লৌকিক দেবদেবী

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)
- ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্সা/রূপকথা/উপকথা ৬৭-১৮২
- খ. কিংবদন্তি
- গ. লোকপুরাণ
- ঘ. লোকছড়া
- ঙ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৮৩-১৮৬

লোকশিল্প
- ১. শোলার কাজ
- ২. নকশি কাঁথা ও শিকা
- ৩. আলপনা

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৮৭-১৮৮

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৮৯-১৯২

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ১৯৩-২২৪

ক. অষ্টক গান
খ. হয়লা
গ. কর্মসংগীত
ঘ. হয়ালি
ঙ. কীর্তন গান
চ. দেহতত্ত্ব গান
ছ. বরগুনার আঞ্চলিক গান
জ. বিচ্ছেদ গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২২৫-২২৮

১. ঢাক
২. ঢোল
৩. খোল/শ্রী খোল/মৃদঙ্গ
৪. একতারা
৫. চাকি বা করতাল
৬. বাঁশি
৭. সারিন্দা

লোকউৎসব (folk festival) ২২৯-২৪০

১. নবান্ন
২. আমুয়ার দশোহরা উৎসব
৩. বিয়ে : মুসলিম বিয়ে
৪. ঈদ উৎসব
৫. রাখাইন সাংগ্রাই উৎসব
৬. শারদীয় দুর্গোৎসব
৭. কঠিন চীবরদান উৎসব
৮. দোল উৎসব
৯. চরক উৎসব

লোকমেলা (folk fair) ২৪১-২৪৬

১. বৈশাখি মেলা
২. থৌল
৩. তেন্নাথের মেলা

লোকাচার (ritual) ২৪৭-২৮০

১. জোমাত/ফইত্যা/শ্রাদ্ধ, ২. মাইট্যাল, ৩. শ্রাদ্ধ, ৪. খৎনা/মুসলমানি,
৫. আকিকা, ৬. সন্তান জন্মের পর আজান/শঙ্খ ধ্বনি, ৭. হাতেখড়ি,

www.pathagar.com

৮. অন্নপ্রাশন, ৯. নবজাতকের নাভিতে ছাই দেওয়া, ১০. মঙ্গল প্রদীপ/আকাশ প্রদীপ, ১১. বরণ/বরণডালা, ১২. উলুধ্বনি বা জুকইর, ১৩. অতিথি সৎকার বা আপ্যায়ন, ১৪. জলখাবার/শরবত, ১৫. পান-সুপারি/হুঁকো, ১৬. ধূপ-ধুনো, আগরবাতি, ১৮. সোনা-রুপার জলের ছিটা, ১৯. মানতি/মানত, ২০. হালখাতা, ২১. রমজানে রোজা-খোলানো, ২২. মঙ্গলঘট, ২৩. গোপালের আখড়ায় পূজা-অর্চনা, ২৪. বৃক্ষপূজা/রক্ষাতলা/রক্ষাচণ্ডীপূজা, ২৫. শীতলাপূজা, ২৬. হরিরলুঠ/ঠাকুরসভা/হরিসভা, ২৭. নামকীর্তন, ২৮. গ্রাম-কীর্তন, ২৯. খোদাই ষাঁড়/ধম্মের ষাঁড়, ৩০. হরিকাইল্যা রাইত, ৩১. কিরা/দিব্যি, ৩৪. গণকঠাকুর, ৩৫. কুলাইপূজা/কুমিরপূজা, ৩৬. মনসা দেবীর পূজা/মনসা মন্দির, ৩৭. লক্ষ্মীপূজা, ৩৮. কালীপূজা, ৩৯. কলাবউ, ৪০. সরস্বতীপূজা, ৪১. নীলগাজন, ৪২. নীল গাজনের সঙ, ৪৩. সুন্দরবনের দেব-দেবী, ৪৪. বনবিবি, ৪৫. রাখাইনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ৪৬. সন্ন্যাস ব্রত, ৪৭. পাট স্নান, ৪৮. পাট নাচানি, ৪৯. উড়োভোগ, ৫০. কাঁটা সন্ন্যাসী, ৫১. আগুন সন্ন্যাসী, ৫২. দশাবতার নৃত্য, ৫৩. চাষা নৃত্য, ৫৪. মুখা নৃত্য, ৫৫. মশাল নৃত্য, ৫৬. খেজুর ভাঙা, ৫৭. চড়ক ঘূর্ণি, ৫৮. মেয়েদের ব্রত অনুষ্ঠান, ৫৯. বারইলের ব্রত, ৬০. তারার ব্রত, ৬১. সন্ধ্যামণির ব্রত, ৬২. গুণ ফাগুনের ব্রত, ৬৩. নইল্যা, ৬৪. রজদর্শন বা ঋতুবতী অনুষ্ঠান, ৬৫. গৃহপ্রবেশ/ঘর হাচরানো/ঘর সঞ্চার, ৬৬. ঘরের চালে ধাইর বাঁধা, ৬৭. ইলিশ পুরাণ

লোকখাদ্য (folk food) ২৮১-২৯২

১. কলা-কচু, মিডা আলু, ২. ফলফলাদি, ৩. মিডা, ৪. পিডা/পিঠা, ৫. লাতা ভাজা, ৬. বিচকি, ৭. বউদ্দা, ৮. ফেনা ভাত, ৯. মিডাই/মিঠাই, ১০. রসগোল্লা, ১১. দানাদার, ১২. ছানার জিলিপি, ১৩. কালোজাম, ১৪. রসমালাই, ১৫. সন্দেশ, ১৬. বাতাসা/ফেনি, ১৭. মিছরি/তক্তি, ১৮. কাঁচাগোল্লা, ১৯. জিলিপি, ২০. আমিত্তি, ২১. ঘোল, ২২. দই, ২৩. উড়ুম, ২৪. মোয়া, ২৫. চিড়া, ২৬. খই, ২৭. মলিদা, ২৮. মাছ-ভাত, পান্তাভাত

লোকনাট্য (folk theatre) ২৯৩-৩১০

বেউলা লখিন্দরের পালা

লোকক্রীড়া (folk games) ৩১১-৩১৮

১. গোল্লাছুট, ২. ওপেন টু বাইস্কোপ, ৩. হা-ডু-ডু বা কাবাডি, ৪. ইটকুড়ি মিটকুড়ি খেলা, ৫. ঘুঘুসই, ৬. ইচিং-বিচিং খেলা, ৭. কুতকুত খেলা, ৮. পুতুল খেলা

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৩১৯-৩৩৮

১. জেলে, ২. ভাসান ব্যবসায়ী, ৩. কামার, ৪. ঢোল বাদক, ৫. করাতি,
৬. দাই, ৭. বাওয়ালি ও মৌয়াল, ৮. স্বর্ণকার, ৯. ঋষি/মুচি, ১০. মেথর,
১১. ধোনকার/ধুনারি, ১২. ঘরামি, ১৩. মিস্ত্রি, ১৪. রাজমিস্ত্রি, ১৫. গুনরাজ,
১৬. কাঁসারি, ১৭. সাপুড়ে, ১৮. বানরওয়ালা, ১৯. মাঝি, পাটনি, ২০ সানদার

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ৩৩৯-৩৪৬

ক. লোকচিকিৎসা
তাবিজ কবজ, বাটি চালান, থাল পাড়া, পানি পড়া/মিষ্টি পড়া,
টোটকা চিকিৎসা

খ. তন্ত্রমন্ত্র
বাঘ ও সাপের মন্ত্র, নালীবাত, বিচি-ফোঁড়ার বিষ দূর করতে মন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ৩৪৭-৩৫২

প্রবাদ প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩৫৩-৩৬৮

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৩৬৯-৩৭২

ক. লোকসংস্কার
শিশুদের কপালে কাজলের ফোঁটা, শিশুর গলায় তবিজ, আটমোড়/ধুকধুকি,
শিশুর কোমড়ে তাগা, রাতে পেঁচার ডাক, যাত্রামঙ্গল,
গ্রহণকালে মানতে হয়, আজান দেওয়া

খ. লোকবিশ্বাস
দান বাক্স

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩৭৩-৩৯২

১. কুটারকুর, ২. ইঁদুর মারার কল, ৩ কামডি কল, ৪. নৌকা, ৫. ঢেঁকি,
৬. কাকতাড়ুয়া, ৭. মাটির চুলা, ৮. আলডা, ৯. হাজাল, ১০. ল্যাম,
১১. লুফা/ব্যানা, ১২. লণ্ঠন, ১৩. তাওয়া, ১৪. কালো পাতিল,
১৫. দেশীয় অস্ত্র, ১৬. কৃষি যন্ত্র, ১৭. মাছ ধরার যন্ত্র,
১৮. কোচ দিয়ে মাছ ধরা, ১৯. বড়শি দিয়ে মাছ ধরা, ২০. ইলিশের জাল,
২১. গড়া, ২২. লেতরা, ২৩. নলের চল, ২৪. পাখি ধরার জালের ফাঁদ,
২৫. পোষা পাখির ফাঁদ, ২৬. আঠার আঁকশি, ২৭. রাসকা, ২৮. আকাশি,
২৯. কলাগাছের ভেলা, ৩০. বাঁশ-বেতের কাজ, ৩১. বাঁশের লাঠি,
৩২. গৈ, ঘুঁটে, ৩৩. সিকা, ৩৪. পুরা, ৩৫. চার/হাক্কা/সাঁকো,
৩৬. ওগলা/হোগলা পাটি, ৩৭. চুইন্যা, ৩৮. সাজি

লোকভাষা (folk language) ৩৯৩-৪১৬

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

বরগুনা জেলার নামকরণ কীভাবে হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে লোকজ ধারণা থেকে যতদূর জানা যায় যে, দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে যেসব সওদাগর ও কাঠ ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে আসতেন তাঁদের খরস্রোতা খাকদোন নদ অতিক্রমের সময় অনুকূল প্রবাহ বা বড় গোনের (জোয়ার) জন্য এখানে অপেক্ষা করতে হতো। ফলে লোকমুখে এ এলাকার নাম হয়ে যায় 'বড় গোনা'। আবার কারো মতে, প্রবল স্রোতের বিপরীতে গুন (দড়ি) টেনে নৌকা অতিক্রম করতে হতো বলে এ স্থানের নাম হয় 'বড়গুনা'। মতান্তরে কেউ কেউ বলেন, কোনো প্রভাবশালী মগ আদিবাসীর নামানুসারে বরগুনা নামকরণ হয়েছে। আবার কেউ বলেন, সুন্দরবনের অংশ হওয়ায় এখানে কাঠ সংগ্রহের জন্য আসা কোনো বাওয়ালির নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ হয়েছে।

দক্ষিণের জেলা বরগুনার মোট আয়তন ১ হাজার ৮৩১ বর্গ কিলোমিটার যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের এক দশমিক ২৭ ভাগ। আয়তনের বিচারে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে বরগুনা জেলার অবস্থান ১১তম স্থানে ও বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৩৭তম এবং বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে।

বরগুনা জেলায় ছয়টি উপজেলা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বরগুনা সদর, আমতলী, বেতাগী, তালতলী, বামনা ও পাথরঘাটা। তালতলী নবগঠিত উপজেলা। জেলায় বরগুনা সদর, বেতাগী, আমতলী ও পাথরঘাটা এই চারটি পৌরসভা রয়েছে। জেলার আওতায় ৩৮টি ইউনিয়নে ৩১১টি মৌজা বা মহল্লা ও ৫৬৩টি গ্রাম রয়েছে।

দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠ, সবুজ ছায়াঘেরা নিসর্গ, চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নদ-নদী আর বঙ্গোপসাগরের কোলে শুয়ে থাকা অপার সৌন্দর্যের সুষমামণ্ডিত জনপদের নাম বরগুনা। প্রকৃতি যেন এখানে স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে। প্রকৃতির রূপ, লাবণ্য আর সৌন্দর্যের নান্দনিক আবহ জুড়ে আছে দক্ষিণের এই জেলার ধূলিকণা, অস্থি-মজ্জা আর উর্বর মৃত্তিকার ত্বকে। হরেক পাখির কলরব, বঙ্গোপসাগরের শোঁ-শোঁ গর্জন ধ্বনি আর বনানীঘেরা নিসর্গ—এ যেন সৌন্দর্যের মিলনমেলা। পদ্মা, মেঘনার পলল ভূমি দিয়ে গঠিত বরগুনা জেলার একদিকে লবণ জল অন্যদিকে মিঠা জলের প্রবাহ। এর পশ্চিমে পিরোজপুর, বাগেরহাট জেলা, পূর্বে পটুয়াখালী এবং উত্তরে ঝালকাঠি ও দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বিষখালি নদী তীরের জনপদ ফুলঝুরিতে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বরগুনার প্রশাসনিক ক্রমবিকাশের সূচনা হয়েছিল।

www.pathagar.com

বরগুনা জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

বরগুনা ছিল আমতলীর গুলিশাখালী থানার আওতায়। পরবর্তীকালে ১৯০৪ সালে আমতলী থানা থেকে বরগুনাকে আলাদা করে এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ থানা স্থাপন করা হয়। ১৯৬৯ সালে বরগুনা থানাকে মহকুমায় রূপান্তরিত করা হয়। আর এর অধীনে বরগুনা সদর, বেতাগী, আমতলী, বামনা ও পাথরঘাটা থানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৩ সালে বরগুনা শহরকে পৌরসভার মর্যাদা দেন তৎকালীন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার সরকার। বরগুনা পৌরসভায় ওই বছরের প্রথম নির্বাচনে জেলার বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও তৎকালীন মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল লতিফ মাস্টার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ বহু আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বরগুনা মহকুমা থেকে জেলায় রূপান্তরিত হয় এবং জেলায় প্রথম জেলা প্রশাসক হিসেবে মো. বদিউজ্জামান দায়িত্ব পালন করেন।

খ. ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা

বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণ সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত বরগুনা একটি জেলা। কক্সবাজার জেলার পশ্চিম-উত্তরে, মধ্য বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে ২১°-৫০´-০৫´´ থেকে ২৩°-০৪´-১০´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°-৫৯´-৫০´´ থেকে ৯১°-০৪´-৮৮´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থান সমুদ্রতল থেকে ১১´ উর্ধে অবস্থিত। পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও বাগেরহাট জেলা বেষ্টিত বরগুনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। জেলার আয়তন ১ হাজার ৪শ ৯৫ দশমিক ১৩ বর্গ কিলোমিটার। জেলার ভূগঠন পূর্ব ও পশ্চিমাংশে একটু উঁচু, মধ্যভাগ নিচু বঙ্গোপসাগর থেকে ১১´-১২´ উঁচু ভূমি। ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ, নদ-নদী, নালা-খাল, সাগর সৈকত, মোহনা, চর, দ্বীপ, ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস নিয়ে বরগুনা জেলার একটি নিজস্ব বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক কারণেই এখানে সবুজের সমারোহ চারদিক জুড়ে। বরগুনার সর্বত্র ঘন বন, ফলজ-বনজ গাছ-গাছালি আর অবারিত ফসলের মাঠ। দেখলে মনে হবে যেন ওপর থেকে ছেঁটে দেওয়া কোনো ঘন অরণ্য। প্রকৃতির এই অনন্য সুষমার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক এ জেলার মানুষের নিত্যসঙ্গী। নির্মল প্রকৃতির সাময়িক বৈরিতা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বাঁচতে হয় এ জেলার মানুষকে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব মোকাবিলায় এখনও সক্ষমতা অর্জন করতে না পারায় এই সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে এ জেলার মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর।

জোয়ার-ভাটা : বরগুনার কাছাকাছি সমুদ্র থাকায় এখানে দিনে দুবার জোয়ার ও ভাটা হয়। জোয়ারের সময় নদী খাল বিল পানিতে ভরে যায়। আবার ভাটার সময় নদী খালে পানির পরিমাণ অনেকটা কমে যায়।

ডালা গোন, জোবা গোন : পূর্ণিমা ও অমাবশ্যায়র আগে পরে কয়েক দিন সমুদ্রে জলস্ফীতি ঘটে। সেকারণে জোয়ারের সময় নদীগুলোর জল স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়ে। একে এ অঞ্চলে জোবা গোন বলে। জোবা গোন হলো ভরা কটাল। অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার প্রভাব কেটে গেলে জলের চাপ কমে যায়। একে ডালা গোন বলে। ডালা গোন হলো মরা কটাল।

www.pathagar.com

মোহনা : অপরূপ প্রাকৃতিক ও বৈচিত্র্যে ভরা এই জেলার মোহনা মানুষকে কাছে টানে। এসব মোহনায় রয়েছে বেশ কিছু চর। চর ও মোহনার মানুষেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে যেমন মিতালি করে বসবাস করছে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। জেলায় দুটি নদীর মোহনা রয়েছে। বিষখালি নদী ও বলেশ্বর নদ হরিণঘাটায় মিলিত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। প্রমত্তা পায়রা নদী বঙ্গোপসাগরে মিলে আরেকটি মোহনার সৃষ্টি হয়েছে।

চর-দ্বীপ ও সৈকত : বরগুনার সৌন্দর্যকে অবারিত করেছে বেশ কয়েকটি চর ও দ্বীপ। এর মধ্যে বিষখালি, বলেশ্বর ও পায়রা নদীর সঙ্গমস্থলে সোনাকাটাচর, ফাতরার চর (টেংরাগিরি বনাঞ্চল), তেঁতুলবাড়িয়ারচর, নলবুনিয়ারচর, আশারচর, লালদিয়ারচর, ছোনবুনিয়াচর ও সোনাতলাচর। এসব চরের আয়তন জেলার মোট আয়তনের ০.১১ ভাগ। এছাড়া জেলার দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর। এই সাগর তীরে জেলার মূল ভূমি সংলগ্ন বড় সৈকত রয়েছে।

জলবায়ু : বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো বরগুনা জেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এই জেলার ষড়ঋতুর মধ্যে তিনটি মৌসুম জোড়ালভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্ম মৌসুম সাধারণত মার্চ থেকে মে পর্যন্ত। এই সময়কে অনেকটা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এসময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকে সীমিত। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড়, বন্যা ও দমকা বাতাস বইতে থাকে। যাকে কালবৈশাখি বলে। তবে এ জেলায় কালবৈশাখি ও শিলা-বৃষ্টির প্রকোপ কম। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষা মৌসুম স্থায়ী হয়। বছরের প্রায় ৯০ ভাগ বর্ষণ হয় এই সময়। নভেম্বরে শীত শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাধারণত তা স্থায়ী হয়।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাব প্রধানত জুন-জুলাই ও অক্টোবর-নভেম্বরে বেশি হয়। ফলে এ জেলায় সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি বেশি।

মাটি : বরগুনা জেলার ভূ-প্রকৃতি সমতল ধরনের। আর মাটি প্রধানত পলিময় এঁটেল প্রকৃতির। কিছু এলাকায় আবার দো-আঁশ মাটিরও আধিক্য আছে। তাই বরগুনার ভূ-ভাগকে দুটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—ক. গংগা কটাল পলল ভূমি এবং খ. মেঘনা পলল ভূমি।

ক. গঙ্গা কটাল পলল ভূমি জেলার উত্তর-পশ্চিম এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকাটি অপেক্ষাকৃত পুরনো সমতল ডাঙা এবং প্রশস্ত বিল ভূমি দ্বারা গঠিত যা ছোট-বড় খাল দ্বারা বিভক্ত। এসব এলাকায় সাধারণত বৃষ্টি ও জোয়ারের জলে স্বল্প গভীরতায় প্লাবিত হয়।

খ. মেঘনা কটাল পলল ভূমি বরগুনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ ভূ-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে দক্ষিণের চর এবং দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি লবণাক্ত মেঘনা সমুদ্র পলল ভূমি দ্বারা গঠিত। জেলার এই এলাকায় বৃষ্টি ও জোয়ারের জলে স্বল্প গভীরতায় এবং কিছু অংশ মাঝারি গভীরতায় প্লাবিত হয়।

www.pathagar.com

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বরগুনার ইতিহাস ও লোকজ ধারণা থেকে বলা যায় যে, বরগুনা নামের ভূখণ্ডটির আনুষ্ঠানিক নামকরণ হয়েছিল সম্ভবত ১৮৭১ সালে তৎকালীন পটুয়াখালী মহকুমা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ইতিহাস ঘেঁটে যা পাওয়া যায় তাতে ত্রয়োদশ শতকে এ অঞ্চলে আবাদের কোনো নমুনা উদ্ধার করা যায়নি। তবে চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে বেশ কিছু জমিদার, রাজা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ এলাকা শাসন করেছেন, এমন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়। ওই সময়ে বরগুনা জনপদের সৃষ্টি না হলেও গোটা দক্ষিণাঞ্চল ছিল বাকেরগঞ্জের আওতায়। বস্তুত, তখন বাকেরগঞ্জ নামকরণ হয়নি। তখন এটা ছিল বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অর্ন্তগত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ওই সময়ে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের বাসিন্দারা মগ, পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা বার বার আক্রমণ, উপর্যুপরি ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে সীমাহীন ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিন কাটাত।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে শায়েস্তা খানের ছেলে উমেদ খান বাকলা চন্দ্রদ্বীপের বিভিন্ন স্থান থেকে মগদের নির্মমভাবে দমন-পীড়ন করে চন্দ্রদ্বীপে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করেন। এতে খুশি হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব পুরস্কার হিসেবে উমেদকে চন্দ্রদ্বীপের একটি পরগনা দান করেন। এই পরগনাটি উমেদপুর পরগনা হিসেবে পরিচিত। বর্তমান বরগুনা জেলা ওই পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কথিত আছে নবাব আলী বর্দি খা'র শাসনামলে একদল আরাকানি (রাখাইন) বরগুনা সদর উপজেলার বালিয়াতলী এলাকায় এসে সেখানে ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে। একইসঙ্গে তাঁরা সেখানে আবাদও শুরু করে। মূলত তাঁদের দেখাদেখি দেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু লোক এখানে এসে বসতি গড়ে এবং বনাঞ্চল কেটে আবাদ শুরু করে।

তবে বরগুনা সদর উপজেলার উত্তরে আয়লা-ফুলঝুরি, বেতাগী এলাকায় এর অনেক আগেই বসতি ও আবাদ শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। এর স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তিও রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, ১৪৬৫ সালে বাংলার স্বাধীন সুলতান বারবেক শাহের আমলে আজকের মির্জাগঞ্জ উপজেলার মজিদবাড়িয়ায় একটি শাহী মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া সুবেদার সুজা যখন ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার সুজাবাদে জলদস্যু ও লুণ্ঠণকারি দুর্বৃত্তদের দমনে দুর্গ তৈরি করেন, তখন নেয়ামত শাহ নামে এক ধর্মপ্রচারক বেতাগী উপজেলার বিবিচিনি গ্রামে আস্তানা গড়েন। যুবরাজ সুজা ওই ধর্মপ্রচারকের অনুরোধে বিবিচিনি গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। এই ঐতিহাসিক মসজিদটি এখনও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। ধর্মপ্রচারক নিয়ামত শাহের সঙ্গে তাঁর দু'বোনও ছিলেন। এদর একজনের নাম চিনিবিবি আর অন্যজনের নাম ইছাবিবি। চিনিবিবির নামানুসারে গ্রামটির নামকরণ হয় বিবিচিনি আর সেখানে খনন করা বিশাল একটি দিঘি। নামকরণ করা হয় ইছাবিবির দিঘি। আর নিয়ামত শাহের নামানুসারে নেয়ামতি এলাকার নামকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

কথিত আছে, ওই সময়ে বিষখালি নদীটি সুগন্ধা নদীর অংশবিশেষ ছিল এবং এর জল এত বেশি লবণাক্ত ছিল যে, মানুষ তা মুখে নিতে পারতো না। একদিন চিনিবিবি নদীতে নেমে লবণ জল মুখে নিয়ে তিন ঢোক জল পান করে বলেন, 'জলের বিষ খেয়ে ফেললাম'। সে থেকে নদীর নামকরণ হয় 'বিষ খাই' যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় 'বিষখালিতে'।

পলাশী যুদ্ধের পর এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের নানা প্রমাণ মেলে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা অবাধ বাণিজ্য সুবিধা পাওয়ায় তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার দক্ষিণে তাঁরা লবণ ব্যবসা শুরু করে। বিভিন্ন এলাকার নিরীহ লোকজনকে জোরপূর্বক ধরে এনে বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় লবণ তৈরি করাত। ইংরেজরা এ অঞ্চলের লোকদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত এবং তামাক সেবনে বাধ্য করত। তাঁদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বিবিচিনি ও নেয়াতির প্রতাপশালী জমিদার আইনুদ্দিন শিকদার। তখন বণিকেরা তাঁকে দস্যু আখ্যা দিয়ে ১৭৮৯ সালে জমিদারি কেড়ে নেয়। ইংরেজদের প্রধান লবণ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল ঝালকাঠি, নেয়ামতি ও আমুয়া বন্দর। আজও লবণ উৎপাদনে এসব এলাকায় পুরনো সেই ঐতিহ্য বিদ্যমান আছে।

১৮৯৯ সালের পর এ অঞ্চলের বামনা-রামনা ও আয়লা-ফুলঝুরি এলাকা নিয়ে বড় দুটি তালুক ছিল। ১৮০০ সালে সাবেক বাকেরগঞ্জ জেলার দুর্গাপাশা গ্রামের মাহমুদ শফি চৌধুরী মতান্তরে সফিজউদ্দীন চৌধুরী চীনাদের সহায়তায় লবণের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে বামনা এলাকার উত্তর প্রান্তে ছোট একটি লবণের কারখানা স্থাপন করেন। চীনা ভাষার অনুকরণে ওই এলাকার তখন নামকরণ হয় চেচাং। অবশ্য চীনারা তখন স্থায়ীভাবে নলছিটিতে বসবাস করত। এই শফি উদ্দীন চৌধুরী ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে বোর্ডের কাছ থেকে ১৮০৯ সালে বামনা-রামনা তালুকের বন্দোবস্ত নেন। চেচাং থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণে তিনি বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। তাঁর নামানুসারে বামনার সেই গ্রামের নামকরণ করা হয় সফিপুর। আনুমানিক ১৮১২ অথবা ১৮১৪ সালে শফি চৌধুরী তাঁর বাড়িতে এলাকার প্রথম জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি আজও কালের সাক্ষি হিসেবে রয়েছে। বাড়ির চারদিকে সাহেবি আদলে বিদেশি গাছ-গাছালি লাগানোয় বাড়িটির নাম হয় 'সাহেব বাড়ি'। বামনা শহর এখনও সাহেব বাড়ি বাজার বলে স্থানীয় লোকজনের কাছে পরিচিত। এই বাড়িতে রংমহল, গোল কামরা, হামামখানা, মাটির নিচে বন্দিশালাসহ নানা কিছু ছিল। সেসব স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও রংমহলের একটি প্রাচীর আজও বামনা বাজারের কেন্দ্রস্থলে তার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

কালের প্রবাহে শফি উদ্দীন চৌধুরীর ছেলে হোসেন চৌধুরী তাঁর ছেলে আফসার উদ্দীন চৌধুরী এবং তাঁর অপুত্রক ফকরুদ্দীন চৌধুরীর চরম বিলাসি জীবন-যাপন ও প্রজাদের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের ফলে তাঁদের জমিদারি নিলামে ওঠে। রামমোহন সাহা নামে অপর এক ব্যক্তি তা কিনে নেন। আর তখন থেকেই শফি উদ্দীন চৌধুরীর জমিদারি বিলুপ্ত হয় এবং জমিদার বাড়িটি বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে বামনা বাজার বিষখালি নদীর তীব্র ভাঙনের মুখে পড়লে সাহেব বাড়িটি আবাদ করে বিভিন্ন দপ্তর ও

www.pathagar.com

বাজার আরও দক্ষিণ দিকে (বর্তমানে যেখানে আছে) স্থানান্তর করা হয়। তবে শফি চৌধুরীর বংশধর ছিদাম চৌধুরী ১৮১০ সালে পাথরঘাটা উপজেলার জামপাড়া তালুকের বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আর বরগুনা সদরের আয়লা-ফুলঝুরি তালুকটি ইংরেজ সরকারের তহশিলদার কালীপ্রসাদ মজুমদার ১৮০৫ সালে মাত্র ৩০৫ টাকায় বেনামে বন্দোবস্ত নেন বলে নথিপত্র ঘেঁটে পাওয়া যায়। তিনি ১৮১২ সালে এই তালুক ঢাকার নওয়াব হাফিজুল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেন।

চন্দ্র দ্বীপের রাজা, মোগল সম্রাটদের নিযুক্ত জমিদার কিংবা নওয়াবদের আমলে জেলা, মহকুমা অথবা থানা বলতে কোনো প্রশাসনিক ইউনিট ছিল না। আঠারো শতকের মধ্যভাগে পূর্ব বাংলার আলোচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন আগা বাকের খান নামে একজন পরাক্রমশালী জমিদার। তাঁর জমিদারি বিস্তৃত ছিল আজকের পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলা পর্যন্ত। এই অঞ্চলের নাম ছিল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৭৯৭ সালে ৭ নম্বর কার্যবিবরণী (রেজুলেশন) অনুযায়ী আগা বাকের খানের নামানুসারে বাকেরগঞ্জ জেলা সৃষ্টি করেন। জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বিষখালি নদী তীরের ফুলঝুরিতে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়। এই ফাঁড়িটি ছিল আমতলীর গুলিশাখালী থানার আওতায়। পরবর্তীকালে ১৯০৪ সালে গুলিশাখালী থেকে বরগুনাকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে একটি স্থায়ী পুলিশ কেন্দ্র বা থানা নির্মাণ করা হয়। মূলত এটাই বরগুনাকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছিল প্রথম ধাপ। বরগুনা পূর্ণাঙ্গ থানা ইউনিটে রূপান্তরের পর বঙ্গোপসাগরের তীরঘেঁষা চরগুলোতে মানুষের পদচারণা শুরু হয়। এই থেকে মানুষ স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস শুরু এবং জমি আবাদ করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতে থাকে। পাশাপাশি সুন্দরবনের গাছ-গাছালি সাফ করে বাড়াতে থাকে আবাদি জমি। আর ক্রমশ বরগুনার ভূখণ্ড বিস্তৃত হতে থাকে।

ঘ. জনজাতির পরিচয়

বর্তমানে বরগুনা অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষের ধর্ম ইসলাম–মুসলিম ধর্মাবলম্বি। মুসলমানরা নিম্নবর্গের। কৃষি ও মাছ ধরা তাদের মূল পেশা। সৈয়দ যা উচ্চ শ্রেণির মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম। যা দু-চারজন আছে তারা বহিরাগত।

হিন্দু ধর্মাবলম্বির সংখ্যা বর্তমানে বেশ কমে গেছে। এই সম্প্রদায়ের প্রায় সবই নিম্নবর্গের-নমশূদ্র। ব্রাহ্মণ, কায়স্থর সংখ্যা খুবই কম। ব্যবসায়িক সূত্রে কামার, স্যাকরা, কুমোর, সাউদ, কুণ্ড, পোদ–এরকম মুষ্টিমেয় হিন্দু আছে। তারা মূলত বহিরাগত। বিভিন্ন হাট-বাজারে ব্যবসার সূত্রে তারা উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, বিয়ে, পারিবারিক রীতিনীতিতে স্থানীয় নমশূদ্রদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা খুবই কম। বেতাগীতে একটি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

তালতলীতে রাখাইন সম্প্রদায় আছে, তারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি। তাদের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি পোশাক-আশাক সম্পূর্ণ আলাদা।

এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের পেশা কৃষিকাজ। হয় নিজের নয়তো পরের ক্ষেতে কৃষিকাজ করে থাকে। এ ছাড়া মাটিকাটা, কাঠমিস্ত্রি, দালান কোঠা ওঠানোর কাজ, বেত-বাঁশের কাজ, নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা ইত্যাদি পেশায়ও অনেক লোক কাজ করে। হাট-বাজারে, ছোট ছোট দোকানদারি, ধানচাল, কলাই, সুপারিশ, কলা-কচু ইত্যাদি ব্যবসায় কিছু লোক নিয়োজিত আছে। এদের বলা হয় টরিয়া-অর্থাৎ ছোট ব্যাপারি। আর যারা ধান-চালের বড় ব্যবসা করে তাদের বলা হয় ফড়িয়া।

ধান-পান, নারকেল-সুপারিশ, কলা-কচু এ অঞ্চলের প্রধান ফসল। লোকজন কুশলাদি জিজ্ঞেস করা সময় বলে, 'এবার ধান-পান কেমন অইচে', তারও কথা জানতে চায়। এ ছাড়া নদীর চরাঞ্চলে ফুটি-তরমুজ ও মিষ্টি আলু চাষ হয়। চাষ হয় মরিচেরও। অন্যান্য তরিতরকারিও ফলন হয় প্রচুর।

এ অঞ্চলে দু-তিন দশক আগেও গ্রামভিত্তিক ধর্ম গোলা ছিল। এই ধর্মগোলা ছিল গ্রামভিত্তিক যা সামাজিকভিত্তিক। একটি গ্রামের বা সমাজের লোকজন একটি বাড়িতে বাঁশের চাচ দিয়ে একটি গোলা তৈরি করত। গ্রামাবাসী যার যেমন সাধ্য অনুযায়ী সেই গোলায় ফসলের মৌসুমে—পৌষ মাস মাসে ধান রেখে যেত। অভাবের সময় শ্রাব' কিংবা কার্তিক মাসে যার প্রয়োজন হতো সে সেই পরিমাণ ধান নিয়ে যেত। আব' পৌষ মাঘ মাসে সেই পরিমাণ ধান রেখে যেত। গ্রামেরই একজন হিসাব রাখত বর্তমানে ধর্মগোলার প্রচল খুবই কমে গেছে। বামনা থানার সরকার হাওলা গ্রামে স্বপন হালদার ও কিরণ মিস্ত্রি জানালেন, সীমিত আকারে তাদের গ্রামে এখনও ধর্মগোল প্রচলন আছে।

খাল বিল নদী নালা বেষ্টিত বরগুনা জেলায় শীত ও গ্রীষ্মকালে সুপেয় পা' জলের অভাব হয়। পাথরঘাটা থেকে আমুয়া বেতাগী পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ল পানির আধিক্য থাকে। সেজন্য এলাকায় বড় বড় দিঘি ও পুকুরের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় এই এলাকা সুন্দরবন বেষ্টিত ছিল। দেড় দুশো বছর আগে জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষ বসবাস ও চাষাবাস শুরু করে। এই অঞ্চলে মগ ও পর্তুগিজদের উৎপাত ছিল এক সময়। মগদের অত্যাচারের কথা এখনও মানুষ মনে রাখছে 'মগের মুল্লুক পাইচনি' এই প্রবচনের মাধ্যমে। মগরা এখন রাখাইন নামে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে।

পর্তুগিজদের কথাও মানুষ স্মরণে রেখেছে। সুন্দরবন অধ্যুষিত এই অঞ্চলে পর্তুগিজেরা এক সময় বঙ্গোপসাগরে লবণাক্ত জল ধরে লবণ উৎপাদন করত। তারা স্থানীয়দের ধরে এনে লবণদাস বা মালাঙ্গী হিসেবে খাটাত। তাদের প্রয়োজন ছিল মিষ্টি পানির। তাই তারা বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় দিঘি খনন করিয়েছিল। এ রকম তিনটি দিঘির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই দিঘিগুলো ছিল বিশাল, পাড়গুলো ছিল খুব উঁচু। কালের প্রবাহে দিঘিগুলো মজে বুজে গেছে, দখল হয়ে গেছে। কিন্তু পাড়গুলো এখনো আছে। ৩০-৪০ বছর আগেও এসব দিঘিতে পানি ছিল, মাছ ছিল। তিন কিলো মিটারের মধ্যে এ রকম তিনটি দিঘি হলো বামনা থানার দক্ষিণ রামনায় একটি,

www.pathagar.com

ডৌয়াতলা ইউনিয়নের উত্তর কাকচিড়া গ্রামের কাছারি বাড়ি কাছে একটি, আর চৌদ্দ ঘরে একটি পুরানো দিঘি রয়েছে। ষাটের দশকে সরকারি উদ্যোগে এ অঞ্চলে পানীয় জলের জন্য খাস পুকুর কাটা হয়। এরকম কয়েকটি পুকুর হলো বামনা থানার রামনা ইউনিয়নে মোল্লা বাড়ির পুকুর। ভাইজোড়া মৃধা বাড়ির পুকুর, পাথরঘাটা থানার রায়হানপুর ইউনিয়নের মাদারতলী গ্রামের খাঁয়েদের বাড়ির পুকুর, জামিরতলা গ্রামে করিম হাওলাদারের পুকুর, বেতমোর গ্রামের মনু মাস্টারের বাড়ির পুকুর। বর্তমান এসব পুকুর আর পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হয় না। সরকারি উদ্যোগে প্রায় সব গ্রামে গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। লোকজন খাবার জন্য এসব নলকূপের পানি ব্যবহার করে থাকে।

এক সময় এই অঞ্চলে প্রধান যানবাহন বলতে ছিল নৌকা। কিন্তু বর্তমানে নৌকার প্রচলন কমে গেছে। দুরযাত্রায় ছিল গয়না নৌকা তাও নেই। গয়না নৌকার পরিবর্তে আসে স্টিমার ও মোটর লঞ্চ। যাত্রী স্বল্পতার কারণে এর সংখ্যাও কমে গেছে।

গত ১০-১৫ বছর রাস্তা ঘাটের উন্নতি হওয়ায় রিকশা, বাস, টেম্পু, টমটম, স্কুটার, মোটর সাইকেলে লোকজন চলাচল করছে। ভাড়ায় চালিত মোট সাইকেল বেকার তরুণদের নতুন কর্মসংস্থান দিয়েছে।

বরগুনা জেলা তফা দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলো ছোট ছোট। ঘনবসতিপূর্ণ। গ্রামগুলো গড়ে উঠেছে নদীর তীর ও নদী থেকে ওঠা ছোট বড় অসংখ্য যে খাল রয়েছে তার দুপাড়ে। এখন খুব কম গ্রাম পাওয়া যাবে যার পাশ দিয়ে নদী ও খাল প্রবাহিত হয়নি। আজকের দিনে হয়তো কোথাও কোথাও জনসংখ্যা বাড়ার কারণে মাঠের মধ্যে সেখানে খাল নেই, সেখানে দু-চারটি বাড়ি উঠছে। নতুন নতুন প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের ফলে তার দুপাশেও কিছু কিছু বাড়ি ঘর উঠছে।

নদী ও খালের পাড়ে গ্রামগুলো গড়ে ওঠার ভৌগোলিক ও বাস্তব কারণ রয়েছে। যোগাযোগের সুবিধা ও পানির সহজ প্রাপ্যতা আর মাছের প্রাচুর্য। মাছে-ভাতে যে বাঙালি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দক্ষিণ বাংলা। এই অঞ্চলে নানা জাতের মাছ পাওয়া যায় নদী ও খালে বিলে। আর যোগাযোগ বলতে এক সময় একমাত্র বাহন ছিল নানা ধরনের নৌকা। নদী ও খাল ছাড়া তো নৌকা চলে না।

এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান হাটগুলো নদী ও বড় খালের পাড়ে অবস্থিত। এরও কারণ হলো নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা। বরগুনা সদরসহ প্রতিটা থানা/উপজেলা নদী ও খালের পাড়ে অবস্থিত। এরও কারণ যোগাযোগের প্রধান বাহন নৌকা।

ঙ. নদ-নদী ও খাল

নদ-নদী, খাল

বলতে গেলে বরগুনার ভূখণ্ডটির চারপাশে ঘিরে আছে অসংখ্য নদ-নদী আর খাল। পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ ও মধুমতি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত বরগুনা জেলা। বরগুনার প্রকৃতি নদী আর সাগর নির্ভর। জেলার প্রধান নদ-নদী হচ্ছে পায়রা, বিষখালি, বলেশ্বর ও হরিণঘাটা।

www.pathagar.com

বিষখালি নদী

এছাড়া খাকদোন, টিয়াখালী নদী, বগীরখাল, বেহুলা নদী, চাকামাইয়া দোন, নিদ্রাখাল, আমতলী নদী ইত্যাদি জেলার প্রধান কয়েকটি নদী ও খাল। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে ৩০০ প্রাকৃতিক খাল রয়েছে। এ জেলায় মোট ১৬০ বর্গ কিলোমিটার নদী রয়েছে। যা জেলার মোট আয়তনের ২২ ভাগ। বরগুনা জেলার উপর দিয়ে দুটি নদী প্রবাহিত। পায়রা ও বিষখালি। পাশ দিয়ে প্রবহমান বলেশ্বর ও নীলগঞ্জ। তাছাড়া জেলার উপর দিয়ে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খাল। বিষখালি ও পায়রা নদী নিয়ে এলাকায় উপকথা আছে। যেমন, যার স্বামী বিষ খায় হে বিষখালি পাড়ি দেয়। আবার যে দেয় পায়রা পাড়ি হের মাউগ অয় দুফাইরা রাঁড়ি (বিধবা)। নদীগুলো মানুষের দুঃখের কারণ হলেও নদীর পানি দিয়ে কৃষিকাজ, নদী খাল বিলের মাছ মানুষের জীবিকার উৎস। তাছাড়া বরগুনার দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। নদী ও সাগরের তীরে নদী ও সামুদ্রিক সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে এক শ্রেণির মানুষের জীবন প্রবাহ। এই নদী এখনো এলাকার প্রধান যোগাযোগ পথ হিসেবে মানুষের যাতায়ত ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

চ. বনজ সম্পদ

বরগুনা জেলা আজকের এই ভূমি এক সময় সুন্দরবনের অংশ ছিল। বর্তমানে জেলায় বনভূমির পরিমাণ ১২ হাজার ৪৫১ হেক্টর। এছাড়া ছয় হাজার ৯৮৭ হেক্টর সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে, যেখানে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি দেখা যায়। সোনাকাটার চর এরকম একটি এলাকা। এছাড়া জেলায় বন বিভাগের ছয় হাজার ৫৪৯

www.pathagar.com

হেক্টর সৃজিত বন রয়েছে, যেখানে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-আছালি লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে, সুন্দরী, ছইলা, কেওড়া ও গোলপাতা ইত্যাদি।

চর ও বনায়ন

জেলার বেশ কিছু চরে বনবিভাগের আওতায় সৃজিত বন তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনের বনায়নের মধ্যে আছে মোহনায় জেগে ওঠা চর এবং মূল ভূমির সঙ্গে জেগে ওঠা চরাঞ্চল। এসব চরে যেসব গাছ রোপণ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে, কেওড়া, গড়ান, বাবলা, ছইলা, গোলপাতা ইত্যাদি। এছাড়া বাঁধের বাইরে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর আওতায় বনায়ন রয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, নদী ভাঙণ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস থেকে সম্পদ রক্ষায় এই গাছ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সমুদ্র উপকূলীয় বন

জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড় থেকে সুরক্ষিত রাখতে ৬০ এর দশকে সরকার উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়। এই বাঁধের বাইরের ভূমিতে বনায়নের জন্য ১৯৬৬ সালে তৎকালীন সরকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলায়ও ব্যাপক বনায়ন হয়। এরপর বনবিভাগ ১৯৭৬ সালে উপকূলীয় এলাকায় আরও একটি বনায়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু দ্বীপ চর, মূলভূমি সংলগ্ন চর এবং উপকূলীয় বাঁধ বনায়নের আওতায় আসে। এর আওতায় জেলায় বর্তমানে ১২ হাজার ৪৫১ হেক্টর ভূমি রয়েছে। জেলার অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকেও বাঁধ ও রাস্তার দুপাশে বনায়ন করা হয়েছে। বরগুনায় ৬০ হেক্টর জমিতে বনবিভাগ কর্তৃক ফোরসোর বাগান করা হয়েছে।

ছ. জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ

জীববৈচিত্র্য

বরগুনা জেলার উত্তর অংশে লবণবিহীন পলি এবং দক্ষিণ অংশে লবণযুক্ত পলি দ্বারা ভূ-ভাগ গঠিত। তাই স্বাভাবিক কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের মধ্যে উভয়েরই প্রভাব আছে। বরগুনা জেলার ইতিহাস ও প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই জেলার একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল। মানুষের প্রয়োজনে এই বন কেটে তৈরি করা হয়েছে আবাদি জমি। বরগুনা জেলার সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। এখানে প্রচুর বনজ ও ফলজ গাছ রয়েছে। প্রধান গাছের মধ্যে, আম, কাঁঠাল, বেল, নারকেল, আতাফল, শরিফা, কামরাঙ্গা, পাতরাজ, সুপারি, নিম, কড়ই, টল্লাবন, অরিআ, বিলাতিগাব, পলাশ, পেচিগাব, পেঁপে, সোনালু, জাম্বুরা, মান্দার, বট, অশ্বথ, ডুর, জারুল, দেবদারু, সাজনা, খেজুর, পেয়ারা, ডৌয়া, কাউফল, রেইনট্রি, চালতা, পাইনাল কাউ, জামির, আমড়া, জলপাই, বহই, করচা, ছৈইলা, বেত, কেওড়াকান্ত,

www.pathagar.com

গোল, বরই, জাত কড়াই, আমলকি, বাঁশ, সফেদা, তাল, কাঠবাদাম, তেঁতুল, কলা ইত্যাদি। স্থানীয় তৃণ লতা-পাতার মধ্যে দেখা যায়, হারগোজা, নোলা ঝাউ, টামবুল, ছোদাবন, সুন্দরী লতা, শিংগারা, কালশি, কুমারীলতা, মেঠোলতা ইত্যাদি।

জেলার বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন জাতের কুমির, হাঙ্গর, খরগোশ, ডোরাবাঘ, বন্য শূকর, চিত্রা হরিণ ইত্যাদির নাম বলা যায়। বানর, মোছো বিড়াল, বাগদাস, খাটাস, গন্ধগোকুল, ছোট বেজী, বড় বেজী, শৃগাল, উদ বিড়াল, কলাবাদুড়, মধ্যম আকারের বাদুড়, রক্তচোষা বাদুড়, চামচিকা, ব্রাশজেলা সজারু, চূড়াহীন হিমালয়ী সজারু, বাটা, কালো ইঁদুর, বাইট্টা বা নেংটি ইঁদুর, ব্যান্ডিকোটা ইঁদুর, ছোট ব্যান্ডিকেটা ইঁদুর, চিকা, পদ্মা শুশুক এ জেলার প্রধান প্রাণী।

এছাড়া সরিসৃপের মধ্যে আছে, সুন্দি কাছিম, কাউটা কাছিম, গম কাছিম ও দুরা, টিকটিকি, রক্তচোষা, তক্ষক, আর্জিনা, গুইসাপ, দেয়াল টিকটিকি, অজগর,একচক্র জাতিসাপ, দ্বিচক্র জাতিসাপ, শঙ্কিনী, দুমুখো সাপ, কেউটে, ঢোঁড়া সাপ, মাইটে সাপ, দাড়াস সাপ, লাউডগা, প্রায় ৬ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ, মোহনার লাটি সাপ, চন্দ্র বোড়া, সরু কানা সাপ, বামন কানা সাপ ইত্যাদি।

বরগুনা জেলা প্রাকৃতিক সম্পদের আধার। প্রাকৃতিক নৈসর্গের মাঝে অলংকার হয়ে আছে নানা পাখ-পাখালি। পাখির কলরবে এ জেলার মানুষের ঘু ভাঙে। জেলার ছোট পাখিদের মধ্যে পানকৌড়ি, গয়ার, কর্চি বা গুজাবক, হিষেবক বা গো বক, ডাড়বক বা ধলিবক, মাঝারি বক, ছোট বক, নিশা বক বা অক, রঙ্গিলা বা সোনা ডঙ্গা, ঘোঙটা বা বাচি চোরা, বুনো রাজহাঁস, ছোট সরাণ বা মরাল, বড় সরাল, বানহাঁস, বালিহাঁস, চখাচখি, ভবন চিল, শঙ্খচিল বা লাল চিল, কোরা ঈগল, ডাহুক, কোরা, কালো কুট, জলপিপি, লাল হোট টিটি, হলুদ হোটাটিটি, জল চা পাখি, সুচ লেজা চ্যাগা, বাটান, রঙিলা চ্যাগা, পদ্মা জল কবুতর, কালো মাথা, জল কবুতর, মাছ খেকো গাঙচিল, কালচে গাঙচিল, কপোত বা বুনো কবুতর, সবুজ কবুতর বা হরিয়াল, সবুজ ঘুঘু, লাল ঘুঘু, রাজ ঘুঘু বা ধোরাল ঘুঘু, টিলা ঘুঘু, চোখ গেল, বউ কথা কও, পাপিয়া, কালো কোকিল, কানা কোকিল, কানা কুয়া, লক্ষ্মী পেঁচা, কাঠুরে পেঁচা, যুক্ত পেঁচা, রাত চরা পাখি, নাককাঠি, আবাবিল, পাকরা, মাছরাঙা, সবুজ সুইচোর, নীলকণ্ঠ, হুদহুদ, বসন্ত বাউরী বা কপার স্মিথ, বড় সোনালি কুড়ালি, বড় ভাগীরথ, নীলগলা ভাগীরথ, মেঠো কুড়ালি, ভরত, সাধারণ সোয়ালো, বাঘাটিকি, বাদী, কসাই পাখি, কালোমাথা, হলদে পাখি, হলুদিয়া পাখি বা বেনে হনে বউ, কালো ফিঙ্গে, গুবরে শালিক, কাঠ শালিক, ভাত ালিক, ঝুট শালিক, তাড়ুয়া বা হাঁড়ি চাচা, পাতিকাক, দাঁড়কাক, ক্ষুদে সাত সেলি, ফটিকজল, সিপাহী বুলবুল, বুলবুল, লাল বুক চোটক, সাদা ভুরু বরণ বাটা, টুনটুনি, দোয়েল, সাতেরি, সাত ভাইলা, ধূসর টিট, বাদামী উড, নাটাক, গেছো পিপিট, সাদা খঞ্জনা, হলুদ মাথা খঞ্জনা, ফুলচুষি, বেগুনি মৌচষি, বেগুনি পুচ্ছ ভিত্তি মৌচুষি, ছিটা মুনিয়া, লাল মুনিয়া, বাবুই বা বয়নকারী পাখি, চড়ুই ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূল এবং মোহনায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সাগরের এসব মাছের মধ্যে রয়েছে, রূপচান্দা, বাটা, গুইচ্ছা, ভেটকি,পীতাম্বরী, হাউজিপাতা বা

www.pathagar.com

শাপলাপাতা, পাখি মাছ, বাদুড় মাছ, বিদ্যুৎ মাছ,গুর্তা মাছ, চন্দনা ও পদ্মা ইলিশ, সাগর মাগুর, উড়াল মাছ, বংশি মাছ, তুলার ডাটি, ফ্যাসা, কোড়াল, কাটা মৌছি, সাগর কাউন, লোটিয়া, চান্দা, দাতিনা, সাদা পোয়া, ছুরি, তাউল্লা বা তাউড়া, সোলি, রূপালী পটকা, বাদামি পটকা, সুরমা, বিষতারা, ফিতা, ডোরা রঙিলা, গুটি মুর, বাইল্লা, খল্লা, কাউয়া, সাগর চাপিলা, মেদ, সাগর রুই, ভোল, বিড়াল পোয়া, বৈরাগী, কইট্টা পোয়া, ঢেলা, বকথুরিনা, বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, জাবা ইত্যাদি। এরকম প্রায় ১৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ বরগুনা উপকূলে পাওয়া যায়।

মিঠা পানির মাছ : জেলার নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও পুকুরে প্রচুর মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চাপিলা, ফ্যাসা, চিতল, ফলি, রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, নানদিয়া, রায়েক, কমনকার্প, ঘেসো রুই, সরপুঁটি, থাইপুঁটি চোলাপুঁটি, তিতপুঁটি, ফুটনিপুঁটি, দেতোপুঁটি, কোসাপুঁটি, কাঞ্চনপুঁটি, মলা, চেলা, বাঁশপাতা, গুজি আইর, তল্লা আইর, বাঘা আইর, পাঙ্গাস, গোলসা টেংরা, গুলি টেংরা, বুজুরী টেংরা, কাউনে, রোল, কাজলি, বাচা, সিলেন্দা, গজার, শোল, টাকি, ভেদি,তেলো টাকি, উটকল, কুচে, চান্দা, নাপতে কতই, তুন্ডবেলে, ডোরা বেলে, দুধু বেলে, কালতু বেলে, পোয়া, লাল চেউ, ডরকি চেউ, কই, খলিসা, বাইন, খল্লা, কেচি খল্লা, তপসে, গুটি বাইন, তারা বাইন, টেপা, পটকা, তাইরা, তেলাপিয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলের জেলা বরগুনা কালের বিবর্তনে আজ সব দিক থেকে সমৃদ্ধ এক জনপথ। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি রয়েছে, শিল্প, পর্যটন, মৎস্যভিত্তিক নানা সম্ভাবনায় ক্ষেত্র। যুগ যুগ ধরে এখানের মানুষের প্রবল ইচ্ছা, অঙ্গীকার, একাগ্রতা, সততা, কর্মনিষ্ঠা আর শ্রম-সাধনার নাভিমূলে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়ে আজ একটি সমৃদ্ধ জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। একদিনের ঘণ অরণ্য অগনিত মানুয়ের হাতের শশী আর শ্রমের ক্ষয়ে পরিণত হয়েছিল আবাদি ও বসতি ভূমিতে। সময়ের ক্ষয়ে সেই বরগুনা আর্থ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত এক জনপদ। এই জনপদের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে আবারিত সম্ভাবনা আর লোকজ সাহিত্য। এখন প্রয়োজন সেসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রগতির সেই ধারাবাহিকতাকে আরও এগিয়ে নেওয়া।

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

বরগুনার ঐতিহাসিক নিদর্শন বিবিচিনি শাহী মসজিদ

বরগুনা জেলা বেতাগী উপজেলার এক অজোপাড়া গায়ের নাম বিবিচিনি। এই গ্রামের নয়নাভিরাম দৃশ্যে আচ্ছাদিত উঁচু টিলার উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মোগল স্থাপত্যের নীরব সাক্ষী এক গম্বুজ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিবিচিনি শাহী মসজিদ। গোধূলী লগ্নে টিলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় যেন রাঙা কাপড় পরিহিত কোনো এক গাঁয়ের বধূ টিলার উঁচু শিখরে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে। চারিদিকে সবুজের সমারোহে পরিবেষ্ঠিত এ এক হৃদয় ছোঁয়া দৃশ্য, ভাষায়

www.pathagar.com

প্রকাশ করতে গেলে এক কথায় বলা যায় সুন্দর, কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে এ অনুভবের যেন শেষ নেই। দেশে যতগুলো ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান রয়েছে তার মধ্যে এই বিবিচিনি শাহী মসজিদ একটি অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কালের বিবর্তনে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি। হারিয়ে যাচ্ছে তার অতীত রূপের উজ্জ্বলতা। তবুও অবশিস্ট যা কিছু আছে, তা পুরনো ঐতিহ্য ও শৌর্য বীর্জের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে। এই শাহী মসজিদকে ঘিরে রয়েছে অনেক অলৌকিক ঘটনা, অনেক কিংবদন্তি। স্থানীয় লোকজনের জল্পনা-কল্পনার যেন শেষ নেই এই মসজিদকে ঘিরে। অনেকেই মনে করেন, এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিল পরীরা। তাই এই মসজিদকে পরির মসজিদ বলে জানেন স্থানীয়রা অনেকে। এই ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যার নাম এই মসজিদের নামের সঙ্গে একই সুতোয় গাঁথা তিনি হলেন মহান আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তিমান পুরুষ হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সুদূর পারস্য থেকে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লি আসেন। ওই সময় মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা বঙ্গ দেশের সুবেদার এই মহান সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কয়েকজন শিষ্যকে সাথে নিয়ে এই আধ্যাত্মিক সাধক দক্ষিণ বাংলার বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার বিবিচিনি গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন। পরবর্তীকালে তার শিষ্য শাহ সুজার অনুরোধে এই গ্রামেই তিনি এক গম্বুজ বিশিষ্ট শাহী মসজিদটি নির্মাণ করেন। বরগুনা জেলার ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নেয়ামত শাহের কন্যা চিনিবিবির নামের সঙ্গে মিল রেখে এই গ্রামের নামকরণ করা হয় বিবিচিনি। সমতল ভূমি থেকে এই মসজিদটির অবস্থান প্রায় ৪০ ফুট সুউচ্চ টিলার উপর। এর দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট, প্রস্থ ৪০ ফুট। চার পাশের দেয়াল ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া। উত্তর ও দক্ষিণ পাশে তিনটি দরজা খিলানের সাহায্যে নির্মিত। মসজিদের ইটের রং ধুসর বর্ণের। এই ইটের দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি, প্রস্থ ১০ ইঞ্চি এবং চওড়া দুই ইঞ্চি। বর্তমান যুগের ইটের চেয়ে এর আকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। তৎকালীন সময় এই সাধক শাহ নেয়ামত উল্লাহ অনেক অলৌকিক কীর্তি দেখে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বির মানুষ তার কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করতেন। কথিক আছে, তখনকার সময় বিষখালি নদীর পানি প্রচুর লবণাক্ত থাকায় পানযোগ্য ছিল না। তিনি মানুষের এই লবণাক্ত পানি পানের কষ্টের কথা ভেবে তার আধ্যাত্মিক সাধানার আশ্চর্য তসবিহটি বিষ খালির পানিতে ধুয়ে দিলে লবণাক্ত পানি পরিণত হয় মিঠা পানিতে এবং পানি পানের উপযোগী হয়। মতান্তরে কথিত আছে, ওই সময়ে বিষখালি নদীটি সুগন্ধা নদীর অংশবিশেষ ছিল এবং এর জল এতবেশি লবণাক্ত ছিল যে, মানুষ তা মুখে নিতে পারত না। কথিত আছে যে, ওই সময় বিষখালি নদীতে ছিলো কুমীরের অবাধ বিচরণ। তার আলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে বিবিচিনি সংলগ্ন বিষখালি নদী এলাকায় কোনো কুমির আসত না। এই নিয়ম আজও বলবৎ আছে এমন ধারণা এলাকার মানুষের। এই মসজিদকে ঘিরে রয়েছে অনেক আশ্চর্য ঘটনা। প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে অসংখ্য নারী পুরুষ, তাদের মানত পূরণ করার জন্য। তাদের কাছ থেকে জানা যায়, এখানে মানত করলে তাদের মনবাসনা পূর্ণ হয়। প্রতিদিন

www.pathagar.com

অগণিত নারী পুরুষ এসে এখানে নামাজ আদায় করেন। মসজিদের উত্তর পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটি টিনের ঘর। এই ঘরে মহিলারা তাদের মানতের নামাজ আদায় করে। মসজিদের সদর দরজার পাশেই রয়েছে একটি মানতের বাক্স। এই বাক্সে প্রতিদিন মানুষ এসে তাদের মানতের টাকা ফেলেন। মসজিদ পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি আছে। কমিটির সভাপতি বেতাগী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। তার নির্দেশে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে মানতের বাক্স খোলা হয়। মসজিদটির দেয়ালের কিছু কিছু জায়গা ধ্বসে গেলে পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে সরকারের তরফ থেকে তা পুনঃ মেরামত করা হয়। জানা গেছে, শুধু দেশেই নয় মোগল স্থাপত্যের গৌরব ও মর্যাদার সাক্ষী হিসেবে ইতিহাস খ্যাত ব্রিটেন যাদুঘরে এই শাহী মসজিদের নাম উল্লেখ আছে। যা পাঁচশত বছর পূর্বের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

দীর্ঘ অনেক বছর এই ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ সংস্কারবিহীন অবস্থায় থাকার পর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাল মিয়া নামের একজন কেয়ারটেকার নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে তিনিই এই মসজিদের দেখাশুনা করছেন। জানা গেছে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে ১৯৯৩ সালে মসজিদের উন্নয়নের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত মসজিদের তেমন কোনো সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দেখা গেছে দূর-দূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের জন্য এখানে নেই কোনো বিশ্রামাগার, নেই অজুখানা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভালো পায়খানা। মসজিদে আসার পায়ে চলা যে রাস্তা সেটি অনেক দিন পূর্বে হেরিংবন করা হয়েছিল,কিন্তু বর্তমানে রাস্তার অনেক জায়গায় ইট নেই,মাঝে মাঝে ইট ফাঁকা হয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দর্শনার্থীর যারা এখানে আসেন পদে পদে তাদের ভোগান্তির আর সীমা থাকেনা। যে উঁচু টিলার উপর মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে সেই টিলার নিচের চতুর পাশে সীমানা প্রাচীর টেনে নালা নির্মাণ করা দরকার। এটা করা না হলে বৃষ্টির পানিতে টিলার মাটি ধুয়ে সমতল ভূমিতে নেমে গিয়ে এক সময় মসজিদের তার সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। স্থানীয় আবু বকর, সিদ্দিকর রহমান, আফজাল হোসেন, লাল মিয়া অভিযোগ করেন, মসজিদের নামে যতটুকু জমি তা সরকারিভাবে পরিমাপ করে যে পিলার গাঁথা হয়েছিল, কতিপয় অসাধু লোক সেই পিলার অগ্রাহ্য করে দিনে দিনে তাদের জমির পরিধি বাড়িয়ে নিচ্ছে। এই পূরোনো ঐতিহ্যবাহী শাহী মসজিদটি রক্ষা করা এবং এর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে আরও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। একইসঙ্গে এই পুরনো ঐতিহ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এলাকার সাধারণ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একদিন হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পাঁচশত বছরের মোগল স্থাপত্য ঐতিহাসিক নিদর্শনটি। মসজিদ প্রাঙ্গণে রয়েছে তিনটি কবর। এই কবরগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪-১৫ হাত। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শাহ নেয়ামত উল্লাহ ইহলোক ত্যাগ করেন এবং ঐতিহাসিক বিবিচিনির শাহী মসজিদের উত্তর ও পশ্চিম পার্শে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এই কবরেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন কীর্তিমান পুরুষ আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ এবং তার পাশের দুটি কবরে শুয়ে আছেন দুই সহোদররা বিবিচিনি ও ইসাবিবি।

www.pathagar.com

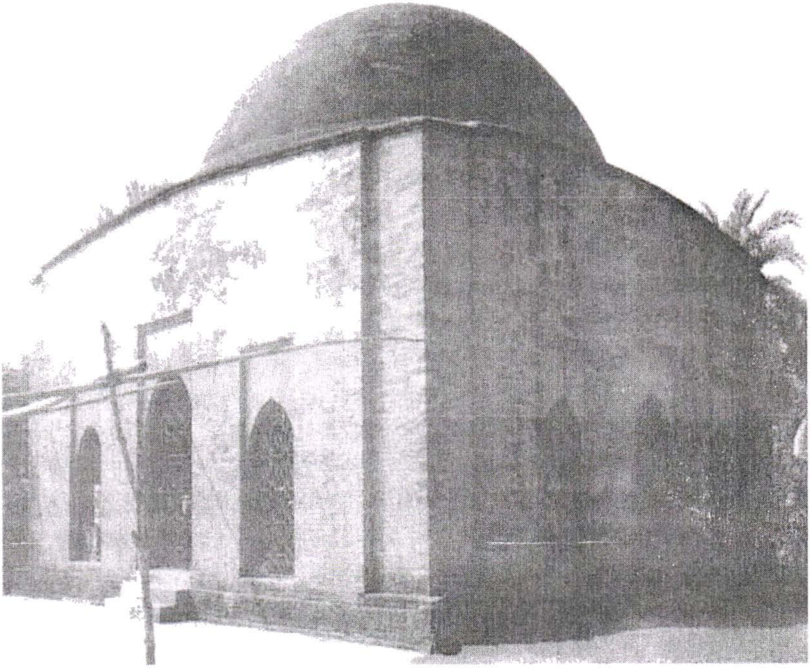

বিবিচিনির শাহী মসজিদ

তালতলীর বৌদ্ধ মন্দির

www.pathagar.com

রাখাইনদের বৌদ্ধ মন্দির ও মূর্তি

ক্যাপ্টেন ক্যোঅং এবং তার সহযোগী রাখাইন রাখাইন নেতা ও কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চল তথা সমুদ্র তীরবর্তী পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় রাখাইন জনপদে গড়ে ওঠে আকর্ষণীয় ধর্মীয়, সামাজিক এক ভিন্নধারা সংস্কৃতির জীবন্ত রূপ। ধমীয় সংস্কৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার জন্য কালজয়ী বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধমূর্তিসমূহ স্থাপন করে রেখে গেছেন তাঁরা। 'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তো। এই শ্লোকটি উচ্চারণ করে জগৎময় সুখ-শান্তির প্রার্থনা করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিরা। শত বছরের পুরনো এসব বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ মূর্তি বর্তমানে পুরাকীর্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বরগুনার বঙ্গোপসাগর তীঁরবর্তী তালতলী থানার রাখাইন অধ্যুষিত এলাকা সমূহে এরকম শত বছরের পুরনো ১৫টি বৌদ্ধ নবগ্রহ ও চৈত্য মন্দির রয়েছে। এসব মন্দির নাভিস্থলে বৌদ্ধমূর্তিসহ বৌদ্ধ ও অহরৎ শ্রাবকদের দেহভস্ম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নবগ্রহ মন্দিরে গ্রহাদি সম্পর্কিত যে কোনো পূজা অর্চনা করা হয়। এতে গ্রহদোষ মুক্ত হয়ে মঙ্গল সূচিত হয়। আর চৈত্য মন্দির হলো বুদ্ধের প্রতীক স্বরূপ।

তালতলীর বুদ্ধ মূর্তি

তালতলী উপজেলার তালতলী রাখাইন প্রধান এলাকা। এখানে একাধিক রাখাইন বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি মন্দির ছিল তাঁতিপাড়ায়। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, স্বাধীনতার পর তাঁতিপাড়ার রাখাইন সমপ্রদায়ের লোকজন হ্রাস পেতে থাকলে পার্শ্ববর্তী কলাপাড়া উপজেলার জনৈক থঞ্চানন মাস্টার সেই তাঁতিপাড়ার মন্দির থেকে অষ্টধাতুর তৈরি আশি মণ ওজনের বুদ্ধ মূর্তিটি চট্টগ্রাম হয়ে বার্মায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে সাম্পানে তুলে রওয়ানা দেয়। তখন বড়বগী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অংকুজান তালুকদার, চানজোয়া তালুকদার, মংখেলা, আমজাদ মৃধা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় লোকজন নিয়ে মূর্তিসহ নৌকাটি আটক করেন। এ সময় রাখাইন নেতৃবৃন্দ মূর্তিটি পার্শ্ববর্তী তালতলী জয়ারামা বৌদ্ধ মন্দিরে (তালতলী বৌদ্ধ বিহার) প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই থেকে মূর্তিটি তালতলী মন্দিরে রয়েছে। ধর্মপ্রাণ রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন পরম শ্রদ্ধায় অষ্টধাতু নির্মিত এ মূর্তিতে তাদের পূজা দিয়ে থাকেন। জানা যায়, মূর্তিটি ১৯১৬ সালে নলবুনিয়া আগাপাড়াতে তৈরি হয়। আশি মণ ওজনের এ মূর্তির সম্পূর্ণ অংশ খাঁটি সোনার প্রলেপে ঢাকা। তালতলীতে আগত পর্যটকদের জন্য এই বুদ্ধ মূর্তি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযোদ্ধের প্রেরণা

একাত্তরের ৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ মুক্তিকামী মানুষদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেরণা জোগায়। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার

www.pathagar.com

সংগ্রাম।" অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার করণে বরগুনার মানুষ ঐদিন সরাসরি সেখানে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর আহবান শুনতে পাননি। পরের দিন ৮ মার্চ রেডিওর মাধ্যমে তারা তাঁর আহবান শুনেছেন। বঙ্গবন্ধুর আহবান শোনানোর জন্য সেদিন তাঁর ভাষণ মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আহবানে উজ্জীবিত হয়ে সেদিন বরগুনার শান্তিকামী মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করে এবং সংগঠিত হতে শুরু করে।

সংগ্রাম পরিষদ গঠন

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পূর্বে ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার পরপরই বরগুনা মহকুমা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। বরগুনা মহকুমা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুল লতিফ মাস্টারকে সভাপতি, সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আসমত আলী সিকদারকে সহ-সভাপতি, মহকুমা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সিকদারকে সদস্যসচিব, সাবেক এমপি রোসমত আলী খান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ন্যাপ তৎকালীন মহকুমা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন খান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির তৎকালীন মহকুমা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোসলেম আলী শরীফ, জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ, আবদুল লতিফ ফরাজী, মো. ইউনুস আলী, আজাহার উদ্দিন মাস্টার, জালাল উদ্দিন মোল্লা, জহিরুল ইসলাম পঞ্চাইত, কালু মোল্লা, আবদুল খবির মাতুব্বর, সিদ্দিকুর রহমান পনু, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান মিয়া, পরেশ তালুকদার, আবদুল হামিদ মিয়া, আবদুর রহমান খাঁ, কাকচিড়ার এনায়েত হোসেন শামসন মিয়া (সাউথ ভাসানী নামে খ্যাত) প্রমুখ আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতাদের নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠন করা হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। এসময় বরগুনা জেলার তৎকালীন মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর কবীরকে আহবায়ক, মহকুমা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ মিয়াকে সদস্য সচিব, মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নাজমুল আহসান দুলাল মাতুব্বর, মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মনোয়ার, মহকুমা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান আহম্মেদ, মহকুমা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন, টিইও জাহাঙ্গীর, দিলীপকুমার সাহা, মো. রশিদ দুলাল, মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য মো. আলতাফ হোসেন, শহিদ অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান, গাজী আবদুল মোতালেব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা শামসুল আলম, মো. আবদুল বারী, সৈয়দ গোলাম রব, জাফরুল হাসান ফরহাদ, গোলাম মোস্তফা, আবুল হোসেন তালুকদার, সমাজসেবক সুখরঞ্জন শীলসহ ছাত্রনেতাদের নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। প্রয়াত জাতীয় সংসদ সদস্য তৎকালীন পটুয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে মো. সিদ্দিকুর রহমান সংগ্রাম পরিষদকেদ পরিচালনা করতেন। তৎকালীন পটুয়াখালী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ও ছাত্রনেতা ঝালকাঠি কলেজের ছাত্র শাহজাহান প্যাদা সংগ্রাম পরিষদের সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ রেখে সহায়তা করেছেন। তৎকালীন এমএনএ আসমত আলী সিকদার ও সাবেক এমপিএ রোসমত আলী খানের নেতৃত্বে দুই সহস্রাধিক লোক ২৩ মার্চ বরগুনা শহরে লাঠি মিছিল করেন এবং মিছিল শেষে সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের শপথ নেন। ঐ সময় সরকারি বালিকা বিদ্যালয়কে সংগ্রাম পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুস শরীফের নেতৃত্বে লাইসেন্সধারী বন্দুক মালিকদের নিয়ে সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়। অপর দিকে বরগুনা মহকুমায় প্রত্যেক থানায় অনুরূপভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তার মধ্যে আমতলীতে আসমত আলী কেরানি, আফাজ উদ্দিন বিশ্বাস, পাশা তালুকদার, নিজাম উদ্দিন তালুকদার, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আমির হোসেন গাজী সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব দিতেন। বেতাগী আবদুল মন্নান মৃধা, নাজেম আলী ও তৎকালীন ছাত্রনেতা হুমায়ুন কবির হিরুর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল।

বামনায় তৎকালীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি আবুল হাসেম, আবদুস শহিদ সিকদার, আবদুল মালেক, সেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান আনোয়ার হোসেন খান মজনু এব ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি আবুল হাসেম-এর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। পাথরঘাটায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মজিবুল হক, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি বারী আজাদ, বামনা-পাথরঘাটার এমএনএ শামসুল হকের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে তৎকালীন থার্ড অফিসার সিরাজ উদ্দীন আহমেদ সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন।

সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম

বরগুনা মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ শুরু করে। এছাড়া তারা সভা সমাবেশ মিছিল করে গণসংযোগের মাধ্যমে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন। বরগুনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে পুরাতন থানার সামনে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিতেন বরগুনা থানার তৎকালীন টিএসআই আছাদুজ্জামান খান আজাদ ও সার্কেল অফিসের রিডার। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউয়িনের নেতাকর্মীরা যুবকদের সাথে নিয়ে বরগুনা থানার রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে বরগুনার সব কটি থানায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ হয়েছিল।

বরগুনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন

বরগুনায় ২৩ মার্চ ঐতিহাসিক বাঁশের লাঠির মিছিল করা হয়। বরগুনার বিভিন্ন ইউনিয়নের হাজার হাজার লোক এ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিল শেষে বরগুনা ঈদগাহ মাঠে জনসভা করা হয়। ঐ জনসভায় পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো হয়। ঐ দিনই আসমত আলী সিকদারের নেতৃত্বে বরগুনা ক্লাবের সামনে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বরগুনার সেকেন্ড অফিসার স্টাফ কোয়ার্টারের বাসার সামনে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করলে তৎকালীন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি দিলীপ কুমার সাহা অন্যঅন্র কর্মীদের সাথে নিয়ে পতাকা নামিয়ে পুড়ে ফেলেন।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৬ মার্চের পরে বরগুনা থেকে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা আস্তে আস্তে শহরের বাইরে চলে যায়। তখন প্রয়াত সিদ্দিকুর রহমান, আবদুর রশিদ, লাকুরতলার কানা ননী ও আবুল বাশার পল্টু তৎকালীন থার্ড অফিসার সিরাজ উদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে স্পিড বোট নিযে বামনার রুহিতার তালুকদার বাড়িতে গিয়ে দুই দিন অবস্থান করেন। সিরাজ উদ্দিন সাহেব জানালেন, পাকিস্তানি সেনারা বরগুনায় আসেনি। এ খবর শোনে তারা আমতলীর গুলিশাখালীর বাজারে গিয়ে সভা করে। সভা চলাকালে পাকিস্তানি সেনারা হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণ করতে করতে পটুয়াখালী শহরে নেমে পরে। তখন তারা গুলিশাখালীর সভা বন্ধ করে বরগুনা চলে আসে। স্পিড বোট জমা রেখে ননী ও পল্টুকে আলমের বইয়ের দোকানে রেখে সিদ্দিকুর রহমান ও আবদুর রশিদ রোডপাড়া গ্রামে চলে যায়। সাহেবের হাওলায় বসে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লোক সংগ্রহ শরু করে। সেখান থেকে তারা মির্জাগঞ্জে দুলাল মৃধার বাড়িতে চলে যান। সিদ্দিকুর রহমান, আবদুর রশিদ, মো. মোশারেফ হোসেন, সুলতান আহমেদ ও আবদুল মোতালেব মৃধা তার বাড়ির কাছ থেকে আনসারদের একটি রাইফেল উদ্ধার করে। সিদ্দিকুর রহমান ও আবদুর রশিদ রাইফেলটি নিয়ে চলে আসেন। তারা সাহেবের হাওলা গ্রামের আবদুল হাইয়ের বাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করেন। রাইফেলটি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দল গঠন করা হয়। সে মাসের মাঝামাঝিতে মহকুমা শান্তি কমিটির সভাপতি সাবেক এমএনএ আবদুল আজিজ মাস্টার, কেওড়াবুনিয়ার আবদুল মোতাবেল মাস্টার, হোসেন মাস্টার, আবদুল রশিদ মাওলানা, চরকগাছিয়ার আজিজ কেরানি, মতি মোক্তার, শ্যামলী সিনেমা হলের মালিক কাকচিড়ার চান মিয়া সিকদার, ফুলঝুড়ির ফেরেস্তালী মাস্টার, রায়হানপুরের খলিল চেয়ারম্যান, বেতাগীর শের আলী মাস্টার, চাদশী ডাক্তার, আজিজ বিএসসি, মফেজ কারীসহ রাজাকাররা পাকিস্তানি সেনাদের স্বাগতম জানিয়ে পটুয়াখীল থেকে বরগুনায় নিয়ে আসে। পাকিস্তানি সেনারা এসেই সিদ্দিকুর রহমান পনু চেয়ারম্যানকে ধরে পটুয়াখালী নিয়ে হত্যা করে। অপর দিকে সাবেক এমএনএ আসমত আলী সিকদার ও সাবেক এমপিএ শাহাজাদা আবদুল মালেক খান ভারতে চলে যান। এমপিএ রোসমোত আলী খন ভারতে রওনা দিলে পথিমধ্যেই দুর্ঘটনায় তার বাম হাত ভেঙে যায়। তকন তিনি বরিশালে আত্মগোপন করেন। অপর দিকে সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে বালিয়াতলী ইউনিয়েন হালিম চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করা হয়। দল গঠন করে ফিরে এসে সিদ্দিকুর রহমান ও আবদুর রশিদ গুদিঘাটার লতিফ খানের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। পরের দিন আছর নামাজের পরে পাকিস্তানি সেনারা স্পিড বোট নিয়ে চান্দখালীর ভারানী খালে আসলে মোসলেম আলী মাস্টারে বাড়ির উত্তর পাশে বসে তারা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে ৪০/৪৫ জন যুবক বরগুনার বিভিন্ন এলাকা থেকে লাইসেন্সধারী বন্দুক সংগ্রহ করে। এ সময় আবদুর রশিদের নেতৃত্বে দুলাল, গিয়াস

www.pathagar.com

উদ্দিন, মকবুল হোসেন, আব্বাস মোল্লা, নুরুল ইসলাম, কুদ্দুস মাস্টারসহ ৩০/৩৫ মিলে ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর আমতলা পাড়ের বাসায় বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রোকের রফিক মাসটার ও আনোয়ার তহশিলদারে ঘর পুড়িয়ে ফেলে। রাজাকারদের সহায়তা করায় এ সময় আনসার মাস্টারের বাসার এক পরীক্ষার্থীর কান কেটে ফেলা হয়। এ সময় শাহজাহান প্যাদা, আনোয়ার হোসেন মনোয়ার, রফিকুল ইসলাম কনু, মাহতাব হোসেনসহ অনেকে বরগুনায় ককটেল ফাটিয়ে পরীক্ষা বন্ধ করে। সেদিন অন্য একটি গ্রুপ জেলা স্কুলে আগুনও ধরিয়ে দিয়েছিল।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আসমত আলী সিকদার, শাহাজাদা আবদুল মালেক খান নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলের সাথে বৈঠক করে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী পটুয়াখালী ও বরগুনা মহকুমাকে নিয়ে বামনার বুকাবুনিয়ায় ক্যাপ্টেন মেহেদী আল ইমামের নেতৃত্বে নবম সেক্টর কমান্ডের সাব-সেক্টর করা হয়েছিল। জহির শাহ আলমগীরকে টুআইসি এবং ৬ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করে পটুয়াখালী-বরগুনায় এলাকা ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়। ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমাম ওখান থেকে মুক্তিযোদ্ধা জুলফিকার জলফু ও আবদুস ছত্তারকে বরগুনা, সুবেদার হাতেম আলী, আলতাফ হোসেন, বজলুর রশিদকে আমতলী ও কলাপাড়া, আবদুল মোতালেব, হুমায়ুন কবির হিরুকে বেতাগী, আবদুল মজিদ ও মোবারক মল্লিককে বামনা, আবুল কাসেম, আলতাফ হোসেন ও আবদুল খালেককে পাথরঘাটা থানা, নুরুল হুদা ও গাজী দেলোয়ার হোসেনকে পটুয়াখালী, আলতাফ হায়দারকে মির্জাগঞ্জ, পঞ্চম আলীকে বাউফল, আবদুর রব ও নুরুল হুদাকে গলাচিপায় কমান্ডারের দায়িত্ব দেন। বেতাগীর আবদুল মন্নান মৃধা, হুমায়ূন কবির হিরু, আমতলীর আজগর আলী আকন, পাশা তালুকদার, আফাজ বিশ্বাস, মঈন কুতুব, নিজাম উদ্দিন তালুকদারসহ অনেকেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সুবেদার হাতেম আলীর নেতৃত্বাধীন আগা ঠাকুরপাড়ার ক্যাম্পে কলাপাড়া থেকে পাকিস্তানি সেনারা এসে নীলগঞ্জ নদী থেকে আক্রমণ চালায়।

সুবেদার হাতেমের তেনৃত্বে সম্মুখ যুদ্ধ হয় এবং সেদিন ৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। ১৪ এপ্রিল হানাদার বাহিনী শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের সহায়তায় বরগুনার বিভিন্ন এলাকা থেকে হিন্দুদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন প্রহলাদ মিস্ত্রী, রামচন্দ্র গাইনসহ অনেকে। ঐদিন গণেশ চন্দ্র গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়েছিলেন। কাকচিড়ার কনককে রায়হানপুর ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনারা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

বুকাবুনিয়া ছিল নবম সেক্টরের আওতায় একটি সাব-সেক্টর। ২৪ নভেম্বর রাতে সেকেন্ড ইন কমান্ড আলমগীরের নেতৃত্বে মোবারক আলী মল্লিক, আবদুল মজিদ মিয়া, আবদুল মোতালেব, আলতাফ হায়দারসহ মুক্তিযোদ্ধারা ভোর পাঁচটায় থানা আক্রমণ করেন। তখন মীর মকবুলের নেতৃত্বে রাজকারেরা আত্মসমর্পণ করেন। পরের দিন বামনা পুরাতন বাজারে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩০

www.pathagar.com

নভেম্বর প্রায় বিনা যুদ্ধে বেতাগী ও পাথরঘাটা থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ৩ ডিসেম্বর আবদুস সত্তার খানের নেতৃত্বে বরগুনা জেলা শহর হানাদার মুক্ত হয়।

আমতলী থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) আতাহার আলী বিশ্বাস স্বাধীনতার প্রত্যাশায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেন। তিনি তাঁর অফিসে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সভা করেন। এই সভায় এ বি এম আসমত আলীসহ অনেক উপস্থিত ছিলেন। সিভিল কমিটি, অর্থ কমিটিসহ মুক্তিবাহিনী তৈরীর জন্য তিনটি কমিটি এই সভায় গঠিত হয়। আমতলী থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন। পটুয়াখালী হানাদার বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প আমতলী থেকে আরপাঙ্গাশিয়ায় স্থানান্তর করা হয়। পরে এই ক্যাম্প স্থানান্তরিত তালতলীর ছকিনায় নেয়া হয়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন বজলুর রহমান, আনসার কমান্ডার আমিন উদ্দিন ও পুলিশ কনস্টবল মোক্তার আলী। বজলুর রহমানকে এজন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। আতাহার আলী আমতলী সার্কেলের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত ১২ লক্ষ টাকা বরগুনা ট্রেজারি থেকে উত্তোলন করে সংগ্রাম পরিষদকে দিয়ে দেন।

এই কার্যক্রমে আমতলীর তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা আসমত আলী কেরানী, আফাজ উদ্দিন বিশ্বাস, পাশা তালুকদার, মঈন, কুতুব, নিজাম উদ্দিন তালুকদার, শাহজাহান কবির ও সিরাজ উদ্দিন সাথে ছিলেন। তালতলীর রাখাইনরা ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৪ ডিসেম্বর আমতলী উপজেলা হানাদার মুক্ত করার জন্য সুবেদার হাতেম আলী, আলতাফ হোসেন চেয়ারম্যান, বজলুর রশিদ দুলাল, আবদুর রব ও জাহাঙ্গীরসহ মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর রাজাকার ও পুলিশ সদস্যরা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মার্চ মাসের শেষের দিকে বেতাগীর তৎকালীন সাব-রেজিষ্টার দলিল উদ্দিনের সহযোগিতায় সিরাজুল ইসলাম পাকিস্তানি পতাকা পুড়ে ফেলেন। আবদুল মান্নান মৃধা ছিলেন বেতাগী সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। সুখরঞ্জন বাবু, আবদুস সোবাহন, আবদুল মোতালেব, নাজেম আলী ও হুমায়ূন কবির হিরু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন। জুন মাসের ৪ তারিখে রাজাকাররা বেতাগী বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। বেতাগীর কুখ্যাত রাজাকার মহারাজ যখন দিনের বেলায় মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করছিল তখন মুক্তিকামী জনতা তাকে ট্যাডাবিদ্ধ করে হত্যা করে।

বামপন্থিদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ

বরগুনা জেলায় বামনা, পাথরঘাটা থানা ও বর্তমান পিরোজপুর জেলায় মঠবাড়িয়া থানায় তখনকার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র উইনিয়ন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) ন্যাপ ও কৃষক সমিতির নেতৃত্ব দেন তখনকার ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আনোয়ার হুসেন। তাঁকে সহায়তা করেন আবদুল হালিম, গোলাম মুস্তাফা পান্না (কথাসাহিত্যিক মুস্তাফা পান্না), গোলাম সরোয়ার কামাল, গোলাম আহাদ জামাল, আব্দুল হাসেম মিয়া প্রমুখ।

www.pathagar.com

এরা একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। এদের ৮টি ট্রুপ ছিল। এরা মূলত বামনা, পাথরঘাটা ও মঠবাড়িয়া নিয়ন্ত্রণ করত। পাথরঘাটা থানার ঝাঁটিবুনিয়াতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ১২ জন রাজাকার নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো লোকক্ষয় হয়নি। বামপন্থিদের এই গেরিলা বাহিনী বুকাবুনিয়া সাব-সেক্টর ও সুন্দরবনের সাব সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে মুক্তযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

বরগুনায় গণহত্যা

বরগুনাবাসীর জন্য রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত দুটো দিন ২৯ ও ৩০ মে। একাত্তরে এ দুটি দিনে বরগুনা জেলখানায় আটককৃত নিরীহ রোষানলের শিকার হয়ে অনেক বাঙালি মুসলমান সেদিন কবরের সাড়ে তিন হাত জায়গা পায়নি, হিন্দুরা পায়নি আগুনের ছোঁয়া। তাদেরকে দেয়া হয়েছে একই গর্তে মাটি চাপা। বরগুনা শহরের পৌর এলাকার শহিদ স্মৃতি সড়ক দিয়ে দক্ষিণ দিকে হেঁটে গেলে চোখে পড়বে লাল রং করা পাঁচিল ঘেরা জেলখানা। জেলখানার দক্ষিণ পাশে শহিদদের গণকবর। যেখানে বরগুনার মুক্তিকামী মানুষদের মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। ১৯৯২ সনে সেখানে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। স্মৃতি সৌধের শ্বেত পাথরে লেখা রয়েছে শহিদদের নাম। ১৯৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের দল আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়েছিল, তাদেরকে এই দু'দিনে হত্যা করা হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ২৬ এপ্রিল তৎকালীন বরগুনা মহাকুমা সদর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা দখলে নেয়। বরগুনার মুক্তিকামী জনতা এ সময় ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য স্পিড বোট নিয়ে রওনা হয়। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিমান হামলা ও মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতের কথা চিন্তা করে এবং নিজেদের কাছে লড়াই করার মতো অস্ত্র না থাকায় আবার ফিরে আসেন। মুক্তিযোদ্ধারা বরগুনা ছেড়ে লোকালয়ে যাবার সুযোগে মুসলিম লীগ, জামায়াত ও অন্যান্য পাকিস্তানপন্থিরা বরগুনা শহর দখল করে এবং সাবেক মুসলিম লীগ নেতা এমএনএ আবদুল আজিজ মাস্টার ও পাথরঘাটার আহের উদ্দিন হাওলাদার পটুয়াখালী গিয়ে ১৪ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের বরগুনা নিয়ে আসে। তখন বরগুনা শহর ছিল প্রায় জন মানবহীন। এসডিওর জেটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পজিশন নিয়ে কোর্ট বিল্ডিং এলাকায় কিছু লোক জড়ো করে ভাষণ দেয়। পরের দিন ১৫ মে পাথরঘাটা থানার বেশ কয়েকজনকে ধরে এনে বিষখালি নদীর তীরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর এ হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিল পটুয়াখালী জেলা সামরিক আইন প্রশাসক মেজর নাদের পারভেজ। এসময় পাথরঘাটার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষণ দাস, তার ছেলে কৃষ্ণ দাস, অরুণ দাস ও স্বপন দাসকে ধরে এনে বরগুনা কারাগারে আটক রাখা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অবস্থানের কারণে সাবেক সিও আতিকুল্লাহ, এস আই আবদুল মজিদ, সিপাহী আড়ি মিয়া ও আবদুল জব্বারকে পটুয়াখালী নিয়ে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের অত্যাচারে বরগুনা শহর ক্রমে লোকশূন্য হতে থাকে এ সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা কূটবুদ্ধির মাধ্যমে মরণ ফাঁদ পাতে। তাদের সহযোগিরা ঘোষণা দেয়, হিন্দুদের কিছু বলা হবে না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা তখন বরগুনা ছেড়ে পটুয়াখালী চলে যায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঘোষণায় আশ্বস্ত হয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বিসহ আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বরগুনা শহরে এসে যার যার বাসায় অবস্থান নেয়। ২৬ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন সাফায়াত চারজন সহযোগী নিয়ে স্পিড বোটে বরগুনা চলে আসে। তাদের আসার খবর সেদিন কেউই জানতে পারেনি। পরের দিন সকালে ২/৩ জন করে লোক ধরা শুরু করে। দুপুরে সামান্য বৃষ্টি হলে লোকজন পালাতে থাকে। তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা সহযোগীদের নিয়ে নাথপাড়া, পশ্চিম বরগুনা ও শহর এলাকা ঘেরাও করে শতাধিক নারী পুরুষকে বেঁধে জেলখানায় নিয়ে যায়। এ সময় মা-বোনরা পালানোর চেষ্টা করলেও চান মিয়া সিকদার সহযোগীদের নিয়ে তাদের ধরে সিনেমা হলের ভিতরে পাশবিক নির্যাতন চালায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্য ও তাদের সহযোগীরা সিঅ্যান্ডবির ডাক বাংলাকে ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে। রাতে অনেক মা-বোনকে জেলখানা থেকে সেখানে নিয়ে গণধর্ষণ চালানো হয়। সকাল বেলায় আবার তাদের জেলখানায় পাঠানো হয়।

২৮ মে পটুয়াখালী জেলা সামরিক আইন প্রশাসক মেজর নাদের পারভেজ বরগুনায় আসে এবং ২৯ মে বরগুনা জেলখানায় প্রহসনমূলক বিচারের ব্যবস্থা করে গণহত্যা শুরু করে। জেলখানার উত্তর-পশ্চিম পাশে বরগুনা জেলা স্কুল অবস্থিত। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও ছাত্ররা স্কুলে এসেছিল। ক্লাস শুরুর ঘণ্টা বাজার সাথে সাথেই প্রচণ্ড গুলির শব্দে শহরময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। বরগুনা জেলখানায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তখন একের পর এক মৃত্যুর কোলে ঢলে পরতে লাগল।

প্রথম দিন তারা ৫৫ জনকে হত্যা করেছিল। অনেকে সেদিন গুলি খেয়ে আধমরা অবস্থায় পরে রয়েছিল। কিন্তু তাদেরও শেষ রক্ষা হয়নি। পরের দিন আবারও ১৭ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। জেলখানায় হত্যা করে তাদের সবাইকে একটি গর্তে মাটি চাপা দেয়া হয়। দুই দিনে ৫ বার গুলি করার পরও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান সকল ঘটার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ফারুকুল ইসলাম। তাবে তার অপর দুই ভাই নাসির ও শানুকে মেরে ফেলা হয়ে ছিল। কেষ্ট ডাক্তার নামে পরিচিত কৃষ্ণ দাস গুলিবিদ্ধ হয়েও প্রাণে বেঁচে ছিল। হামাগুড়ি দিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাস্তা পাড় হবার সময়ে লবণগোলার রাজাকার রাঙ্গা সামসু তাকে ধরে কোদালের বাট দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে হত্যা করে। হত্যা করা হয়েছিল পাথরঘাটার লক্ষ্মণ দাস ও তার ছেলে অরুণকে।

বরগুনা মুক্ত দিবস

একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর। বরগুনার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এদিনে বরগুনাবাসী হানাদার মুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরে বরগুনার মুক্তিকামী

www.pathagar.com

সহস্রাধিক তরুণ বাঁশের লাঠি, গুটি কয়েক রাইফেল, বন্দুক নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে। এরই মধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর দুর্বল প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে পার্শ্ববর্তী পটুয়াখালী জেলা দখল করে ফেলে। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়-ক্ষতির ভয়ে বরগুনার মুক্তিযোদ্ধারা এলাকা ছেড়ে চলে যান। কেননা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করার মতো তাদের কোন অস্ত্র ছিল না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিনা বাঁধায় বরগুনা শহর দখল করে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বরগুনার বিভিন্ন থানা ও তৎকালীন মহাকুমা সদরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অবস্থান করে পৈশাচিক নারী নির্যাতন ও নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। সময়ের ব্যবধানে কয়েক মাসের মধ্যেই বরগুনার মুক্তিযোদ্ধারা শক্তি অর্জন করে মনোবল নিয়ে এলাকায় ফিরে আসেন। বরগুনা, বামনা, বদনীখালী ও আমতলীতে যুদ্ধের পরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা বরগুনা ট্রেজারি ও গণপূর্ত বিভাগের ডাকবাংলায় অবস্থান নেয়। মুক্তিযুদ্ধে বরগুনা ছিল বুকাবুনিয়া সাব-সেক্টরের অধীন। মুক্তিযোদ্ধা হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ পেয়ে বুকাবুনিয়া মুক্তিযোদ্ধারা ৭১ এর ২ ডিসেম্বর বরগুনা বেতাগী থানা বদনীখালী বাজারে আসে। রাত তিনটার দিকে আবদুস সত্তার খানের নেতৃত্ব মুক্তিযোদ্ধা নৌকা যোগে বরগুনার খাকদোন নদীর পোটকাখালী অবস্থান নেয়। সংকেত পেয়ে ভোর রাতে তারা কিনার উঠে আসে। তারা দলে ছিলেন মাত্র ২১ জন। তারা বরগুনা কারাগার, ওয়াপদা কলোনি, জেলা স্কুল, সদর থানা, ওয়ারলেস স্টেশন, এসডিওর বাসাসহ বরগুনা শহরকে কয়েকটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যে যার অস্ত্র নিয়ে অবস্থান অনুযায়ী শীতের সকালে ফজরের আজানকে যুদ্ধ শুরুর সংকেত হিসেবে ব্যবহার করেন। আজান শুরুর সাথে সাথে ৬টি স্থান থেকে একযোগে গুলি শুরু করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন তারা। দ্বিতীয় দফা গুলি করে তারা জেলখানার দিকে এগোতে থাকেন। চারজন সহযোগীসহ সত্তার খান ছিলেন কারাগার এলাকায়। তারা এসময় জেলখানায় অবস্থানরত পুলিশ ও রাজাকারদের আত্মসমর্পণ করিয়ে এসডিও অফিসের সামনে নিয়ে আসে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গিয়ে তৎকালীন এসডিও আনোয়ার হোসেনকে আত্মসমর্পণ করান। দুপুর বারোটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রশাসনিক দায়িত্ব এসডিওকে সাময়িকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবরুদ নিয়ে বুকাবুনিয়া সাব-সেক্টর হেড কোয়ার্টারে চলে যান।

গণহত্যা ও বধ্যভূমি

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে বর্বর গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন চালিয়েছিল তার জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরগুনা শহিদ স্মৃতি সড়কে গণকবর, কাকচিড়া মুজিবর রহমান কনকের হত্যাকাণ্ড, বরগুনার খেয়াঘাটে, পাথরঘাটার শাহজাহান, দিলীপ কুমার, দিলীপ গাইন ও মানিকখালী ৭ শহিদদের হত্যাকাণ্ডের কাহিনি। যাঁদের রক্তে গড়া বাংলাদেশ, আজ অযত্নে অবহেলায় পড়ে রয়েছে এলাকার সেই বধ্যভূমিগুলো।

৭১-এর ২৯ ও ৩০ মে বরগুনা জেল হত্যার সেই কালো অধ্যায় মানুষ আজও ভুলতে পারেনি। বরগুনা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দখলে আসে ৭১-এর ১৪ মে

www.pathagar.com

এবং বরগুনাসহ বিভিন্ন এলাকার যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, কিশোর-কিশোরীসহ শতাধিক মানুষকে বরগুনার জেলখানায় ধরে নিয়ে আসে। এরপর থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চালাতে থাকে একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

২৯ ও ৩০ মে নির্বিচারে গুলি করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শতাধিক লোককে হত্যা করে। এছাড়াও গণপূর্ত বিভাগের ডাকবাংলায় রাজাকার শান্তিকমিটির সহায়তায় যুবতীদের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধর্ষণ করে। হত্যাকাণ্ডের সময় গুলিবর্ষণ এবং হতাহতের আর্তচিৎকারে বরগুনা শহরের আশাপাশে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন পটুয়াখালী জেলার সামরিক আইন প্রশাসক মেজর নাদের পারভেজ। নাদের পারভেজের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা বরগুনাবাসী আজও ভুলতে পারেনি। বরগুনা জেলহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ফারুক ভেন্ডারের শরীরে ৫টি গুলি বিদ্ধ হওয়ার পরও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান এবং তিনি আজও বেঁচে আছেন। তার দুই ভাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে শহিদ হন। ২৯ ও ৩০ মে গুলিতে অনেকেই আহত অবস্থায় জীবিত ছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে চলে যাওয়ার পর তাদের সহযোগী রাজাকার ও শান্তিকমিটির লোকেরা হতাহতের অনেককেই জীবিত অবস্থা বরগুনা জেলখানার পশ্চিম পাশে গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন বরগুনার কোয়াক ডাক্তার কৃষ্ণ কান্ত (কেষ্ট)। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণকান্ত ডাক্তার বরগুনা ভারানী খাল সাঁতার কেটে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজকার সদস্যরা তাকে ধরে এনে গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দেয়। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন যাবৎ এই গণকবরটি অযত্ন-অবহেলায় পড়েছিল। গত ৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্‌র আর্থিক সহযোগিতায় বরগুনার সাংসদ ও সাবেক খাদ্য উপমন্ত্রী অ্যাড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর নেতৃত্বে শহিদদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। শহিদদের নামে সড়কটির নামকরণ করা হয় শহিদ স্মৃতি সড়ক।

বরগুনা পাথরঘাটা উপজেলায় মানিকখালী শিংড়াবুনিয়া গ্রামে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের সমাধি দীর্ঘ ৩৯ বৎসরেও সংরক্ষণ করা হয়নি। সরকার আসে সরকার যায়, এলাকায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগলেও আজ পর্যন্ত তাদের স্মরণে কোনো স্মৃতিসৌধ গড়ে ওঠেনি। ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর বলেশ্বর নদী দিয়ে মানিকখালী শিংড়াবুনিয়া গ্রামে হঠাৎ করে গানবোট যোগে আসে পাকিস্তানি সেনারা। দেশীয় রাজাকার শান্তি কমিটির সহায়তায় এলাকার বেপারি বাড়ির চারিদিকে ঘেরাও করে ৭ জনকে চোখ বেঁধে পার্শ্ববর্তী হরের খালের পাড়ে নিয়ে যায় এবং এক এক করে ব্রাশ ফায়ার করে সবাইকে হত্যা করে। পরে পাকিস্তানি সেনার সহযোগিতায় রাজাকার শান্তিকমিটির লোকেরা এদের হরের খালের পাড়ে একই গর্তে মাটি চাপা দিয়ে রাখে। স্থানটি অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। এখানে শহিদ হয়েছেন চন্দ্রকান্ত হাজরা, অশ্বীনি কুমার বালা, লক্ষ্মীকান্তে গয়ীলী, মনোরঞ্জন বেপারি, নিত্যানন্দ বেপারি, ক্ষিরোদ বেপারি ও অনন্ত কুমার। বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শাহজাহানের সমাধি দীর্ঘ ৩৯ বৎসরেও সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ১৯৭১-এর ২৪

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর পাথরঘাটার গহরপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি চাপরাশি বাড়ি আ. মজিদ মাস্টারের বাড়ি থেকে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহানকে রাজাকার-শান্তি কমিটির লোকেরা ধরে এ পাথরঘাটার পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং ঐদিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে পাকিস্তানি সেনা এবং শান্তি কমিটির লোকেরা পাথরঘাটা খালের পাড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। হত্যার পরে শাহজাহানের লাশ তার স্বজনদের কাছে না দিয়ে পিশাচরা নৌকায় করে উল্লাস করতে বিষখালি নদীতে ফেলে দেয়।

বরগুনার গণকবরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

www.pathagar.com

একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে ১৫ মে ৭১ পাকিস্তানি সেনার হাতে নিহত পাথরঘাটার সিপাই আ. মজিদ, দিলীপ কুমার সাহা, কেশব গাইন, রাম গাইন, প্রহাদ মিস্ত্রী, যাদব গাইন, দিলীপ গাইন। এর মধ্যে দিলীপ গাইন ও যাদব গাইন দুজন আপন ভাই। এদেরকে পাথরঘাটার লঞ্চঘাটের পূর্বপাশে পাকিস্তানি সেনারা এক এক করে হত্যা করে বিশখালীর মোহনায় ফেলে দেয়।

বরগুনা পাথরঘাটা উপজেলার লেমুয়া গ্রামের মুজিবুর রহমান কনককে পাথরঘাটা থেকে ২৯ নভেম্বর রায়হানপুর ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান শান্তি কমিটির নেতা খলিলুর রহমান বরগুনা ধরে নিয়ে আসে। ৩০ মে '৭১ দুপুরে পাকিস্তানি সেনারা বরগুনা খাকদোন নদীর পুরাতন খেয়াঘাট বর্তমানে বরগুনা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ের উত্তর পাশে গুলি করে হত্যা করে লাশ পরিবারের সদস্যদের হাতে না দিয়ে নৌকাযোগে খাকদোন নদীর মোহনায় ফেলে দেয়। তাকে ৩ দিন পরে পোটকাখালী সুইজ সংলগ্ন চরে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পারিবারিক ও স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে ঐ সময় তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাকচিড়া অফিসের এস. ও হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং এরই পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতেন।

১২ বছর পরেও শেষ হয়নি মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর বুকাবুনিয়া মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তৎকালীন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. জিল্লুর রহমান বামনার বুকাবুনিয়া এক সফরে আসেন এবং ১৯৯৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের সময় নাইন সেক্টরের সাব-সেক্টর হেড কোয়াটার বুকাবুনিয়ায় ৩৬ শতাংশ জমির উপর উদ্বোধন করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ। এ উপলক্ষে বিশাল এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আজও সেই স্মৃতিস্তম্ভ ফলক হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নিমির্ত হয়নি।

ঞ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

এককালের পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের অংশ বরগুনা জনবসতিপূর্ণ ও প্রাশসনিক আয়তনে পরিণত হয়। এই ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবয়বও পরিপুষ্ট হতে থাকে। আর এই জনপদে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বির্নিমাণ এলাকার বেশকিছু বরেণ্য ব্যক্তির শ্রম-সাধনা আমাদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বরগুনায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল মূলত ১৯৩০ সালের দিকে। ওই বছর বরগুনা সদরের গৌরিচন্না ইউনিয়নের নওয়াব সলিমুল্লাহর কাছারীর সামনে কৃষক প্রজা পার্টির উদ্যোগে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিলেন বরগুনার কৃতি সন্তান মরহুম আবদুল কাদের ওরফে লাল মিয়া ও সাবেক ছাত্রনেতা রুসমত আলী খান। সমাবেশে বিশিষ্ট কৃষক ও বামনেতা বাণীকণ্ঠ সেন, খান বাহাদুর হাসেম আলী খান, বিডি হাবিবুল্লাহ বক্তৃতা করেন।

www.pathagar.com

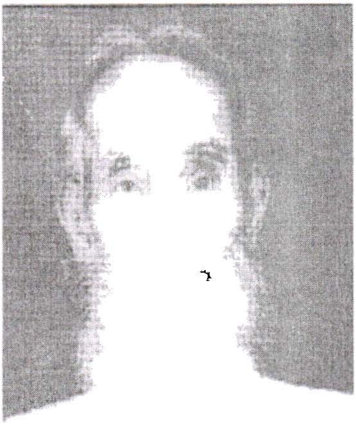

আবদুল মজিদ মাস্টার

আসমত আলী সিকদার

আবদুল লতিফ মাস্টার

আবদুল কাদের লাল মিয়া

www.pathagar.com

শাহজাদা আবদুল মালেক খান

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির বরগুনা-আমতলী নির্বাচনী এলাকা থেকে মরহুম আবদুল কাদের ওরফে লাল মিয়া এবং বামনা-পাথরঘাটা থেকে মরহুম হাতেম আলী জমাদ্দার সদস্য নির্বাচিত হন।

ভারতবর্ষ বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় থেকে সরকারিভাবে বরগুনা এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকা-শুরু হয়। মূলত বরগুনায় তখন থেকেই শিক্ষা, যোগাযোগ, অবকাঠামোসহ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এলাকার বেশ কিছু ব্যক্তি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

এদের মধ্যে আবদুল কাদের ওরফে লালমিয়া, মো. ইয়াসিন মাস্টার, জ্ঞান রঞ্জন ঘোষ, গগন আলী হাওলাদার, রমজান আলী মাস্টার, আ. খবির মিয়া, আ. লতিফ মাস্টার (দুইবার নির্বাচিত বরগুনা পৌর চেয়ারম্যান) রুসমত আলী খান,গাজী আলী আহমেদ; পাথরঘাটার হাতেম আলী পহলান, আবদুর রহমান (প্রাক্তন চেয়ারম্যান, নাচনাপাড়া ইউনিয়ন), হাতেম আলী জমাদ্দার, বামনার আসমত আলী শিকদার, আবুল হাসেম (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদ), আবদুল ওয়াহেদ (ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদ), নাজমুল আহসান, বেতাগীর শাহজাদা আব্দুল মালেক খান (প্রাক্তন শিল্প প্রতিমন্ত্রী), কাউনিয়ার নুরু মিয়া, আমতলীর খোর্শেদ তালুকদার, মফিজ তালুকদার, আর্শেদ পাটোয়ারি নাম উল্লেখযোগ্য। বরগুনা মহকুমায় রূপান্তরিত হওয়ার আগেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয় এসব

www.pathagar.com

উদ্যোগী ব্যাক্তিদের আন্তরিক প্রচেস্টায়। আবদুল কাদের ওরফে লাল মিয়া, রমজান আলী মাস্টারের নেতৃত্বে বরগুনা মুসলিম হাইস্কুল (বর্তমানে জিলা স্কুল) ও বরগুনা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানিন্তন মুসলিম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে আবদুল মজিদ মিয়ার নাম বরগুনার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে চিরদিন স্মরণীয় থাকবে। এছাড়া তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক সুলতান আলীর আগ্রহে বিদোৎসাহী আজিজ মাস্টার, আ. লতিফ মাস্টারসহ অন্যান্য বিদ্যেৎসাহীদের প্রচেষ্টায় দানবীর জ্ঞানরঞ্জন ঘোষের জমিতে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বরগুনার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বরগুনা কলেজ।

বরগুনার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আরও যাদের নাম স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ফজলুর রহমান মাস্টার, গাজী আলী আহমেদ, রমজান আলী মাস্টার, আবদুল লতিফ মাস্টার, জহিরুল হক কনু মাস্টার, বেলায়েত হোসেন মাস্টার; বেতাগীর বজলুর রহমান মাস্টার উল্লেখযোগ্য।

ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই জেলায় যারা খ্যাতিান হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে বেতাগীর মোকামিয়ার পির মরহুম মাওলানা হাসান আলী, বরগুনা সদরের খাকবুনিয়ার পির আবদুল লতিফ, পাথরঘাটার চলাভাঙার পির সৈয়দ মাওলানা আব্দুর রশীদ চিশতির নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বরগুনার কেওড়াবুনিয়ার পির মাওলানা আব্দুর রশীদ এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে কাজ করেছেন।

ঞ. লোকশিল্পী ও সাধক

লোকসংস্কৃতি মূলত বাংলাদেশের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরা। লোকসংস্কৃতির পরিধি কেবল লোকসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক লোকসংস্কৃতির চর্চায় যুক্ত লোকসংগীত থেকে শুরু করে লোকনাট্য, জারিগান, পালাগানসহ নানান উপকরণ। লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করে এখনো তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারীর পরিচয়কে তুলে ধরেছেন এবং টিকিয়ে রেখেন লোকশিল্পী ও সাধকবৃন্দ। এছাড়াও তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে অনেকেই লোকসংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন এ অঞ্চলে। উল্লেখ করার মতো রয়েছে গাথক ও গায়ক হাতেম ফকির। তাঁর বর্তমান বয়স ৮৫। কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরও লোকসংগীতের সঙ্গে নিজেকে সমান্তরালভাবে গতিশীল রেখেছেন। লোকগানের বিভিন্ন আঙিকে নেচে গেয়ে আসর মাতিয়ে রাখেন। তাঁর বাড়ি এ জেলার বামনা উপজেলার উত্তর কাকচিড়া গ্রামে। তিনি মূলত কিশোর বয়স থেকেই গান বাজনার সাথে যুক্ত।

শিল্পী মাতাম সাধু একজন কথক। তিনি মূলত রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন ধর্মীয় উপকথার একজন প্রাণবন্ত কথক। তাঁর পরিবেশনা নারী পুরুষ সবাইকে মুগ্ধ করে। গাঁওয়ালে পান বিক্রি করা তাঁর পেশা হলেও লোকসংস্কৃতির জগতে তিনি সক্রিয় রয়েছেন ছোটবেলা থেকেই। তাঁর বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। তাঁর বাড়ি এ জেলার গোলককাশী গ্রামে। উত্তর কাকচিড়া বাজারে তাঁর ছোট একটি মনিহারি দোকানও রয়েছে।

www.pathagar.com

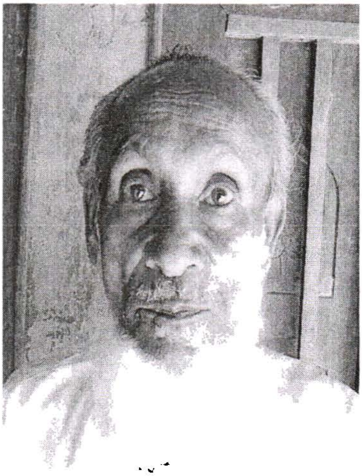

গাথক ও গায়ক হাতেম ফকির

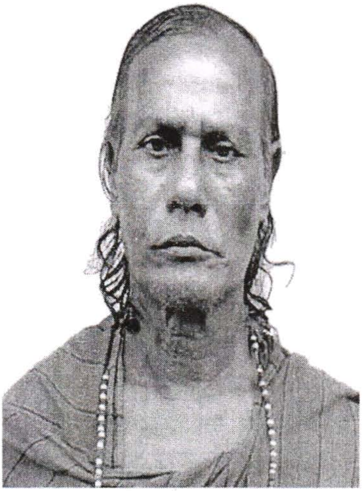

কথক শিল্পী মাতাম সাধু

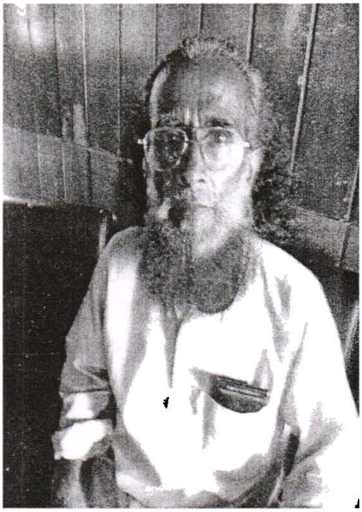

জারিশিল্পী হোসেন বয়াতি

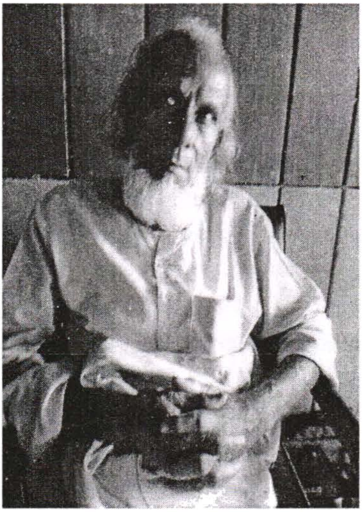

জারিশিল্পী গণি বয়াতি

www.pathagar.com

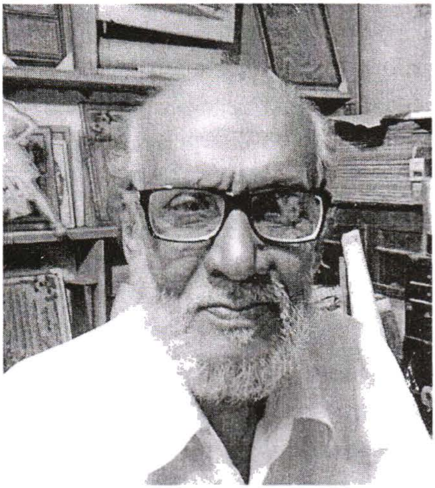

চিত্রশিল্পী মোশারফ হোসেন কনু

লোকসংগীতের এমন কিছু পরিবেশনা রয়েছে যা বয়াতি ব্যতিত অন্য কোনো লোকশিল্পীর দ্বারা পরিবেশন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জারিগানের কথা বলা যায়, বলা যায় বিভিন্ন পালা বা কিস্‌সার কথা। বরগুনা অঞ্চলে বয়াতি হিসেবে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন হোসেন বয়াতি ও গণি বয়াতি। লোকশিল্পের আর একটি অন্যতম মাধ্যম চারুশিল্প। লোকজ ধারার এই শিল্পের অন্যতম শিল্পী এ অঞ্চলের চিত্রশিল্পী মোশারফ হোসেন কনু।

ট. রাখাইন সংস্কৃতি

প্রাচীন পালি ভাষার শব্দ 'রক্ষা' থেকে রাখাইন শব্দটির উৎপত্তি। রাখাইন সম্প্রদায় মূলত একটি ক্ষুদ্র জনসমাজ। রাখাইনেরা মঙ্গোলীয় মহানৃগোষ্ঠির অর্ন্তভুক্ত। এ জাতির আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১৫ থেকে। (মু-ম)

প্রচলিত আছে যে প্রাচীন ভারতে শাক্য বংশের রাজত্বকালে কপিলাবস্তুর রাজা অর্জুন রাজপদ ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একদা তিনি হাঁটতে হাঁটতে কচ্ছপ নদীর কল্লোলিত এক মনোরম পরিবেশে এসে থমকে যান। সেখানে তিনি শুরু করেন তপস্যা। এসময় তিনি শাক্যবংশীয় রূপবতী এক যুবতীকে ধাবমান জলস্রোত থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে উদ্ধার করা ওই রমণীকে তিনি বিয়ে করে সংসার জীবন শুরু করেন। তাঁদের পরিবারে মারায়ু নামে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সেখানে একটি নতুন জাতি গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে কোনো এক সময় এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে অর্জুনপুত্র মরায়ুকে ওই জনগোষ্ঠীর অধিপতি ঘোষণা করে। আর এর মধ্য দিয়েই বর্তমান মায়ানমারের অর্ন্তগত আরাকান ভূখণ্ডে

www.pathagar.com

প্রথম ধান্যবতী নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নগরে পরবর্তীকালে শাক্যবংশীয় রক্ষণশীল জাতির লোকজনের আধিক্য বাড়তে বাড়তে প্রতিষ্ঠিত হয় রাখাইন বা রাক্ষাইন জাতি ও রক্ষাপুর দেশ। বর্তমানে এই ভূখণ্ডটি আরাকান রাজ্য নামে পরিচিত। এর অর্থ হচ্ছে রৌপ্য, শুভ্র ও শান্তিময় দেশ।

রাজা মরায়ু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রক্ষাপুর নামে রাজ্যটির স্থিতি ছিল ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ম্রাউকের ২৭তম রাজা মহাসামন্তের সময় তার পরিসমাপ্তি ঘটে (মংতাহান প্রবন্ধকার)। প্রায় ছয় হাজার বছর স্থিতি ছিল রাক্ষাইন রাজ্য। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বার্মিজ রাজা বোদ্রোপ্রা আরাকান রাজ্য আক্রমণ করলে রাক্ষাইনেরা প্রাণরক্ষার্থে পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেয়। এ সময় ব্রিটিশরা বাংলার ইজারা নিয়ে তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য আরাকান দখলেও অভিপ্রায়ে বিতাড়িত রাক্ষাইনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে এবং আরাকান মুক্তির সংগ্রামে রাখাইনদের সহযোগীতা করে। একইসঙ্গে ব্রিটিশরা রাখাইনদের জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণ বাংলা আবাদের জন্য দক্ষিণ উপকূলের বিভিন্ন দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকায় স্থানান্তর করে (মু-মর্জিদ)। তবে এর মতান্তরে কথিত আছে যে বার্মিজ রাজার অনুগত বাহিনীর তাড়া খেয়ে অনেক রাখাইন পরিবার সরাসরি দক্ষিণ উপকূলের পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা, বরগুনা জেলার তালতলী ও বালিয়াতলী এলাকায় আশ্রয় নেয়।

তখন এসব এলাকা ছিল জনমানবহীন ও জঙ্গলময়। বন্য প্রাণী যেমন বাঘ, শূকর, ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী ও নদী-খালে কুমির, হাঙরের হিংস্র থাবা এবং নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে রাখাইনেরা বন-বাদাড় পরিষ্কার করে এই জনপদটি আবাদি জনপদে পরিণত করে (মংতাহান)। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা .৬ ভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। এদেশে ৪৫টির বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। রাখাইন সম্প্রদায় এরকম একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। বাংলাদেশের সাগর পাড়ের জেলা পটুয়াখালী ও বরগুনায় এদের বসবাস বেশি। এছাড়া পার্বত্য এলাকায়ও এরা বসবাস করে, তবে সংখ্যায় কম।

রাখাইন জাতির বৈশিষ্ট্য : রাখাইনদের অদিবাস বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ। আরাকান বর্তমানে মিয়ানমারের অঙ্গরাজ্য হলেও একসময় এটি ছিল স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। একত্রে আরাকন শব্দের অর্থ রৌপ্য শুভ্র সুখ ও শান্তিময়। তালতলীতে বসবাসকারী রাখাইন সম্প্রদায়ের ইতিহাস খুঁজে দেখা যায়, আরাকানের নামের যথার্থতা ছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা এ নামকরণ করেছিল। ১৭৮৪ সালে বর্মরাজা আরাকান বা রাখাইন রামপ্রের দখল করার কারণে এরা দেশত্যাগ করে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় বসতি স্থাপন করেন।

১৭৮২ সালে রামপ্রের বিভাগীয় শাসনকর্তা মহাসামন্ত উপাধি ধারণ করে রাখাইন সিংহাসনে আরোহণ করে। তখন থেকেই রাখাইন জাতির ভাগ্যের পতন ঘটে। বর্মিরাজা বোদকায়া আরাকান দেশ বা রাখাইন প্রে'র স্বাধীন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিশ্বখ্যাত মহামুনি ফয়া বা বুদ্ধমূর্তি তার রাজধানী মন্দালয়ে নিয়ে যান এবং স্থাপন করেন। এতে আরাকানবাসী রাখাইন বৌদ্বরা ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁরা বর্মী

www.pathagar.com

দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু বর্মী দখলদার বাহিনীর রাজা বোদকায়া আরাকান বিদ্রোহীদের দমনে নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করেন। তারা নির্বিচারে পুরুষ-নারী, শিশুদের ওপড় নির্মম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্মম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের বীভৎস্যতায় আতঙ্কিত,পরাজিত ক্যাপটেন মংগ্রী, ক্যাপটেন উম্রাচো তিনখানা বড় সমুদ্রগামী নৌকাযোগে সপরিবারে আরাকানের পশ্চিম-দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সচেতন তং গ্রাম থেকে সোজাসুজি পশ্চিম দিকে সাগর পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পশ্চিম তীরে অবস্থি'ত পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী নামক দ্বীপে নোঙর করে। তখনকার দিনে এসকল দ্বীপ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, দুর্ভেদ্য ও জনমানবহীন।

১৭৮৪ সালে আরাকানের মেঘবতীর স্বান্দ্যে জেলার এক নির্জন এলাকা থেকে ১৫০টি পরিবার বর্মি রাজার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি লাভের: আশায় ৫০টি নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে, অবশেষে তিনদিন তিনরাত পর বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে পটুয়াখালী জেলার হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ অরণ্য ভূমির বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে পৌঁছায়। হিংস্র জীবজন্তু'র সঙ্গে যুদ্ধ করে রাখাইনেরা এসব অরণ্যভূমি বা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে তাদের সঙ্গে আনা ধান ও অন্যান্য বীজ বপন করে। আজ থেকে ২৩০ বছর আগে এদেশে আসার ফলে রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। রাঙ্গাবালী দ্বীপ থেকে আস্তে আস্তে এরা ছড়িয়ে পড়েছিল বড়বাইশদিয়া, মৌডুবি, কলাপাড়া,তালতলী, বালিয়াতলী ও কুয়াকাটায়। ১৯৪৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় রাখাইনের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার আর পাড়ার সংখ্যা ছিল ২২০টিরও বেশি। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ১৯৭০-১৯৭১ সালের জরিপ অনুযায়ী রাখাইনের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার আর পাড়ার সংখ্যা ছিল ২৮টি। ১৯৯০-৯১ সালের জরিপে এদের সংখ্যা ছিল ৫২৮২ জন আর পাড়ার সংখ্যা ছিল-২৮টি। ২০০০-২০০১ সালের জরিপে এদের সংখ্যা ছিল ১৫৬০ জন আর পাড়ার সংখ্যা হলো ২৮টি। রাখাইনরা যখন উপকূলীয় এলাকায় বসবাস শুরু করে তখন তা ছিল অরণ্যভূমি বনজঙ্গল, দুর্গম ও হিংস্র শ্বাপদের বিচরণ ভূমি। বাঘ, বন্য মহিষ, বিষধর সাপ ডাঙায় আর জলে ছিল কুমির। তবু তারা বহু কষ্টে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায় গাছপালা কেঁটে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ঘরবাড়ি ও আবাদিজমি তৈরি করে। হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে বাঁচার জন্য উঁচু মাচা তৈরি করে ঘর বাড়ি তৈরি করে। বাড়ির চারপাশে বেড়া দিয়ে রাখত। সমস্ত এলাকা ১০/১২ হাত উঁচু সুন্দরী কাঠ দিয়ে প্রাচীর বানিয়ে রাখত। বন্য মহিষ, শূকর, হরিণ ইত্যাদি ফসল নষ্ট করে ফেলত। ফলে আবাদি জমির চারপাশে বেড়া দিয়ে রাখতে হতো। এছাড়াও ছিল বড় বড় ইঁদুরের উপদ্রব। সুপেয় পানির ছিল খুব অভাব ছিল তখন। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা হওয়ায় চারিদিকে ছিল লবণাক্ত পানি। সুস্বাদু পানি লাভের আশায় এরা কুয়া কেটে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করেছিল। আর এই কুপ কাটা থেকেই আজকের বিখ্যাত পর্যটন এলাকা কুয়াকাটা নামের উৎপত্তি।

www.pathagar.com

রাখাইনদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক প্রশস্ত এবং চ্যাপ্টা, চুলের রং কালো, পুরুষের মুখে দাড়ি কম। এরা মাঝারি আকৃতির এবং বেশ শক্তিশালী ও কর্মঠ। গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা। অধিকাংশই দেখতে সুন্দর। বিশেষ করে মেয়েরা খুব সুন্দরী হয়। এদের শিশুরা দেখতে খুবই সুন্দর। বাংলাদেশিদের মতোই এরা মাছ ভাত খায়। এছাড়া গো-মাংস, মহিষ, ছাগল ও শূকর এদের প্রিয় খাবার। মদ এরা নিজেরাই তৈরি করে, রাখাইন ভাষায় যাকে 'আরা' বলে। পরিমিত মাত্রায় মদ পান এবং উৎসব-পার্বণে মদ এদের প্রাসঙ্গিক লোকখাদ্যের পানীয় উপাদান। বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের আধুনিকতার ছোঁয়া এদের পোশাক পরিচ্ছদে এনেছে বিশাল পরিবর্তন। উৎসবে শিশু-কিশোরদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়, তারা দল বেধে নাচ ও গান, নিজস্ব খেলাধুলা ছাড়াও স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদ্রায় সাথে খেলাধুলা করে। রাখাইনরা অতিথি আপ্যায়ানে নানা ধরনের নকশি পিঠা বানায়। পিঠার লোকজ ঐতিহ্য ধরা পড়ে।

রাখাইনরা সাধারণ লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে এবং মেয়েরা লুঙ্গি পরে ও ব্লাউজ গায় দেয়, পুরুষরা মাথায় পাগড়ি পরে এবং মেয়েরা নানা ধরনের গহনা পরে। রাখাইন শিশুরা শিক্ষা শুরু করে মন্দিরে। রাখাইন মারা গেলে চিতায় পোড়ানো হয়। রাখাইন মারমা সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চা করে। তবে সাধারণ স্কুলে কলেজে তারা বাঙালি ছেলেমেয়েদের মতো লেখাপড়া করে। রাখাইন উৎপাদন ব্যবস্থায় রয়েছে নিজস্বতা। কুটির শিল্প, কৃষি কাজ, শূকর পালন ইত্যাদি খুবই সমৃদ্ধ। রাখইনরা উৎসবে আনন্দে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নৃত্য-গীতে মেতে ওঠে।

ফানুস

www.pathagar.com

উৎসবের মধ্য জলক্রীড়া, ফানুস উড়ানো ছাড়া ও পিঠা উৎসব, ফসল ঘরে তোলা ইত্যাদি। তালতলী পাড়ায় অংলা চিং গান ও নাচের অংচা খায় বাঁশি বাজনা শিল্পীদের অনুষ্ঠানে লোকঐতিহ্য জীবন সংগ্রাম ফুটে ওঠে। রাখাইন যখন এলাকায় প্রথম আসে তখন তারা পরিষ্কার করে আবাস গড়ে তোলে। এর একটি প্রতীকী দৃশ্য তুলে ধরে 'বাঘ শিকার' নামক লোকনৃত্য। বাঘ শিকার ছাড়াও আছে কিন্নার নাচ। এটি প্রেম কাহিনি ভিত্তিক নৃত্যানুষ্ঠান।

রাখাইনদের আচার-আচরণ : রাখাইনেরা রক্ষণশীল হলেও তারা সাদাসিদে সহজ-সরল জীবন-যাপন নানা আচারে বর্ণিল। নদীর পাড়, ও বঙ্গোপসাগর উপকূলে সমতল ভূমিতে দলবদ্ধভাবে ঘরদোর তৈরি করে বসবাস করে তাঁরা। এসব বসতিস্থলকে 'পাড়া' নামে অভিহিত করা হয়। আর তাদের বসতগৃহকে বলা হয় 'টং'। রক্ষণশীল জনগোষ্ঠী হওয়ায় আধুনিকতা তাদের এখনো তেমন আচ্ছন্ন করেনি। তাদের ঘরদোর ও জীবনাচরণের মধ্যেই এর ছাপ স্পষ্ট। এক সময়ে বাঘ, ভল্লুকের আক্রমণ ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রর আদলে উঁচু পাটাতনের টংঘরে বসবাস শুরু করলেও এখনো সেই ধারা অব্যাহত আছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বসবাসকারী রাখাইন সম্প্রদায়ের নারীরাই পরিবারের প্রধান বা নেতৃত্বদাতা। তাই বিয়েশাদিতে তাঁদের সমাজে কোনো যৌতুক বা পণপ্রথা নেই। বিয়ের পর বর-কনে বসে ঠিক করে তাঁরা শ্বশুর না বাবার বাড়িতে থাকবে। রাখাইন সমাজের প্রচলন অনুযায়ী বেশিরভাগ রাখাইন ছেলেরাই বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। রাখানেরা আমোদ-প্রমোদ যেমন পছন্দ করে তেমনি তারা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখারও পক্ষপাতি। অর্থাৎ অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর চেয়ে শান্তিপ্রিয়। কারো সঙ্গে দেখা হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হাতজোড় করে অভিবাদন জানানো, মৃদু হেসে কুশল বিনিময় তাদের ঐতিহ্য বলা যায়। বার মাসে তাঁরা নানা পার্বণ করে উৎসবের মধ্যদিয়ে। এসময় নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে নানা বরণে সেজে অংশ নেয় নৃত্যগীতে। হরেক রকম নকশি পিঠা, সুস্বাদু পায়েস তৈরি করে। বিয়ে রাখাইনদের একটি উৎসবের মত। বৈচিত্র্যময় এই বিয়েতে সেবাই মেতে ওঠে অপার আনন্দ আর উৎসবে। গৌতম বুদ্ধের জন্মোৎসব, বৈশাখি পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, প্রবরণা পূর্ণিমা, বসন্ত উৎসব, নবান্ন উৎসব, বিবাহ, নতুন গৃহে প্রবেশ, জন্ম ও মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এসব নানা উৎসব খুব বর্নাঢ্যভাবে উদযাপন করে রাখাইনেরা। রাখাইন সম্প্রদ্রায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা যাকে মারমা সংস্কৃতি ও ভাষার উত্তরাধিকার হিসেবে ভাবা হয়। তারা দীর্ঘদিন বাঙালিদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করেও এই উত্তরাধিকারকে বহন করছে যত্নের সঙ্গে। রাখাইন শিশুরা তাদের নিজস্ব ভাষার হাতেখড়ি নেয় বৌদ্ধ বিহারগুলোর পাঠশালায় যা 'কিয়াং' নামে অভিহিত। এসব বিহারে রাখাইন ভাষা-সংস্কৃতির পাশাপাশি নানা শাস্ত্রীয় শিষ্টাচার শেখানো হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এসব শিক্ষা ও জ্ঞানদান করেন। এজন্য রাখাইনেরা স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়। রাখাইনেরা শতভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি। 'হীনযান' ও 'মহাযান' বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন ধারা। বরগুনায় বসবাসকারী রাখাইনেরা 'হীনযান' গোত্রের।

www.pathagar.com

বুদ্ধ পূর্ণিমা : শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা। এ পূর্ণিমা তিথিটি বৌদ্ধদের পবিত্রতম তিথি। এ তিথিটি বৈশাখ মাসে না পড়লেও বৈশাখি পূর্ণিমা নামে খ্যাত। বৌদ্ধদের কাছে এটিই বুদ্ধ পূর্ণিমা। বুদ্ধ পূর্ণিমা মহামানব গৌতম বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত একটি পবিত্র দিন। বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতেই নিস্পন্ন হয়েছিল ভাবী বুদ্ধ কুমার সিদ্ধার্থের মাতৃকুক্ষি হতে নিষ্ক্রমণ, বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহা পরিনির্বাণ। খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দের বৈশাখি পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনী কাননের শালতরুতলে কুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। জন্মের পর বড়-বড় রাজজ্যোতিষীগণ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মপঞ্জিকা তৈরি করেন।

পণ্ডিতগণ কুমার সিদ্ধার্থের মধ্যে মহাপুরুষোচিত বত্রিশটি সুলক্ষণ দেখতে পান। বৌদ্ধদের পবিত্রতম গ্রন্থ ত্রিপিটকে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কুমার সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন পর তাঁর গর্ভধারিণী মহামায়া বা মায়াদেবী অকস্মাৎ দেহ ত্যাগ করেন। মায়ের মৃত্যুর পর সৎমা বা মাসি গৌতমীর (মহামায়া এবং গৌতমী পরস্পর সহোদরা, রাজা শুদ্ধোদন দুজনকেই বিয়ে করেন) দ্বারা পালিত হন বলে কুমার সিদ্ধার্থের নাম হয় গৌতম। ঊনত্রিশ বছর বয়সে রাজকুমার গৌতম রাজসুখ ছেড়ে গৃহত্যাগী হন। দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনার পর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে আর এক বৈশাখি পূর্ণিমা তিথিতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে উরুবেলার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিদ্রুম বা অশ্বত্থবৃক্ষের তলে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন। মহামানব গৌতম বুদ্ধ আশি বছর বয়সে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে আরেক বৈশাখি পূর্ণিমায় কুশীনগরের মল্লদের শালবনে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

পরিনির্বাণের পর বুদ্ধের দেহাবশেষ দ্রোণ নামের এক ব্রাহ্মণ মগধের অজাতশত্রু, বৈশালির লিচ্ছবি, কপিলাবস্তুর শাক্য, অল্লকপ্প দেশের কোলিয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেটদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ এবং পাবার মল্লগণের মধ্যে ভাগ করে দেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণ যে কুম্ভ দিয়ে বুদ্ধের দেহাবশেষ ভাগ করেন সেই পাত্রটি নিজে গ্রহণ করেন। অতঃপর পিপ্পলিবনের মৌর্যগণ এসে কিছু না পেয়ে চিতা থেকে অঙ্গার সংগ্রহ করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে প্রিয়দর্শী মহামতি অশোক বুদ্ধের অস্থিধাতুসমূহ উদ্ধার করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে স্তূপ নির্মাণ করে সংরক্ষণ করেন। মহামানব বুদ্ধের পরিনির্বাণের বছর থেকে তাঁর নামে যে অব্দ গণনা করা হয় তা বুদ্ধাব্দ নামে পরিচিত। বুদ্ধ শব্দের প্রকৃত আভিধানিক অর্থ জ্ঞানী।

অন্যদিকে বুদ্ধ নামটির তত্ত্বমূলক অর্থ হচ্ছে আলোকপ্রাপ্ত। বাস্তব সত্যের সন্ধান যিনি পেয়েছেন, যিনি সম্যক জ্ঞানের অধিকারী তিনিই বুদ্ধ। তাঁর আবিষ্কৃত সত্য বা মতবাদ অন্যদের তুলনায় ভিন্ন এবং বাস্তবধর্মী। তাই গৌতম বুদ্ধ যথার্থই বুদ্ধ। মহামানব বুদ্ধ যে সত্য ধর্ম প্রচার করে গেছেন তাতে কোনো ধরনের অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারের স্থান নেই। সেখানে দেব-দেবীর পূজা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা বিশ্বাসের স্থান নেই, আছে সর্বজন গ্রহণযোগ্য কতকগুলো নীতি, আদর্শ ও দর্শন। তিনি জ্ঞানীর শরণ, ন্যায়ের শরণ এবং একতার আশ্রয় গ্রহণের কথা বলেছেন।

www.pathagar.com

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিটি বৌদ্ধদের কাছে পবিত্রতম দিন। বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিকে বৌদ্ধরা সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে উদযাপন করে থাকে। তবে ভাষা, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিন্নতার কারণে পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভিন্ন-ভিন্ন আঙ্গিকে বা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এ পূর্ণিমা তিথিকে উদযাপন করে থাকে। বরগুনায় বসবাসকারি রাখাইন সম্প্রদায়ও তাদের কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বুদ্ধ পূর্ণিমা (রাখাইন ভাষায় কাছুং লাহব্রে) তিথিকে উদযাপন করে থাকে। বুদ্ধ পূর্ণিমা বা কাছুং লাহব্রে উপলক্ষ্যে যে উৎসব হয় তাকে রাখাইন ভাষায় 'এঃংরি লং পোয়ে' বলা হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে বোধিদ্রুম বা অশ্বত্থবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালা হয় বলে রাখাইন ভাষায় এ রকম নামকরণ (অশ্বত্থবৃক্ষকে রাখাইন ভাষায় এঃং পাং বা বঃখি পাং বলা হয়)। সিদ্ধার্থ গৌতম দীর্ঘ ছয়বছর সাধনার পর বোধিবৃক্ষের তলায় বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন বলে প্রতিবছর বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বিকাল বেলা বিহার আঙিনায় রোপণ করা বোধিবৃক্ষের গোড়ায় (প্রতি বছর একই গাছে) চন্দন মিশ্রিত জল ঢালা হয়। এর অর্থ হচ্ছে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা।

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রাখাইন অধ্যুষিত কোনো-কোনো এলাকায় 'ওয়াংকাবাহ' (এক ধরনের চক্রব্যূহ) বসানো হয়। নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই ওই ওয়াংকাবাহ-র অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রদক্ষিণে অংশগ্রহণ করে। বিকালে বৌদ্ধ বিহার থেকে ধর্মীয় শোভাযাত্রা বার করা হয় এবং গ্রাম প্রদক্ষিণের পর পুনরায় বৌদ্ধ বিহারে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রা শেষে নির্দিষ্ট বোধিবৃক্ষের গোড়ায় চন্দন মিশ্রিত জল ঢালা হয়। এর পর সমবেত প্রার্থনা এবং পঞ্চশীল গ্রহণ করা হয়। পঞ্চশীল গ্রহণের পর বয়োজ্যেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মীয় আলোচনা করেন।

এঃংরি লং পোয়ে উপলক্ষ্যে সেদিন রাতে জ্যাঃ (গীত-নৃত্য-অভিনয়ের ত্রিসঙ্গমজাত নাট্য) পরিবেশনের আয়োজন করা হয়। ইদানীং জ্যাঃ-এর পরিবর্তে লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (রোঃরা পোয়ে) এবং প্রাজ্যাঃ (মঞ্চ নাটক) পরিবেশন করতে দেখা যায়। এ ছাড়া বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বয়স্ক রাখাইন নারী-পুরুষ পূত-পবিত্র হয়ে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে উপোস বা অষ্টশীল পালন করে থাকেন।

রাখাইন সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ রয়েছে এবং তা এখনো অনেক জাতি নিজস্ব স্বকীয়তায় তা অব্যাহত রেখেছে। তেমনি রাখাইনদের নিজস্ব একটি সত্তা রয়েছে। রাখাইনেরা সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে নিজেদের মধ্যে নিজস্ব ভাষা নিয়ে মনের ভাব আদান-প্রদান করে যাচ্ছে।

রাখাইন জাতিকে স্থানীয়ভাবে অনেকেই মগ বা মগজাতি বলে থাকেন। কিন্তু আসলে তারা মগজাতি নয়। তাদের একটি পৃথক জাতিসত্তা রয়েছে। মগ শব্দটি অবজ্ঞার সাথে তুলনা করে ডাকা হয়। কারণ, ষোলো শতকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পর্তুগিজ দস্যু ও মগদস্যুদের অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

মগেরা আসলে জলদস্যুজাত। রাখাইন এবং মগদের দৈহিক ও শারীরিক আকৃতির সাদৃশ্যগত মিল থাকায় স্থানীয়রা রাখাইনদেরকে মগ নামে অভিহিত করে। যদিও মগ নামে কোনো শব্দ রাখাইন অভিধানে নেই। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৪১ বছর আগে রাখাইন জাতির উৎপত্তি।

পণ্ডিতমহলের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ ও ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্ব যথাক্রমে নিগ্রিতা এবং দ্রাবিড়িয়ান জাতির আবাসভূমি ছিল। পরবর্তীকালে আর্য এবং মঙ্গোলিয়রা এখানে বসবাস শুরু করে। আগন্তুক এই দ্রাবিড়িয়ান জাতিরা প্রথম জনগোষ্ঠী নিগ্রিতাকে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে। পরে দ্রাবিড়িয়ানদেরকে আর্য ও মঙ্গোলিয়রা বিতাড়িত করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। পরবর্তীকালে সভ্য জনগোষ্ঠী আর্য ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রনে রাখাইন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গোলিয়রা আসাম, মণিপুর, বিহার, গঙ্গা নদী তীরবর্তী অঞ্চল, উত্তর ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারত হতে আরাকানে অনুপ্রবেশ করে। আর্যরাও কপিলাবস্তু, দেবদাহ ও কনিষ্ক, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও উত্তর ভারত হতে আরাকানের প্রবেশ করে বসতী স্থাপন করেন। ইন্দো-এরিয়ান গ্রুপ সুদূর পথ পরিক্রমণ করে বারবার গঙ্গা থেকে কালাদান এবং কালাদান থেকে গঙ্গাতে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হত। যুদ্ধে বিজিত দল পালিয়ে গেলে সেখানেই নতুন রাষ্ট্র বর্তমান আরাকান রাজ্য গঠন করেন।

আরাকানি বলতেই রাখাইনকে বুঝায়। আরাকান শব্দটি রাখাইন শব্দের বিকৃতি রূপ, রাখাইন/ রাখাইং/ রাখাং/ রাকাং/ আরকান/ আরাকান। আরাকান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মায়ানমারের অন্তর্গত একটি প্রদেশ যা রাখাইন স্টেট নামে পরিচিত। সাগর, নদী ও পাহাড় ঘেরা পাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাখাইন প্রদেশ। এওযব অংরধ নামে পরিচিত। এখানে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্থায়ী ভাবে রাখাইনেরা বসবাস করেছিল। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ বাংলার সুবেদার শায়েস্তাখান আরাকানিদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম দেন ইসলামাবাদ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রধান সেনাপতি উমেদ খান ২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম দুর্গে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাখাইনেরা পরবর্তীকালে তাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করে।

কিন্তু ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আরাকানের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পড়ে যায়। যার ফলে রাখাইন ইতিহাসে বিদ্রোহ, পাল্টা বিদ্রোহ, হত্যা ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বার্মার (মায়ানমার) আলাঙ্গপায়া বংশের বর্মিরাজ বোধপায়ার (১৭৮২-১৮১৯) রাখাইন ইতিহাসের শেষ রাজা থামাদাকে হত্যা করে আরাকান রাজ্য দখল করে নেয়। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রাখাইনদের পিতৃভূমি আরাকান ভূ-খণ্ডটি কুরুক্ষেত্রে পরিণত হলে সদ্য স্বাধীনতা লুপ্ত আরাকানে রেমব্রে, মেংঅং, সেনডোয়ে, ক্যাউ-ফ্রো অঞ্চল থেকে স্বাধীনচেতা তেমেনগ্রী প্যো অং, উ ঘং গ্রী এবং উ অংক্য চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৫০টি রাখাইন পরিবার ৫০টি নৌযান যোগে পিতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে বঙ্গোপসাগরের

www.pathagar.com

উত্তাল ঢেউ অতিক্রম করে দক্ষিণ বাংলায় জনবসতিহীন বন্য অরণ্যময় দ্বীপাঞ্চল উপকূলীয় এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

সে সময় এ অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় বাঘ, ভল্লুক, কুমির ইত্যাদি ভয়ানক জন্তুতে ভরপুর ও বসবাসের অনুপযোগী ছিল। রাখাইনরা সব ভয়ানক জীব জন্তুর সাথে জীবন বাজি রেখে অসীম সাহসের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে অনাবাদি পতিত এলাকাসমূহকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সুজলা-সুফলা, শষ্য-শ্যামলা আবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে। রাখাইনদের আত্ম-ত্যাগের মহিমায় আজ এতদঞ্চলে সোনালি ফসল ক্ষেত, মাঠ ভরা সবুজ শস্য। অনাবাদী ভূমিকে আবাদি ভূমিতে রূপান্তর করে যুগান্তরী পরিবর্তন করেছে দেশে দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্র কল্লোলিত শেষ প্রান্তকে। রাখাইনরা মূলত কক্সবাজার, রামু, মহেশখালী, চকরিয়া, সাতকানিয়া, উখিয়া, টেকনাফ, বরগুনা, পটুয়াখালী, খেপুপাড়া, পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, আমতলী, গলাচিপা এলাকায় বর্তমানে রাখাইনেরা বসবাস করে আসছে। এখানে বসবাসকারী মোট পরিবারের সংখ্যা-১৬,৮৮২, জনসংখ্যা ১,৫০,০০০। (তথ্য সূত্রঃ রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন)।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২৫ অব্দ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কালাদান নদীর তীরে গড়ে ওঠা সু-সভ্য রাখাইন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও লোকাচার, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক পটভূমি স্বল্প সময়ে চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত শিলালিপি ও স্তম্ভ, পুথি ও গুহা দেয়ালে উৎকীর্ণ লেখাসমূহ থেকে ধারণা করা যায় যে, রাখাইন প্রে তথা খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতকের আগে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম লিপি ব্যবহার করত, কিন্তু কালক্রমে এর ব্যবহার বিলুপ্তি ঘটে। ছয় শতকের প্রারম্ভে এসে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে রাখাইন ভাষা ব্যবহার করে। রাখাইন সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় তৎকালীন চকরিয়া (সুরতন) এর আরাকান রাজকুমারী চপ্রেঞো (সুবর্ণা দেবী)। ৬০১ সালে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক চেতনা আর ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রাজকুমারী চপোক্রো (সুবর্ণা দেবী) 'ছিঙকেঙমিংটেঙ' নামে বিরহ গীতিকাব্য রচনা করে রাখাইন সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। সুবর্ণা দেবী হারবাঙ গ্রামের আলয়ে বসে এ বিরহ গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন। বিরহ গাথাটিতে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। তৎকালে প্রকৃতি ও সামাজিক বিবরণ নির্ভর সাহিত্য কর্ম অকল্পনীয় ছিল। সূবর্ণাদেবীর ঐতিহাসিক প্রেম কাহিনিকে নিয়ে রচিত একটি গীতি কাব্যের কিছু পঙ্‌ক্তির বাংলা অনুবাদ তুলে ধরছি।

কেঁদে ফেলি যখন দিদিরে মারে
বাম কানের দুলও হারিয়ে ফেলি গোসলের সময়ে
আছাঃফ্রোকে খুঁজে পাই না, আছে যুবনেতার বাম পাশে
তার বাম হস্তে পানখিলি, ডান হস্তে সিগারেট
দেশে দেশে রাজা বাদশাহর ঘরে ঘরে চুরুট
সুন্দর হও মোর ছেলে, সুন্দর হও মোর মেয়ে

www.pathagar.com

রেখো না আর তাদের। সাংগ্রের পোওয়ে পাঠিয়ে দাও
না পাঠালে নালিশ জানাবো, রাজা পুলিশকর্তার নিকট
ভয় লাগে রে ভয়, ভয় লাগেরে ভয়
মগদের আমার ভয় লাগে
হায়রে হায়রে কি করব এখন।

সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাখাইন ভাষা ও বর্ণমালা পরিশীলিত করার লক্ষ্যে ৭৬০ অব্দে একটি বর্ণমালা সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাখাইন বর্ণমালার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ৭৬৮ সালে ধম্মজেয়া রাখাইন ভাষায় ৩৩টি বর্ণমালা নিয়ে 'লেটঅছেং' নামক একটি গীতিকাব্য রচনা করেন। এটি ছিল তৎকালীন আরাকান রাজ্যের রণসংগীত। ঢেওয়ের তালে তাল মিলিয়ে যুদ্ধের অনুপ্রেরণা ও স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নৌ-যুদ্ধাগণ গীতটিকে রণসংগীত হিসেবে কোরাস গাইতেন। বর্তমান রাখাইনরা ওই গীতটিকে রণসংগীত হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন।

আরাকান ইতিহাস রাজ-ওয়াং পর্যালোচনা করে দেখা যায়-আরাকান রাজ্যের কবিদের মধ্যে উ ওক্কাপ্যেং, উ ওটো, উ অংচাউ, উ ক্যউ, উ ঙামে, উ মংছাথু প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসময় কালজয়ী কবি ও সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় অনুশাসন, নীতিকথা, কল্পকাহিনি, সূত্র গাঁথা, ছড়া, শ্লোক, পদ্য, কাব্য-কবিতা, স্লোগান, খনা-বচন, গীতি নাটক, উপন্যাস রচনা করেছেন এবং এসব রাখাইনদের মধ্যে কংগ্যখাং ঝা ম্রাক্যউ, চাইটাগংঝ সোয়েছ, মি পিং রেং, সাকে উম্রাওয়া, উক্কাব্যং, চ য়েইং মি, ঙালাৎবুং প্রমুখ। এরা সবাই রাখাইন ভাষায় কবিতা চর্চা করতেন বলে ক্য থিং অং 'রাখাইন ভাষার শিক্ষার হাল আর বিবর্তনে রাখাইন সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।

বর্তমান রাখাইন লিখিয়েরা রাখাইন ভাষায় কবিতা চর্চার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় কবিতা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। রাখাইনেরা মূলত লিটলম্যাগ কেন্দ্রিক কাব্য চর্চা করেন। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায়ও লেখালেখি করতে দেখা যায়। তবে তারা এখনো গীতি কবিতার ধারা থেকে বের হতে পারেনি। কিছু কিছু রাখাইন কবি আধুনিক তথা উত্তর ঔপনিবেশিকবা পোস্ট কলোনিয়াজম ধারায় অনেকেই গীতি কবিতা চর্চা করে থাকেন।

ঠ. লৌকিক দেবদেবী

সন্তান রক্ষক পাঁচু ঠাকুর ও পেঁচো-পেঁচি : পাঁচু ঠাকুর শিশুসন্তান রক্ষক দেবতা। শিশুসন্তান হারাবার ভয় বাবা ও মাকে চিরদিন কাতর করে রাখে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো না থাকায় সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েক দশক আগে পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার ছিল ভয়ানক। লৌকিক দেবতা পাঁচু ঠাকুরের জনপ্রিয়তা হয়েছে সন্তান হারাবার ভয় থেকে। গৃহস্থের বাসস্থান থেকে কিছু দূরে পুকুর অথবা খালের

www.pathagar.com

পাড়ে তালগাছ, বটগাছ তলায় উন্মুক্ত স্থানে পাঁচু ঠাকুরের উপাসনা ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত হয়। কোথাও গ্রামের বাইরে মাটির ছোট্ট ঘরে পাঁচু ঠাকুর, স্ত্রী দেবতা পাঁচি ঠাকুরানি পূজিত হন। অনেক মা আছেন, যারা শারীরিক কারণে বারবার মৃত সন্তান প্রসব করেন। এই মায়েরা পাঁচু ঠাকুরের থানে পূজা দেন। সন্তান রক্ষা হলো পাঁচু ঠাকুরের থানে মাটির মূর্তি বা ছলন প্রতিষ্ঠা করে পূজা দেন।

কুমির দেবতা কালু রায় : সুন্দরবনের মূর্তিমান যমদূত কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পাবার বিশ্বাসে জল ও বনজীবী মানুষের কুমির দেবতা কালু রায়ের পূজা করে। দক্ষিণ রায়ের মতো এর মূর্তি একেবারে মানবীয়। পোশাক পৌরাণিক যুদ্ধ-দেবতার মতো। দুই হাতে টাঙ্গি ও ঢাল, কোমরবন্ধে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো, পীঠে তীর ধনুক। আরণ্যক দেবতার প্রাচীন পূজা পদ্ধতি মেনে কালু রায়ের পূজায় বনঝাউ ফুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয়া হয়।

বাদাবনের রক্ষক আটেশ্বর :সুন্দরবন অঞ্চলের আমি আরণ্যক লোকদেবতা আটেশ্বর। বনজঙ্গল সমাকীর্ণ গ্রাম সমাজের ইনি দেবতা জ্ঞানে উপাসিত হন। ক্ষেত-খামারে আবাদকারী কৃষিজীবী, জেলে ও বনজীবী প্রভৃতি লোকসমাজের মানুষের কাছে দক্ষিণ রায়, নারায়ণী, বনবিবি, গাজী সাহেবের মতো আটেশ্বর সমান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা পান। আটেশ্বরের মূর্তি পূজার প্রচলন ব্যাপক। বেশির ভাগ থানে মূর্তিপূজা হয় নিয়মিত। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, বনরক্ষক আটেশ্বর জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামের মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করেন।

জ্বরনাশক জ্বরাসুর : জ্বররোগ নাশক রূপে পূজিত বিচিত্র দেবতা জ্বরাসুর। অনুররূপী এই জ্বরের দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য লোকসমাজ এর পূজা করেন। এই দেবতার দেহাবয়ব বিচিত্র ধরনের। গায়ের রঙ ঘন নীল। তিনটি মাথা, নয়টি চোখ, ছয়টি হাত ও তিনটি পা নিয়ে জ্বরাসুর অসংখ্য থানে শীতলা, মনসা, দক্ষিণ রায়, আটেশ্বর, প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে পূজা পান। এর মূর্তি পূজার প্রচলন খুব বেশি এবং শীতলার থানে বা মন্দিরে জ্বরাসুর নিত্যপূজা পান।

সর্পদেবী মনসা : সুন্দরবন অঞ্চলে মনসা পূজা হয় অতি সাধারণ থান ও মন্দিরে। অনেকে পারিবারিক গৃহদেবীরূপে মনসার প্রতীক ঘট অথবা মূর্তি প্রতিষ্ঠা পুরুষানুক্রমে করে আসছেন। সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারে প্রতিবছর ভাদ্র মাসে মনসার ভাসান, পদ্মপুরাণ ও মনসামঙ্গল কাব্য পাঠের ব্যবস্থা থাকে। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বার্ষিক পূজা করা হয়। বার্ষিক মনসা পূজাকে চলতি কথায় বলা হয় রান্নাপূজা।

জঙ্গলজননী বিশালাক্ষী : কৃষিজীবী, জলজীবী ও বনজীবী লোকসমাজে জঙ্গলজননী বিশালাক্ষীর প্রভাব অসীম। এক সময় সুন্দরবনের জঙ্গলমহল যত প্রসারিত হয়েছে; বিশালাক্ষী পূজার ক্ষেত্র ততই বিস্তৃত হয়েছে। কৃষক, জেলে, মৌয়ালি-বাওয়ালি প্রভৃতি পেশার মানুষের নয়নের মণি ইনি।

www.pathagar.com

ভাঙ্গড় পির : ভাঙ্গড় পির মধ্যযুগের বলিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক। তার মাহাত্ম্য কথা প্রচারিত হয়েছে তৎকালীন নিম্নবঙ্গ জুড়ে। মুন্সী মোহাম্মদ খাতের, মোহাম্মদ মুন্সী ও মুন্সী বয়নন্দীন রচিত বনবিবির জহুরানামা পুথিতে পির ভাঙ্গড় শার পরিচয় পাই। আল্লাহ্ রসুলের আজ্ঞায় বনবিবি ও শা জাঙ্গলী ভাটির দেশে এসে প্রথমেই ভাঙ্গড় পিরের আস্তানায় গিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

গ্রামজননী বিবি মা : বিবি মা! এই শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে ভক্তি, ভালোবাসা ও নির্ভরতা। জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কোনো রূপভেদ এখানে নেই লোকধর্মে বিবি মা খুব সহজ, সরল ও অনাড়ম্বরভাবে স্থান পেয়েছেন। বিবি মা নামটি আবেগপ্রসূত এবং মাতৃত্ববোধক। কিন্তু বিবিমা একক ব্যক্তিত্ব নন। বিবি মাদের মধ্যে ওলাবিবিমা সর্বজ্যেষ্ঠ। সাত বিবিদের মধ্যে তিনি অধিক সমাদৃত। অন্য ছয়জন তাঁর প্রিয়তমা ভগ্নী। ওলা উঠা রোগের অধিষ্ঠাত্রী বিবি হিসেবে তিনি সর্বজন পরিচিত। অন্য ছয়জন বোনদের নাম হলো ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটুনেবিবি ও আসানবিবি। মতান্তরে আর একজন আছেন, তার নাম মড়িবিবি। এদের মধ্যে ঝোলাবিবি বলে মানুষের বিশ্বাস। মাটির স্তূপের প্রতীকে এবং মাটির প্রতিমা মূর্তিতে সর্বত্র এরা পূজিত হন। বালি-সিমেন্টে জমিয়েও এদের স্তূপ বানানো হয় কোথাও কোথাও। তবে ছোট-বড় মাঝারি মাটির মূর্তিতে পূজা-হাজত দেয়া হয় প্রায় সর্বত্র।

পশুরক্ষক মানিক পির : মানিক পির গোরক্ষক দেবতারূপে চাষী হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে পূজ্য। এর ব্যক্তি-পরিচয় অন্যান্য পীর-গাজী-বিবিদের মতো রহস্যাবৃত। ভক্তজনের বিশ্বাস, ইনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো হেকিমি চিকিৎসক ও সাধক। গৃহপালিত পশুপক্ষীর রোগ নিরাময়কারী ছিলেন বলে এক সময় শ্রদ্ধাভক্তির প্রাবল্যে লৌকিক দেবতায় উন্নীত হয়েছেন। সেবা পূজার ব্যাপকতায় মানিকপীর লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে একই থানে বা দেবালয়ে পূজা পান।

মাছের দেবতা মাকাল ঠাকুর : সুন্দরবনের জেলেদের সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা হলেন—মাকাল ঠাকুর। তার মূর্তি মানবাকৃতি নয়, বরং ছোট একটি বা একসঙ্গে দুটি স্তূপের মতো। এই স্তূপটি মাটির তৈরি ওল্টানো গ্লাস বা কতকটা টোপরের মতো দেখতে। মাকাল ঠাকুরের পূজার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। সুন্দরবনের জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে নদী বা খালের পাড়ে পূজা করে থাকে। পূজার জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে মাটি দিয়ে বেদি তৈরি করে তাতে মূর্তি বসানো হয়। বেদির চারপাশে তীরকাঠি পুঁতে বেড়া দেয়া হয়। সিঁদুর মাখানো ফুল, বেল পাতা ও তুলসিপাতার সঙ্গে নৈবেদ্য হিসেবে আতপচাল, পাকা কলা, বাচ্চাদের চকলেট ইত্যাদি দিয়ে মাকাল ঠাকুরের পূজা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস পূজায় ঠাকুর সন্তুষ্ট হলে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা/পরাণকথা

এ অঞ্চলের লোকেরা নানা রকম ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে নানা রকম সামাজিক সংগতি-অসংগতি, উপদেশ ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। এসব গল্প খুব সংক্ষিপ্ত হয়। গল্পগুলো বেশ রসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক হয়ে থাকে। কোনো বিয়ের আসরে, মজলিশে, হাটে বাজারে, কিংবা নিছক আড্ডায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। এখানে কয়টি গল্প সংকলিত হলো।

১. মাইয়া পোলা অয় কয় মাসে

শাশুড়ি ও পুতের বৌয়ের মধ্যে কথা হচ্ছে–

পুতের বৌ : আম্মা, আমনেগো দ্যাশে কয় মাসে মাইয়া পোলা অয়।

শাশুড়ি : ক্যা? দশ মাস দশ দিনে।

পুতের বৌ : আম্মা, মোর বুঝি হেতাইক যায় না। মোগো দেশে তো যহন তহন মাইয়া পোলা অয়।

এখানে পুতের বৌ বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল তাই বোঝানো হয়েছে।

২. হজাগ কইরা দিও

মেয়েরা সাধারণত সন্তান প্রসবের আগে মায়ের বাড়িতে থাকে। এখানে মেয়ের প্রথম সন্তান হবে। অনভিজ্ঞা মেয়ে ও মায়ের কথা হচ্ছে–

মেয়ে : মো, যে সময় সন্তান অইবে মোরে হজাক কইর‍্যা দিও।

মা : মোর হজাক হরা লাগবে না। তুমিই বেবাক্কেরে হজাক হরবা আনে।

৩. কোপে কোপে আইয়া পড়ে

কাঠুরে কুড়াল দিয়ে কাঠ ফাঁড়ার সময় 'হেঁক্ক হেঁক্ক' শব্দ করে। কেন এই শব্দ করে জানতে চায় এক গ্রামবাসী।

গ্রামবাসী : ও ব্যাডা, কুড়াল মারার সময় হেঁক্ক হেঁক্ক শব্দ হরো ক্যা।

কাঠুরে : অ কোপে কোপে আইয়া পরে।

৪. ও ব্যাডা ঝোলো ক্যা

এক বিয়ের আসরে দেখা গেল একটি যুবক বসে বসে দুলছে। তাই দেখে এক বুড়ো লোকের কৌতূহল হলো–

www.pathagar.com

বুড়ো : ও ব্যাডা ওরহম বইয়া বইয়া ঝোলো ক্যা?
যুবক : অইব্যস।
বুড়ো : অইব্যাসডা বোজলাম না।
যুবক : সাগরে মাছ ধরতে যাই তো?
বুড়ো : হ্যাতে কি অইচে? মাছ ধরার লগে ঝোলনের সম্পর্ক কী?
যুবক : সাগরের ঢেউতো দেহেন নাই! তাল গাছের হোমান। হেই ঢেউতে নাও ঝোলতে থাহে। হেই ঝোলতে ঝোলতে ঝোলনের অইব্যাস অইয়া গ্যাচে।
বুড়ো : কয় মাস আলহা সাগরে।
যুবক : তিন খ্যাপে তিন মাস।
বুড়ে : হারে বেডা অ কও কি? মোর ৩০ বচ্ছর বিয়ার বয়স, মুইতো তোর নাহান হারা দিন ঝুলি না। (কোমরের বিশেষ ভঙ্গি দেখিয়ে)।

৫. গু খাইলাম বাড়ি

এক কৃপণ লোক বাজারে গিয়ে একটা কাঁঠাল কিনল। তারপর একটা গাছের ছায়ায় বসে কাঁঠালটা ভেঙে খাওয়া শুরু করল। ভাবল, পয়সার কেনা কাঁঠাল বিচিগুলো ফেলে দেবো কেন? সে বিচিসহ কাঁঠালের কোয়াগুলো খেয়ে ফেলল।

বাড়ি এসে বাগানে গিয়ে পায়খানা করল। বিচিগুলো পায়খানার সাথে বেরিয়ে গেল। কদিন পর বৃষ্টি হলো। বৃষ্টিতে পায়খানা ধুয়ে গেলে বিচিগুলো বেরিয়ে এল। কৃপণ লোকটির বউ গেল বাগানে শাকপাতা টোকাতে। দেখল কতগুলো কাঁঠালের বিচি পড়ে আছে। ভাবল, কোনো শেয়ালে কাঁঠালে খেয়েছে, শুধু বিচিগুলো পড়ে আছে। সে বিচিগুলো কুড়িয়ে এনে সেদ্ধ করে রান্না করল।

কৃপণ লোকটি খেতে বসে কাঁঠালের বিচির তরকারি দেখে বৌকে জিজ্ঞেস করল—কাডালের বিচি পাইলা কই? বৌ বলল, বাগে টোহাইয়া পাইচি।
কৃপণ লোকটির মনে পড়ল তার বিচিসহ কাঁঠাল খাওয়ার কথা। সে মনে মনে বলল, কাঁঠাল খাইলাম কাঁঠালতলী, গু খাইলাম বাড়ি।

৬. গন্ধের করবা কী

জামাই ও শ্বশুর খেতে বসেছে। এলাকার রেওয়াজ অনুযায়ী জামাইকে কাঁসার থালায় খেতে দেয়া হয়েছে। খেতে খেতে জামাইয়ের বায়ুত্যাগের বেগ হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় বায়ুত্যাগকে 'পাদ' বলে।

জামাই ছিল চতুর। সে করল কি পাদ দেওয়ার সাথে সাথে আঙুল দিয়ে থালায় ঘষা দিয়ে পোঁ শব্দ করল। শ্বশুর গন্ধ পেয়ে বুঝল জামাই পাদ দিয়েছে। চালাকি করে থালায় ঘষা দিয়ে শব্দ করেছে।
শ্বশুর তখন বলল—
শব্দ দিয়ে শব্দ ঢাকলা
গন্ধের হরবা কী?

www.pathagar.com

৭. পেরায় কী

এক কৃষক তার ঘরে রাতের বেলা শুয়েছিল। ঘরে পেছনে হঠাৎ শব্দ হলো। ভাবল তার জামাই যাচ্ছে। লোকটি জিজ্ঞেস করল—ওহানদ্যা যায় কেডা, জামাই নাকি?

লোকটি উত্তর করল—পেরায়।

কৃষক : পেরায় কী হালার পো হালা।

লোকটি উত্তর করল : জামাইর ছোডো ভাই।

৮. মাডিগুলো গ্যালে কই

জামাই ও শ্বশুর নদীর পাড়ে বেড়াতে গেছে। জামাইয়ের একটু বোকার ভাব ছিল। ভাবল শ্বশুরের সাথে একটু গল্পগাছা করি। জামাই বলল-শ্বশুর আব্বাজান একটা জিনিস বোজলাম না। এই যে এত বড় নদী এডা অইলো ক্যামনে? শ্বশুর বলল, এ্যা আল্লার কেরতেগারি। হে পাহাডারে নদী বানাইতে পারে, আবার নদীরে পাহাড় বানাইতে পারে।

জামাই এবারে বলল, হ্যা তো বোজলাম, কিন্তু নদীর মাডিগুলা গ্যালে কই। শ্বশুর এবার রেগে বলল, বাবা তোমারে জন্ম দিয়া তোমার বাফে খাইচে অর্ধেক, আর মাইয়া জন্ম দিয়া মুই খাইচি অর্ধেক।

৯. পিডানের ধরন দেইখ্যাও বোজ না

এক স্বামী তার বউকে একটা লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করল। বউ ঘর থেকে দৌড়ে গেল রান্নাঘরে। স্বামী সেখানে গিয়েও পিটায়। বউ দৌড়ে গেল উঠানে। স্বামী সেখানে গিয়েও পিটায়া। তারপরে বউ গেল গোয়াল ঘরে। স্বামী সেখানে গিয়েও পিটায়। বউ এবার বলল, মুই যেহানে যাই হেইহানে যাইয়া পিডাও, মোরে কি তুমি রাকপানা? স্বামী এবার বলে, বিডি পিডানের ধরন দেইখ্যাও বোজ না? তোরে রাকমু কি রাকমু না।

১০. এহন আগে গরে

জামাই গেছে বাজারে। তার শ্বশুরের সাথে দেখা। শ্বশুর জিজ্ঞেশ করল—জামাই বাবাজি হোনলাম তোমার বাপের অসুখ। এহন কেমন আচে?

জামাই : আগের চাইয়া একটু ভালো আচে।

শ্বশুর : কী রহম ভালো আচে?

জামাই : এই আগে আগতে বাইরে, এহন আগে গরে (ঘর)।

১১. আত ধরলে না কইতে পারি না

এক বুড়ি একটা হোগলা-পাটি বগলে করে বাজারে বাজারে হাঁটে। এক হাটুরে বুড়িকে জিজ্ঞাস করে, ও বুড়ি তুমি হোগলা লইয়া বাজারে বাজারে আডো ক্যা। বুড়ি বলে, বাবা কেউ আত ধরলে তো আর না কইতে পারি না।

www.pathagar.com

১২. তোরা কার ধারে যাবি

ভাদ্রমাস। মাঠে জোয়ারের পানি ঢুকেছে। একটা শুশুক সেই জোয়ারের পানিতে মাঠে আটকা পড়েছে। গ্রামবাসী এমনপ্রাণী কখনো আগে দেখেনি। সবাই ভাবল জুব্বার আলী মৌলবীকে ডাকা যাক। সে তো অনেক জ্ঞানী মানুষ—প্রাণীটা চিনলেও চিনতে পারে। জুব্বার আলী মৌলবী এল। ভালো করে প্রাণীটা দেখল। দেখে খুব গম্ভীর হলো। তারপর হাসল। বলল, আরে বোকার দল, মুই না থাকলে তোগো কি অবস্থা অইবে। সুর করে বলল—

দ্যাশটা গেলে অরানে
কেরি ডাউকটা চিনলি না
দাঁত দুইটার ধরনে?

এই গল্পের অন্য পাঠ—

মৌলবি প্রথম মাথা নাড়ল। তারপর মিটিমিটি হাসল। তারপর গম্ভীর হলো। শেষে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। গ্রামবাসী বলল—মৌলবি তুমি কানতেচো ক্যান? মৌলবি বলল—ভাবতে আছি মুই মইরা গেলে এমন কঠিন সমস্যায় পড়লে তোরা কার ধারে যাবি।

গ্রামবাসী—হ্যা তো বোজলাম, প্রাণীডা কি তুমি কি চিনতে পারলা?

মৌলবি—আসলে অইচে কি, প্রাণীডা কি মুইও চেনতে পারলাম না।

১৩. কোন কুকতা হিখ্যা আইচো

পাকিস্তান আমল। ছেলে সেনাবাহিনীতে চাকরি করে। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকে। সাত আট বছর পর বাড়িতে ফিরে এসেচে। তাকে দেখতে উঠানে বাড়ির ছেলে-মেয়ে, ঝি-বৌরা সবাই ভিড় করেছে। তার মধ্যে তার মাও এসেছে। ছেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মা তুমকো মাথার সব বাল পাকগিয়া। মা রেগে বলল, হারামজাদা বেয়াদব মুক সামলাইয়া কতা ক! উল্লুকোর দ্যাশে গোনে কোন কুকতা হিখ্যা আইচো!

১৪. অটর অটর রোগ

ছেলে বিদেশে থাকে। দেশে এসেছে। কথায় কথায় ইংরেজি বলে। মাকে বলে-রাইচ দেও, চিকেন দাও, ফিশ ফ্রাই দাও। যা কিছু জিজ্ঞেস করে ইয়েস, নট, ভেরি গুড বলে। একদিন ছেলের খুব জ্বর হয়েছে। এমন জ্বর যে বিছানায় পড়ে গেল। মা তো সারারাত ছেলের সেবা করছে। ছেলে শেষ রাতের দিকে বলে, মা ওয়াটার। মা ওয়াটার। মা এটা দেয়, ছেলে বলে নো, ওয়াটার। ওটা দেয়, ছেলে বলে নো ওয়াটার। এমনি করে সময় যায়। মা কিছুই বুঝতে পারে না।

শেষে ছেলে মারা গেল। মা বিলাপ করে কাঁদতে থাকে—হায়রে মোর বাবায় অটর অটর হরতে হরতে মইরা গ্যালো কিছু বোজলাম না। আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শি, অটর অটর রোগটা কি তারাও বুঝল না।

www.pathagar.com

১৫. জামাইয়ের দাঁতে ছাতা

জামাই গেছে শ্বশুরবাড়ি। জামাই তো দাঁত মাজে না। শাশুড়ি দেখল জামাই যখন কথা বলে ভগভগ গন্ধ বের হয় মুখ থেকে। দাঁতে প্রায় হাঁটু সমান ছাতা। জামাইয়ের দাঁতে ছাতা সে কথা শাশুড়ি বলে কেমন করে। শাশুড়ি জামাইকে এক টাকা দিয়ে বলল, বাবা আডে যাইয়া একখান আউখ কিন্না খাইও। আখ চিবিয়ে খেলে দাঁতের ময়লা কেটে যাবে শাশুড়ি এমন ধারণা করল।

জামাই গেল হাটে। সে আখ কিনে খাবে কী, তার সব দাঁত তো নড়বড় করে। আখ চিবাতে গিয়ে দাঁতগুলো খোয়াবে? সে হাটে দেখল এক লোক সাজিতে কতগুলো পাকা পেয়ারা নিয়ে বসে আছে। সে করল কি এক টাকা দিয়ে সেরখানিক পেয়ারা কিনে বসে বসে খেল। ফল হলো–তার দাঁতের ময়লা তো গেল না, আরো ময়লা জমল।

১৬. আ কইয়া তা কইছি

আতাউল্লাহ খুব মানি লোক। তার নাতি কলিমুল্লাহ। কলিমুল্লাহ একদিন গেল বাজারে। মাছ কিনতে গিয়ে মাছুয়ার সাথে গোলমাল বাধাল। মাছুয়া তার দুই গালে কষে দুই চড় মারল। দুটো দাঁত গেল পড়ে।

কলিমুল্লাহ বাড়ি এল। সব ঘটনা খুলে বলল দাদাকে। শুনে দাদা আতাউল্লাহ বলল, তুই আতাউল্লার নাতি, আতাউল্লার দোআই দিতে পারলি না? তখন কলিমুল্লাহ কাঁদতে কাঁদতে বলল–দাদাজান হে সময় তো পাই নাই–আ কইয়া তা কইচি এ্যার মইদ্যে দুই গালে দুই চোপাড়–দেখি দুইহান দাঁত গ্যাচে পইড়া। হেইয়া দ্যাইক্যা ঝাড়া দৌড়। এক দৌরে বাড়ি।

১৭. চুৎ মারানি

জ্যৈষ্ঠ মাস। আম-কাঁঠালের দিন।

জামাই গেছে শ্বশুরবাড়ি। টোলের পন্ডিত জামাই। কথায় কথায় সংস্কৃত বলে। জামাই খেতে বসেছে। তাকে শাশুড়ি আম-দুধ খেতে দিয়েছে। আমটা ছিল একটু টক। জামাই আম একটু মুখে দিয়ে থালাটা ঠেলে দিল। তাই দেখে শাশুড়ি বলল, বাবা কি অইচে? জামাই বলল, চুৎ মারানি অর্থাৎ আম কিছুটা টক। শাশুড়ি শুনে মাথায় ঘোমটা টেনে বলে, গোল্লাসুকির পোয়ায় অ কয় কী?।

বরগুনা এলাকায় চুতমারানি খুব খারাপ গালি।

১৮. আল্লায় যদি খাওয়ায়

এক ছিল বুড়ি। বুড়ি ছেলেদের বাড়িতে দুধ ভাত খেতে পারে না। নাতিপুতিতে খেয়ে ফেলে। বুড়ি ভাবল, মেয়ের বাড়িতে যাই পেট ভরে সেখানে দুধ ভাত খেতে পারব। চৈত্রমাসের দিন। বুড়ি রওয়ানা দিল মেয়ের বাড়ির দিকে। রোদে বুড়ির মাথা গেল

www.pathagar.com

ঘুরে। পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল। দাঁতকপাটি লেগে গেল। হাটুরেরা যাচ্ছিল সে পথ দিয়ে। তারা বুড়ির সেবা-যত্ন করতে লাগল। কিছুতেই বুড়ির জ্ঞান ফিরছে না। একজনের বদনায় ছিল দুধ। সে করল কি বুড়ির মুখ হাঁ করে দুধ খাওয়াতে গেল। বুড়ির দাঁত ছিল নড়বড়ে। বদনার নাল ঢুকাতে গিয়ে দুটো দাঁত পড়ে গেল। তাতে সুবিধেই হলো। ফাঁকা জায়গা দিয়ে মুখের ভেতর দুধ ঢেলে দিল। বুড়ির জ্ঞান ফিরে এল। বুড়ির দুটো দাঁত পড়ে গেছে দেখে একটু দুঃখ হলো বটে। তারপরও বলল, আল্লায় যুদি খাওয়ায় দাঁত ভাইঙ্গাও খাওয়ায়।

১৯. পোত একটু কমল

এক বুড়ি যাবে মেয়ের বাড়ি। মেয়ের আবার ছেলেপুলে হবে, তাই তাকে খবর দিয়েছে। বর্ষাকাল, রাস্তা একটু পিছল। হঠাৎ বুড়ি আছাড় খেল। পিছলে সে খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তাই দেখে পথচারীরা এগিয়ে এল। বুড়িকে ধরে উঠাল। বুড়ি বলল, তোমরা যে যাই-ই কও পাছার খাইয়া পোত তো একটু কমল। মুইতো ওই দিকেই যাইতে আচিলাম।

২০. হাসতে হাসতে পেরান যায়

ছেলে গেছিল বাবার সাথে হাটে। বাড়ি ফিরে এসে থেমে থেমে শুধু হাসে। মা জিজ্ঞেস করে—ও ব্যাডা তুই এলহা এলহা হাস ক্যা? ছেলে বলে, এক হাউদ ব্যাডা বাবারডে টাকা পাইত, তক্কে-বিতক্কে বাবার কান ধইরা দুইডা লাড়া দেচে। হেইয়া দেইক্যা মোরতো হাসতে হাসতে পেরান যায়। হেই হাসির চোড এ্যাহনও থামাইতে পারি নাই।

২১. আল্লায় মান ইজ্জত রাখছে

বাপ ছেলে গেছে বাজারে। এক পাওনাদার বাবার গলায় গামছা ছিয়েছে। তাই দেখে ছেলে ভোঁ দৌড়। পথে হাটুরেরা জিজ্ঞেস করে, ও ব্যাডা তুমি দৌড়াও ক্যা? ছেলে বলে, আল্লায় মোর মান ইজ্জত রাখছে। বাবার গলায় এক ব্যাডা গামছা দেচে। মোরে ধরতে পারে নাই।

২২. যত কাশো মাপা তো অইয়া গ্যাচে

দুই বন্ধু ছিল খুব গল্পবাজ। এক বন্ধু গল্প শুরু করলে আর থামতে চায় না। শেষে তারা ঠিক করল গল্প যখন বেশি আজগুবি হয়ে যাবে তখন অন্য বন্ধু কাশি দেবে। তখন যে গল্প বলছে গল্পের লাগাম টেনে ধরবে। এক দিন এক বিয়ের আসরে এক বন্ধু গল্প শুরু করল।

হে বছর মুই আর মোর দোস্ত মকবুল গেলহাম সুন্দারবন। সুন্দারবনে থাহে তো বাঘ। নৌকাখান মাত্তর পাড়ে ভিড়াইচি, দেহি জোঙ্গল লড়ে। বুজলাম ওহানে বাঘ আছে। ছুয়ের উফরে থেইক্যা ল্যাজাখান নিলাম আতে। হ্যারপর দেলাম একখান হাক-

www.pathagar.com

ও ব্যাডা বিলইর বুইনের পোয়া বাঘ ওহানে কি হরং আগামুতা হরং ওম্মে বাঘ বাইরাইয়া গোঁফে তাও দিয়া কডমডাইয়া মোগো দিগে চাইয়া আর ল্যাজে বাড়ি মারে। বোজলাম বাঘে এহন থাবা মারবে। মুই হরলাম কি আলি আলি কইয়া ল্যাজাহান মারলাম ফিক। ওম্মে বাঘ একখান লাফ দিয়া হুমুত হইরা পইর্যা গ্যাল। আন্দাজ হরলাম বাঘটা পেরায় ৩০ আত লম্বা অইবে।

গল্প বেশি হয়ে যাচ্ছে দেখে অপর বন্ধু কাশি দিল। এবার গল্পবাজ বন্ধু বলল, কুলে উড্ড্যা একটু একটু আউগাইয়া মনে অইল কমসে কম বাঘখান ২৫ আত লম্বা অইবে। এবারও গল্প বেশি হচ্ছে মনে করে অপর বন্ধু আবার কাশল। গল্পবাজ বন্ধু এবার বলল, এক্কেবারে গেলাম হালার বাঘের কাছে। এবার একটা লাডিদ্যা দেলাম মাপ। ওমা দেহি বাঘখানা ২০ আত লম্বা। গল্প আবারও বেশি হয়ে যাচ্ছে দেখে বন্ধু একটু জোরে কাশল। গল্পবাজ বন্ধু এবার বলল, আর কাইশ্যা কি হরবা দোস্ত, বাঘ তো মাইপ্পা হালাইচি, এহন কমামু ক্যামনে।

২৩. মাগো ও কচ্ছাৎ মোরেও দেচে

বোকা ছেলেকে বিয়ে করিয়েছে। মা অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে মণ্ডা মিঠাই দিয়ে ছেলেকে পাঠাল শ্বশুরবাড়ি। মা ছেলেকে বহুবার শেখাল, শ্বশুরবাড়ির শাশুড়ি, শালাবৌ, শ্বশুর, মুরব্বি যাকে দেখবে সবাইকে বলবে আস্‌সালামু আলাইকুম। কয়েকবার মা ছেলেকে সালাম শেখাল।

ছেলে সেজেগুজে মণ্ডা মিঠাই নিয়ে শ্বশুরবাড়ি রওয়ানা দিল। পথে যেতে যেতে জিকিরের মতো বলতে থাকল আস্‌সালামু আলাইকুম ... পথে এক খালে পড়ল একটা বাঁশের সাঁকে। সাঁকোটি ছিল নড়বড়ে। জামাই সাঁকোর মাঝামাঝি যেতেই সেটি ভেঙে পড়ল। জামাই বাবাজি পড়ে গেল খালের পানিতে। শব্দ হলো কচ্ছাৎ। জামাই কূলে উঠে দেখল হাতের মণ্ডা মিঠাইর হাঁড়ি নেই, ভেসে গেছে। কি আর করা, শ্বশুরবাড়ি কাছেই, তাই আর বাড়ি ফিরে গেল না। চলল শ্বশুরবাড়ি। সে বার বার মা কি কেন শিখিয়ে দিয়েছিল, মনে করতে থাকে। কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে কচ্ছাৎ। সে হাঁটে আর বলতে থাকে কচ্ছাৎ কচ্ছাৎ।

যেতে যেতে একেবারে শ্বশুর বাড়ির দরজায় গিয়ে পড়ে। দেখে তার শাশুড়ি বেগুন ক্ষেতে বেগুন তুলছে। তাকে দেখে জামাই বলল, আম্মাজান কচ্ছাৎ। শাশুড়ি তো লাজে ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

জামাই এবার বাড়ির ভিতরে যায়। দেখে দুই শালাবৌ উঠানে কলাই শুকাচ্ছে। তাদের দেখে নতুন জামাই বলল, ভাবীসাবেরা কচ্ছাৎ। শালাবৌয়েরা লজ্জা পেয়ে দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে শাশুড়ি এসে পড়ল। শালাবৌয়েরা শাশুড়িকে নতুন জামাইয়ের বিত্তান্ত বলল। শুনে শাশুড়ি বলল, হ্যাঁ মাগো, জামাই ও কচ্ছাৎ মোরে আগেই দেচে।

www.pathagar.com

২৪. মরা গরু খায় তোর বাপে

ছোট্ট একটা ছেলে শহরে এসেছে। শহরের একজন থাকে জিজ্ঞাসা করল, মনু তোমাগো বাসা কই? ছেলেটি তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করতে থাকল, বাসা?

-ছেলেটি প্রথম ভাবল, বাসা তো থাকে পাখির মানুষের থাকে ঘর। তাহলে লোকটি তো জিজ্ঞাসা করছে বড় পাখির বাসার নাম। বড় পাখি যদি হয় তাহলে তো সে পাখির নাম শকুন। তাহলে শকুনে কী খায়? শকুনে খায় মরা গরু। লোকটি তাহলে আমাকে শকুনের সাথে তুলনা করেই বাসার কথা জিজ্ঞাসা করেছে। কী লজ্জা? ভাবছে গ্রামের ছেলে বুঝতে পারবে না। সে আরো ভাবল তাহলে শকুন যেমন মরা গরু খায় আমাকেও মরা গরু খাওয়ার কথা বলছে। ছেলেটি অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, এ মরা গরু খায় তোর বাপে। প্রশ্নকর্তা ছেলেটির এমনতর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না।

২৫. পুলিশ ফলনাতা করি না

আসামি ধরার জন্য থানা থেকে পুলিশ এসেছে গ্রামে। সাথে এলাকার চৌকিদার। পুলিশ চৌকিদারকে আসামির বাড়ির সামনে গিয়ে বলল, যাও লোকটিকে ডেকে নিয়ে আস। চৌকিদার বাড়ির মধ্যে গিয়ে আসামিকে ডেকে বলল, বড় মেয়া আফনেরে বোলায়। বড় মেয়া চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করে কেডা বোলায় চৌকিদার উত্তর দেয়, পুলিশ। বড় মিয়ার এ কথা বিশ্বাস হয় না। সে চৌকিদারকে বলে, তোর পুলিশ মুই ফলনাতা (বাজে কথা) করি না। চৌকিদারও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সে গিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে বলে হুজুর, বড় মেয়ায় আইবে না।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, কী কয়? চৌকিদার বলে, বড় মেয়ায় পুলিশ ফলনাতা করে না।

বাজে শব্দ উচ্চারণ শুনে ক্ষিপ্ত পুলিশ নিজেরাই গিয়ে বড় মিয়াকে ধরে নিয়ে আসে। সাথে সাথে পাছার উপরে ৩/৪টা পিটান দিয়ে চিৎ করে ফেলে এবং গজ গজ করে বলতে থাকে, শালা পুলিশ ফলনাতা কর না তোকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব– বলে যখন আবার পিটাতে শুরু করে তখন বড় মিয়া বলতে থাকে, না না ফলনাতা করি ফলনাতা করি।

২৬. অর্জুনের পাঁচালি

এক গাজাখোর। নাম অর্জুন। গাজা খেয়ে গালগপ্প মারে। অনেক সময় আশেপাশে লোকজন থাকে তারাও নানা প্রশ্ন করে।

মুলাদির রায়ডের সুম আমরা ৭ ভাইয়ায় ৭খান রামদা লইয়া লাফাইয়া পড়লাম।
লাল মিয়া সাইবে বন্দুক ধইরা কইলো অর্জুন তুমি থাম। আমরা থাইমা গেলাম।
এ সময় পাশের ছেলেরা প্রশ্ন করে, এই ছ্যামরা হে সোমায় তুই অইছো? তখন অর্জুন বলে, বাবায় কইছে তখন তরা ছট ছট ছিলি।
ওপারে কয়টা পেরেস রে?
সঙ্গীরা : কেন, ১টা!

www.pathagar.com

তখন অর্জুন বলে : না ২টা। একটা অইলো নূরুল ইসলাম মিয়ার ইসলামিয়া পেরেস আর একটা অইলো ডাক বাংলার কাছে সুখাদার ভাই চিত্তর কেলাব পেরেস। (প্রেসক্লাব)

অর্জুন : তেরা আর কী ঘুণ্ডি ওড়াস, ঘুণ্ডি ওড়াইতাম তখন।

ছেলে পেলেরা : কখন কখন?

অর্জুন : সেই বিটিশ আমলে, তখন ঘুণ্ডিগুলা ছিল জ্ঞান ঘোষের ঘরের মত বড়, নাটাইগুলা ছিল সাহা পট্টির তেলের পিপার মতো মোটা, সুতাগুলা ছিল লঞ্চের মোটা কাছির মতো মোটা।

একবার ভাইয়ায় ঘুণ্ডি আকাশে উড়াইয়া আমার হাতে নাটাই দিয়া কইলো, অর্জুন্যা ধর, মুই একটু আইগ্যা আই। অমনি সেই ঘুণ্ডি উড়তে উড়তে গিয়া পড়লো ফুলঝুড়ির দত্ত মশাইর রেন্ডি গাছের উপড়ে। ভাইয়ায় গিয়া ছাড়াইয়া আনল।

ছেলেপেলেরা : এই ছ্যামরা হে সোমায় তুই অইছো?

অর্জুন : বাবায় কইছে, তরা তখন ছট ছট ছিলি।

অর্জুন : তেরা আর কি পেরেম করস, পেরেম করত তখন।

ছেলেপেলেরা : কখন কখন?

অর্জুন : সেই বিটিশ আমলে, সুরেন ঘোষে গার্লস স্কুলের পুকুর পাড়েরখন ঘুণ্ডি উড়াইয়া দিত। সেই ঘুণ্ডির লগে বাইন্দা দিত যাও পাখি বল তারে সে যেন ভুলে না মোরে। সেই ঘুণ্ডি উড়তে উড়তে গিয়া পড়ত ৭৫ ফুটের কোনায় সুরেন মাদবরের ঘরের চালে। সুরেন মাদবরের শাশুড়ি সেই চিঠি পাইয়া দিত তার নাতির কাছে। কইত, নিব্বুইংসা ধর। ছ্যাউট্যা নাতি বুড়া দিদিমার ভাঙা গালে চুমা দিয়া কইত তোমার মুতের টালিডা ফালাইয়া দিমু আনে দিদিমা। তোরা আর কি পেরেম করস।

ছেলেপেলেরা : এই ছ্যামরা তুই তহন অইছ?

অর্জুন : বাবায় কইছে।

২৭. ডরাইলে ডর

'পাগলামি ছাগলামি ডরাইলে ডর না ডরাইলে চ্যাডও না।' এক পাগলের মুদ্রা ছিল এ কথাটি। এ কথাটি বলেই সে তার স্বার্থ উদ্ধার করত। একদিন পাগলের প্রচণ্ড ক্ষুধা পায়। সে বলতে থাকে, ডরাইলে ডর না ডরাইরে চ্যাডও না। সে হাঁটতে হাঁটতে প্রথম যায় ঝোলা গুড়ের দোকানে এবং ঐ কথা বলতে বলতে সে হাতখানা ঢুকিয়ে দেয় গুড়ের হাঁড়ির মধ্যে।

দোকানদার কিছু বুঝে উঠার আগেই সে দ্রুত পালিয়ে যায় সেখান থেকে। চলে যায় মুড়ির দোকানে। এবারও সে দোকানদার কিছু বুঝে উঠার আগেই মিষ্টি মাখা হাত খানা ঢুকিয়ে দেয় মুড়ির ধামার মধ্যে মধ্যে। এবার সে গুড় ও মুড়িমাখা হাতখানা নির্বিঘ্নে চাটতে থাকে আর বলতে থাকে—ডরাইরে ডর না ডরাইলে চ্যাডও না।

www.pathagar.com

২৮. কুকুরের হোলে এত মজা, আহা চকলেট

কতিপয় ছেলেপেলে এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছে তাদের কাছেই শুয়ে ছিল একটা কুকুর। কথায় কথায় ছেলেপেলেরা জুয়া পাতে। ঐ কুত্তার হোলে যে জিহ্বা দিয়ে চাটা দিতে পারবে তাকে ৫০ টাকা দেয়া হবে। কথারও বার নেই অমনি এক ছেলে কুত্তার হোলে চাটা দিতে থাকে। বেজায়গায় অতিরিক্ত আরাম অনুভব করে কুত্তাও দেয় লাফ। লাফ দিয়ে কুত্তা যখন ভোঁ দৌড় দেয় তখন ৫০ টাকা লোভী পড়ে যায় বিপদে। শর্ত পাল হল কিনা সন্দেহে সেও ছুটে দিল দৌড়। মুহূর্তে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। সবাই মজা করে বলতে শুরু করল—কুকুরের হোলে এত মজা,আহা চকলেট।

২৯. জামাই কাদের

মেয়ে গেছে পাশের বাড়ি বেড়াতে। রাতে মেয়ের বিছানায় গিয়ে শুয়ে আছে তার মা। জামাই বাজার থেকে ফিরে অন্ধকারের মধ্যেই সে বিছানায় গিয়ে শোয়। সে নিজের স্ত্রীকে ভেবে শাশুড়ির সাথে স্ত্রীর মতো ব্যাবহার শুরু করে। টের পেয়েই হুংকার ছাড়ে শাশুড়ি। কেডা জামাই কাদের? এবার জামাই ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, জে। জবাব পেয়েই বলে ওঠে শাশুড়ি, আর একটা ঠেলাও দেও বুঝি ল্যারের পো। এবার জামাই সেখান থেকে ভেগে যায় কিন্তু রেখে যায় স্মৃতি।

৩০. তোর বাপের ছেরাদ্দ

বাপ মারা যাবার এক মাসের মাথায় শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে। বামন ঠাকুর শ্রাদ্ধের আসনে বসেছেন। যথারীতি নৈবেদ্য সাজানো হয়েছে। মন্ত্রপাঠ শুরু হবে। ঠাকুর বুঝিয়ে দিচ্ছেন সবকিছু। তিনি বলছেন, সবকিছু তৈরি এবার মন্ত্র পাঠ। আমি যা কমু তুই হেইয়া কবি। ঠাকুর আবার বলতে শুরু করে, আমি যা কমু তুই হেইয়া কবি। এবার শুরু করে মৃত ব্যক্তির ছেলে, আমি যা কমু তুই হেইয়া কবি। বিভ্রান্ত হয় ঠাকুর। তার ধারণা সে ছেলেকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সে আবার বলতে শুরু করে, সোন আমি যা কমু তুই হেইয়া কবি। এবারো ছেলে বলে ওঠে, শোন। আমি যা কমু তুই হেইয়া কবি। বুঝলি না, আমি যা কমু তুই হেইযা কবি। ছেলে বলে, বুঝলি না আমি যা কমু তুই হেইয়া কবি। এবার ঠাকুর আর ছেলে দুজনে একই কথা কে কার মুখ থেকে নিয়ে বলবে তা নিয়ে গোলযোগ বাধে। ঠাকুর যেভাবে ছেলেকে বোঝাতে চায় ঠিক সেভাবেই ছেলেও বলতে চায় আর ঠাকুর তাকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ হয়, তাকে মারতে ওঠে আর ছেলেও তাই তাই করে। এই নিয়ে শ্রদ্ধের কর্মসূচি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

৩১. যার শ্রাদ্ধ হে কই?

শ্রাদ্ধ বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে এসে এক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নাম স্মরণ করে অনেক দুঃখ করেন। তিনি তার সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, আহ সে

www.pathagar.com

কী স্মৃতি! শ্রাদ্ধ খেয়ে চলে যাবার সময় তিনি মৃত ব্যক্তির ছেলেকে ডেকে মৃত ব্যক্তির খোঁজ নেন। তখন ছেলেরা বলে, আসলে তার শ্রাদ্ধ খেতেই তিনি এখানে এসেছিলেন।

৩২. শ্রাদ্ধের গল্প : শুবাতানি ভক্ষণ

এক গ্রামে ছিল তিন ভাই। তাদের বাবা ছিল বুড়ো মানুষ। সে ছেলেদের খুবই ভালোবাসত। সেই বাবা একদিন ছেলেদের রেখে মারা যায়। বাড়িতে বাবার শোকে বেশ কান্নাকাটি হয়। পরে বাবার লাশ দাহ করে আসে। এক মাস পরে বাবার শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের সব আয়োজন যথারীতি সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক লোকজন আসে নিমন্তন্নে।

বিশাল আয়োজন। দুপুরে সবাইকে খাবার দেয়া হয়। কিন্তু সমস্যা হয় কিছুক্ষণ পরে। বেশ কয়েক পদের খাবার দেবার পর বড় ছেলে খাবার ঘরে গিয়ে দেখেন যে বড় ডোঙায় শুকতানি পড়ে আছে কেউই সে শুকতানি ভুলে কারো পাতে এক রত্তি বিতরণ করেনি। এটা একটা মারাত্মক ক্রুটি। বড় ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বলে, সর্বনাশ। বাবার বদনাম হয়ে যাচ্ছে। এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। এদিকে বৈঠক চলছে। সবাই খাওয়া-দাওয়া করছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বড় ভাই গলায় গামছা দুই হাতজোড় করে সবাইর দিকে মিনতির সুরে বলতে থাকে : বাপ গুরু দশা থেকে আমাদের মুক্ত করতে আজ আপনারা যারা দুটো অন্ন গ্রহণ করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন আপনারা আমাদের ক্রুটি মার্জনা করবেন। এই নেমন্তনে আপনারা এসেছেন এ আমাদের প্রতি আপনাদের করুণা।

আপনাদের সকলের পদধূলির কারণেই আমাদের বাবার ভাগ্যে স্বর্গ দর্শন হতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় খাবার দেবার সময় সর্বপ্রথম যে তরকারি আপনাদের পাতে দেবার কথা ভুলবশত সে তরকারিটি দেয়া হয়নি। এটি মারাত্মক ক্রুটি। এ ক্রুটির জন্য আমরা সর্বন্তঃকরণে ক্ষমা চাইছি। নিমন্ত্রণে আসা অতিথিরা বলেন, কোন তরকারিটি বলুন? বড় কর্তা উত্তর করেন, শুকতানি। অতিথিদের একজন তখন দাড়িয়ে বলেন,এখন তো আর সে খাবার খাওয়ার সুয়োগ নেই কারণ শুকতা খাবার খেতে হয় সব খাবারের আগে। সব খাবার খেয়ে তো আর শুকতা খাওয়া যায় না। তখন মৃত ব্যক্তির মেঝো ছেলে ঘরের মধ্য থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বলে, বুদ্ধি একটা আছে। তখন সকলেই তার দিকে তাকায়। মেঝো ছেলে দুই হাত জোড় করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলে, যদি আপনারা দয়া করেন বুদ্ধি একটা আছে। শুকতা খাবার আপনাদের পেটের মধ্যে প্রথম দিকেই থাকবে যদি আপনারা সেভাবে গ্রহণ করেন। উৎসুক আমন্ত্রিত অতিথিরা তখন বলতে থাকেন, পদ্ধতিটা আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

তখন মেঝো ছেলে বলেন, যদি আপনারা পরনের ধুতির কাছাটা একটু খোলেন এবং পাছা উঁচু করে মাথাটা নিচু করেন। বড় ভাই তখন বলেন, এটাই ভালো বুদ্ধি যদি

www.pathagar.com

আপনারা সেটা করেন। একথা শুনে আমন্ত্রিতরা অতিশয় রাগান্বিত হয়ে পড়েন এবং যে যার পথে পা বাড়াতে থাকেন। এসময় ছোট ছেলে একখানা বড় রামদা নিয়ে ঘর থেকে বের হয় এবং হাঁক দিয়ে বলতে থাকেন,আমার বাপের শুকতা না খেয়ে এক শালার পোলায়ও যদি বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছ তাহলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। খোল কাছা শালার পোলারা। বড় ও মেঝো ছেলে তখন ঘর থেকে নিয়ে শুকতানি আসে এবং সবাইকে তা পরিবেশন করে। ছোট ছেলে সকলকে পাছা খুলে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

৩৩. বাড়ি কেথায় বোদা

বরগুনার এক লোক চাকরি করে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায়। লোকটা কিছুটা থোতল। সে অনেক দিন পর বাড়িতে ফিরে এলে এলাকার লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করে, বাজান কোথায় চাকরি করেন। সে উত্তর দেন, ভো ভো দায়। এ নিয়ে হাসির রোল পড়ে যায়। আর লোকটাকে যখন উৎসাহিরা পায় তখনই বার বার জিজ্ঞাসা করে আর শুনতে পায় তোতলানো ভাষায় ভো ভো দায়। এ শব্দটি হলো এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় মেয়েদের যৌনাঙ্গের নাম।

৩৪. বাড়া দেও

বিয়ে করে নতুন বৌকে নিয়ে রিক্সায় ঘুরতে বের হয়েছেন বোদায় চাকরিরত সেই লোক। তিনি বাড়ির কাছে নেমেই তার স্ত্রীকে বলতে থাকে, দেও বা ড়া দেও।

স্ত্রী তখন বলে, হেয় মুই পামু কই। হ্যাঁ তো তোমারডে। কার কাছে–এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি। রিক্সাওয়ালা বেশ কিছুক্ষণ মুখ বুজে উপভোগ করে শেষ পর্যন্ত হেসে বলতে থাকে, থাউক মোর ভাড়া লাগবে না, আপনেরা যান। বাড়া হলো এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় পুরুষের যৌনাঙ্গের নাম।

৩৫. কতার কতা পরণকতা
যার নাই আগামাতা

(বরগুনা অঞ্চলে রূপকথা পরণকথা হিসেবে প্রচলিত)

ক. উড়াল মহারাজ

এক দ্যাশে আছেলে এক রাজা। রাজার আছেলেএকটা গরু। গরুর নাম আছেলে উড়াল মহারাজ। বিপদে পড়লে গরুডায় উইর‍্যাও যাইতে পারতে। একদিন গরুডায় করছে কী গ্যাছে ঘাস খাইতে। ঘাস খাইতে খাইতে গরুডায় যাইয়া ওঠছে এক গৃহস্থ বাড়ি। গরুডায় বাড়ির সব গাছপালা খেয়ে ফেলে। এ অবস্থা দেখতে পায় সে গৃহস্থ বাড়ির বড় ছেলে। অমনি সে গরুর লেজ জাপটে ধরে। বিপদ বুঝে গরুডা উড়তে শুরু করে। উড়তে উরতে গিয়ে নামে রাজা বাড়িতে। রাজার কাছে গিয়ে ছেলেটা নালিশ করে গরুডার বিরুদ্ধে। সে জানায় দুষ্টু গরুডায় তাদের ফসল খেয়ে ফেলেছে। ছেলের

www.pathagar.com

আকুতি দেখে রাজা মহাশয় বেশ ক্ষেপে যায়। অবশেষে ছেলেটাকে আদর করে লাড়ু, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি খাওয়ায়। শ্যাষ পর্যন্ত গরুডাকে আদেশ দেয় ছেলেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

বাড়ি ফিরে ছেলেটা তার ঠাকুরমাকে খুলে বলে কাহিনি। কাহিনি শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে ঠাকুমা। সে তার নাতিকে অনুরোধ করে আবার এ ঘটনা ঘটলে যেন তাকে নিয়ে যায়। একদিন সত্যি সত্যিই আবার গরুডা তাদের বাড়িতে আসে এবং তাদের বাড়ির গাছপালা খেতে শুরু করে। এমন সময় ছেলেটা দৌড়ে এসে গরুর লেজ ধরে। সাতে সাথে তার ঠাকুমা, মার ভাই, বোন এসে ছেলের সাথে একজনে আরেকজনের কোমর ধরে ফেলে। যখন গরুডা উড়তে শুরু করল ঠাকুমা জিজ্ঞেস করে তার নাতিকে, কুরে বলতো লাড়ুটা কত বড়? এ কথা বার বার উচ্চারণ করায় কুরে হাত ছেড়ে হাত দিয়ে দেখাতে গিয়ে বলে ওঠে, আরে মাগি এতবড়। অমনি ধপাস কওে মাটিতে পড়ে দুজন।

খ. আসমান সিং-এর বৌ

এক দ্যাশে আছেলে এক ব্যাডা। হ্যার আছেলে তিনগা পোয়া। হ্যাগো নাম আছেলে কি? এউক্কার নাম আসমান সিং আর দুউক্কার নাম ধলাই সিং আর কালাই সিং। আসমান সিং, ধলাই সিং ও কালাই সিং ব্যাবাক্কেই সিং। সিং মশায়। এয়ার মধ্যে কেও জজ, কেও ব্যারিস্টার, ব্যাবাক্কে শিক্ষিত। শিক্ষিত অওয়ার পর কি করবে? বাপে গ্যাছে মইর‌্যা। কিছু তো করা লাগবে। বইয়া বইয়া তো আর খাইতে পারবে না। মানে কইবে কি। হেয়ার পর চাকরি লইছে তিন পোয়ায়। এউক্কা চাকরি করতে বরিশাল, দুউগ্যা চাকরি করতে কলিকাতা।

এ হোন ঐ আসমান সিং তো আছেলে বরিশাল। হ্যার বৌ মাইয়া আছেলে বাড়ি। বৌর নাম দুর্গামনি আর মাইয়া নাম তারামনি। আসমান সিং বেতন পাইয়া টাহা বাড়ি পাডাইতে। হেইয়া দিয়া দুইজনে চলতে। তয় এদিগে বাজজে আবার নতুন কেছ্ছা। আসমান সিং-এর বাড়ির পাশে আছেলে এক মোসলমান। নাম আছেলে খাঁ সাইব মেয়া। দুর্গামনি আবার হের লগে করছে ভালোবাসা। ভালোবাসা করার পর করছে কি পেরতেক দিন হাদা, জর্দা, পান আইন্যা দুইজোনে ঘরের দোতালায় বইয়া খাইতে। এর পান ও খায় অর পান এ। পান খায় আর আসে, আসে আর পান খায়। হেয়ার পর গপ্পো জে করে মোডে জিরায় না। হেই দুর্গামনির আছেলে এউক্কা মাইয়া। নাম আছেলে তারামনি।

গান

আয় আয় দুর্গামনির মাইয়া ছেলে তারামনি নাম
গুরু বাড়ি ল্যাহা পড়া এই ছিল তার কাম।
বাড়ির সামনে খেলাধুলা করতে হারা দিন
মায়ের কতা তুইল্যা মানে দেতে তারে পিন।

www.pathagar.com

এই দুঃখ লইয়া মাইয়ায় মোন মরা হয়।
মনের কতা মোন থাহে কওনো না যায়।

তারামনি গুরু বাড়ি যাইতে আর ঘরে আইয়া খাইতে, কোনো কাম করত না। গুরু বাড়িদ্যা একদিন নিজেগো বাড়ি আইয়া দেহে কি অর মায় জানাল দিয়া এক দাড়িআলা ব্যাডার লগে কতা কয়। এইয়া দেইক্যা মাইয়ায় তার মায়েড্ডে জিগায়, ঐ ব্যাডা তার কি অয়? দুর্গামনি কয়, তার ধর্মের ভাই। তহন তারামনি কাইন্দ কাইন্দা কয় :

গান

মেয়ে : আমার বাবার খাট পালঙ্কে মাগো দিবা নিদ্রা যাও,
জানালার ধারে যাইয়া মাগো কার পানে চাও?
ও রে আমার দয়াল চানরে।

মা : আমার যদি ধর্মের ভাইও তারা
তোমার মামা হয়।
এমোন ভাই থাকলে পাশে মাগো
নাই মোগো ভয়, ওরে আমার দয়াল চানরে।

মেয়ে : আমার যদি মামা অইতো মাগো
দাড়ি থাকতো নয়
তোমার নামে মাগো
মাইনষে নানা কতা কয়
ওরে আমার দয়াল চানরে।

এয়া কি কইতে আছে তারামনি, এ মাইয়া তুই কি কও? হে সোমায় তারামনি কয়, যদি আমার মামাই অয় হেয়া অইলে হ্যার দাড়ি থাকপে ক্যা? তারামনি দারুণ খেইপ্পা যায়। হে কয়, এয়া মোর মামা না। মোরা হিন্দু হে মোসলমান। মুই গুরু বাড়ি যামু হেহানে যাইয়া ব্যাবাক কমু।

গান

ঐখান দিয়া তারামনি দ্বোচানদিয়া লয়
দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাইয়া কত দূরে যায়
কত দূরে যাইয়া মাইয়ায় গুরু বাড়ি বয়।
গুরু বাড়ি বইয়া মাইয়ায় আদি অন্ত কয়।

তারামনি : এ গুরু মশায়, এ গুরু মশায়, বাড়ি আছেন?

গুরু মশায় বিরক্ত অইয়া ঘরের বায়রায় নামে, জিগায় গুরু মশায় : এ তোর অইছে কি? চিকরাও ক্যা? মরছে নাকি কেও?

তারামনি : মরলে তো ভালোই অইতে। এহানে আইতাম না। এক চোডে পুইররা টুইর‍্যা ঘরে আইতাম।

গুরু মশায় : কি অইছে ক, এই গেলি আবার আইছো?

তারামনি : আরে গুরু মশায়আগুন লাগজে আগুন।

গুরু মশায় : খালি ভগর ভগর, খুইল্লা ক কি অইছে।

www.pathagar.com

তারামনি : আরে গুরু মশায় কি আর কমু।

গান

আউলা কেশে বাউলা ব্যাশে গুরু
জাত বিজাতে যায়।
একটা বিহিত কর গুরু
মান ইজ্জাত তো যায়
ওরে আমার দয়াল চানরে।

তারামনি : গুরু তুমি লও, মুহে সব কইতে পারমু না, সব দ্যাখপা আনে যাইয়া।

গান

ঐখান দিয়া গুরু মশায় দোচান দিয়া লয়
দৌড়াইতে দৌড়াইতে তিনি কতদূরে যায়।
কতদূরে যাইয়া জেলে মনে মনে কয়।
মনে মনে কইয়া জেলে কলা বাগানে বয়।

কলাবাগে যাইয়া যখন বইছে তখন গুরু মশায় সব দ্যাখতে লাগজে। ঘটনা সত্য। দেহে কি খাঁ সাইব মেয়ার মুখের পান দুর্গামনি খায় দুর্গামনির মুখের পান খাঁ সাইব মেয়ায় খায়। আর একছের আল্লাদ করে। বোঝার তো কিছুই বাকি নাই। এ হোন তো গুরু মশায় এখান দিয়া রওনা করছে নিজেগো বাড়ি। গুরু মশায় নিজের বাড়ি আইছে।

তখন তারামনি গুরু মশায়ে কয়–

গান

এমোন পত্র লেখবেন গুরু মশায়
যেন বাবার ধারে যায়।
সেই পত্র পাইয়া বাবায়
দ্রুত বাড়ি আয়,
ওরে আমার দয়াল চানরে।

একতা যহন কইছে তখন তো গুরু মশায় চিডি ল্যাখছে আর চাকতি পাডাইছে। কেডা লইয়া যাইবে। এত যে রদ্দুর লঞ্চতে নাই, নাই কোনো নৌকাও নাই। যাওয়া লাগবে আইড্ডা। গাট্টি বোচকা মাতায় কইর‍্যা টানা লাগবে। কি করবে, তারামনি মেয়ে মানুষ। গুরু মশায় কি করবে দেছে রওনা। মাঠ ঘাট কত কি। যাইতে যাইতে দেহে কি একটা নদী। এহোন পাড়াইবে কেমনে? নদীর পাড়ে বইয়া রইছে। কতক্ষুণ পর চাইয়া দেহে কি নদীতে একটা খেওয়ার নৌকা। খেওয়া বায় এক পাডনি। পাডনি তহন ভাত খাইতে বইছে। দেহে কি গরমের মধ্যে পাডনিরে এমোন ঘামাইছে, চৈত্র মাসের রৌদ ঘামে একছের মাইক্কা গ্যাছে। দিশা মিশা না পাইয়া পাডনি সাপের মন্ত্র পড়া শুরু করছে।

তখন গুরু মশায় করুণ সুরে বলতে শুরু করছে–

গান

সাপের মন্ত্র থুইয়া পাডনি মোরে পার কইর‍্যা দেও।

www.pathagar.com

দূর দ্যাশে যামু পাডনি মোর কতা লও
ওরো মোর দয়াল চানরে

পাডনি কি আর করে, মাইনষে ঠেকলে করবে কী। ভাতের থাল ঠেইল্লা থুইয়া যাইয়া নৌকা ধরছে। এক ঠেলায় নৌকা অপর পারে আইয়া পরছে। কিন্তু গুরু মশায়রডে তো কোনো কড়ি টড়ি নাই। কী করবে। পাডনি কয়, কড়ি কই। গুরু মশায় কয়, যাবার সোমায় দিমু আনে এহোন তো নাই। হুইন্না পাডনি রাগ অইয়া যায়। কয় কি হালার পো হালায়। ভাতের থাল ঠেইল্লা থুইয়া পাড় কইর‌্যা দেলাম এহোন কয় পয়সা পরে দিমু আনে। রাগ অইয়া গুরু মশায়রে এমোন কেনু মারছে কেনুর চোডে গুরু মশায় ডরার মধ্যে ঢুইক্কা গ্যাছে। তখন গুরু মশায় কাইন্দা কাইন্দা কয়।

গান
আসমান সিং-এর দুখের চিডি আমি লইয়া যাই
তুমি মোরে দয়া কর ওরে মোর ধর্মের ভাই
ওরে মোর দয়াল চানরে।

এই কতাডা যহন গুরু মশায় কইছে তখন পাডনির দয়া অইছে। মনে মনে কয় এয়া করলাম কী। গুরু মশায়কে নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া নৌকর উপর লইছে। তখন পাডনি গুরু মশায়ড্ডে কয়,এ গুরু মশায় এই কথা যেন অসমান সিং না শোনে। হেইলে হাটফেল করবে। গুরু মশায় হে সোমায় কয় আরে ব্যাডা পাগল অইছো। না না মুই হেয়া কমুই না। তুমি নামাও আমি এখান দিয়া যাই।

গান
ঐখান দিয়া গুরু মশায় দোচান দিয়া যায়
দৌড়াইতে দৌড়াইতে গুরু মশায় কত দূরে যায়।
কতদূরে যাইয়া জেলে মনে মনে কয়
মনের কতা কইতে জেলে বরিশালের বাড়ি যায়।

এদিকে আসমান সিং সকাল বেলা গামছা একখানা পইর‌্যা ঘডি একটা আতে লইয়া নাইতে মেলা করছে। অমনে পিছন দিয়া গুরু মশায় বোলাবুলি শুরু করছে,

গান
আতে ঘডি পেনদে গামছা বাবু স্নান করিতে যাও
বাড়ি ঘরের দুখের কতা একটু নিয়া লও।
ওরে আমার দয়াল চানরে।

এই কতা পিছন দিয়া গুরু মশায় বার বার কইতে আছে কিন্তু আসমান সিং যখন শোনে না তখন সে দৌড়াইয় তার সামনে গিয় আগোল দিয়া ধরে। এ আসমান সিং তোমার মাইয়ার পত্র আমি লইয়া আইছি। বিত্তান্ত সবই আছে পইর‌্যা দেহ। আসমান সিং চিডি পইর‌্যা বাড়ির ঘটনা সবই জানতে পারে। এ অবস্থায় আসমান সিং ঘডি বাডি রেখে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

গান
ঐখান দিয়া আসমান সিং দোচান দিয়া লয়

www.pathagar.com

দৌড়াতে দৌড়াতে জেলে কতদূরে যায় ।
কতদূরে যাইয়া জেলে মনে মনে কয়
মনে মনে কইয়া জেলে পাডনির খেওয়ায় যাইয়া বয় ।

আসমান সিং : ঐ পাডনি, ঐ পাডনি ।

পাডনি ভাবে হেদিন যে গুরু মশায়রে মারছে হে মোনে অয় জজ ব্যারেস্টার লইয়া আইছে । আইজ আর পাডনিরে থুইবে না । আইজ পাডনিরে মাইর‍্যাই হালাইবে ।

আসমান সিং : এ পাডনি তড়াতড়ি পার কইর‍্যা দিয়া ল ।

এহোন পাডনি একঠেলা দে তিন ঠেলা দৌড়ায় ।

আসমান সিং আবার ধাতায়, এ ব্যাডা তড়াতড়ি কর মোরা অনেক দূরে যামু । তাড়াতাড়ি । পাডনি আসমান সিংরে দ্রুত পার করে দেয় । আসমান সিং নদী পার হইয়া নিজেগো বাড়ি না যাইয়া গুরু মশায়ের বাড়ি যায় । যাইয়া দেহে কি তারামনি গুরু বাড়ি বইয়া আছে । কোনো জাগায় যায় নায় ।

আসমান সিং : এ তারামনি কী অইছে তুই বোলে অসুস্থ?

তারামনি : হয় বাবা । শরীরের চাইয়াও মোন বড় খারাপ ।

তারা গুরু বাড়িতে বইয়া রানছে বারছে খাইছে । সন্ধ্যার পর রওনা করছে বাড়ির দিগে । বাড়ি যাইয়া ঢোকে বাগানে ।

গান

ঐখান দিয়া গুরু মশায় দোচান দিয়া যায় ।
দৌড়াইতে দৌড়াইতে জেলে কত দূরে যায় ।
কত দূরে যাইয়া জেলে মনে মনে কয়
মনে মনে কইয়া জেলে বাগানে যাইয়া রয় ।

কলা বাগে যাইয়া দেহে কী, খাঁ সাইব মেয়ার মুখের পান দুর্গামনি খায়, দুর্গামনির মুখের পান খাঁ সাইব মেয়ায় খায় । তারা খাওয়া খাওই করে । একেবারে বড় পানের মোচা লইয়া আইচে । এ সময় আসমান সিং একখান তলোয়ার লইয়া বাইর অয় । তলোয়ার লইয়া হে নিজের ঘরের দিকে যায় । যাইয়া দেহে কি ঘরের কপাট বন্ধ । আসমান সিং দরোজায় টোকা দিয়া কয়, এ বিডি কপাট খোল তোরে আইজ হোদ দিছি তো । হে সোমায় খাঁ সাইব মেয়ায় ভিতর দিয়া আরো শক্ত কইর‍্যা কপাট দিয়া দে । আসমান সিং কপাটে টোকা দিয়া কয়–যদি ঘর আমার অইয়া থাহ তা অইলে কপাট খুইল্যা যা । দরোজা খুইল্যা গেলে দুর্গামনি তার ছোড মাইয়ডা কোলে লইয়া সামনে খারায় আর খাঁ সাইব মেয়া খারায় দুর্গামনির পিছনে চোরের মত । রাগের চোডে আসমান সিং যখন খাঁ সাইব মেয়াকে কোপ দেয় তখন খাঁ সাইব মেয়া দ্রুত সরে গেলে তলোয়ারের কোপ পড়ে দুর্গামনির কোলে মাইয়ার উপর । টর্চ লাইড মাইর‍্যা দেহে কি মাইয়া গ্যাছে দুই ভাগ অইয়া । তখন দুর্গামনি কি করবে মাইয়ার লাশ লইয়া বরিশাল রওনা অইছে । বরিশাল যাইয়া দুর্গামনি রোডে রোডে ঘোরে । ঘোরতে ঘোরতে একদিন বরিশালের জজ সাইবের বাড়ির সামনে যায় । নিজের মাইয়া নিজে খুন করলে বিচার

www.pathagar.com

আচার আছে কি না জানতে চায়। তহোন বরিশালের বড় জজের কানে গেছে কতাডা। বড় জজ সাইব তখন বলে ঐ মহিডারে ডাকো দেহি কি উপকার করা যায়।

দুর্গামনি : আসমান সিং নিজের মাইয়া নিজে খুন করছে এর কোনো বিচার আচার আছে কি না। এহোন আইজ, কাইল, পরশু কার বিচার কেডা করে। এ বিচারের মানু নাই এ দ্যাশে।

অনেক ভাইব্বা চিন্তা জজ সাইব করছে কি চিডি একখান লেইখ্যা দেছে ভারতে। চিডির মালিক ধলাই সিং আর কলাই সিং। চিডিখানা যে পিওনে নিয়ে যায় সে একটু শয়তানি করে। চিডিতে আসমান সিং-এর জায়গায় লেখে দেয় আসমান কাউল্লা। বিচারে আসমান কাউল্লার ফাঁসি হয়ে যায়। তয় ঐ পিওনেরডে যখন আবার চিডি পরে তখন আবার চিডিতে লেইখ্যা দেয় আসমান সিং। ভারতের জজ ধলাই সিং ও কালাই সিং আসমান কাউল্লার ফাঁসি দেতে আইয়া দেহে কি আসলে ফাঁসি হচ্ছে আসমান সিং এর। তখন তারা আসল ঘটনা জানতে পারে। জজ সাইবরা তহন খাসাইব মেয়া ওদুর্গামনিকে ধরে একটা গর্তে ঢুকাইয়া ইট দিয়া মাইরা ফেলে।

গ. চন্দনমালা

দুই মায় ঝি। চন্দনমালা আর অর মায়। দুই মায় ঝি আর কী। আর কোনো পোয়াও নাই মাইয়াও নাই। দুই জোনেই সুখ ভোগ করে আর খায় দায়। একদিন দেহে কি দুগ্গা পোয়া নাও বাইতে বাইতে চন্দনমালাগো বাড়ির ঘাডে আইয়া নাও ভিরাইছে। কেরায়া নাও। আইয়া চন্দনমালাগো ঘরে দরোজায় কয়, আপনেগো বাড়িতে মোরা একটু থাকতে পারমু? ছোডো ভাই আর বড় ভাই। সন্ধ্যা কাল একটু পরেই রাইত আইবে থাকপে কই।

মা : থাকপা আনে। রাইত অইছে যাবা কই।

ছেলে : তয় নাও থুমু কই।

মা : থোবা হানে ঐ হোতায়। হোতার মধ্যে টাইন্যা ঐ গাছের লগে বাইন্ধা রাখপা আনে।

ছেলে : বৈডা থুমু কই?

মা : বৈডা কাচারি ঘরে থোবা আনে।

কইছে পর বড় ভাই আর ছোড ভাই নাও হোতায় থুইয়া বৈডা কাচারিতে লইয়া আইছে। আইছে পর কয় মোর থাকমু কোন হানে?

মা : কেয়া ঐ কাচারি ঘরের চহিতে।

হেই কাচারতে যাইয়া পাও টাও ধুইয়া বইছে। কতক্ষুণ পর ভাত টাত খাইছে। কলা তরকারি আর চেউয়া মাছ পাতায় ভাজা। দুই ভাই কী মজা কইর‍্যা যে খাইছে কওয়া যায় না। হারা দিন নাও বাইছে কি করবে। হেয়ার পর ঘুমাইয়া পরছে। পরের দিন ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বেইল ১০টা। উইড্যা দেহেকি এউক্কা মাইয়া ঘরের মধ্যে কান্দে। বিয়া অয় না দেইখ্যা কান্দে। কান্দোন হুইন্যা বড় পোয়ায় কয় কি

ছেলে : মাঐজান এউক্কা কতা কমু?

www.pathagar.com

মা : কবা কি কথা?

ছেলে : আপনার মাইয়াউগ্গা বিয়া দেবেন?

মা : বিয়া দিমুনা কি ঘরে রাখমু। ক্যারডে বিয়া দিমু?

ছেলে : ক্যা মোর ছোড ভাইরডে।

মা : তয় নেবা। আড বাজার কইর‍্যা আও। তার পর রাইতে আনে বিয়া অইবে।

হাচাইও পোয়ার বড় ভাই বাজারে যাইয়া আড বাজার কইর‍্যা আনছে। হেইয়ার পর রাইতে সরা অইছে। সরা অইছে পর এই কতা হুইন্না বাড়ির ধারে গোনে আইছে মেহমান। এদিগে খবর পাইয়া পোয়ার বাপেও আইছে।

মেহমান : ও মালার মা, তোমার মাইয়া বোলে বিয়া দেছো? পোয়া কই?

মা : ক্যা পেয়া তো কাচারি ঘরে। যাইয়া দেখপা কেমন।

মেহমানরা কাচারি ঘরে যাইয়া দেহে কি পোয়াউগ্গা একছের কালা। হেইয়া দেইখ্যা টেইখ্যা আইছে

মেহমান : ও মালার মা এয়া করছো কী, মাইয়াডারে হোদ দেলা? মাইয়াডা সুন্দার পেয়াডা কালা। বান্দোরের মুহে কলা দেলা? এইয়া হুইন্না মায় কয়

মা : এহোন তয় করমু কী?

মেহমান : একটা কাম কর পোয়াডারে মাইর‍্যা ফালাও। হেয়ার পর আবার এক খানে বিয়া দেবা আনে।

মা : টাহা দিমু আনে। হেইদ্যা আডে গোনে বিষ কিইন্যা আনেন। খাওইয়া পোয়অডারে মাইর‍্যা ফালান।

মেহমান : হয় হেইয়াই ভালো, হেইয়ার পর আর একখানে বিয়া দেবা আনে চন্দমালারে।

চন্দমালা হোনে টোনে আর কান্দে। একছের কান্দে। কিছু কয় না। এদিকে মেহমান টাহা লইয়া গেছে বাজারে। যাইয়া দোকান্দারেরে কয়–

গান

আরে মোর বাইনাতি মেয়া মুই বলি তোমারে,
৩ তোলা জহর নেতে কয়টি টাকা লাগে?
মরি হায় হায়রে।

এইয়া কইছে পর দোকান্দার ৩ তোলা জহর দেছে। লাগবে ২০ টাহা। এত টাহা হেগোড্ডে নাই। মেহমানরা দ্রুত বাড়ি আইয়া মালার মায়েরডে কয় : এয়া কী দেছো এ টাহাতে কী অয়।

মা : তয় কয় টাহা লাগবে? তুমি রাগ অও ক্যা কী অইছে। যা লাগে নেবা। নামাইয়া আরো টাহা দেছে, হেয়ার পর মেহমানরা বাজারে গেছে। যাইয়া দোকান্দারেডে আবার কয়–

গান

এরো মোর দুলা মিয়া মুই বলি তোমারে।

www.pathagar.com

ওরে ৩ তোল জহর কেনতে ৯ টাহা লাগে।
মরি হায় হায়রে।

হেইয়ার পর বাইন্যা মেহমানেরডে ৩ তোলা বিষ দেছে। হেই বিষ আইন্না মেহমান মালার মায়েরডে দেছে। হেইয়ার পর মালার মায় করছে কী বাজার দিয়া দুধ কিইন্যা আনছে। কিইন্যা আইন্যা হেই দুধ গামলায় আউডাইছে। দুই গামলায় আউডাইছে। একটা ধলা আর একটা কালা। ধলাডা ভালো আর কালাডা বিষ। হেইয়ার পর পোয়ার বড় ভাইর সন্দেহ অইছে বিষয়ডা কী? উদ্দিস পাইয়া কয়–

গান
এরো শোনেন মাঐ জান মুই বলিযে আপনেরে
আমাগো হগোলডির ভাণ্ডে ধলা দুগ্ধ
ছোড ভাইর ভান্ডে কালা
মরি হায় হায় হায় রে।

হুইন্না আবার মাঐ কয়–

গান
শোন শোন তাঐে জান মুই বলি যে তোমারে
একেতো বাজাইর‍্যা দুগ্ধ আরো মাদার চলা রে
ফুয়াইতে ফুয়াইতে দুগ্ধ অইছে কালারে।
মরি হায়রে হায়।

এহোন জল পিড়ি কইর‍্যা সবাইরে খাইতে দেছে। খাইতে দেছে পর চন্দনমালা একছের কান্দা শুরু করছে। চন্দনমালা জামাইর লগে খাইবে। তয় জামাইর লগে শ্বশুর ভাসুর বইলে চন্দনমালা বয় কেমনে? তখন মাইয়ায় কইতে আছে–

গান
ভাসুর বইছে সুশুর বইছে বইছে প্রাণের পতি।
তোমরা সবাই সইর‍্যা বও সঙ্গে বমুরে আমি।
মরি হায়রে হায়।

লগে বইয়া বউ খাইবে। আর বিষের গামলা ফালাইয়া দেবে তয় কেও সরে না। ভাসুরেও না শ্বশুরেও না। এর পর জামাই কয়–

গান
শোনেন শোনেন আম্মাজান মুই বলি যে আপনেরে
সবার ভাণ্ডে সাদা দুগ্ধ আমার ভাণ্ডে কালারে।
মরি হায় হায়রে।

এইয়া কইছে পর জামাইরডে শাশুড়ি আবার কয়–

গান
এরো হোনো দুলা মেয়া মুই বলিযে তোমারে

www.pathagar.com

হগলডির ভাগে ধলা দুগ্ধ আমার ভাগেও কালারে।
মরি হায় হায়রে।

শাশুড়ি কয়, জামাই মেয়া মোর ভাগের দুধ ও কালা। হেইয়ার পর ব্যাবাক্কেতো হেই দুধ খাইছে। তয় দুধের বিষে তো কালা জামাইর প্যাডে যাইয়া উপরে দেছে ঠ্যালা। পোয়ায় তো ঢইল্লা পড়ছে। এহোন বড় ভাই কয় : ভাইতো ঢইল্লা পড়ছে হ্যারে তো হোদ দেছে। এহোন ছোড ভাইরে দাফন দেতে বাড়ি লয়েন সকলে। বড় ভাই ছোড ভাইর লাশ টাইন্যা নৌকায় উডাইছে। এ সময় মাইয়ায় কয় : মোরে একটু ঐ নৌকায় লও মুই যামু। নৌকায় ওঠতে দেইখ্যা মাইয়ারে দেছে বড় ভাই খামার।

বড় ভাই : তুই মোর ছোড ভাইরে খুয়াইছো, তোরে নৌকায় লইয়া আবার গুষ্টি হোদ দিমু? যা তুই ভাগ। দেছে নৌকা দিয়া লামাইয়া। এইয়া দেইখ্যা আশেপাশে ব্যাডারা আছে না হ্যারা কয়, এ ও হরছে কি ও হরছে কি? হরছে অর মায়।

এইয়া হুইন্যা চন্দমালা আবার যাইয়া নৌকায় ওডে। বলে কতা আছে। হুইন্না বড় ভাই কয় কি কথা ক।

চন্দনমালা : মায় যে ঘরের খাডালে হুইয়া রইছে হের একখান পায়ের আঙ্গুল কাইট্যা আনেন হেইলে মোর স্বামীরে জিয়াইতে পারমু। পায়ের রক্ত দিয়া মুই সিডা দেলে অমনি স্বামী হজাগ অইয়া যাইবে আনে। হুইন্না ভাসুরে আইজো দৌড় কাইলে দৌড়। যাইয়া দেহে কি মাঐ সত্যই ঘরের খাডালে হুইয়া রইছে। পুত্রায় ছ্যাত কইর‍্যা মাঐর এক পাও পারা দিয়া ধইর‍্যা অন্য পা টান দিয়া ছিইড়া ফালাইয়া এক পাও লইয়া দেছে দৌড়। নৌকায় যাইয়া আঙ্গু ছিইড়ুড়া রক্ত দিয়া দেছে চন্দনমালারডে। চন্দনমালা হেই রক্ত দিয়া দেছে জামাইর গায় ছিডা। আর গান শুরু কইর‍্যা দেছে।

গান

ও গা তোল গা তোল প্রাণের বন্ধু
কতই নিদ্রা যাওরে প্রাণের বন্ধু জাগরে
আরে ভাঙ্গের লাড়ু থুইয়া প্রাণের বন্ধু
বিষের লাড়ু খাওরে প্রাণের বন্ধু গা তোল গা তোলরে।
গা তোল গা তোল প্রাণের বন্ধু চোক্ষু মেলিয়া চাও রে।
আরে বিষের লাড়ু খাইয়া প্রাণের বন্ধু কতই নিদ্র যাওরে।

এরপর ছোড ভাই চোখ মেলে তাকায়। তয় কোনদিন আর চন্দনমালা বাপের বাড়ি যায় না।

গ. কিংবদন্তি

চাওড়া মাটির দুর্গ

আমতলী উপজেলার চাওড়া ইউনিয়নের পাতাকাটা গ্রামে একটি সু-উচ্চ মাটির ঢিবি দেখা যায়। মনে করা হয় এটি একটি মাটির দুর্গ। লোকজ কিংবদন্তি আছে যে, মোগল

www.pathagar.com

যুগে মগ পর্তুগিজ জনদস্যুদের দমনের জন্যে শাহ সুজা, শায়েস্তা খাঁ, আগাবাকের খাঁ ও পরবর্তী সুবেদারগণ বৃহত্তর বরিশাল এলাকায় বহু মাটির দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, এটি তারই একটি। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র ও কীর্তিনারায়ণ, গুঠিয়া, রায়পুরা, জাগুয়া, কাগাগুরা, নথুল্লাবাদ, হলুদপুর, রহমতপুর, কাশীপুর, রাজাপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। রেনেলের ১৭৬৪-১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের মানচিত্রে রামনাবাদ নদীর তীতে রাজা কন্দর্পনারায়ণ নির্মিত দুটি দুর্গ দেখা যায়। বর্তমানে দুর্গ দুটির কোনো চিহ্ন নেই। আগুনমুখা নদীতে প্রায় ১০০ বছর আগে দুর্গ দুটি বিলীন হয়ে যায়। স্থানীয় নজরুল স্মৃতি সংসদের পরিচালক অ্যাডভোকেট শাহাবুদ্দিন পান্না জানান, কিংবদন্তি আছে যে, চাওড়া মাটির দুর্গটি আমতলীর চাওড়া নদীকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। চাওড়া নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ কি.মি.। এখন আর নদীর সেই উন্মত্ত প্রবাহ নেই তাই শুধু কালের সাক্ষী হয়ে দুর্গটি ঢিবি আকারে আজও টিকে আছে।

ফকিরখালী গ্রামের দিঘি ও মাটির টিলা

এলাকায় কথিত আছে যে, সুলতানি আমলে বরিশালে মুসলমানদের আগমন ঘটে। মোগল জাহাঙ্গীরের সময়ে পটুয়াখালীতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ে আরব, ইরান, ইরাক ও দিল্লি থেকে অনেক পির-আউলিয়া এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। তারা দিঘি খনন করে মসজিদ ও হানকা শরীফ নির্মাণের জন্য জায়গা উচু করতেন। ফকিরখালী গ্রামে তেমন একটি দিঘি ও উচ্চ মাটির টিলা দেখা যায়। ধারণা করা হয়, এখানে কোনো পির অথবা ফকিরের আস্তানা ছিল। গ্রামের নামের সাথে উক্ত ফকির শব্দটি জড়িয়ে থাকায় এ ধারণা যুক্তিসঙগত বলে অনেকে মনে করেন।

গাজি কালুর দরগাহ

গাজি কালু এক কিংবদন্তী। যখন এসব অঞ্চল গভীর অরণ্যতে পূর্ণ ছিল সেই দূর অতীত থেকে প্রচলিত এই কাহিনি। জানা যায়, গাজি এবং কালু শাহ নামক দুই সাধক পির তাদের সাধনার দ্বারা বন-জঙ্গলের সমস্ত হিংস্র পশুপাখির উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাদের কথা বা নির্দেশ ছাড়া হিংস্র পশুকুল কাউকে আক্রমণ করত না। এ বিষয়টি সুন্দরবনের মধু, মোম আহরণকারী, বাওয়ালি ও জেলেরা জানত। তাই তারা বনে নামার আগে গাজি কালু পিরের দরগায় মানত করতে যেন তারা হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ করতে পারে।

আমতলী উপজেলা হলদিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ টেপুরা মৌজায় এই গাজি কালুর দরগা অবস্থিত, স্থানীয়ভাবে জানা যায় গাজি ও কালু পরস্পর দুই ভাই মতান্তরে মামা ভাগিনা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন জাগ্রত পির। মাঝে মাঝেই তারা এই টেপুরার দরগায় সাধনের জন্য বসতেন। এখানে তাদের দরগাহ বাড়িতে দুজনের ধ্যানের জন্য দুটি আসন রয়েছে।

www.pathagar.com

কাছাকাছি রয়েছে একটি পাকা ইন্দিরা, সামান্য দূরে রয়েছে তাদের শিষ্য বা বারো আউলিয়ার বসার স্থান। এলাকাটি দুর্গম, যথাযথভাবে সংরক্ষিতও নয়। কিন্তু প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী আগমন করেন এই মাজারে। প্রতি বছর ২৯ মাঘ ও ২৯ ফাল্গুন এখানে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এখন আর সেই ঘন বন নেই, নেই এখানে সেই হিংস্র পশুও, কিন্তু রয়ে গেছে গাজি কালুর দরগাহ আর তাঁদের সেই কিংবদন্তি। এখনো সুন্দরবনের কাঠ-মধু-মৎস্য আহরণকারীরা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করে গাজি কালুর নাম।

গ. লোকপুরাণ

নিরাহলি কথা

ঠাকুর ও নারদ তীর্থে যাইত কইলাসে। একদিন তার মামির কাছে কইল কি মামি মামায় তোমায় কয় আমি কইলাসে যাই। মামি সব মিথ্যা কথা, যায় কই তুমি যান? যায় পিও কোস নগর, কোস নগর কোসানর সাথে খেলাধুলা করে, তুমি মামি যান না আজ কইল যাইবে। তুমি আইজগো যাইতে চাবা। তোমাকে কাইল নিতে চাইবে না। যদি তোমারে না নিতে চায়। গোসা ঘরে যাইয়া রাগ হইয়া ববা।

মামা আইয়া ডাকাডাকি করবে তুমি মোটে কথা কবা না। দেখবা যে সময় বোলা বোলি বেশি করবে। হেই সময় একটা কথা কবা। কী হইছে। চেচাচেচি কর কেন। এদিকে আমি রাইন্দা বাইরে গোছাইতে পারি না। রান্দা বারার যে কি কষ্ট ওনার সেই কইলাসে যাওয়ার সময় হয়। আর অমনি চিল্যা চিলি্য আরম্ভ হইয়া যায়। আজ আমিও যামু আমারে না নিলে কোনো কাজ ভালো হবে না কচ্ছি। মামি আমি যা কইল তা মামারে কবা না। হেইলে আমারে কইল রাগারাগি করবে, খবরদার মামি। এদিকে ঠাকুরের কৈলাসে যাওয়ার সময় অইয়া গেছে, বাড়িতে আইয়া ঠাউরানের কেন উত্তর নাই, পরে রাগ করে খুব জোরে বোলান দিল বলে ও ঠাউরান, তখন ঠাউরাইনে কয় কি হইছে মেতামেতি করাছ কেন কি হইছে। বুজি কৈলাসে যাওয়ার সময় হইছে আজ আমারে না নিলে কথাও বলব না, রান্নাও করব না দেখি কী হয়।

ঠাকুরঃ হেঃ হেঃ বুজেছি এ চক্রান্ত সব নারদের। বলি ও ঠাউরাইন তোমারে নিনা তাই তুমি রাগ করছ আইজ তোমারে নিমু। তুমি তাড়াতাড়ি রাইন্দা বাইরা সোজা হও। তোমারে আজ লইয়া যামু। তুমি রাগ কইরো না, তুমি আমার কাছে আও, আমার পরানডা একটু জুড়াক। বুজেছি এসব চক্রান্ত সব নারদের, নারদ বোজবা আমি কি পারি? ঠাকুর ও নারদ হাত ধুইয়া খাইতে বসে লগে লগে ঠাউরাইনেও বসে। তাড়াতাড়ি ঠাকুর খাই চৌকিতে সুইতে গেছে ঠাউরাইনে ও উষ্টা কাথা না ধুইয়া তাড়াতাড়ি গড়ানো ঠাকুরের পাশে যাই। শুইল। ঠাকুরে ওমনি নাকে গর গর টান দিয়ে ঘুমের ভান করর। ঠাউরাইনে করে কি। ঠাকুরে তাগার লগে নিজের কাপড় গিডাইল। জটা পিঠের নিচে দিল। আর গায়ের উপর হাত পাও দিয়া শক্ত করে ঘুমাল। এদিকে ঠাকুর করল কি? কাল নিদ্রারে ডাকল। কাল নিদ্রা আইয়া ঠাউরানের চোখে ঘুম বসাইয়া দিল। ঠাউরানের অমনি ঘুম পড়ল। তারপর ঠাউরে বান্ধনগুলো সব খুলল। আর হাত পাগুলো আস্তে আস্তে সারল। তারপর নরদের কইল। নারদ চল না এই

ফাঁকে। নরদ ও ঠাকুরে রওয়ানা হয়ে গেল কোস নগরের দিকে। এদিকে ঠাউরাইনে ঘুম হইতে উঠল, উঠিয়া দেখে ঠাকুরে বিছানায় নাই, তখন অভিশাপ করল, হে সূর্য আমি যদি সতী হই তবে ১২টা সূর্যের তাপ একটায় হও, ঠাকুরে যেন না যাইতে পারে আবার যেন এই পথে আয়। এদিকে ঠাউরানে দৌড়াতে দৌড়াতে কোলার মাঝে যাইয়া এক বেল গাছ হইয়া গেছে। এদিকে ঠাউর ও নারদ রোদের তাপে অসহ্য হইয়া জল পিপাসায় কাতর হইল। তখন নারদকে কয় নারদ দেখতো আমাকে একটু জল খাওয়াতে পার কী। জল পিপাসায় আমি কাতর হয়ে গেলাম আমাকে একটু জল খাওয়াও না হলে আমি মরে যাব। এ চক্রান্ত তোমার মামির নারদ। জলের জন্য অনেক দূর গেল। কিন্তু কোথাও জল পেল না। আবার দৌড়ে আমার কাছে আসল কইল মামা কোথাও জল পাই নাই। ঠাকুর কইল কোথাও গাছের ছায়া দেখ কি না বসে একটু প্রাণ জুড়াই। নারদ চতুর্দিকে চাইয়া দেখে যে পথে আছে সেই দিকে একটা গাছ। মামার কাছে কয় মামা অনেক দূরে একটা গাছ দেখা যায়। ঠাকুর কয় নারদ সেখানে গিয়ে দেহটা শীতল করি। অমনি ঠাকুর নারদ রওয়ানা করে। যাইয়া দেখে একটা বেল। গাছ অমনি ঠাকুর শুইয়া পড়ল। গাছের দিক চাহিয়া দেখে দুইটা বেল। তখন ঠাকুর নারদরে কয় ওই দুইটা ফল দেখা যায় দেখি যেন তোর মামির স্তনের মতো। ফল দুটি পাড়তে পার নাকে মুখে ছোয়াইয়া দেখি শরীর একটু শীতল হয়নি। অমনি নারদ পাড়তে যায়, নারদ যেই ফল ধরতে যায় আর ফল। অন্য ডালে যায়। তারপর ঠাকুর খাড়াইয়া যেই হাত পাতল অমনি তার হাতে এসে পড়ল। ঠাকুর মুখে, বুকে মাথায় ছোয়াল। নারদকে বলে ওরে নারদ এখন আমার শরীর শীতল হয়ে গেল তুই ও একটু নে, নারদ কয়কি মামা তুমি তো সব যাগায় ছোয়াইছ তুমিই নাও ঠাকুর কয় নারদ তুই ভাঙ খা আমিও খাই। নারদ কইল তোমারটা তুমি-ই ভাঙ। ঠাকুর ফল দুটি ভাঙল। তাই ৭টি আঁটি বাহির হইল। আঁটি একটা বেল পাতার রং হইল, আর কটা পাতা দিয়ে ডাকল। এমনি করে থুইয়া বাড়ি দিকে রওয়ানা হলো। তারপর এক কন্যা বের হলো, বলল, বাবা আমারে জন্মাইয়া থুই কোথাও যাও। আমার নাম রাখবা না, আর আমি বা খাব কী। তখন ওই কন্যার নাম রাখল নিরাহলি। আর বলল মানুষের বিপদে পড়ে তোর নাম ডাকবে। আর ধূপ দিপ জল ফুল দিবে তাহাতে তোর পরিপূর্ণ ভোজন হবে। এমনি করে আরও ছয়জন বের হলো আর একেক জনার নাম থুইল এবং ওইভাবে এককে জনকে বর দিল।

এদিকে সৌথি নামে ছিল এক গ্রাম, ওই গ্রামের মাঝে দিয়ে গেছে এক খাল, খালের এক পাড়ে ছিল এক কামার, আর এক পাড়ে ছিল কুমার। তারা ছিল ১২ বৎসরের রোগি। কামারনি ও কুমারি দুয়ে ছিল। একদিন ভোরে খালে ঘাটে এখন যার যার স্বামীর কথা জিগায় কামনি কয় কুমারনির কাছে তোগ জনার কি খবর। কয় সই কমু কী কিছু বুঝি না পরান একটু দুক দুক করে। আর জনে কয় তোমারা ও কথা। এমন সময় নিরাহলি এসে কয় তোমারা কী কও তোমরা একটা কাজ কর তোমরা নিরাহলির কথা কও তাহলে তোমাগো স্বামি ভালো হইবে। হের কথা কইতে কি লাগে তা মোরা বলি না। এতে লাগে নিরাহলি এক পয়সার পান এক পয়সার সুপারি এক

www.pathagar.com

পয়সার তৈল এই লগে এক পয়সার খয়ের এক পয়সার ধূপ। কামারের বৌ বলে, মোরা পয়সা পাব কোথায়? নিরাহলি বলে কুমারের বৌ তুমি তোমাদের পুরান হাঁড়ি পাতিল ভাঙাচুরা আছে না তাহা বিছরাইয়া দেখ ১৬ খানা পয়সা পাবে। তাই দিয়ে বাজার করে তোমরা পূজা কর। নিরাহলি বলল, গ্রামের মহিলাদের নিমন্ত্রণ করতে। আর যদি পাতিল হাতাইয়া দেখ কিছু খুদ টুত পাবে তাই দিয়া তোমাদের স্বামীকে খেতে দাও। এই কথা বলে মেয়েটি অন্তর্ধান হয়ে গেল। কামার ও কুমারের বৌ কূলে ওঠে আর মেয়েটিকে দেখেন না। ওরা বলে ভুত না দুত কী হরে কী দেখলাম। এ মোরা বাড়ি যাই মেয়েটি যা কইছে তাই করি যাইয়া। বাড়ি যাইয়া দেখো সারথে স্বামী। একটু একটু নড়াচড়া করে আর একটু চক্ষু মেলে চায় কামার। কুমারের বৌ বাজারে গিয়া ১৬.১৬ পয়সার বাজার করে এনে নিরাহ্লির নাম নিয়া কথা কইতে থাকে এমন সময় এক সদাগর উপস্থিত হইয়া বলে তোমরা কি কর। সবে বল আমরা নিরাহলির কথা বলি। এ বলে কি হয় এবলে ধনে জনে বারে আর রোগ ভোগ দূরে যায়। সদাগর অহংকারে বলে আমার সব আছে। কপালে না থাকলে নিরাহলি দিবে ধন। অহংকারে সদাগর বাণিজ্য চলে গেল। এদিকে রাজাকে স্বপপন দেখান নিরাহলি আমার পূজা কর না হলে তোর ধনে জনে রাজ্য হারা করব। রানি তখন রাজাকে বলে আমাকে মৃগ মাংশ খাওয়ায়, আমি হরিণ শিকারে যাব। তুমি আমার নিরাহলি কথায় জোগাড় করিও। খরদার মনে থাকে যেন। হয় হয় থাকবে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও। রাজা শিকারে গেল কিন্তু কোথাও শিকারে মিলল না। এদিকে রানি নিরাহলি কোনো জোগাড় করে নায়। রাজা সন্ধ্যায় আসিয়া বলে আমার নিরাহলির জোগাড় করছ? কিন্তু কোনো জোগাড় না করে গোসা হয়ে দাওয়ার উপর বসে রইল। রাজার কাছে বলে আমার শরীরের যে কষ্ট। আমি কিছু জোগাড় করি নাই—কাল করব। এমন করে ৭ দিন যায় নিরাহলির কোনো জোগাড় হয় না আর মৃগও শিকার করতে পারে না। নিরাহলি রাগ হইল। এখন রাজ্যে অনাবৃষ্টি হলো। খেতে শস্য পুড়িয়া যায়। খেতে ধান হয় না। প্রজারা খুদায় না খেয়ে মরতে আছে। তাই দেখে রাজা তার জন্য ঘুরে দেখতে নামলেন। ঘুরে দেখে খেতে শস্যকণা নাই। প্রজারা না খেয়ে মরতে আছে। তখন রাজার মনে মনে চিন্তা করল আমি যদি রাজ্য ছেড়ে চলে যাই প্রজারা সুখে দিন কাটাবে আর আমি যদি না যাই প্রজারা দুঃখে কাল কাটাবে। তাই রানিকে বলল, আমি বনবাসে যাব। রানি বলল, তোমার সাথে যাব।

রাজার দোষে রাজ্য হারা।
প্রজা কষ্ট পায় বিধিরে ॥
আমি রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।
প্রজা সুখে থাকবে রে ॥
আমি রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।
প্রজা সুখে থাকবে রে ॥
(সংক্ষিপ্ত)

এই বলে রাজা রাজ্য ছেড়ে চলে যান এমন সময় রানি বলে আমিও যাব তোমার সাথে।

www.pathagar.com

গান
ও বিধিরে।
আগে রাজায় পিছে রানিরে।
মধ্যে তার ছাওয়াল ॥
রাজায় গেল বন বাসরে
রাজায় গেল বন বাসরে
ও বিধি প্রজার যায় ॥
(সংক্ষিপ্ত)

বনবাসের মধ্যে রানির গর্ভচলে তখন রাজার কয়, রাজা আমার প্রসর ব্যথায় পরান যায়। আমার খুব শীত করে তুমি আমাকে একটু আগুন আনিয়া দাও। রাজা আগুন আনতে গেল। রাজা আর ফিরিয়া আসল না। সে ও জঙ্গলে লুপ্ত হয়ে গেল। এদিকে রানি এক পুত্র সন্তান লাভ করল। এখন রানি গর্ব স্নান এ যাবে। বড় ছেলের কাছে রেখে যায়। বড় ছেলের নাম অরুণ। ছোট ছেলের নাম তরুণ। অরুণের কাছে নলখাক রেখে মায় বলে মনু যদি কন্দে এইয়া ভাইঙ্গা জল দিও মুখে । রানি এই কথা বলে গাঙে নাইতে গেল। এদিকে সদাগরের নাও আটকা পড়েছে গাঙে কারণ নদীতে জল নাই। নদীর কূলে এক অপরূপ কন্যা দেখে মাঝি মোল্লার কাছে বলে সদাগর একি মানুষ নাকি দেবি? একে যদি নৌকায় লই তা হলে আমাদের নৌকা জলে ভাসবে। তখন রানিকে নৌকায় তুলে লইল। তখন গান গায় ও–

ও মাঝিরে,
ছুঁইও না, ছুঁইও না মাঝিরে ॥
ও মাঝি ছুঁইও না মোরে ॥
এনা জঙ্গলে আছে মোর দুইটা শিশুরে ॥
ও মাঝি তারা যাইবে কোন মুখেরে ॥

ওই নৌকায় ছিল রাজা, তারে চোর বলে নৌকায় আটকে রেখে দিল। রানিকে ও সদাগর নৌকায় তুলে লইল, শুনল না রানির কাকুতি মিনতি। যখন রানিকে নৌকায় তুলে লইল অমনি নদীতে জল আসল, নৌকা চলতে শুরু কর। তখন সূর্য দেবকে আরাধনা করে রানি কুৎসিত জীবন শুরু করল। গায় গালে পচা দুর্গন্ধ, চোখে কেতর, নাকে হেত।

এদিকে রাজা অনুরোধ করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু ছেড়ে দেয় না। কিছু সময় পর নৌকা দিয়া লাপাইয়া পড়ে। রানি দেখে চিনতে পারল। তাই দেখে নৌকা থেকে এক বালিশ পাক্কাইয়া দিল। রাজা ও বালিশ পেয়ে আলিশ দিল আর তাল বেতালকে স্মরণ করল এবং ভাসতে ভাসতে এক রাজ্যে গেল যে দেশে কোনো রাজা ছিল না।

রানির বিলাপ
দারুণ বিধিরে ॥
ছুঁইয়ো না ছুঁইয়ো না মাজিরে।
ও মাঝি ছুঁইয়ো না মোরে
স্বাক্ষী থাইক চন্দ্র সূর্যরে

www.pathagar.com

স্বাক্ষী থাইক যত দেবগণরে ॥
আমার যে দুটি শিশুরে।
ও মাঝি এইনা জঙ্গলের মাঝেরে ॥ ঐ
(সংক্ষিপ্ত)

বরণ করে ঘাটে আনতে গেল। রানিরা গিয়া দেখে নৌকার মধ্যে এক যুবতী। তাই দেখে রানিরা বরণ কুলা সব ফেলে চলে আসে। ওই যুবতীকে সদাগর রাস্তার পাশে ছোট্ট একখানা ঘর করে থিল। সেই ঘরে যুবতী খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতেন।

এখন ছেলেদের কাহিনি

ছেলেরা জঙ্গলের মধ্যে কী খাবে। নিরাহলি মায়ের চক্রান্তে ঐ দেশে ছিল এ গোয়ালিয়া তার ছিল একটি কামধেনু। ও কামধেনু জঙ্গলে গিয়া শিশুদেরকে নিত্য দুধ খাওয়াত। আগে যে গতিতে দুধ দিতেন এখন তা হয় না। কিন্তু গোয়ালা তার স্ত্রীকে নিত্য গালমন্দ করতেন। বলত তোর বাপের বাড়ি দাও বিক্রি করে। এই বলে মাঝে মাঝে মারধর করতেন।

তিনি বলতেন, আমি কিছুই করিনি। একদিন ঐ বেটা গাভীর পাছে পাছে গেলেন। দেখে জঙ্গলে দুটি শিশুকে দুধ খাওয়াতে। শিশুরা কিছু দুধ মাটিতে পুঁতে রাখে। তাই দেখে বেটা মিশুকে নিয়ে আসে। আনিয়া স্ত্রীর কাছে দেয় বলে আমি দুটি বাচ্চা পেয়েছি জঙ্গলে। আমাগো তো বাচ্চা নাই এইয়া লালন-পালন করি।

স্ত্রী বলে : এইটা ঝামেলা কাগো বাচ্চা চুরি করে আনছ, এইয়া যদি জানতে পারে। শালা এই বাচ্ছা লইয়া যাইবে। তখন বুঝবে মজা।

গান

উরিয়া যাও ওরে বাদুররে।
তুমি মোর ধর্মের সইরে। ঐ
বুধা পেলে খেতে দিও বাদুররে
ও দুধুর রেখ পাখার তলেরে ॥ ঐ

শিশুর বিলাপ

পিতায় গেছে আগুন আনতেরে।
ও বিধিরে খাইছে বনের বাঘেরে ॥ ঐ
মায় গেছে গাং স্নানে
ও বিধি, খাইছে জলের কুমিরে ॥ ঐ
(দারুণ বিধিরে)
ছোট ভাই কেঁদে উঠলোরে।
কে খাওয়াবে দুগ্ধরে। ঐ
রাত্র না না দুপুরের কালেরে।
ও বিধি কাকে করে কাকারে ॥ ঐ

www.pathagar.com

আমরা কাকে ডাকব মা বাবারে ।
রাত্র না দুপুরের কালে দেয়াল দেশি ।
ও বিধিরে এখন খাইয়া মরি বিষ । ঐ

সেই দেশে গিয়া উঠল এবং সে রাজা চলতে আরম্ভ করল। এদিকে সদাগর বাণিজ্য করে দেশে ফিরে গেলেন। তাই শুনে সদাগরের রানিরা ফুল দিয়ে বরন করে নিল সদাগরকে। তারপর দিন গোয়ালা গলা ঢোল বাইন্দা বাজাতে লাগল আর বলে হইছে যে হাত জিগায় শুআওয়ারা এক কথা বলে হইছে হইছে পারা প্রতিবেশীরা যা জিগায়। ঐ একই কথা পারার মহিলারা ভোর বেলায় আইছে বলে কী হইছে, গোয়ালিনি বলে দুগ্ধ দুগ্ধ। বেড়ার ফাঁক ছেলেটাকে দুই বার দেখায় এরকম দেখে সবাই চলে যায়। আস্তে আস্তে ছেলেরা বড় হতে লাগল, পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে লাগল। পাঠশালায় যত ছাত্র আছে তাদের চাইতে সকল বিষয় উত্তরণ। রাজার কাছে এ কথা শুনল। রাজার মনে ভাবল গোয়ালিনির ছেলে ভালো হয়ে যাবে। দেখি কী হয়, রাজায় ঘোষণা দিল। কাল সকালে রাজপোশাকে আমার পাঠশালায় আসতে হবে। যে না পারবে তাকে আমার পাঠশালা থেকে বের করে দেওয়া হবে। গরিব ছেলেরা কোথা পাবে রাজপোশাক? কানতে কানতে বাড়ি ফিরছিল, তখন পথে এক বুড়ি বলে তোমরা কাঁদছ কেন? ও বুড়ি তোমার কাছে কইলে কী লাভ হবে? ক দেহি, ছেলেরা রাজার ঐ কথা কইল। বুড়ি কইল, তোরা এই পথে আছিস তোগো সব হবে। ছেলেদের চোখে জল দেখে মা বলে তোরা কান্দ কেন?

গোয়ালিয়া বলে, আরে না মানবে কিয়ে। কেউ দেখে নায়। তুমি একটা কাজ কর, পেটে কিছু কাপড়-চোপড় তেনা বাইন্দে ঘুরে আও। স্ত্রী হেয়া হুনিয়া পেটে কিছু কাপড় চোপড় বাইন্দা নগরে গেল।

নগরবাসীরা : বলি ও গোয়ালিনি তোমার যে কী যে কী দেখছি এ আবার কখন বুড়া কাল নয় কালের ছয় কাল গেছে। বুড়া কালে দেখি গোয়ালিনি আরে সখিরা কি কমু নয় কালের ছয় কাল গেছে। বুড়া কাল দেখি দের দেইরা কাল।

গোয়ালিনি : আরে সখিরা কি কমু নয় কালের ছয় কাল গেছে। এখন দেও দেইবা কাল আয়া পড়েছে।

নগরবাসী : আচ্ছা ও গোয়ালিনি তোমার আবার খাইতে টাইতে চায় নাকি কিছু আমাগো কাছে কাইল আইও যদি কিছু নিতে পারি।

গোয়ালিনি : আরে না না ওসব কিছু মানে টানে লয় না তবে একটু এ বিয়াল খোঁজ খবর লইও। আমি এখন যাই।

নগরবাসী : হয় হয় এহন যাও দিন কাল ভালো না। আকাশ বাতাসের দোষ আছে। সকাল সকাল বাড়ি যাও। বোঝ যদি অসুবিধা তয় তোমার ভেবাপের পাঠাইয়া দিও। আর কি কমু একটু সাবধানে থাইকো।

সন্ধ্যায় হয়ে গেলে গোয়ালিয়া বাড়ির চাইরপাশে বেরের হাক্কাটা ফেলাই রাখল। ছেলের তখন বলে মা কাল পরতে যাইতে না করছে রাজায়। কইছে রাজপোশাক পড়ে

www.pathagar.com

আসতে হবে না হইলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। তাই কাঁদি কোথা পাব রাজ পোশাক। গোয়ালিনি চিন্তায় ব্যাকুল। রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখান নিরাহলি মায়, তোর কোনো চিন্তা নাই তোর ছেলেদের সব হয়ে যাবে।

পরদিন ভোরে পাঠশালায় রওনা হলে পথে বুড়ি রাজপোশাক লয়ে দাঁড়ান। ছেলেদের পোশাক দিল ছেলেরা পোশাক পরে পাঠশালে গেল। রাজা দেখে অবাক। বলে গোয়ালিয়া ছেলে রাজপোশাক পেল কোথায় মনে মনে ভাবে। যাক আর একটা ঘোষণা করে। ৭ দিন পরে আমার বাবার শ্রাদ্ধ যত লোক হতে সব দুধ দিতে হবে তোমাদের। না পারলে তোমাদের সকলে আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। ছেলেরা তাই শুনে আবার ঐ দিন কাঁদতে কাঁদতে আসতে ছিল। ঐ বুড়ি বলে আবার কাঁদ কেন?

কী কমু বুড়ি ৭ দিন পর বাজার বাপের শ্রাদ্ধ তাতে যে লোক হবে তাতে সব দুধ নাকি আমাগো দিতে হবে।

কোথায় পাব এত দুধ? তোমরা একটা কাজ কর, তোমাগে যে দুধ হয় তা দুইটি আবার লইও আর দুইটা তুলসি পাতা দিয়া নিও তাতে সব হয়ে যাবে তোমাদের আর পাত্র খালি হবে না।

ছেলেরা তাই দিতে দিতে উঠান বাড়ি তলাই গেল কিন্তু দুধের ভার ভরা রইল। কিন্তু দুধের যোগান দিতে দিতে রাত হলো। এদিকে প্রচণ্ডবৃষ্টি নামল। বৃষ্টির কারণে বাড়ি যেতে না পারায় পথিমধ্যে চলে গেল যে দুখিনি ছিল তার বাড়িতে গেল বুগি ছেলেদের দেখে মনে খুব দুঃখ পেলেন। বলেন, বাবারা তোমরা খাইছ কী। বলে আমরা কিছু খাইনি। বুড়ি বলে আমার ভাত আছে তোমরা খাও। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে তুই খাবি। ছোটায় বলে তুই খা আমি খাব না এই বলে ও ঘুমিয়ে পড়র। বড় ছেলে খুদার জ্বালায় খাইল। বড়টি ঘুমিয়ে পড়ল। বুড়ি বসে রইল, আর দুই ছেলের পা খুঁটিতে রইল। ছোটটার গায়ে হাত পরে আর চিৎকার দিয়ে বলে বুড়ি আমারে ধর। বড়টায় তখন বলে। ওতে তোরে ভালো পায়।

এভাবে রাত ভোর হলো, ওরা দুই ভাই বাড়ি চলে গলে। দুখিনি বুড়ি রাজার কাছে নালিশ দিল। বলল, ও ছেলে দুটো আমার। রাজা বলল, তা কেমন করে হয়। তা যদি হয় তবে একটা শর্ত করে দেখাও, কোথায় কি করা যায়। তখন দুখিনি কইল, রাজা তুমি তাহলে ৬০+৫০ হাত একটা দিঘি কাট। যদি গোয়ালিনি তার দুধে দিঘি ভরে দিতে পারে হেইলে পোলা দুটো তার, সে যদি না পারে আমি আমার দুধে দিঘি ভরে দিব। তাহলে ছেলে আমার। রাজা বলে তাই হবে। গোয়ালা বলল তাই হবে। রাজা দিঘি কাটল। রাজা দুখিনিকে ও গোয়ালিকে ডাকল। একটু পরে ছেলে দুটিকে দাঁড় করাল, তারপর গোয়ালিনি নিজের দুধে চাপ দিল। এক ফোঁটাও দুধ বের হলো না। গোয়ালিয়া যাইয়া গোয়ালিনির দুধে চাপ দিল। অমনি দুধ ফেটে গেল। গোয়ালি চিৎকার করে বলে ওরে নির্বংশা পরে ছেলেতে কাম নাই। এই বলে গোয়ালিনি মারা গেল।

www.pathagar.com

দুখিনি সকল দেবতা দেবীগণকে আরাধনা করে নিজের দুধে চাপ দিল। এবং দিঘির এপার থেকে ওপারে গিয়ে ছেলেদের মুখের উপর পরে এবং দিঘিও ভরে যায়। দুখিনি সূর্যদেবকে আরাধনা করে আগের জীবন ফিরে পায়। তখন রাজাকে বলে আমি তোমার রানি। রাজা শিকার করে বলে তুমি আমার রানি, ছেলে দুটি আমাদের। লাজা ও রানি নিরাহলির পূজা করে এবং বর দেয়। (সংক্ষিপ্ত)

নিরাহ্লির বর

(ওগো মা মাগো)
ওগো মা মাগো, বর দিয়ে যাও–
যেবা আছে অকুমারী মাগো দিও বিয়ার কর ॥ ঐ
যেবা আছে পুত্রহীনা মাগো।
দিবা তারে পুত্র বর ॥ ঐ
যেবা আছে ধন শিমা মাগো।
দিও তারে ধন জনের বর ॥ ঐ
যেবা আছে বিদ্যাহীন, মাগো।
দিও বিদ্যার বর মাগো ॥ ঐ
(সংপিক্ষপ্ত)

ঘ. লোকছড়া

লোকসাহিত্যের অন্যতম মৌখিত সৃষ্টি লোকছড়া। পণ্ডিতগণ ছড়াকে ছেলেভুলানো বা মেয়েলি ছড়া বলে অভিহিত করে থাকেন। বরগুনা অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লোকছড়া প্রচলিত রয়েছে। নিম্নে এ অঞ্চলের সংগৃহীত কিছু লোকছড়া তুলে ধরা হলো। ছড়া আবৃত্তি করে ছেলে পেলেদের ঘুম পাড়ানো হয়।

১.
উলুলুলু মাদার ফুল
জামাই আইছে ঘামাইয়া
ছাতি ধর লামাইয়া
ছাতির উপর বল্লা,
দর জামাইর কল্লা। (মা-মাসিদের কণ্ঠে শোনা যায়)

২.
ঐ ছ্যামরারে ধর, চুঙ্গার মধ্যে ভর
চুঙ্গা যেন লড়ে না, ছ্যামরা যেন মরে না।
ছেলে মেয়েরা কুমির কুমির খেলে তখন বলে–
এই গাঙ্গেতে কুমির নাই,
চাউমা ধইরা খাই। (ছিবুড়ি খেলার সময় ছেলে মেয়েরা আবৃত্তি করে)

www.pathagar.com

৩.

আদগান কৈতর তালগাছ বায়
সোনার কৈতর উইড়্যা যায়।
নলবুইনিদ্যা অতীত আইছে
গঞ্জি কিইন্যা লইয়া আইছে।
হে গঞ্জিতো ভালো না
মাইয়া বিয়া দিমু না।
মাইয়ার মাথায় লম্বা চুল
কোথায় পাবো কুসুম ফুল।
কুসুম ফুলের গোন্দে
খোপা বান্দে নোন্দে।
খোপার উপর দাড়াইশ সাপ
লাফ দিয়া পড়ে বেয়াই সাব।
বেয়াই সাবের ডরে
ভুতুম পড়ে চরে।
ও ভুতুম, তুই কর কী?
ধ্যাতরা কাথায় তালি দি।
আদগান কৈতর তালগাছ বায়
সোনার কৈতর উইড়্যা যায়।

৪.

আইছে পাদ, মারছি পাদ
পাদ কি কেউ বাজানের ব্যাসাত।
হাক্কার তইল দ্যা যায় কী?
হাপ।
ওই ব্যাডা তোর বাপ!

৫.

এক আলহে মইল্লা
হোগা ওঠছে ফুইল্লা
মুই দিছি গাইল্লা
তুই খা গিল্লা।
রহিম করিম দুই ভাই
পোতে পাইছে মরা গাই
রহিম কয় খাইয়্যা যাই
করিম কয় মা'র লইগ্গা লইয়্যা যাই।

www.pathagar.com

৬.
ভ্যাঙ্গায়-চ্যাঙ্গায়
গুইয়্যা পোক চুইয়্যা খায় ।

৭.
ওয়ান টু থিরি
পাইলাম একটা বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন
পাইলাম একটা বাগুন
বাগুনে নাই আডি
পাইলাম একটা বাডি
বাডিতে নাই কান্দা
পাইলাম একটা রান্দা
রান্দায় নাই ধার
পাইলাম একটা হার
হারে নাই লকট
পাইলাম একটা পকট
পকটে নাই টাহা
ক্যামনে যামু ঢাহা
ঢাহা নাই গাড়ি
ক্যামনে আমু বাড়ি..

৮.
ঘাউড়া মানষের ত্যাদড় বচন
নানান ছুতা খুঁজে
লাফাইয়্যা পইড়্যা কাইজ্জা হরে
মাজায় খাতা গুঁজে । (অহেতুক ঝগড়া করাদের ক্ষেত্রে আবৃত্তি করা হয়)

৯.
তালের পাখা
প্রাণের সখা,
গরমকালে
দিয়ো দেখা ।

১০.
তাইরে নাইরে বন্ধুরে

www.pathagar.com

পোম্বা খাইলো ইন্দুরে,
পোম্বার মধ্যে দানা নাই
বিয়া করতে মনে নাই ।

১১.
বন্ধু আইছে বিদ্যাশ গোনে
পাইলায় নাই ভাত,
বন্ধু তুমি শুইয়্যা থাহ
গায়ে দিও না হাত ।

১২.
অবলায় মাছ ধরে
তবলায় খায়,
অবলার জামাই আইলে
তবলায় চায় ।

১৩.
আকাশেতে উড়ে পাখি
নিচে পড়ে ছায়া,
বন্ধু বিদেশ গেলো
রেখে গেলো মায়া ।

১৪.
আমার নাম তালের পাখা
শীতকালে না দেই দেখা
গ্রীষ্মকালে প্রাণের সখা । (নকশি পাখায় বা হাত পাখায় ছড়াটি লেখা হয়)

১৫.
বিন্দু বিন্দু সৎকর্ম গড়ে
তোলে সুখের প্রাসাদ
বিন্দু বিন্দু লোভে দুঃখ,
বিন্দু বিন্দু কষ্টে অবসাদ । (নকশি পাখায় বা হাত পাখায় ছড়াটি লেখা হয়)

১৬.
গোয়ালার গরু নাই,
চাষা কাঁদে রাতে

www.pathagar.com

আমার সন্তান কেমনে
থাকে দুধে ভাতে?

১৭.
এক দমের কত বাহাদুরি
মাটির কঙ্কাল সাজে সোনার মোহরে,
গরিবের অর্থ করে চুরি।

১৮.
নিম গাছে টিয়ার ছাও
টিয়া কয় ইউ,
আমি তোমারে ভালবাসি
আই লাভ ইউ। (বরগুনা অঞ্চলের লোকজ রোমান্টিক ছড়া)

১৯.
আম গাছ তলায় ঝাপুর ঝুপুর
ক্যালা গাছ তলায় টিয়া,
ও ছেমড়ি তোর জামাই আইছে
নতুন শাড়ি নিয়া।

২০.
আলে কলে
চিপ দিলে জ্বলে
টিপ দিলে বলে
চাপ দেলে গলে।

২১.
কুমড়া পাতা খস খস
কদু পাতা নরম,
তোমার লগে কতা কইতে
আমার করে শরম।

২২.
কচু পাতায় চিনা জোঁক
চিনচিনাইয়া রোদ্দুর ওঠ।

www.pathagar.com

২৩.
ছিয়া ছিয়া করবো বিয়া
লাল টুপি মাথায় দিয়া ।

২৪.
ছিয়া বুড়ি নাক বাড়ালি
দক্ষিণারি আড়ালে
লাড়া পক্ষি থাড়া মারে
টেনি পক্ষির ভাতাড়ে ।

২৫.
কাতারে কাতারে ক্যালা গাছ
ওই বুছি মোর মায়গো দ্যাশ
ম্যায় গো দ্যাশে যামু ভাপা পিডা খামু
ভাপা পিডা গরম
মুখে লাগে শরম ।
২৬.
কদম ফুল ফোটছে
বউ লইয়্যা ছোটছে ।

২৭.
এক আত কচু,
দুই আত বই
খোকন তোমার আব্বায় কই
আব্বায় গ্যাছে উত্তরে
বাপ বোলাবি কাহারে ।

২৮.
ফতে ফত কুড়াইতে যায়
ফতে ডেহির গুঁতা খায়
ফতে রাঙা ভাতার পায় ।

২৯.
ইস্কি বিস্কি সাবুর দানা
রাইত পোয়াইলে বৈঠকখানা
মামায় আইছে কামাইয়া

www.pathagar.com

ছাতি ধরো টানাইয়া
ছাতির উফরে গামছা
দ্যাহো মামির তামশা ।
ছোট মামি রান্দে বারে
বড় মামি খায়
মেঝো মামি গাল ফুলাইয়া
বাফের বাড়ি যায় ।
বাফে দেলো লাতি
অইলো একটা বাতি
বাতিতে নাই তেল
অইলো একটা ব্যাল
ব্যালে নাই বিচি
অইলো একটা কেচি
কেচিত নাই ধার
অইলো একটা হার
হারে নাই লকেট
হইলো একটা পকেট
পকেটে নাই টাকা
কেমনে যামু ঢাকা
ঢাকায় নাই গাড়ি
কেমনে যামু বাড়ি
বাড়িত নাই ভাত
দিলাম একটা পাদ
পাদে নাই গোন্দ
হাইস্কুল বন্ধ
হাইস্কুলে যামু না
ব্যাতের বাড়ি খামু না
ব্যাত গ্যালো বাইঙ্গা
স্যারে দেলো কাইন্দা ।

৩০.
ছুটি ছুটি ছুটি
গরম গরম রুটি
এক কাপ চা
সবাই মিল্লা খা ।

www.pathagar.com

৩১.
আয়শা বিবি কলে যাবি
কল ঘুরাইয়া পয়সা পাবি
হেই পয়সাইদ্দা বিয়া ববি
সুন্দর একটা স্বামী পাবি ।

৩২.
মফিজ আলি
হোয়ায় তালি
মুরহা লইয়া
ফালাফালি ।

৩৩.
বরিশাইল্লা
গরু চোর
ব্যাড়া ভাইঙ্গা
দিল দৌড় ।

৩৪.
নাইড়্যা ব্যাল কউড়্যা ত্যাল
টাক দেলে যায় বরিশাল
বরিশাইল্লা ডিলা
নাইড়্যারে ধইর‍্যা কিলা ।

৩৫.
নাইড়্যা, নাইড়্যা ত্যাল কুমাইর‍্যা
নাইড়্যার পাতে ঝোল
সবাইর পাতে মুরহার সালুন
নাইড়্যার পাতে ওল ।

৩৬.
বোরহা বোরহা নালে
গু খায় থালে
থাল গ্যাঝে ভাইস্যা
বোরহা দেছে আইস্যা ।

www.pathagar.com

৩৭.
ইশ বিশ ধানের শীষ
মন্টু মিয়ার হোগা বিষ ।

৩৮.
বেয়াইন বেয়াইন ময়না
এত কতা কয় না
মুহে পড়বে ছাই
ওড়ে ভায়রা ভাই ।

৩৯.
আদা পাদা লবণ চাদা
হুয়ারে বলে হাই হুই
পাদজো ব্যাডা তাই তুই ।

৪০.
মামু গ্যাছে মাছ খাইতে
মামি দেছে কাশ
গ্যাছে পাছায় বাঁশ
আরে সব্বনাশ ।

৪১.
মায়ের বুইন মাসি
কথার তালে ঠাসি
বাপের বুইন পিসি
ভাত কাপড়ে পুষি

৪২.
ইনুচ ইনুচ মোমবাতি
ইনুচের বৌ খয়রাতি
ইনুচ যদি যানতে
পাডি লাইচ্যা নাচতে
পাডির উপরে মুরহার গু
ইনুচের বৌ কান্দে কু কু ।

www.pathagar.com

৪৩.
ভুলু পাগলের বড়ি
রামসার ঘড়ি
নকুল মাতবরের মোচে তাও
পচা গপ্প হোনতে অইলে
যুবরাজ শা'র ধারে যাও ।

৪৪.
খাইতে অইলে যাও
আজী বাড়ি
সুইতে অইলে যাও
ছোটনের বাড়ি
খামার খাইতে অইলে যাও
খাঁয়গো বাড়ি ।

৪৫.
হোক্কা করে গুরু গুরু
মোনডা করে দুরু দুরু
ঝোলের লাউ অম্বলের কদু
যে না খাইবে হ্যার চৌদ্দ গুষ্টি চদু

৪৬.
আয় চান লইরা,
ক্যালা গাছে চইররা
দুধ ভাত খাইয়া
গেদুর লগে টুক্কুরুত্

৪৭.
অলদি পক্কিরে
কাপড় কাইচ্চা দে
তোর বিয়ায় নাচতে যামু
ঘুঙ্গুর বাইন্দা দে ।

৪৮.
ছোড মুহে বড় কতা
বড় মুহে খৈ

www.pathagar.com

পাছ দুয়ারে ব্যাঙ্গে বোলায়
মাঐ মাঐ

৪৯.
মোল্লা বাড়ির বক্কর
গরু কয়ডা ভাক্কর
দেছে গরুতে লাফ
ডাক হ্যারে বাপ।

৫০.
ছোড কাইল্লা তালই তুমি
বয়সের কাইল্লা লাং
আস্তে আস্তে দিও ঠ্যালা
কাপড় হান পুরান।

৫১.
বাপে পোয়ায় ভায়রা ভাই
আল্লাদের আর সীমা নাই
যেমন জামাই হোসনা
মাইয়া মোগো জোসনা।

৫২.
নাচতে জানি নাচি না
কোমর ব্যাতায় বাঁচি না
খাইতে গ্যালে খাই
বেশি কইলো যাচি না

৫৩.
বাব দাদার নাম নাই
গালে আত দিয়া কতা
আডে নাই ঘাডে নাই
হে গেরামের মাতা।

৫৪.
মেয়া ছাব বলে বুড়ি
দশায় গুতায় তোরে

www.pathagar.com

গুতাইতে গুতাইতে নিমু
ঢাহারো শহরে
ঢাহারো শহরে মেয়া
এত পোলাপান
একদিন দেখিলে মিয়া
বাইর অয় জান।

৫৫.
কোপা শামসু কোপা
দল ক্ষমতায়
বোঝবে নেতায়।

৫৬.
একখান কুলা দুইখান কুলা
কুলার আগায় নুন
অলদি পক্কি ডাকছে
ক্যালা ছড়া পাকছে
বাদশা বাড়ির প্যাদা আইছে
কতা কইতে মানা হরছে
চুপচাপ নিচ্চুম।

৫৭.
ওলো ঝি রানছো কী?
ব্যাঙ্গের ঠ্যাং
কি ব্যাঙ্গ?
সরু ব্যাং
কিসরু?
বামন গরু
কি বাওন?
ছাও বাওন
কিছাও?
গু খাও।

৫৮.
কালা বাইগুন
ধলা বাইগুন বাইগুনরে
নোনদের এউক্কাপোয়া অইছে আতুররে

www.pathagar.com

ওলা বিলেইর ঝোলা অইছে ক্যাতোর রে
ব্যাঙ্গে ধইর্‍্যা দেছে তাবা গেদুরে

৫৯.
ওরে আমার বাপ
আর খাব না গাব ।
গাব খাব না খাব কী
গাবের চাইতে মিষ্ট কী ।

(একটা কাক গাব খেতে গিয়ে গাবের বিচি খেয়ে ফেলে। গাবের বিচি যখন পায়খানার দরযায় আটকা পড়ে তখন সে মহাবিপদে পড়ে। সে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে এবং বরে,আর খাব না গাব, আর খাব না গাব । যখন গাবের বিচিটি বের হয়ে যায় তখন কাকটি আবার গাব খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয় । আর তখন কাকটির মুখে উপযুক্ত ছড়াটি ব্যক্ত হয় ।)

৬০.
গেদু নাচে দুয়ারে
ধান খাইয়া যায় হুয়ারে
ও হুয়ারডা ফিইর্‍্যা চা
গেদুর নাচন দেইখ্যা যা ।
গেদু গেদু করে মায়
গেদু গেছে কাদের নায়
দাড় কাউয়ায় দাড় বায়
মাউচ্ছা রাঙ্গায় বইঠা বায়
গেদুরে তুই শিগগির আয় ।

৬১.
আমতলী কাঠালতলী ধুতি টাঙ্গাইছে
ভাল মাইনষের মাইয়া আইন্যা চিরা কোটাইছে
সেই চিরা খাইয়া দাদায় আটখোলা গেছে
আটখোলা আইয়া দারোগা বাবু পিডান মারিছে ।
সেই পিডান খাইয়া দাদায় গাছে উঠিছে ।
গাছে আছিল কাউয়া পাখি ঠোহর মারিছে
সেই ঠোহর খাইয়া দাদায় তলায় পড়িছে
তলায় আছিল ভাউয়া ব্যাঙ্গ কামর মারিছে
সেই কামর খাইয়া দাদায় ওস্বায় উঠিছে
ওস্বায় আছিল নাতি পুতি লাত্থি মারিছে
সেই লাত্থি খাইয়া দাদায় ঘরে উঠিছে

www.pathagar.com

ঘরে আলহে কিলাকিলি কিল মারিছে।
সেই কিল খাইয়া দাদায় আইতনায় নামিছে
আইতনায় আলহে লাথালাথি লাথি মারিছে
সেই লাথি খাইয়া দাদায় স্বর্গে উঠিছে
স্বর্গে আলহে চাপাচাপি চাপ মারিছে
সেই চাপ খাইয়া দাদায় মইর‍্যা গিয়াছে।

৬২.
কলকি হরছো কী?
বেইচ্চা হালাইছি।
পয়সা হরছো কী?
পান কিনিছি।
পান করছো কী?
খাইয়া ফালাইছি।
চিবড়ি হরছো কী?
বাগার মায়ের
হোগায় দিয়া
রাঙ্গা বানাইছি।

৬৩.
বাপে গ্যাছে আড়ে
বাইজ্জা পড়ছে ফাড়ে
উডাইবে কার চ্যাডে
আড়ে আছে বাইন্যা
উডাইবে আনে টাইন্যা।

৬৪.
নাচতে জানি নাচি না
কোমর ব্যতায় বাঁচি না।
বুইনে দেছে আই
কোমর ব্যাতা নাই।

৬৫.
পইর‍্যা পাইছি ধইর‍্যা আনছি
খইদ্দর পাইছি বেইচ্চা ফালাইছি।

৬৬.
পাগলের ম্যাজ বান ছাগলে খায়
গপ্প মারতে মারতে বাড়তে যায়।

www.pathagar.com

৬৭. খেলার ছড়া

ক.

ঘুঘু সই,দাহান কই
দাহান কই, দাইদ্যা করবি কী
বৌভাত খামু বৌ কৈ
ঘাডে গ্যাছে, ঘাট কই
ভাইস্যা গ্যাছে
বড় তালগাছটা লড়ে চড়ে
ছোড তালগাছটা ভাইঙ্গা পড়ে ।
এই গুইয়া ব্যারে পড়বি না
মুতা ব্যারে পড়বি?
ছুইস না ছুইস না ।

খ.

ঘুঘু সই
দাহান কই?
দাদিয়া হরবি কী?
পাত কাডমু
পাত দিয়া হরবি কী?
বউ ভাত খাইবে
বউ কই?
বোনে গ্যাছে
বোন কই?
পুইড়া গ্যাছে
ছাই কই?
ধোপায় নেছে
ধোপা কই?
যুদ্ধে গ্যাছে
যুদ্ধ কই?
থাইম্মা গ্যাছে

গ.

বুরীলো বুরী
তোর পাইলা আরি সরা
ছোড তালগাছটা লড়ে চড়ে
বড় তালগাছটা ভাইঙ্গা পড়ে
দুপপুত... ।

www.pathagar.com

আয় চান লইর‍্যা
ক্যালা গাছে চইর‍্যা
দুধ ভাত খাইয়া,
গেদুর লগে টুক্কুরত।

ঘ.
আয় চান লইর‍্যা
ক্যালা গাছে চইর‍্যা
দুধ ভাত খাইয়া
গেদুর লগে টুক্কুরত।

ঙ.
অলদি পক্কিরে
কাপুড় কাইচ্চা দে
তোর বিয়াতে নাচতে যামু
আলতা কিইন্যাদে।

চ.
এত দুগ্গা ভাত খাবি—হ্যাঁ
বগ মারতে যাবি—হ্যাঁ
ডরাবিতো না-না—ঠুঁশ
এই যে ডরাইলি? হে হে হে।
টাশ খ্যালায় টউস্যারা
কাইন্দা মরে পাউস্যারা
ভাত দেলাম,
তরকারি দেলাম
মাছ দেলাম,
মাংস দেলাম
দুধ দেলাম
প্যাডা গুডুডু কই
প্যাডা গুডুডু কই
কাতুকুতু দেয়।
জ.
ওপাড় গেলাম বেড়াইতে
পোতে পাইলে ডাইতে
ডাহাইত না বোনের বাঘ
ঘোড়া গরু ঘরে বান।

www.pathagar.com

ঙ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ

গাজি-কালু-চাম্পাবতীর পুথি

গাজি-কালু-চাম্পাবতীর পুথির কাহিনি যাই থাকুক না কেন হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত সুন্দরবনের সবাই তাকে স্মরণ করে। যে কেউ সুন্দরবনে ঢুকবার আগে হাতজোড় করে বনবিবির পাশাপাশি গাজির নামে দোহাই দিয়ে ঢোকে। সুন্দরবন সংলগ্ন লোকালয়গুলোতে সাদা বর্ণের মুখে দাড়িসহ কোথাও জামা-পায়জামা-পাঞ্জাবিসহ মূর্তি, কোথাও লুঙ্গি পরা ঘাড়ে গামছাসহ মূর্তি পূজিত হয়। এই পূজার নিরামিষ নৈবেদ্য হলো বাতাসা, পাটালি, আতপচালের শিরনি ইত্যাদি। গ্রামের সাধারণ লোকেরা জঙ্গলে প্রবেশ ছাড়াও গৃহপালিত পশুপাখির মঙ্গল কামনা করেও গাজি সাহেবকে স্মরণ করে থাকে।

গাজি, কালু

বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য পরিবেশনারীতির মধ্যে গাজির গান সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকজ ঐতিহ্য। প্রায় সারা বাংলাদেশেই এই দেশজ পরিবেশনারীতিটি নিয়মিতভাবে অভিনীত বা মঞ্চস্থ হয়ে থাকলেও গাজির গানের প্রসিদ্ধ এলাকা হচ্ছে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সুন্দরবন সন্নিহিত জেলাগুলো। তবে সারাদেশেই গাজির গানের অসংখ্য পেশাজীবী, আধা-পেশাজীবী শিল্পী ও দল রয়েছে। তারা প্রায় সারা বছরই বায়নার ভিত্তিতে সাধারণত মানতে এই গান পরিবেশন করে থাকেন এসব এলাকায়। প্রচলিত আছে যে, গাজি পিরের আখ্যান বিশেষত এদেশের সুন্দরবনসংলগ্ন সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলেই বেশি প্রচলিত। তবে কালভেদে গাজি পিরের এই উপাখ্যান বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় নতুন মাত্রার যোগ করেছে। বরগুনায় বরগুনা সদরে গাজি পিরের বন্দনায় যোগ হয়েছে গাজির গানের পাশাপাশি মারফতি, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ পালা ও বাউল গান। বরগুনা জেলা গাজি, কালু কমিটির সভাপতি ইউনুস আলী হাওলাদার জানান, আটটি স্থানে গাজি, কালুর খানকা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বরগুনা সদরে প্রধান খানকা ছাড়াও তালতলীর জয়ালভাঙা, নাওভাঙা, নিদ্র-সখিনা বাজার, আমতলীর চাওড়া; পাথরঘাটার কাকচিঁড়া বাজার, মানিকখালী বাজার; বেতাগীর চান্দখালী, এসব প্রতিবছর ওরস আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে বরগুনা সদরে প্রধান ওরস অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জেলা ও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ভক্ত যোগ দেন। প্রতিবছর ১৫, ১৬ ও ১৭ চৈত্র বরগুনা শহরের পশ্চিম সদর রোড়ে তিনদিনের এই বিশাল ওরসের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার এই খানকায় সাপ্তাহিক ওরসে ভক্তরা সমবেত হয়ে দয়াল পির গাজির বন্দনা করেন আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য গানের মধ্য দিয়ে। এসময় সমবেত ভক্তদের তবারক হিসেবে সবজি খিচুড়ি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। বাতসরিক ওরসের আগে ভ্যানে করে পিতলের ডেগ লাল কাপড় মুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল ও নগদ অর্থ তোলেন ভক্তরা। এদেরকে খাদেম বলা হয়। আমতলী উপজেলার চাওড়া ইউনিয়নে রয়েছে গাজি, কালুর মাজার। কিংবদন্তি আছে সেখানে ধ্যান করতেন। গাজির সেই আসনকে ঘিরে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে গাজি, কালুর মাজার। এখানে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় ওরস ও গাজির কিস্‌সার। এতে দেশের বিভিন্ন এলাকা

www.pathagar.com

থেকে ভক্তবৃন্দ সমবেত হন। স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থান থেকে বায়নার শিল্পীরা গাজির গান পরিবেশন করেন। পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানি এলাকায় গাজি কালুর খানকা বা দরগা রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যেসব পরম পূজ্য হিসেবে সপ্তদশ শতক থেকে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে তাদের মধ্যে গাজি পির উল্লেখযোগ্য। এই পির কখনও গাজি জিন্দাপির, কখনও বড় খাঁ বা গাজি সাহেব হিসেবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিতি পেয়েছে। তবে বাঘের দেবতা হিসেবে এই গাজি পির হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের লোকের কাছেই সমানভাবে পূজ্য। আর গাজি পিরের আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো তার নামের পাশাপাশি একই সঙ্গে কালু এবং চাম্পাবতীর নামটি জড়িত রয়েছে। বাংলার অন্য কোনো পিরের দোসর হিসেবে দুয়েকজন পুরুষের নাম যুক্ত থাকলেও কোনো নারী চরিত্রের নাম তেমনভাবে যুক্ত থাকতে দেখা যায় না। গাজি পিরের আখ্যানটি সেদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। গাজি পিরের কাল্পনিক আখ্যানকে নির্ভর করে আনুমানিক সপ্তদশ শতক থেকে পুথিসাহিত্য রচিত হতে থাকে এবং তার ধারাবাহিকতা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। এ ধরনের পুথির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হলো আবদুর রহিম রচিত গাজি-কালু ও চাম্পাবতী কইন্নার পুথি।

গাজি পির পুথি ও গাজির গানের আখ্যানে জানা যায়, বৈরাট নগরের রাজা সেকেন্দার যুদ্ধে বলিরাজকে হারিয়ে কন্যা অজুপাকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরে জন্ম নেয় সন্তান জুলহাস। ১২ বছর বয়সে এই পুত্র জুলহাস শিকারে গিয়ে এক মায়া হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে পাতালপুরী চলে যায়। পাতালপুরে জুলহাস জঙ্গ রাজার কন্যা পঞ্চতোলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে সংসার করতে থাকে। এদিকে পুত্র হারাবার শোকে বৈরাট নগরের সেকেন্দার বাদশা ও তার বেগম অজুপা কাঁদতে থাকেন। শেষে জ্যোতিষ বিচারে তাঁরা জানতে পারেন যে, জুলহাস পাতালপুরে সংসার পেতেছে এবং কিছুদিন পর সে আবার ফিরে আসবে। পুত্রশোক ভুলবার জন্য অজুপা রানি একদিন সাগর দেখতে যান। আর সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে একটি লোহার সিন্দুক ভাসতে দেখে দাসীদের তা ধরে দিতে বলেন। কিন্তু দাসীরা সিন্দুক ধরতে গেলে সিন্দুক ভেসে দূরে চলে যায়। এমন দৃশ্য দেখে রানি অজুপা নিজেই সিন্দুক ধরতে সাগরে নামে। অমনি সিন্দুক অজুপার হাতে ধরা দেয়। সিন্দুক খুলে অজুপা ছয় মাসের এক পরম সুন্দর শিশু দেখতে পান। শিশুটিকে কোলে নিয়ে অজুপা তাকে ঘরে এনে কালু নাম রাখেন। এর মধ্যে অজুপা ঋতুমতী হয়ে সেকেন্দার বাদশার সঙ্গে মিলিত হলে গর্ভ সঞ্চার ঘটে। সেই গর্ভ থেকেই জন্ম হয় গাজির। এই গাজির বয়স দশ বছর হলে পিতা সেকেন্দার তাকে রাজ্যভার নিতে বলেন। কিন্তু গাজি অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ পিতা গাজিকে হত্যার জন্য নির্দেশ দেন।

গাজি শরণাপন্ন হয় কোরআন শিক্ষাগুরুর। অতি অলৌকিক ক্ষমতার বলে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পরও গাজির সামান্য ক্ষতি হয় না। রাজা অবশেষে স্ব-স্বাক্ষরিত সুই দরিয়ার পানিতে ফেলে দিয়ে গাজিকে সেই সুই খুঁজে আনার নির্দেশ দেন। গাজি

www.pathagar.com

খোয়াজ খিজিরের সাহায্যে তাও এনে দেয়। গাজি এক রাতে গোপনে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ভাই কালুসহ ফকির হয়ে যায়।

নানা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে গাজি কালু সুন্দরবনে এসে উপস্থিত হয়। এখানে সুন্দরবনের বাঘ গাজির মুরিদ হয়ে যায়। তারপর গাজি ও কালু আশা ভর করে নদী পার হয়ে আসেন শ্রীরামপুরে। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দুই ভাই অন্ন লাভের আশায় শ্রীরাম রাজার দরবারে উপস্থিত হন। রাজা মুসলমানের কথা শুনে তাদের রাজ্য থেকে বের করে দেন। কালুর অলৌকিক ইচ্ছাশক্তিতে রাজপুরীতে আগুন লাগে। দিশেহারা শ্রীরাম রাজা গত্যন্তর না পেয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। পুথির ভাষায় আছে–

"কহেন শ্রীরাম রাজা জোড় করি কর
আগুন জ্বলিয়া পুরি হৈলা গেল ছাই,
কোথায় গেলেন রানি খুঁজিয়া না পাই।"

ভক্তগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাজি কালু চলে আসে সাত কাঠুরিয়ার বনে। গরিব কাঠুরিয়াদের দুর্দশামুক্ত করার জন্য গাজি কালু গঙ্গীর কাছে স্বর্ণের আবেদন জানায়। স্বর্ণ পেলে শাহ পরী ও বায়ান্ন হাজার পরীকে দিয়ে বনের মধ্যে বন কেটে সহস্র দালান ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নাম রাখে সোনাপুর। পরীরা চলে যায়। দুই ভাই পুরীটা ঘুরে ঘুরে এর নাম রাখে সোনাপুর শহর। এই সোনাপুর শহরে মসজিদে দুই ভাই পালঙ্কে ঘুমাচ্ছিল। কুকাফ থেকে ছয় পরী ঘুরতে আসে সোনাপুর শহরে। গাজির রূপ দেখে তারা মোহিত। পরীরা বহু বাগ-বিতর্কের পর গাজির জন্য যোগ্য নারী হিসেবে মনোনীত করল ব্রাহ্মণ্যনগরের মুকুট রাজার কন্যা চাম্পাবতীকে। কথা তো কাজ, পরীরা গাজির পালঙ্ক নিয়ে উড়াল দিল ব্রাহ্মণ্যনগরে। চাম্পাবতীর পাশে গাজিকে রাখল।

ঘুমের ঘোরে গাজির হাত পড়ে চাম্পাবতীর বুকে। চাম্পাবতীর ঘুম ভেঙে যায়। প্রথম দর্শনেই গাজির রূপ দেখে চাম্পাবতী বিমোহিত হয়ে যায়। পরিচয় হয় তাদের দুজনের। চাম্পাবতী ভাগ্যগুণে দেখে গাজিই তার স্বামী। মুখের পান বদল ও হাতের আংটি বদল করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুজনে আবার নিদ্রায় গেলে পরীরা গাজিকে নিয়ে সোনাপুর চলে আসে। ঘুম ভেঙে গেলে গাজি চাম্পার জন্য পাগল হয়ে যায়। কালুকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঠায়। কালু বন্দি হয় মুকুট রাজার হাতে। পুথির ভাষায়–

সাত শত গাড়ল লয়ে
দাবার ঘাট পার হয়ে
গাজি চললেন খুনিয়া নগর
খুনিয়ানগরে যেয়ে মুকুট রাজার মেয়ে
গাজি বিয়ে করলেন কৌশল্যা সুন্দরী।

গাজি জানতে পেয়ে বনের বাঘ নিয়ে ভাই কালুকে উদ্ধারের পথে রওনা দেয়। এদিকে এই খবর জানতে পেরে মুকুট রাজা গাজিকে প্রতিহত করার জন্য দক্ষিণ রায়কে যুদ্ধে ন্যস্ত করে। গাজির সঙ্গে যুদ্ধে নেমে দক্ষিণ রায় পরাস্ত হয়। মুকুট রাজা

www.pathagar.com

এবার কুমির দিয়ে গাজির বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করায়। বাঘ ও কুমিরের সেই লড়াইয়ে মুকুট রাজের শক্তির কাছে গাজি প্রায় সর্বশান্ত হয়। গাজি গো-মাংস দিয়ে মুকুট রাজার মৃত্যজীব কূপ ধ্বংস করে। আর আশা ও খড়ম দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গাজি মুকুট রাজাকে পরাজিত করে। পরাজিত রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং গাজি-চাম্পাবতীর বিয়ে দেয়। রাজপুরীতে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর গাজি, কালু ও চাম্পাবতী পাতালপুরে জুলহাসকে নিয়ে বৈরাট নগরে চলে আসে পিতামাতার কাছে। তাদের সুখের মিলন হয়। পুথির ভাষায়–

বড় আহ্লাদের মোর কন্য চাম্পাবতী
সাতপুত্র মধ্যে সেই আদরের অতি।
তার প্রতি দয়া তুমি সদয় রাখিবা
অনিষ্ট করিলে কোন মার্জনা করিবা।

গাজি চাম্পাবতীকে নিয়ে বিদায় হলেন। বাঘ ও পরীগণ রাজাকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলো যার যার আবাসে। গাজি চাম্পাবতীর রূপে মুগ্ধ হলেন। পুথিতে তার অপরূপ রূপের কথা বর্ণিত আছে–

জ্বলিতেছে রূপ যেন লক্ষ কোটি শশী
হঠাৎ চাম্পার রূপ নয়নে হেনিয়া
মূর্ছিত হইয়া গাজি পড়িল ঢলিয়া।

কিছুদিন পরে পথিমধ্যে গাজি দেখলেন, এক নদীর কূলে তিন শত যোগী সাধনায় নিযুক্ত আছেন। সঙ্গীকে ডেকে তিনি যোগীদিগের অভীষ্ট কমলে কামিনী দর্শন করালেন। যোগীরা মুসলমান ধর্মের ন্যায় ধর্ম নাই দেখে ঝুঁটি কেটে মুসলমান হয়ে গেল। পরে পাতালপুরী হতে জুলহাসকে নিয়ে গাজি কালু ও চাম্পাবতী সাগর পার হয়ে বৈরাটনগরে পৌঁছলেন। মলিন রাজপুরী আবার হর্ষ কোলাহলে মুখরিত হলো। এই কাহিনিই হলো গাজি-চম্পাবতী উপাখ্যান নিয়ে পুথির মূল কথা।

গাজির গানের একটি ভিন্নতর পরিবেশনারীতি হলো গাজির পট গান। এ ধরনের পরিবেশনা সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁশের খণ্ডের অগ্রভাগে ঝুলিয়ে গাজির পট রাখা হয়। প্রায় একই দৈর্ঘ্য ও প্রায় ৩ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একখণ্ডবস্ত্রে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ছবি আঁকা থাকত এবং বস্ত্রখণ্ডটিকে বাঁশের আগায় বেঁধে মানচিত্রের মতো করে মুড়িয়ে রাখা হয়। বাঁশের গোড়াটিকে প্রথমে আড় করে একটু দূরে সরিয়ে রেখে ওপরের ছবিগুলোকে প্রথমে দেখানো হয় একখণ্ড ছোট ও সরু লাঠির সাহায্যে। গাজির এই পটে সাধারণত গাজির পিতা সেকান্দর বাদশার লড়াইয়ের কাহিনি, গাজির সঙ্গে মটুক রাজার ও দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ, সে যুদ্ধে গাজির বিজয়, ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে গাজির যুদ্ধযাত্রা এবং বাঘ-কুমিরের যুদ্ধচিত্র অঙ্কিত থাকে। গাজির পট মূলত ভিন্ন ধরনের একটি পরিবেশনারীতি। অঙ্কিত চিত্রই সেখানে কাহিনির প্রকাশক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ ও ভারতে বেশ কয়েকটি স্থানে পির গাজি ও কালুর নামে আস্তানা এবং কোথাও মাজার বা সমাধিও রয়েছে। বরগুনার একটি জনপ্রিয় গাজির গীত ও পালার

www.pathagar.com

দল হচ্ছে রহিমুদ্দিন বয়াতি ও তাঁর দল। বরগুনা সদর উপজেলার বারঘর গ্রামের রহিমুদ্দিন বয়াতি (৭০) দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে গাজিরগীত ও গাজি, কালু ও চম্পাবতীর পালা করছেন। তাঁর দলে রয়েছে ৩২ জন সদস্য। বরগুনা ছাড়াও বাগেরহাট, খুলনা, পিরোজপুরসহ অন্যান্য জেলায়ও বায়নার ভিত্তিতে তিনি গাজির পট, গাজি, কালু ও চাম্পাবতীর পুথির নাট্যপালা করেন।

পেশাজীবীর ভিত্তিতে বায়না নিয়ে থাকে এবং পরিবেশনার জন্যে সারা বছরই প্রায় ব্যস্ত থাকে। তাদের কেউ কেউ আবার আধা-পেশাজীবীর ভিত্তিতে গাজির গানের পালা করে থাকে। এই ধরনের দল গায়েন, বাদ্যকর, দোহারগণ গান পরিবেশনার পাশাপাশি কৃষিকাজ বা ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

বরগুনায় গাজির গান পরিবেশনার ক্ষেত্রে কোনো রকমফের দেখা যায়না। বরগুনায় গাজির গান, মারফতি ও দেহতত্ত্ব গানে নারী ও পুরুষ উভয়কেই একসঙ্গে গান পরিবেশন করতে দেখা যায়। তবে গাজি, কালু ও চাম্পাবতী পালায় পুরুষেরা ছুকড়ি সেজে নারীর অভিনয় করে।

জনশ্রুতি আছে যে, বরগুনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীরা হিন্দুরা বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে নামার আহে সুন্দরবনে গাজির নামে পাঠা বলি দিতেন। মুসলমান মৎস্যজীবীরা গাজির নামে শিরনি দিত। যাতে তারা নদী ও সাহরে ঝড়-তুফানের মধ্যেও দাঁড়ি-মাঝিরা নৌকা চালিয়ে আপন মনে পাল তুলে চলতে পারেন এজন্য। এনিয়ে মুখে মুখে জেলে ও মাঝিদের মধ্যে শক্তিধর গাজি শাহের গুণ-কীর্তন বন্দনা হতো এভাবে–

আমরা আজি পোলাপান
গাজি আছে লিখাবান
শিবে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পির বদরবদর।

বরগুনা সদর উপজেলার খাজুরতলা গ্রামের প্রবীণ বাওয়ালি আফেজ উদ্দীন হাওলাদারের (৭৭) কাছ থেকে জানা যায়, আগে সুন্দরবনে বাওয়ালিরা বিপদ-আপদের কবল থেকে মুক্তির জন্য বনবিবির পূজা করত।

বনবিবির জহুরনামা নাম মুসলমানী কেতাবে বনবিবির কাহিনি বর্ণিত আছে। পুথিতে আছে যে, মক্কাবাসী নির্বাসিত হন। সেই সময় তিনি সন্তান সম্ভবা ছিলেন। বনের মধ্যে শাহ জঙ্গুলী ও বনবিবি নামে দুই জমজ পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জানা যায় যে, বনবিবির বাল্যকাল রোমাঞ্চকর কাহিনির সাথে জড়িত ছিল। পুথিতে আছে-

বনের হরিণ সব খোদার মেহের ॥
হামেশা পালন করে বনবিবি তরে ॥
বেহেশতের হুর এসে কোলে কাখে নিয়া
তুষিয়া মায়ের মতো ফেরে বেড়াইয়া ॥

www.pathagar.com

গাজিকালু ও চাম্পাবতী কণ্যার পুথি

হাম্‌দ্ ও নাআত

পয়ার। প্রথমে বন্দিনু প্রভু সূচি নিরঞ্জন। এ তিন ভুবনেতে যত তাহার সৃজন। সৃজিয়া সকল জীবে আহার যোগায়। দুঃখ সুখ মৃত্যু রোগ তাহার আজ্ঞায়। মৃত্তিকা গগনে নাহি তার সমতুল। পুজিবার যোগ্য সেই সকলেল মূল। তাহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর। পতিত পাবন সেই করুণা সাগর। মহা২ পাপী কত আমার সমান। কৃপা করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান। তাহার পরম সখা নবী মোস্তফার। লক্ষ কোটি সালাম দুরুদ পরে তার। সখা সঙ্গী যত তার আছে ভার্য্যাগণ। নবী বংশের যত আর হইল উৎপন। সবাকারে কোটি ২ সালাম আমার। সদয় রহুক প্রভু উপরে তেনার।

কাহিনি আরম্ভ

ত্রিপদী। বৈরাট নগরে ধাম, শাহা সেকান্দর নাম, রূপ যিনি পূর্ণ শশধর। নগরের শোভা তার, অতিশয় চমৎকার, স্বর্গ তুল্য দেখিতে সুন্দর। ছিল শাহা হেন ধনি, ধনেতে কারুণ যিনি, দাতা ছিল হাতেম সমান। শক্তি হেন ছিল তার, রোস্তম হারিবে আর, হারিবেক শাম নুরিমান। আকাশের তারা যত, সমরের সেনা তত, গনিবার সাধ্য নাহি কার। কত রাজা মণ্ডলে কর দিত সবে মিলে, তবে ছিল ভাবত সংসার বলি রাজা দর্প করে, কহিলেন যবনেরে, রাজকর না দিব কখন। তবে শাহা সেকান্দর, লইতে বলির কর, চলে গেল তাহার ভবন। বলি রাজা ক্রোধ হৈয়া, অনেক যুদ্ধ করিয়া, শেষে রাজা হারিল সমরে। হাবিয়া সে বলি যায়, সেকান্দর শাহার পায়, গলে বসন বান্ধিয়া সে পরে। অজুপা নামিনী কন্যা, ছিল তার অভি ধ্যান, সেকান্দর হাতে সুপে দিল। তবে শাহা সেকান্দরে, অজুপারে দীন পড়ে, আনিয়া সে বিবাহ করিল। কন্যা দিয়া রাজা বলি, পাতালেতে গেল চলি, বৈরাটেতে রহে সেকান্দর। তবে কিছুদিন পরে, অজুপার সতীর ঘরে, হইল এক সু-পুত্র সুন্দর।

পায়ার। বৈরাট নগরে ঘর শাহা সেকান্দর। অজুপা তাহার পত্নী অতি মনোহর। হইল সন্তান এক অজুপার ঘরে। চাঁদের সমান রূপ ঝলমল করে। রূপেতে হইল আলো সমস্ত ভুবন। রাখিল তাহার নাম জুলহাস সুজন। দিনে২ সেই পুত্র বাড়িতে লাগিল। দ্বাদশ অব্দের যবে বয়েস হইল। একদিন চলিলেন করিতে শিকার। লইয়া অনেক লোক সাথে আপনার। হইলে উপস্থিত এক কাননেতে। কাননের মধ্যে মৃগ খুঁজে সকলেতে। হঠাৎ হরিণ এক উঠে দৌড় দিল। ভুপের নন্দন তার পশ্চাতে চলিল। মায়ার হরিণ সেই কি করে তখন। একটি সুরঙ্গ দিয়া করিল গমন। দেখিয়া নৃপের সুত না পারে থাকিতে। সুরঙ্গের পরে চলে হরিণ মারিতে। এখানেতে লাক সবে না দেখে তাহায়। কাননে২ তারা খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেক খুঁজিল নাহি পাইল দরশন। আক্ষেপ করিয়া সবে চলিল তখন। সুরঙ্গেতে গিয়া সেথা সেকান্দর সুতে। দেখে হেন অন্ধকার রজনী হইতে। এদিক ও দিক কিছু দেখিতে না পায়। বিপাকে পড়িয়া যুবা করে হায়২।

www.pathagar.com

পায়েল ঠাহরে তবে চলিতে লাগিল। এগার কোসের পথ চলে যদি গেল। চক্ষু মেলি দেখে এক সুন্দর শহর। সুবর্ণের অট্টালিকা সুবর্ণের ঘর। সুবর্ণের বৃক্ষ আর সুবর্ণের ফুল। সোনার কোকিল কাক ভঙ্গ বুল বুল। কিট পতঙ্গ যত আদি সকলি সোনার। স্বর্গের সমান পরী দেখিতে বাহার। দেখিয়া সে জুলহাস আশ্চর্য হইয়া। ধীরে২ পুরি মধ্যে প্রবেশিল গিয়া। জঙ্গ বাহাদুর নাম সে দেশি রাজার। পুত্রের সমান করে পালন প্রজার। সেকান্দরের সুত সে অতিথের মতো। উপস্থিত হইল গিয়া রাজার বাটীতে। দেখিয়া তাহার রূপ সেই রাজ্যেশ্বর। অজ্ঞান হইয়া পড়ে পালঙ্ক উপর। কতক্ষণ পরে রাজা চেতন পাইয়া। জিজ্ঞাসিল জুলহাসে কোলে বসাইয়া। কি নাম তোমার বাছা ঘর কোথা হয়। কেবা তোর মাতা পিতা দেহ পরিচয়। জুলহাস বলেন শুন পরিচয় মোর। বৈরাট নগরে ঘর পিতা সেকান্দর। অজুপা সুশীলা হয় আমার জননী। মা বাপের দুলাল আমি মায়ল পরানি। আমি বিনে পুত্র কন্যা কেহ নাহি আর। মরিবেন মাতা পিতা শোকেতে আমার। জঙ্গ রাজা বলে বাছা শান্ত কর মন। আমার রাজ্যতি এই জানিবে আপন। এক কন্যা বিয়ে মোর আর কেহ নাই। তাহাকে বিবাহ করি থাক এই ঠাঁই। এস রাজস্ব আমি তোমাকে শুপিব। তোমাকে রাজস্ব দিয়া তীর্থে চলি যাব। তব যোগ্য কন্যা সেই পরমা সুন্দরী। পাঁচ তোলা নাম তার যিনি হুর পরী। শুনিয়া বৈরাট রাজা স্বীকার করিল। শুভ দিনে বিয়া তবে জঙ্গ রাজা দিল। পাইয়া সুন্দরী কন্যা জুলহাস সুজন। রহিলেন মাতা পিতা হইয়া বিস্মরণ। এখানেতে লোক সবে অনেক খুঁজিয়া। সেকান্দর শাহা কাছে কহিল আসিয়া। অদৃশ্য হইয়া গেছে তোমার নন্দন। খুজিনু অনেক মোরা না হইল দরশন। শুনা মাত্র সেকান্দর মুণ্ডে হাত দিয়া। অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল ঢলিয়া। পুত্র ২ বলিয়া শাহা কান্দে উচ্চস্বরে। হাহাকার শব্দ হইল বৈরাট নগরে। অজুপা সুন্দরী কান্দে লুটিয়া ধুলায়। দাস দাসী সবে কান্দে করে হায়২। আসিয়া জ্যোতিষগণ গণিয়া তখন। কহিলেন সবাকারে শান্ত কর মন। জীবমানে আছে পুত্র পাতাল নগরে। জঙ্গ রাজ নামে তার কন্যা বিয়ে কৈরে। কিছু কাল পরে পুনঃ পাইবা তাহায়। তবে সবে কহিলেন ভাবিয়া খোদায়। মনে২ কান্দে রানি হইয়া আকুল। তাহা পুত্র সদা কাল মুখে এই বোল। একদিন কেন্দে নাথ কাছে কয়। সাগর দেখিব মোর মনে ইচ্ছা লয়। না পারি থাকিতে আর গৃহেতে বসিয়া। শুনিয়া দিলেন শাহা সওয়ারি করিয়া। মাহাফায় আরোহিয়া গিয়া সে সাগরে। জলের তরঙ্গ দেখে হরিষ অন্তরে। ইতিমধ্যে দেখে এক সিন্দুক কাঠের। আসিয়া লাগিল সে কুলেতে ঘাটের। দাসীগণে আজ্ঞা দিল অজুপা সুন্দরী। সিন্দুক উঠায়ে মোরে দেহ শীঘ্র করি। যেই দাসী যায় সেই সিন্দুক ধরিতে। সিন্দুক ভাসিয়া যায় মধ্য সাগরেতে। একে২ সব দাসী ফিরিয়া আসিল। অজুপা সুন্দরী তবে পশ্চাতে চলিল। জলেতে নামিয়া সখী হাত বাড়াইতে। আসিল সিন্দুক সেই অজুপার হাতে। তখনি খুলিয়া দেখে সিন্দুক ভিতর। ছয় মাসের শিশু এক পরম সুন্দর। কোলেতে লইয়া শিশু অজুপা সুন্দরী ঘরেতে আসিয়া দ্রুত পালে যত্ন করি। দিনে২ শিশু সেই বাড়িতে লাগিল। কালু বলিয়া নাম তার অজুপা রাখিল।

www.pathagar.com

মাতা পিতা কোথা তার নির্ণয় না জানি। অজুপার শূন্য পুত্র এই মাত্র শুনি। আবদুর রহিম বলে মধুর পাচালি। গাজির জনম কথা শুন সবে বলি।

গীত তাল আদ্ধা

ভাবরে২ মন ভাই নিরঞ্জন। চেয়ে দেখ চক্ষু মেলি সামনে সমন তলব চিঠি লয়ে হাতে, আছে সেই সাথে সাথে চেতন থাকি করি প্রভুর স্মরণ গাজির জন্মের বিবরণ ও ফকির হইয়া যায়।

পরায়। করিয়া ঋতুর স্নান অজুপা যুবতী। আপন পতির সঙ্গে করিলেন রতি। সেই রাত্রে স্বপ্ন এই অজুপা দেখিয়া। আকাশের চন্দ্র আসি পেটে সান্ধাইল। স্বপ্ন দেখিয়া সতী উঠিল কাঁপিয়া। জিজ্ঞাসিল মহিপাল বুকে হাত দিয়া। কি কারণে কাঁপ প্রিয় কহ বিবরণ। রানি বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন। উদরেতে গগনের চাঁদ প্রবেশিল। স্বপন দেখিয়া প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। সেকান্দর বলে সতী না বলিও কারে। জন্মিবেক সু-সন্তান তোমার উদরে। শুনিয়া হরিষ অতি অজুপা সুন্দরী। করেন খোদার স্তব দিবা ও সর্ব্বরী। এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল। চারি মাসে রক্ত বীজ মিলে মাংস হইল। পঞ্চম মাসেতে মুর্ত্তী জন্মিল মাংসতে। খোদার আজ্ঞায় প্রাণ প্রবেশিল তাতে। পরেতে লিখিল প্রভূত ললাটে তাহার। আয়ু মৃত্যু ভক্ষ্য ভিত দুঃখ সুখ তার। যতেক লিখিল আর কৈলে পুথি বাড়ে। আশ্চার্য খোদার কাজ দেখ চিন্তা করে। দিনে২ শিশু সেই বাড়ে গর্ভ পুরি। সপ্তম মাসেতে সতী অজুপা সুন্দরী। নানা ইতি মিষ্টি দ্রব্য করেন ভক্ষণ। মিষ্টি দ্রব্য আস্বাদান লাগে কি কখন। ঘন২ হাই আর মুখে ওঠে জল। খাইতে অধিক সাধ ঠিকরি অম্বল। হইলে পাণ্ডু দুর্ব্বল শরীর। হেলিয়া পড়িল কুচ হইয়া কালা শির। উদর বাড়িল অতি অশক্তি চলন। কটিতে আটিয়া নারে পড়িতে বসন। জরদ হরিদ্রা বর্ণ ঢাকা নাহি যায়। অধিক না হয় জির্ণ কিছু যদি খায়। সর্দী কাস ভরা শ্বাস ওঠে উদগার। খাইলে সুপারী পান দেখে জমদ্বার সর্ব্বদা আলস্য আর কাতর নিদ্রায়। পালঙ্ক ছাড়িয়া থাকে শুইয়া ধরায়। এই মতে দশ মাস আসিয়া পুরিল। শুভক্ষণে পুত্র এক প্রসব করিল। তাহার রূপেতে আলো হইল ভুবন। শশী ছটা নিন্দে রূপ অতি সুশোভন। সে রূপ বর্ণনা করা আক্ষেপ আমার। সংসারেতে নাহি কিছু উপমা তাহার। রূপের নাগর সেই রূপ পরে। লক্ষ কোটি শশী যিতি ঝলমল করে। দেখিয়া গাজির মুখ অজুপা সুন্দরী। জুলহাসের যত শোক গেলেন পাসরী। দিনে২ বাড়ে রূপ রাজিব অঙ্গের। যখন হইল গাজি তিন বৎসরের। মিষ্টি২ কথা কয় যিনি মধুসুরা। শুনিয়া তাহার বাণী দূরে যায় ক্ষুধা। গাজি কালু দুই ভাই রহে এক ঠাঁই। এক তিল কেহ কারে কভু ভুলে নাই। দোহার প্রেমেতে দোহে মজাইয়া মন। দিবা নিশি জপ করে নাম নিরঞ্জন। গাজি কালু দুই তনু একই পরাণ। দুজনে দোহার রূপ করেন ধেয়ান। কালুকে জানেন গুরু গাজি মনে২। গাজিকে মানেন গুরু কালুশা দেওয়ানে। বাল্যকালে সাধ্য সন্ধি হইল দোহার। পাইলেন দুই জনে দরশন খোদার। দশ বৎসরের গাজি যখন হইল। এক দিন সেকান্দর কহিতে লাগিল। রাজত্ব করহ বাছা বসে সিংহাসনে।

www.pathagar.com

দেখিতে বিচার তব অলিষ মনে। সাথে২ মৃত্যু ফিরে কোন সমে মরি। পাটে বস দেখি যাই দুই চক্ষ ভরি। গাজি বলে শুন রাজ নিবেদি চরণে। রাজত্ব করিতে মোর ইচ্ছা নাহি মনে। এই যে ঐশ্বর্য রাজ্য কি কামে আসিবে। মরিলে কড়ার বস্তু সাথে নাহি যাবে। অন্ধকার কবরেতে থাকিবে পড়িয়া। কিড়ায় খাইবে মাংস টানিয়া২। দারা পুত্র কোথা রবে সেইত সময়। খাটিব কাহার লাগি কেহ কার নয়। সকলি বিষের ভাণ্ড দেখিবা ভাবিয়া। কেবা ফান্দে পড়ে গিয়া জানিয়া শুনিয়া। যেই জন গড়িয়াছে এ তিন সংসার। ফকির হইব আমি নামেতে তাহার। সেকান্দর বলে শুন মোর বাছা ধন। সেই সব ক্ষমা দিয়া রাজ্য দেহ মন। তোমা বিনে পুত্র আর না আছে আমার। এহের রাজস্ব নাহি কর ছারখার। গাজি বলে শুন বাপ জনমের দাতা। নাহি বল মোর কাছে রাজত্বির কথা। সংসার বাসির মুণ্ডে মারিয়াছি লাথি। কণ্ঠ কাট তবু নাহি করিব রাজত্বি। এ কথা শুনিয়া শাহা ক্রোধ হইয়া বলে। আহারে কুণ্ডপুত্র মোর ঔরষে হইলে। সু-পুত্র হইতে ভালো না থাকে সন্তান। এখনি কাটিব তোরে করি খান২। জল্লাদে ডাকিয়া শাহা কহেন রাগিয়া। আমার সম্মুখে এরে ফেলহ কাটিয়া। শুনিয়া জল্লাদগণ ভাবে হেট শিরে। বাদশার আজ্ঞা নাহি পারে টলিবারে। তলওয়ার খুলিয়া মারে গাজির কণ্ঠেতে। আল্লাকে স্মরণ গাজি করে জোর হাতে। সদয় হইয়া আল্লা গাজির উপর। আসিল আকাশ বাণী ভয় কিরে তোর। যখন জল্লাদ আসি গাজিকে মারিল। খোদার আজ্ঞায় চোট কণ্ঠে না লাগিল। একে একে সাত বার করিল ওয়ার। একটি চুপের মাথা নাহি কাটে তার। দেখে শাহা সেকান্দর বলে ক্রোধ হইয়া। বড় বড় দশ হাতি আনো সাজাইয়া। শুনিয়া মাহুতগণ আনে দশ হাতি। কহিলেন শাহা তবে মাহুতের প্রতি। হাতি হুলাইয়া মার গাজিকে ত্বরায়। তবেত মাহুত হাতি তখনি হুলায়। শুড়েতে ধরিয়া হাতি গাজির কোমরে। আছাড়ে কাছাড়ে দাত সর্ব অঙ্গে মারে। ভূমিতে ফেলিয়া তারে মাড়ায় হাজীগণ। মনে২ করে গাজি আল্লাকে স্মরণ। একতিল ব্যথা নাহি অঙ্গে লাগে তার। ভাঙিল হাতির দাঁত পদ ভাঙ্গে আর। গাজি পায়েতে হাতি সালাম করিয়া। মাহুত ফেলিয়া ত্রাসে গেল যে চলিয়া। তবে শাহা সেকান্দার কহে ক্রোধ ভরে। আগুনের কুণ্ডু এক কর শীঘ্র করে। শুনিতেই সব লোক কাষ্ঠ বাঁশ আনি। নমরুদের কুণ্ডু যিনি করে কুণ্ডু খানি। গাজিকে ধরিয়া ফেলে তাহার উপর। আল্লাকে ডাকেন গাজি হইয়া কাতর। গাজি বলে রক্ষা কর নিরঞ্জন। বাপ হইয়া পুত্র বধে না শুনি কখন। তোমা বিনে কেহ নাই ত্রিজগতে মোর। দোয়া কর দয়াময় করুণা সাগর। এই রূপে কেন্দে করে আল্লাকে স্মরণ। তাহার স্তবেতে হেলে আল্লার আসন। করুণা করিল প্রভু গাজির উপর। অগ্নিকে নিষেধ দিল তাহাকে পুড়িবারে। চারিদিকে জ্বলে অগ্নি দাউ২ করি। গাজির অঙ্গেতে তাপ লাগে নাহি তারে। ইব্রাহিম নবীর মতো আছেন বসিয়া। তিন দিন বাদে গেল আগুন নিভিয়া। ছাই হতে গাজি এসে হইল বাহির। না পুড়িল একলোম গাজির অঙ্গের। দেখিয়া বিস্ময় হইয়া শাহা সেকান্দর। বলিলেন পুত্র মোর বড় যাদুগর। আরবার সেকান্দার কোনো কাম করে। দশ মনি শীলা এক আনিয়া সত্বরে। গাজিকে

www.pathagar.com

বান্ধিয়া সেই পাথরের সাথে। ফেলিয়া দিলেন লিয়া মধ্যে সাগরেতে। সাগরে পড়িয়া অতি হইয়া কাতর। আল্লাকে গাজি জোর করি কর। ওহে প্রভু কৃপাময় রক্ষা কর দীনে। তোমা বিনে কেহ মোর নাহি ত্রিভুবনে। জনমের দাতা বাপ হেন কাজ করো। তুমি তরালে আর কে ত্বরায় মোরে। গাজিকে করিল কৃপা প্রভু নিরঞ্জন। খসিয়া পড়িল সব অঙ্গের বন্ধন। প্রভুর আদেশে শিলা ভাসিয়া উঠিল। তাহার পীঠেতে গাজি উঠিয়া বসিল। ভাসিয়া চলিল শাহা উজান ধরিয়া। ধন্ধ লাগে লোক সবে তাহাকে দেখিয়া। জলেতে ভাসিল শিলা যাহার গুণেতে। হেন পুত্র সেকান্দর চাহে মারিতে। আরোহিয়া পাথর পরে সুধীর কিশোর। পুনরায় উপস্থিত বৈরাট নগর। তবে শাহা সেকান্দরে বলে আরবার। শুন তুমি হও যদি ফকির আল্লার। এইবার কেরামত তোমার দেখিব। পার যদি তবে আমি তোমাকে মানিব। একথা কহিয়া শাহা কোনো কাম করে। মার্কা মারিয়া সুক সুইয়ের উপরে। অকুল সাগরে নিয়া দিলেন ফেলিয়া। তারপর কহিলেন গাজিকে ডাকিয়া। কেমন ফকির তুমি দেখিব চক্ষেতে। উঠাইয়া দেহ এই সাগর হইতে। শুনিয়া চলিল গাজি প্রভুর নাম স্মরি। সাগরের তটে গিয়া হাত জোড় করি। কান্দিয়া২ করে এই নিবেদন। দয়া কর দয়াময় প্রভু নিরঞ্জন। তুমি যার অনুকূলে তার কি ভাবনা। উঠাইয়া দেহ সুই করিয়া করুণা। এইরূপে কেন্দে২ আবেদন-করে। সদয় হইয়া তবে প্রভু করতারে। আদেশ করিল শুন খোওয়াজ খিজির। ত্বরিতে করিয়া এক মানস গাজির। অনুমতি পেয়ে এই খোয়াজ তখন। গাজির নিকটে গিয়া দিল দরশন। জিজ্ঞাসা করিল পির সু-মিষ্ট বচনে। কহ কহ বাবা কহ তুমি কান্দিতেছ কেন। গাজি বলে পরিচয় দেহ আগে তুমি। কি কারণে কান্দিতেছি শেষে কব আমি। খোওয়াজ কহেন তবে আপনার নাম। ত্বরায় উঠিয়া গাজি করিল সালাম। তারপরে খোওয়াজের ধরি দুই পায়। যত দুঃখ দিল বাপে সকলি জানায়। কহিলেন শেষে গাজি মানস আপন। খোওয়াজ কহেন বাছা শান্ত কর মন। সুরাসুরি বলি ডাক দিল তিন বার। আসিলেন দুই মূর্ত্তী পর্ব্বত আকার। সালাম করিয়া তারা জিজ্ঞাসে তখন। আমাদিগকে ডাকিয়াছ কিসের কারণ। খোওয়াজ বলেন শুন জানাই খবর। সাগরে ফেলিল সুই শাহা সেকান্দর। শীঘ্র করি সেই সুই দিবা উঠাইয়া। ডাকিয়াছি তোমা দিকে ইহার লাগিয়া। শুনিয়া তখন তারা নামিয়া জলেতে। সাগরের জল তুলে টানিয়া পর্ব্বতে। সাগর সুখায়ে গেল বালুচর হইয়া। সুরাসুরি সুই নাহি পাইল খুঁজিয়া। খোওয়াজের কাছে এসে লাগিল কহিতে। অনেক খুজিনু সুই নাহি সাগরেতে ধেয়ান করিয়া দেখে খেওয়াজ খিজির। যে সমে ফেলিল সুই শাহা সেকান্দর। জলের মানুষ এক সেই সুই লিয়া। পাতাল নগরে সেই গেলেন চলিয়া। ফলানি বেটী সেই ফলানি নামেতে। গাঁথিয়া রাখিয়াছে সুই তাহার চুলেতে। সুরাসুরি দিগে পুনঃ লাগে কহিবারে। ফলানির চুলে সেই পাতাল নগরে। শুনিয়া দানব দুই ততক্ষণ গিয়া। পাতাল হইতে সুই দিলেন আনিয়া। গাজির হাতে সুই দিয়া খোওয়াজ চলিল। হরিষ অন্তরে গাজি গৃহেতে আসিল। তৎকালে সুই লিয়া দিলেন বাপেরে। দেখিয়া চিনিল সুই শাহ সেকান্দর। তখনি গাজিকে লয়ে আপনার কোলে।

www.pathagar.com

লক্ষ লক্ষ চুমা দেয় বদন কোমলে। কহে আর শুন বাছা মোর প্রাণধন। তোমাকে করেছি আমি বহু বিড়ম্বন। সেই কথা মনে কিছু না রাখিবে। যে ছিল আমার মনে বুঝিতে নারিবে। হেরে দেখে বিষ বড়ি আছয় জেবেতে। যদিত মরিতা বাছা এ সব শিদ্দতে। তখনি ত্যাজিতাম প্রাণ খেয়ে বিষগুলি। খোদার শপথ যদি মিথ্যা আমি বলি। শুন বাছা কহি তোরে করিয়া মিনতি। তোমা বিনে নাহি আছে আমার সন্ততি। অন্ন জল তুমি মোরে কিছু নাহি দাও। পিতা বলি মান্য আর নাহিক করিও। দ্বারে২ গিয়া আমি ভিক্ষা মাগি খাব। ইহাতে অন্তরে কিছু দুঃখ না জানিব। রাজত্বি করহ তুমি পাত্র মিত্র লিয়া। পরাণ জুরাবে মোর তোমাকে দেখিয়া। তুমি পুত্র ভাগ্যবান বংশের চেরাগ। মা বাপের অন্তরেতে নাহি দিও দাগ। এখন রাজস্ব কর পাটেতে বসিয়া। আমি মৈলে যেও তুমি ফকির হইয়া। এই রূপে কাতরেতে সেকান্দর কয়। না দেয় উত্তর গাজি হেট শিরে রয়। পশ্চাতে পিতার পায় সালাম করিয়া। অন্দরে মায়ের কাছে গেলেন চলিয়া সালাম করিল গিয়া জননীর পায়। নয়নের জলে দুটি গাল ভেসে যায়। গাজিকে দেখিয়া মায় কেন্দে২ কয়। এত দুঃখ ছিল যাদু তোর যে কপালে। আহারে দুঃখিনীর পুত্র নির্দ্ধনের ধন। অঞ্চলের নিধি মোর যত্নের রতন। বাপ হইয়া এত দুঃখ দিল যে তোমারে। আর না যাইও তুমি বাটির বাহিরে। আমার মন্দিরে তুমি থাকিবে বসিয়া। পরান জুড়াক মোর মোতাকে দেখিয়া। গাজিকে লইয়া কোলে অজুপা সুন্দরী। খাওয়াইল অন্নজল অতি যত্ন করি। দিন মান গত হইয়া রাত্রি যখন হইল। বুকেতে লইয়া পুত্র অজুপা শুইল। কাল নিদ্রা যায় রানি পালঙ্কে শুইয়া। নিশিকালে শাহ গাজি উঠিল জাগিয়া। জাগিয়া কান্দেন গাজি সজল নয়নে। যত দুঃখ দিল বাপে ভেবে তাহা মনে। কান্দিয়া২ বলে করি হাহাকার। কোথা রব বাপ হইল বিপক্ষ আমার। যত দুঃখ দিল বাপে কার কাছে কব। নিঠুর বাপের দেশে আর না রহিব। এদেশ ছাড়িয়া আমি যাইব পালাইয়া। এ বলিয়া শাহা গাজি তখনি উঠিয়া। জামরুদ্দি কারচুবি তাজ তুলি দিল শিরে। পাগড়ি মাণিক্য গাঁথা তাহার উপরে। জরীর দোলক আর পড়িলেন গলে। লক্ষ২ রত্ন তাতে সূর্য যিনি জ্বলে। সোনার জিঞ্জির দিয়া কোমর বান্ধিল। সুবর্ণের আশা তার হাতেতে লইল। পায়েতে দিলেন গাজি খড়ম সোনার। কান্ধেতে লইল ঝোলা হাতে মালা আর। এই সব সাজ গাজি অঙ্গেতে করিয়া। মায়ের নিকটে গেল কান্দিয়া২।

ধুয়া॥

হায়২ জিন্দা গাজি যায়২ চলি। জাগো২ অজুপাগো
জাগো চক্ষু মেলি। দেখগো তোমার বুক হইয়া
যায় খালি। হায়২ কাল ঘুমে কি রত্ন হারালি।

পয়ার। কাল নিদ্রা যায় রানি পালঙ্ক উপরে। কান্দিয়া২ গাজি লাগে কহিবারে। তাহা২ জননীগো রহিলা শুইয়া। যায়গো তোমার যাদু ফকির হইয়া। হইল তোমার বুক আজি হইতে খালি। আর না লইবা মাগো মোরে কোলে তুলি। আর নাহি অন্ন জল তুমি মোরে দিবা। আর না মুখের বাণী আমার শুনিবা। আর না ডাকিবা মাগো পুত্র২ বলি।

www.pathagar.com

আর না দেখিবা মোরে দুটি চক্ষু মেলি। আহা২ জননীগো ফেটে যায় বুক। কেমনে তোমায় আমি ভুলি চন্দ্র মুখ। আর না পাইবা দেখা থাকিতে জীবন। আহা মাগো কি করিব কপালের লিখন। তোমার দুধের ধার না পারিনু দিতে। রহিলাম বান্ধা আমি এই দেহনেতে। ক্ষমিবেন অপরাধ করুণা করিয়া। জনমের মতো যাই বিদায় লইয়া। ঝর২ ঝরিতেছে নয়নের বারী। হায়২ যায়২ জননীকে ছাড়ি। কান্দিয়া২ গাজি উঠিল তখন। মায়ের চরণ দুই করিল চুম্বন। চুমিয়া মায়ের পদ দু-চক্ষু মুদিয়া। বাড়াইল দুই পদ প্রভু নাম লিয়া। ছাড়িয়া যাইতে মায়ের পদ নাহি চলে। বুক ভেসে যায় দুটি নয়নের জলে। নিশ্বাস ছাড়িয়া তবে মায়া সম্বরীল। আল্লাকে স্মরণ করি বাহির হইল। যাত্রা কালে শুনিলেন কানে আপনার। এস বলে সম্মুখেতে ডাকে তিন বার। হরিষ অন্তরে গাজি চলে মহা বেগে। দুয়ারী প্রহরী যতো কেহ নাহি জাগে। একে একে সপ্ত দ্বার পার হইয়া গেল। অষ্টম দ্বারেতে গিয়া কালুকে দেখিল। গাজিকে দেখিয়া কালু করে জিজ্ঞাসন। কহ ভাই কোথা তুমি করিছ গমন। গাজি বলে যাই আমি এ দেশ ছাড়িয়া। ফকির হয়েছিল ভাই গলে মালা দিয়া। কালু বলে গাজি এই কী উচিত। একেলা চলিছ তুমি মোরে বিসর্জ্জিত। দাসকে লইয়া যাও সাথে আপনার। খড়মের বোঝা আমি বহিব তোমার। গাজি বলে চল এবে যদি ইচ্ছা থাকে। কেহ যদি দেখে ভাই পড়িব বিপাকে। তখন চলিল কালু গাজির সঙ্গেতে। চলিয়া সমস্ত রাত প্রভাত কালেতে। বৈরাট নগর ছাড়ি ভাই দুই জনে। উতরিল গিয়া এক নির্জন কাননে। কাননের পথে গাজি করিল গমন। এখানেতে কিবা হইল শুন বিবরণ। জাগিয়া যে নিদ্রা হইতে অজুপা সুন্দরী। চেয়ে দেখে খালি শয্যা রহিয়াছে পড়ি। খুঁজিলেন চারিদিকে গাজিকে না পায়। মস্তকে হানিয়া হাত করে হায় হায়। আহা পুত্র বলি বাণী পড়িলেন ঢলি। ধুলায় লুটিয়া কান্দে গাজি২ বলি।

আহারে প্রাণের গাজি পালালি কোথায়। কেহ নাহি লিয়া গেলে অভাগিনী মায়। নয়নের তারা তুমি চিত্তের পুতুলি। কেমনে গেলরে যাদু বুক করে খালি। আর না দেখিব চক্ষে তোমার বদন। আর না শুনিব কানে মধুর বচন। আর না ডাকিবে মোরে জননী বলিয়া। আর না লইব আমি কোলেতে তুলিয়া। আহা আহা বিধাতার এ কেমন বিধি। কী দোষে হইনু হারা হেন প্রাণ নিধি। কাহার ফলন্ত গাছ ফেলিলাম তুলি। কাহাকে দিলাম গালি পুত্র শোক বলি। কাহার ভাণ্ডার আমি করিলাম চুরি। হারাইনু হেন ধন আহা মরি২। হায়রে প্রাণের গাজি কোথায় গেলে পাব। না পাইলে বাছা মোর প্রাণ হারাইব। আর নাহি আছে কেহ আমার সন্তান। কাহারে দেখিয়া ঘরে জুড়াইব প্রাণ। অঞ্চলের নিধি গাজি হাতের সে লড়ি। আহা২ মরি২ কেমনে পাসরি। এইরূপে কান্দে সতী আক্ষেপ করিয়া। আহা পুত্র আহা পুত্র বলিয়া২। শুনিয়া গাজির বার্ত্তা শাহা সেকান্দর অজ্ঞান হইয়া পড়ে পালঙ্ক উপর। চেতন হইয়া শাহা কতক্ষণ পরে। মস্তকে হানিয়া হাত কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। কান্দিয়া২ বলে আক্ষেপ করিয়া। মোর দোষে গেল পুত্র দেশান্তর হইয়া। আগে যদি জানি আমি করিবে এমন। কিছু নাহি কহিতাম তাহার কারণ। এ বলিয়া কান্দে শাহা করি

www.pathagar.com

হাহাকার। শোকের সাগর মধ্যে দিলেন সাঁতার। পাত্র মিত্রগণ আর যত দাস দাসী। কান্দিলেন সকলেতে তিন দিবা নিশি। গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দে যে গোধন। শাখী পাখি যত সবে করে যে ক্রন্দন। মালিয়া মালিনী কান্দে মুখে নাহি বলে। ভাবে বসি গেঁথে দিব ফুল কার লগে। প্রজাগণ সকলেতে কান্দে ঘরে ঘরে। হাহাকার শব্দ হইল বৈরাট নগরে। এইরূপে লোক সবে করিয়া ক্রন্দন। লইয়া আল্লাহর নাম শান্ত করে মন। গাজির উদ্দেশ্যে লোক চারিদিকে গেল। অনেক খুঁজিয়া তারা ফিরিয়া আসিল। বিরহ বদনে রহে শাহা সেকান্দর। শুন সবে কহি এবে গাজির খবর।

ধুয়া ॥
যায় যায় জিন্দা গাজি যায় যায় যায়
শোকের সাগরে ফেলি বাপ আর মায়

ত্রিপদী। গাজি কালু এক সাথে, চলিল কানন পথে, সমুখে সাগর এক পায়। তরণী জাহাজ নাই, তটে বসে দুই ভাই, বলে আল্লা পড়িলাম দায়। দোগানা নামাজ পড়ি, দুই হাত জোর করি, কহে গাড়ী সমীপে খোদায়। পড়িয়া সঙ্কট পরে, ডাকিতেছি প্রভু তোরে, কৃপা করি কর মোরে পার। শুনে তার আবেদন, তুষ্ট হইল নিরঞ্জন, কহিলেন আকাশ বাণীতে। আসিলেক বাণী এই ভয় কিরে ভয় নাই, আশা তুমি ফেল সাগরেতে। তবে গাজি কৌতুহলে, মুখে আল্লা২ বলে, দিল আশা ফেলিয়া সাগরে। ভাসে আশা তরী হৈয়া, গাজি কালু তাতে গিয়া, বসিলেন হরিষ অন্তরে। সে তরী ভাসিয়া জলে পবনের আগে চলে, পার হইয়া গেল নিয়ষিতে। গাজিকে তটেতে দিয়া, গেল তরী আশা হইয়া, তুলে গাজি লইলেন হাতে। বিছমিল্লাহ্ মুখে বলে, দুই ভাই পথে চলে, পাক নাম জপিতে২। ভ্রমিয়া অনেক দেশ, বাংলাতে অবশেষে, বসিলেন সুন্দরবনেতে। সেখানে চিল্লালিল, বনে যাত বাঘ ছিল শিষ্য হইল কাছেতে গাজির। ছিল হেন কেরামত, চরাচরে বাঘ যত, সবে তারে মানিত যে পির। নামে যাইতেন যবে, দাঁড় বাইত বাঘ সবে কুম্ভীরেতে কাণ্ডার ধরিত। গঙ্গা দুর্গা শিব যাইয়া, তাহাকে করিত দয়া, মাসী তারা গাজির হইতে। যত আর জ্বিন পরী, শাহা পরী আদি করি, মুরিদ হইল গাজির কাছে। সাহেব গাজির গীত, আবদুর রহিম গাইতেছে।

গীত খয়েরা
দিন গেল২ হায় দিন গেল। ডুবিল২ তরী অকুলে ডুবিল
ভবের বাণিজ্য এসে, মূলধন খাইনু বসে, কি লইয়া যাব দেশে
বল মন বল। পথ নাহি পালাইতে, মৃত্যু যম হাতে লয়ে ডোর
খাড়া সমুখেতে, ধরিল ধরিল।

পয়ার। সুন্দরবনেতে গাজি রহে হরষিতে এক দিন কালু শাহা লাগিল কহিতে। হইল বৎসর সাত সুন্দরবনেতে। কাটাবে সমস্ত কাল বুঝি এই খানেতে। ফকিরের বিধি নহে থাকা এক ঠাঁই। এ দেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই। গাজি বলে কালু ভাই কৈলা সত্য কথা। এই বেলা চল আর না রহিব হেথা। এ বলিয়া শাহা গাজি তখনি উঠিল।

www.pathagar.com

কালুকে লইয়া সাথে পথে মেলা দিল। নানা দেশ নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ। খোদার সংসার দেখে ভরিয়া নয়ন। ভ্রমিয়া অনেক দিন দেশ দেশান্তর। সমুখে সাগর এক পায় দেখিবারে। আশাকে করিয়া ভর পরে হয়ে গেল। পার হইয়া লোক কাছে জিজ্ঞাসা করিল। কি নাম এ দেশের বল রাজা কেবা হয়। শুনিয়া তাহারা সবে গাজির আগে কয়। ছাপাইয়া নগর এই শুন সমাচার। শ্রীরাম নামেতে রাজা তার অধিকার। সেইখানে গাজি কালু সে দিন রহিল। পর দিন দুই ভাই উঠিয়া চলিল। কালু বলে শুন গাজি মোর নিবেদন। আমার নিকটে আজি করিবে এ পণ। পথে ঘাটে দেখা যদি হয় কার সাথে। তাহাকে সালাম তুমি নারিবে করিতে। এ কথা কবুল যদি নাহি কর ভাই। তোমার সঙ্গেতে আমি আর রব নাই। শুনিয়া সাহেব গাজি স্বীকার করিল। তবেত দেওয়ান কালু হরষিত হইল। ধীরে ধীরে দুই ভাই যাইতেছে চলি। কত দূরে গিয়া গাজি দেখে চক্ষু মেলি। তিন পরী সাথে লিয়া খোওয়াজ খিজির। বসিছে গাছের তলে সমুখে গাজির। হেনকালে শাহা গাজি চলিয়া ত্বরায়। সালাম করিল গিয়া খোওয়াজের পায়। দেখিয়া দেওয়ান কালু ক্রোধ হইয়া বলে। হারে গাজি কেন তবে প্রতিজ্ঞা করিলে। এখন সালাম কর চোট্টা বেটা সবে। লজ্জিত হইয়া গাজি কহিলেন তবে। নাহি চিন কালু ইনি খোয়াজ খিজির। ধ্যানে বসি কেহ নাহি পায় হের পির। কালু বলে দেখিয়াছি কত যে খোওয়াজ। নিজ ক্ষমতায় নারে করিবারে কাজ। লেখা আর আজ্ঞা মতে করেন খোদার। খোদা বিনে কারে আমি নাহি মানি আর। শুনিয়া খোওয়াজ ক্রোধে গাজির কাছে বলে। এমন গাঁওয়ার কেন সঙ্গেতে আনিলে। ইহাকে না রাখ সঙ্গে দেহ খেদারিয়া। এ কথা কহিল পির গেলেন চলিয়া। কালুকে লইয়া গাজি পথান্তরে চলে। মনে২ ক্রোধ কালু বাক্য নাহি বলে। আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর। লাগিল দারুণ ক্ষুধা কাঁপায়ে উদর। গাজি বলে কালু ভাই না দেখি চোখেতে। চল২ যাই চল রাজার বাটিতে। শ্রীরাম নামেতে রাজা ছাপাই নগরে। শুনিয়াছি রাজা সেই অন্নদান করে। এ যুক্তি করিয়া তবে ভাই দুই জনে। উপস্থিত হইল গিয়া রাজার ভবনে। স্বর্গের সমান পুরি দেখিতে সুন্দর। বসিয়াছে শ্রীরাম রাজা পালঙ্ক উপর। হেনকালে গাজি কালু দুই পির গিয়া। খাড়া হইল লা-ইলাহা জিকির করিয়া। রাজা বলে দুর২ কোথায় কোতওয়াল। আসিল যবন দেহ ত্বরায় নিকাল। শুনিয়া কোতওয়ালগণ তখনি আসিয়া। গরদানে ধরিয়া দিল বাহির করিয়া। গাজি বলে ভাই কালু এত অপমান। বাহির করিয়া দিল ধরিয়া গরদান। কালু বলে শুন ভাই দোষ নাহি তার। বৃক্ষ পত্র হেলে সেই আজ্ঞায় খোদার। বৈমুখ হইয়া তবে ভাই দুই জন। নগরের মধ্যে শেষে করিল গমন। ক্ষুধায় কাতর অতি না পারে চলিতে। প্রজাগণ যথা গেল তাদের বাটীতে। না চাহিতে অন্ন আগে মার মার বলে। অগ্নির সমান জ্বলে যবন দেখিয়া। প্রজাগণ যত তার সব হিন্দুয়ান। সে দেশের মধ্যে নাহি এক মুসলমান। যার ঘরে অন্ন চাহে কালু আর গাজি। মার মার বলি তারা আইলেন সাজি। আকুল হইয়া তবে ভাই দুই জন। আল্লা ভাবি চলিলেন বিরস বদন। গ্রামের নিকটে এক কানন আছিল। কাননের মধ্যে গিয়া দুজনে

www.pathagar.com

বসিল। কাননে বসিয়া গাজি কেন্দে২ বলে। এত দুঃখ ছিল আমার কপালে। দুঃখের কপাল মোর দুঃখ ফিরে সাথে। ক্ষুধায় উদর কাঁপে না পারি সহিতে। এ বলিয়া কান্দে গাজি বিরস বদনে। আল্লাহর আসর হেলে তাহার কান্দনে। সেইক্ষণ খোদাতায়ালা করুণা করিয়া। গাজির নিকটে অন্ন দিল পাঠাইয়া। বিছমিল্লাহ্ বলিয়া তবে ভাই দুই জনে। খাইল উদর ভরি যত লয় মনে। খাইয়া কাননে বসি হরষিত রয়। হেন সমে কালু শাহা মনে২ কয়। আগুন লাগিত যদি রাজার ভবনে। রানিকে লইয়া আর যাইতেন জ্বিনে। নগরের লোক আর জাতি আসি দিত। মনের আরজ পুরা আমার হইত। এই কথা কালু শাহা যখন কহিল। সাহেব আল্লাহর কাছে কবুল হইল। লাগিল আগুন দৈব রাজার বাটিতে। এমারত যত আর লাগিল জ্বলিতে। নগরের মধ্যে ছিল যত প্রজাগণ। সকলের ঘরে গিয়া লাগিল আগুন। আছিলেন রাজরানি পালঙ্কে বসিয়া। হঠাৎ আসিয়া জ্বিনে গেলেন লইয়া। মসজিদ আছিল এক নদীর সেপারে। সেইত মসজিদে নিয়া রাখিল রানিরে। খোওয়াজ খিজির সেথা তিন পির সাথে। নামাজ পড়িতে গেল চলিয়া তাহাতে। মসজিদের মধ্যে যবে চারিজন গেল। এখানেতে কালু শাহা ধ্যায়ানে জানিল। মনে২ কহে কালু হুকুমে আল্লার। শক্ত হইয়া মসজিদে লাগুক কেওয়াজ। তাতে নাহি খাটে নাহি কেরামত কারি। মনে২ কহে কালু প্রভুর নাম স্মরি। কবুল হইল যাহা কহিতেন মনে। এ সব বৃত্তান্ত গাজি কিছু নাহি জানে। শুন বলি কি হইল শ্রীরাম রাজার। আগুন দেখিয়া রাজা হইল চমৎকার। একেবারে বেড়া অগ্নি লাগে দেশ জুড়ি। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি। অন্তঃপুর গিয়া দেখে নাহি রাজরানি। চিল্লাইয়া কান্দে শাহা শিরে হাত হানি। ত্বরায় জ্যোতিষ এক তখনি আনিয়া। আজ্ঞা দিল জ্যোতিষেরে দেখহ গণিয়া। তবেত জ্যোতিষ সেই গণিয়া তখন। কহিলেন শুন রাজা কহি বিবরণ। বৈরাট নগরে ঘর শাহা সেকান্দর। আসিল তাহার সুত তোমার নগর। তাহাকে তাড়াইয়া দিছ ধরিয়া গরদান। করিয়াছে এই কাজ সেই মহাজন। এখন মঙ্গল যদি চাহ আপনার। শীঘ্র গিয়া পড় রাজা চরণে তাহার। অমুক কাননে আছে ভাই দুই জন। রক্ষা যদি চাহ দ্রুত করহ গমন। শুনিয়া তখনি চলে সভাষদ লৈয়া। নিকটেতে গেল গলে বসন বান্ধিয়া। সালাম করিয়া পড়ে গাজির পায়েতে। হেন সমে কালু শাহা লাগিল কহিতে। নাহি দাও কুল ভাই এমন দুষ্টরে। কি কহিব ভাই গাজি কৈতে লাজ করে। যে পাক মারিয়াছে মোরে গরদানেতে ধরি। তাহার ব্যথায় ঘাড় ফিরাইতে নারি। শুনিয়া শ্রীরাম রাজা কান্দিয়া২ ধরেন কালুর পদে হাত বাড়াইয়া। কালু বলে বল দেখি কিবা কথা তোর। কহেন শ্রীরাম রাজা জোর করি কয়। আগুনে জ্বলিয়া পুড়ি হইয়া গেল ছাই কোথায় গেলেন রানি খুঁজিয়া না পাই। কালু বলে আগে বেটা হও মুসলমান। শেষেতে বলিয়া দিব রানির সন্ধান। শুনিয়া শ্রীরাম রাজা স্বীকার করিল। তবেত কালেমা গাজি পড়াইয়া দিল। পাত্র মিত্র প্রজাগণ সকল আসিয়া। কালেমা পড়িল হাতে গাজির ধরিয়া। তৎপরে গাজি কালু আল্লা২ বলি। তিন বার ফুঁক দিয়া কতকগুলি ধূলি। ছাপাই নগরের দিকে দিলেন ফেলিয়া। যত অগ্নি ছিল গেল সকলি নিভিয়া। যেই ছিল

www.pathagar.com

সেই হইল ছাপাই নগর। আসিয়া দেখিল সবে সেই বাড়ি ঘর। রাজাকে ডাকিয়া কালু কহে কানে২। রানিকে লয়িয়া গেছে লুচ্চা চারি জনে। নদীর সেপারে কালুর দেখহ মসজিদে। লুচ্চা সবে এইখানে আনিবেক বেন্ধে। শুনিয়া কালুর মুখে এমত বচন। পাঠাইয়া দিল রাজা দ্রুত দশ জন। মসজিদে গিয়া তারা কপাট খুলিয়া। দেখিলেন আছে রানি দূরেতে বসিয়া। খোওয়াজ খিজির আর পির তিন জনে। করেন ধোকার সুস্থিরতা স্বত মনে। হেন সমে চারি জনে বেন্ধে রাজ দূতে। ত্বরায় আসিল লয়ে গাজির কাছেতে। দেখিয়া সাহেব গাজি আপনার পির। উঠিয়া সালাম করে নম্র করি শির। আপনার হাতে দিল খুলিয়া বন্ধন। কালুর কর্তব্য এই জানিল তখন। কোলাকোলি আলাপন অনেক করিয়া। আপনার কাজে গেল খোওয়াজ চলিয়া। রহিবে গাজি কালু কানন ভিতরে। রানিকে লইয়া রাজা চলে গেল ঘরে। রাজা ঘরে গিয়া সেই রথ সাজাইল। নিজে আসি দুই পীরে রথে বসাইল। রথ হইতে নামাইয়া ভাই দুই জনে। যত্ন করি বসাইল রত্ন সিংহাসনে। কত দ্রব্য সুধামধু খাইবারে দিল। আতর গোলাব আর অঙ্গে ছিটাইল। হরিষ অন্তরে গাজি ছাপাই নগরে। মসজিদ গড়িয়া দিল গাজি কালু পীরে। সোনার পালঙ্ক আর চান্দুয়া সোনার। সোনার নিশান চারি চতুর দিকে তার। বসিলেন গাজি কালু পালঙ্ক উপর। নিজ হাতে রাজা আসি ঢুলায় চামর। কত দিন গাজি কালু সেই দেশে রয়। একদিন কালু শাহা গাজির কাছে কয়। ফকিরের এত সুখ কভু নহে ভালো। ভবের মায়ায় বুঝি তোমাকে বেড়িল। ফকিরের এত সুখ কভু নহে ভালো। ভবের মায়ায় বুঝি তোমাকে বেড়িল। অভিলাষ নাহি আর এ দেশে থাকিতে। চলিয়া যাইব কালি প্রভাত কালেতে। রাজাকে ডাকিয়া গাজি মাঙ্গেন বিদায়। কান্দিয়া কহেন রাজা ধরি দুই পায়। তোমাকে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে। না দেখিলে এক পল মরিব পরানে। গাজি বলে রব আমি তোমার কাছেতে। যেই সমে চাহ তুমি আমাকে দেখিতে। বন্ধ করি দুই চোখ ধ্যায়ান করিবা। হৃদয়ের চোখ দিয়া আমাকে দেখিবা। এ বলিয়া শাহা গাজি তখনি চলিল। নগরের লোক সবে কান্দিতে লাগিল। কার দিকে গাজি কালু ফিরিয়া না চায়। তারা কিছু বান্ধা নহে ভবের মায়ায়। কাটিল মায়ার জাল কেহ কার নয়। মোর পুত্র মোর জায়গা মিছে লোকে কয়।

ধুয়া।

মিছা জালে কেন মন বন্ধ হইলে
যে তারে করিল সৃষ্টি তারে না চিনিলে
পুত্র কন্যা পরিবার, ভাই বন্ধু যত আর
কেহ নাহি সঙ্গী হবে মরণের কালে।

ত্রিপদী

গাজি কালু দুই পীরে যায় ধীরে২, নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ। যেইখানে রাত্রি হয়, দুই ভাই তথা রয়, সকালেতে করেন গমন। এরূপ চলিয়া যায়, কত দূর গিয়া পায়, বন এক অতি ভয়ঙ্কর। মধ্যে দিয়া সে বনের পথ দেখে চলনের, দেখিয়া সে দুই সহোদর।

www.pathagar.com

মুখে আল্লা২ বলি, পথ দিয়া যায় চলি, তৎপরে তিন দিন গিয়া। দেখিলেন সমুখেতে, কাঠ কাটে কাননেতে, এক সাথে সাত কাঠুরিয়া। গাজি বলে কালু ভাই, চলিবারে শক্তি নাই, রব এই কাঠুরিয়া ঘরে। কাঠ কাটে তারা যথা দুই ভাই গিয়া তথা, বলে কালু মিষ্ট২ স্বরে। আমরা অতিথি ভাই, থাকিবারে স্থান চাই, ইহাতে কহ কি তোমরা। শুনিয়া কালুর কথা, সকলে তুলিয়া মাথা, জোড় হাতে হইলে খাড়া। সালাম করিয়া পরে, চলিল আপন ঘরে, গাজি আর কালুকে লইয়া। গিয়া তারা তাড়াতাড়ি, একঘর খালি করি, তার মধ্যে শয্যা বিছাইয়া। দিল পরে জল আনি, দুই জনের পদখানি, পাখা লিয়া বসিল শয্যাতে। দুই পির বসাইয়া, অন্দরেতে শীঘ্র গিয়া কহিলেন অন্ন পাকাইতে। নারীগণ সবে বলে, বাজারেতে যাও চলে, আন গিয়া সেতাবী করিয়া। নুন তৈল কোথা পাই, ডাল চাল কিছু নাই, দিব কিসে আমরা রান্ধিয়া। টাকা কড়ি নাই ঘরে, সাত ভাই কিবা করে, দাও কুড়াল বন্ধক রাখিয়া। আনি সেতাবি করি, পাকাইল সেই ঘড়ি, দুই পীরে দিলেন আনিয়া। গাজি কালু হর্ষ মনে, লয়ে সেই সাত জনে, খাইলেন বসি একসাথে। যাইয়া বলেন গাজি, সাত ভাই চল আজি, চল২ আমার সঙ্গেতে। তোমাদের দুঃখ যত এখনি করিব হত, যদি কৃপা করে নিরঞ্জন। এ বলিয়া যায় চলে, গিয়া এক নদীকূলে, গঙ্গা মাসী বলিল তখন। ডাকিলেন তিন বার, দিয়া যে উত্তর তার, গঙ্গা দেবী ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গা বলে যাদু ধন ডাকিয়াছ কি কারণে, বাবা কি বিপদ ঘটিল। কহে গাজি মধু স্বরে, ধন কিছু দেহ মোরে, ডাকিয়াছি ইহার কারণ। গঙ্গা বলে শুন সুত, ধন তুমি লিবে কত, তবে দেবী করিল গমন। পাতালেতে গিয়া সতী, বলে শুন পদ্মাবতী, ভাই এক আইল তোমার। বৈরাট নগরে ঘর, অজুপা ভগিনী মোর, ধন চায় পুত্র আসি তার। পদ্মা বলে মাগো শুন, আমি যাব লয়ে ধন, দেখিব সেই ভাইগো কেমন। সাত মণ সোনা আর চান্দুয়া নিশান তার, আর দুই রত্ন সিংহাসন, এই বস্তু লয়ে, নাগ পরে আরোহিয়ে, গিয়া পদ্মা গাজির কাছেতে। হাসিয়া সালাম করে ভগ্নি২ বলে তারে, ধরে গাজি লইয়া কোলেতে। অনেক আলাপ করি, তবেত পাতালপুরি, পদ্মাবতী গেলে চলিয়া। ধন রত্ন যত ছিল, কাঠুরিয়া সবে দিল, লয়ে তারা যায় মাথে বৈয়া। পরে গাজি জিন্দাপীরে, শাহা পরী নাম ধরে, উচ্চৈঃস্বরে তিন ডাক দিল। শুনিয়া গাজির ডাক, লইয়া পরীর ঝাঁক, শাহা পরী তখনি আসিল। গাজির চরণ ধরি, সালাম করিয়া পরী, জিজ্ঞাসিল হাত জোর করে। কহ পীল বিবরণ, ডাকিয়াছ কি কারণ, আমি হেন অধমা দাসীরে। গাজি বলে শুন পরী, কার্য এক আছে ভারি, তোমা বিনে না পারিবে কেহ। এই যে কানন কাটি, সমান করিয়া মাটি, সহস্র দালান ঘর দেহ। মসজিদ এক আর, সোনার প্রলেপ তার, মধ্যে উর্ধ্বে দুই দিকে চাই। গাজির চরণ তলে, শাহা পরী হেসে বলে, কত বড় কাজ মোর এই। ডাক দিয়া সেই ঘড়ি বাওয়ান্ন হাজার পরী, কাননেতে দিল পাঠাইয়া। কাটিয়া বন গড়িল। রাখে গাজি এত গুণ, আছিল এমন বন, কিছু তার চিহ্ন না রহিল। শহর বাজার তাতে, বসাইল শতে শতে, গাজির দোহাই সেথা করে। প্রজাগণ ঘরে ঘরে, কর নাহি দেয় কারে, দিল গাজি নাখেরাজ করে। গাজির ক্ষমতা দেখি, কালু শাহা

www.pathagar.com

হৈয়া দুঃখী, আপনার দুই চক্ষু মুদি। করে এই ভাবাগুণা, তিন দিন যদি সোনা, নগরেতে পড়িত ঝড়িয়া। মনে মনে যাহা কৈল, কবুল হৈয়া গেল, কতক্ষণ পড়ে সোনার ঝুড়ি। নগর বাসিন্দা সবে, উঠাইয়া সোনা তবে, রাখিলেন ভাণ্ডারেতে ভরি। ইহা দেখি গাজি কয় মনে, তখনি খোদায় শুনে, নৈলে লজ্জা পায় কি খিজির। এ বলিয়া হর্ষ চিতে, কালুকে লইয়া সাথে, সমস্ত নগর দেখে চলি। শহরের শোভা দেখি, জুড়ায় দোহার আঁখি, রাখে নাম সোনাপুর বলি। আবদুর রহিম বলে, হায় দিন যায় চলে, প্রেমের মন মত্ত হইল না। রচিল গাজির গীত, শুন সবে দিয়া চিত, করি কিছু প্রেমের বর্ণনা।

গীত

রাগিনী ইমন, তাল আদ্ধা

প্রেমেতে মজিল মন কি মজা তাহাতে

যার মজা সেই জানে জানিবে কি অন্যেতে

ত্রিপদী। কেরামন কাতেবিনে, অনু জ্ঞান চক্ষু কানে, নাহি জানে থাকিয়া অঙ্গেতে, সাকার কি, নিরাকারে, যাহাতে যে প্রেম করে, লভ্য তাতে মজিল প্রেমেতে। রবি সঙ্গে রেনু দেখ, তেজ ধরে হৈয়া এক তেমন মিল সাকার নবাকৃতে। দেখ যত তারি খেলা, গাঁথিয়া মায়ার মালা, খেলে মন পবন সঙ্গেতে। প্রেমেতে হইয়া মত্ত, পাসরিয়া কায়া চিত্ত, দেখ বসি চিন্তার চোখেতে। বিকশে যাহার আঁখি, তার কি দেখিতে বাকি, গেছ চক্ষু দেখিতে দেখিতে। দিনমণি কমলিনী, বিধু আর কুমোদিনী, ধন্য প্রেমের প্রশংসা জগতে। পতঙ্গ পুড়িয়া মরে শ্রেষ্ঠ প্রেমী বলি তারে প্রাণ দিয়া মিশে প্রিয়া সাথে। প্রেম করা এমনি ধারা, জিয়ন্তে হইলে মরা, তবে সাধু পারিবে হইতে। মৃত্তিকা গগন শশী, সবি তারা দিবানিশি, আছে সব প্রেমের তরেতে। সে জন হইল ভিন্ন করা না চাহিবে চিহ্ন, সর্বনাশ হবে নিমিশেতে। হায় কি অমূল্য রত্ন, তারে না করিল যত্ন, হেন রত্ন যায় অযত্নেতে। প্রেম কিবা বস্তু সেই, হারাইয়াছে মন দেহ, জিজ্ঞাসিও তাহার কাছেতে। পূর্বে প্রভু নিরাকারে, প্রেম ধন সৃষ্টি করে, সে প্রেমে মজিয়া নিতেজে। আপনার তেজ নিয়া, আজ্ঞা কৈল গেল হৈয়া, সাকার মোহাম্মদ নামেতে তার প্রেমে হৈয়া মত্ত, এ তিন ভুবন মতো সৃষ্টি কৈল তাহার তেজেতে। হাজার বৎসর ভরি, প্রেম ব্যাখ্যা যদি করি, তবু না পারিব সীমা দিতে। মজিয়া রোশন গোলে, আবদুর রহিম বলে, প্রেম কর জীবন থাকিতে।

পয়ার। সোনাপুরে রহে গাজি হরিষ অন্তরে। আনন্দের সীমা নাই প্রতি ঘরে ঘরে। গাজি আর কালু শাহা মসজিদের মাঝে। বসিলেন সিংহাসনে মনমোহন সাজে। দেখিয়া গাজির রূপ পরাণ জুড়ায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ব্যথা সকলই পলায়। সেরূপ হেরিল প্রাণ না পারে বান্ধিতে। হারাইয়া প্রাণ চক্ষু কান্দে বসি পথে। মনে লয় সদাকাল গেঁথে রাখি গলে। কোমল শরীর আর রত্ন জিনি জ্বলে। রূপেতে করিয়া আলো দুই সহোদর। শুয়ে ছিল এক রাত্রে পালক উপর। প্রভুর কৌতুক ভাই কে পারে বুঝিতে। আসিলেন পরী ছয় কুকাফ হইতে।

www.pathagar.com

ধুয়া॥
ঠমকে ঠমকে চলে যত সব পরী
ঝলমল করে রূপ আহা মরি২

পয়ার। কুকাফ দেশেতে বাস করে পরীগণ। তার মধ্যে ছয় পরী প্রথম যৌবন। লাল পরী নীল পরী আর সবুজ পরী। চান পরী সোনা পরী তার ছোট নুরী। এই ছয় পরী লয়ে সাথে২। খোদার সংসার দেখে আরোহিয়া রথে। অনেক নগর তারা ভ্রমণ করিয়া। আসিলেন সোনাপুরে রথ চালাইয়া। দেখিতে নতুন পুরি যত পরীগণ রথ নামাইয়া তারা চলিল তখন। বিচিত্র নগরে দেখে ঘর সারি২। যেমন লঙ্কাতে ছিল রাবনের পুরী। হাটিয়া২ দেখে তামাসা মহলের। উপস্থিত হইল গিয়া কাছে মসজিদের। কাতার বান্ধিয়া তারা যায় ধীরে২। হেলিয়া ঢুলিয়া পড়ে যৌবনের ভারে। শুইয়া আছে দুই ভাই পালঙ্ক উপরে। রূপেতে হইয়াছে আলো যিনি শশধরে। দেখিয়া গাজির রূপ যত পরীগণ। মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ঢলিয়া তখন। চেতন হইয়া তারা কতক্ষণ পরে। চাহিয়া গাজির দিকে লাগে কহিবারে। কিবা রূপ অপরূপ আহা মরি২। ইহার সমান নাই ত্রিজগত জুড়ি। এমন সুন্দর রূপ মনুষ্য অঙ্গেতে। পরীগণ তুচ্ছ মোরা তাহার কাছেতে। হেন সময় এক পরী ধরিয়া অঞ্চল। কহিতে লাগিল অতি হইয়া চঞ্চল। লাগিয়াছে রূপের বান অন্তরে আমার। মনে লয় দাসী হৈয়া থাকি আমি তার। আর পরী বলে বোন পাসরা না যায়। আহা মরি তোর মতো মোর মন চায়। আর পরী বলে আমি জাতি কুল দিয়া। সেবিব চরণ এর নিজ অন্ন খাইয়া। এই রূপে সকলেতে হৈয়া উন্মাদিনী। কহিতে লাগিল ওগো প্রাণের ভগিনী। দেখিয়া গাজির রূপ পরাণ বিদরে। হেন রূপের কন্যা কিগো আছে এ সংসারে। এক পরী ওঠে বলে হাত নাড়া দিয়া। কত রূপ ধরে গাজি মজিছ দেখিয়া। এক কন্যা আছে ওগো আমি তাহা জানি। নিশ্চয় গগন শশী সেই বিনোদিনী। হেন রূপ না পাইছে দেবতা কিন্নর। মুখের প্রলাপ যিনি কোটি শশধর। আর যে বত্রিশ দাঁতে মিসশি লাগাইছে। লক্ষ কোটি তারা যিনি উজ্জ্বল করিছে। জবা ফুল যিনি জিহ্বা তাতে খায় পান। না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান। মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন। জিনিয়া চান্দের ছটা চক্ষের কিরণ। চক্ষু মেলি দুই ধনী যার দিকে চায়। প্রাণ হারা হইয়া সেই করে হায়২। ভ্রমরের বর্ণ যিনি লম্বা কেশ মাথে। দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে। জোলায়খার কোটি তুল্য কোটী তার সরু। তাদৃশ্য নিতম্ব আর পীট পাছা উরু। সুগঠন হস্তপদ কি কহিব মরি। তাহার উপমা নাহি ত্রিজগতে জুড়ি। পরীগণ বলে কহগো সত্বর। কি নাম কন্যার সেই কোন দেশে ঘর। সেই পরী বলে সবে শুনে এক চিত্তে। সে দেশ অনেক দূর। দক্ষিণ বার দেখিতে সুন্দর। সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে ঘাট চারিখান। প্রতি ঘাটে চারি শত সোনার নিশান। হেন পুরি নাহি ওগো ছিল রাবনের। মুকুট নামেতে রাজা সেই দেশের। প্রজাগণ যত তার সকলি ব্রাহ্মণ। বেত্রঘাত করেন তারা দেখিলে যবন। ঢুলি মালি নাই ধুবি আর যত ইতি। সকলি ব্রাহ্মণ হয় নাহি অন্য জাতি। নগর নিবাসী যত সব

ধনবান। সে দেশে কাঙাল নাহি সকলি সমান। সুবর্ণের কুম্ভ দিয়া আনে সবে জল। বাটি ঘটী থালা ঝুড়ি সোনার সকল। একখানি ঘর নাহি সেই দেশ জুড়ি। দালান মন্দির মঠ সব বাড়ি২। রাজার বাটীতে সব মন্দির সোনার। দূর থেকে দেখা যায় অগ্নির আকার। তাহার ধনের সংখ্যা করি যে কেমনে। হীরা ও মাণিক্য রাজা করি সমগণে। নামেতে দক্ষিণ রায় রাজার গোসাঁই। তাহার সমান বীর সংসারেতে নাই। চারিটা মহিষ আর চাউল পাঁচ মণ। প্রতি সন্ধ্যাকালে সেই করেন ভক্ষণ। মহাসুখে আজে রাজা ব্রাহ্মণা নগরে। সাত বধূ সাত পুত্র সাত শালা ঘরে। দাস দাসী যত আর সংখ্যা নাহি তার। নীলাবতী নামে সতি মহিষী রাজার। তার কন্যা চাম্পাবতী রূপের সাগর। ভুবন বিজয় রূপ চাম্পার অঙ্গের। আকাশের দিকে যদি চাম্পাবতী চায়। লজ্জায় ভাস্কর গিয়া বারীতে লুকায়। বাপের দুলালী কন্যা মায়ের পরানি। সাত ভাই সকলের কনিষ্ঠ ভগিনী। বাপে ভাই সবে রাখে কোলে২। মাতা আর অন্ন সদা দেয় মুখে তুলে। বাপ ভাই বিনে আর পুরুষ কেমন। চক্ষু মেলি চাম্পা নাহি দেখিছে কখন। সুবর্ণের মন্দিরেতে রত্ন সিংহাসনে। একাকিনী থাকে কন্যা প্রফুল্ল বদনে। গোলাবি পানের খিলি শুয়ে২ খায়। দর্পণেতে মুখ আর দেখেন সদায় দ্বাদশ বৎসর হয় বয়স তাহার। দাসদাসী নাহি রাখে কাছে আপনার মন্দিরের চারিদেকে তিনশ প্রহরী। দিবারাত্র পাহারা দেয় সকলেতে বেড়ী। কহিলাম আদি অন্ত সব বিবরণ। মনে লয় দেখ গিয়া সেরূপ কেমন। পরীগণ বলে তাহা বিশ্বাস না হয়। চক্ষে দেখিলে নাহি করিব প্রত্যয়। এক পরী বলে শুন মোর কথা। গাজিকে লইয়া এবে যাই চলি তথা। লাগায়ে গাজির অঙ্গ চাম্পার অঙ্গেতে কার বেশি কার কমি দেখিব চক্ষেতে। এ যুক্তি সাব্যস্ত করি যত পরীগণ। মসজিদের মাঝে গেল চলিয়া তখন। দুই পালঙ্কেতে শুয়ে আছে দুই ভাই। নিদ্রায় মোহিত অতি কেহ জাগে নাই। হেন সমে পরী সব পালঙ্কের খুড়া। ধরিয়া বাহির করি দিল লয়ে উড়া। গাজিকে লইয়া পরী উড়ে শূন্য ভরে। নিমিষে গেলেন তারা ব্রাহ্মণা নগরে। দেখিল প্রহরী সব আছেন শুইয়া। মৃত্যু আকর হৈয়া রহিছে পড়িয়া। হেন সমে পরী সব খসাইয়া দ্বার। আসিল গাজিকে লইয়া মন্দিরে চাম্পার। শুয়ে আছে চাম্পাবতী পালঙ্ক উপর। শুন বলি সবে পরী কোনো কাজ করে গাজির পালঙ্ক নিয়া চাম্পার ডাহিনে। রাখিলেন মিলাইয়া পরম যতনে। দুই পালঙ্কের নিচে দুই ঠিকা দিল। মধ্যেখানে দুই জনে একত্র করিল। তৎপরে পরীগণ দূরে কিছু গিয়া। দেখে দোহার রূপ নয়ন ভরিয়া। দেখিয়া হইল পরী উন্মাদ লক্ষণ। গালে হাত দিয়া সবে কহেন তখন। একি রূপ অপরূপ আহা মরি২। যেমন সুন্দর গাজি তেমন সুন্দরী। এক অঙ্গ বহিছে গো দু-ভাগ হইয়া। কেমনে গড়িল বিধি এমন করিয়া। এক তিল বেশি কমী নাহি দেখি কার। গড়ন গঠন ধন্য কারিগরী তার। যদিগো সাহেব গাজি রমণী হইত। বদল করিলে কেহ নাহিক চিনিত। এক পরী বলে যদি এদের হৈত বিয়া। আনন্দ সাগরে তবে রহিত ডুবিয়া। হেন রূপ কেন বিধি করিল সৃজন। ভিন্ন জাতি দুই জনে না হইবে মিলন। এই সব আলাপন করে পরীগণ। নগর দেখিতে তারা করিল

www.pathagar.com

গমন। ব্রাহ্মণা নগর সব ভ্রমণ করিয়া। রাজার বাগানে শেষে গেলেন চলিয়া। ফুটিয়াছে উদ্যানেতে নানা জাতি ফুল। কদম্ব কেতকী চাঁপা সেউতি রঙ্গন। পাকিয়া রয়েছে আর কত জাতি ফল। পুস্তক বাড়িয়া যায় লিখিলে সকল। এই সব ফল ফুল দেখে পরীগণ। গাছে২ আরোহিয়া করেন ভক্ষণ। চাম্পার মন্দিরে গাজি গেল পাসরিয়া। এখানেতে কিবা হইল শুন মন দিয়া। গাজি আর চাম্পাবতী দুই পালঙ্কেতে। কেহ নাহি জাগে দোন আছেন নিদ্রাতে। কালু ভাই বলে গাজি মোড়ান দিল। চাম্পার বুকেতে হাত অমনি পড়িল। পুরুষের হাত যদি লাগিল অঙ্গেতে। জাগিয়া উঠিল বালা কাঁপিতে২। বুকেতে এমন শর বদনে হানিল। যেমন ঘৃতের মধ্যে আগুন পড়িল। মনে মনে বলে কন্যা এসে কোন দাসী।

চাতুরি করিছে বুঝি মোর কাছে বসি। দাসী হেন জ্ঞান বামা মনেতে করিয়া। বিবস্ত্র হৈয়া ওঠে খাড়া হাতে লিয়া। দাঁড়াইয়া চাম্পাবতী চক্ষু মেলি হেরে। কোটী শমী যিতি ঝলমল করে। গাজিকে দেখিয়া চাম্পা মুর্চ্ছিত হইয়া। উলঙ্গিনী পালঙ্কেতে পড়িল ঢলিয়া। কতক্ষণ পরে বালা হৈয়া চেতন। ধীরে২ পড়িলেন পৈরন বসন। পরে সতী চাম্পাবতী পালঙ্কে বসিয়া। দেখেন গাজির রূপ স্বচক্ষে চাহিয়া। ক্ষণে দেখে চক্ষু ক্ষণে দেখে বুক। ক্ষণে দেখ হস্তপদ ক্ষণে দেখে মুখ। লক্ষ কোটি চন্দ্র যিনি তার মুখ খান। ছটফট করে কন্যা হারাইয়া জ্ঞান। চাম্পা বলে কিবা রূপ আহা মরি২। একেবারে প্রাণ মোর করে নিল চুরি। হইল চঞ্চল চিত্ত ধৈর্য নাহি হয়।

নিশ্বাস ছাড়িল ধনী ভরিয়া হৃদয়। মন্ত্রণা করিল এই সাথে আপনার। জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করি একবার। কি নাম তাহার হয় ঘর কোথাকারে। কেমনে আসিল চোর আমার মন্দিরে। যেমন পতঙ্গ গিয়া পড়ে আগুনেতে। সেই মতো কন্যা নাহি পারিল থাকিতে। আপন পালঙ্ক হইতে তখনি উঠিয়া। গাজির পালঙ্ক মধ্যে বসিলেন গিয়া। পালঙ্কে বসিয়া চাম্পা গাজির পদেতে। দুই হাত ধরিয়া ডাকে কান্দিতে২। উঠ২ মনচোরা নিদ্রা কত যাও। অভাগিনী চাম্পা ডাকে চক্ষু মেলি চাও। আহারে দারুণ চোর কেনে আসিলে। নাহিক হেরিল তোরে প্রহরী সকলে। কেনবা আসিলে হেথা কাটাইতে মাথা। জান না মুকুট রাজা হয় মোর পিতা। দেখিলে এখনি তোরে ফেলিবে কাটিয়া। জাগরে দারুণ চোর নয়ন মেলিয়া। এইরূপে চাম্পাবতী ডাকে কত মনে। আবদুর রহিম কহে বিরচিয়া গীতে।

গীত তাল আদ্ধা

জাগরে২ নাথ জাগ চক্ষু মেলি। বিফলে রজনী হেন
যায় দেখ চলি। যাইতেছ দ্রিা কত, পাবে নিদ্রা
অবিরত, গা তুল২ বলি করে কৃতাঞ্জলি। তোমার
রূপের বাণে প্রাণ মোর নাহি তনে গেছে প্রাণ বক্ষ দেশ
করে সেই খালি। প্রাণ বিনে কলেবর, কাঁপিছে থর২
প্রাণ করে থর২, পড়িলাম ঢলি। দুই হাতে ধরি বুকে,

www.pathagar.com

চন্দ্র মুখ দিয়া মুখে, একবার দয়া করি লেহ কোলে তুলি ।

পয়ার । শুনিয়া চাম্পার ডাক গাজি জিন্দা পির । উঠিলেন নিদ্রা হইতে হইয়া অস্থির । বিমুখ চাম্পাবতী আছে কাছে বসি । জ্বলিতেছে রূপ যিনি লক্ষ কোটি শশী । হঠাৎ চাম্পার রূপ নয়নে হেরিয়া । মুর্চ্ছিত হইয়া গাজি পড়িল ঢলিয়া । হেন কালে চাম্পাবতী মুখে জল দিল । পরে যে কোমল হাত বুকে লাগাইল । তবেত গাজি চক্ষু মেলি বসিল উঠিয়া । মনে ধন্দ লাগে বড় কন্যাকে দেখিয়া । চারিদিকে চেয়ে দেখে নাহি কালু ভাই । আর সেই মসজিদ চক্ষে চেখে নাই । অস্থির হইয়া গাজি ভাবেন অন্তরে । কেমনে আসিনু আমি এই মন্দিরে । দেখিয়া কন্যার রূপ না পারি থাকিতে । কেবা মোরে এইখানে আনিল কিমতে । হেট শিরে শাহা গাজি ভাবে মনে২ । হেন কালে কহে কন্যা মধুর বচনে । কেমনে আসিলে চোর মন্দিরে আমার । ধন্যরে দারুণ চোর সাহস তোমার । এতেক প্রহরীগণ কেমনে এড়ালে । কারু হাতে তুমি নাহি ধরা পড়িলে । মরিতে আসিলে চোর রক্ষা নাহি তোর । জান না মকুট রাজ পিতা হয় মোর । শুনিলে এখনি আসি কাটিবে গরদান । বাঁচিবার কিছু তোর না দেখি সন্ধান । নামেতে দক্ষিণা রায় গোসাঁই রাজার । বাহু বলে পারে সেই জিনিতে সংসার । মানুষ ধরিয়া বীর চাবাইয়া খায় । তাহার হাতে বাপে দিয়া দিবেন । তোমার ব্রাহ্মণা নগর এই শুন বিবরণ । এ দেশের প্রজাগণ সকলি ব্রাহ্মণ । অন্য জাতি দেশে রাজা নাহি দেয় ঠাঁই । যবন পাইলে খায় দক্ষিণা গোসাঁই । শুন চোর বলি শুন আর সমাচার । লীলাবতী নামে সতী জননী আমার ।

সাত ভাই জ্যেষ্ঠ মোর বলবান অতি । সবের কনিষ্ঠ আমি চাম চাম্পাবতী । বাপ ভাই বিনে আর পুরুষ কেমন । চক্ষু মেলি চেয় নাহি দেখেছি কখন । দাসীগণে দেখি সদা আর কেহ নাই । যদি আমি মিথ্যা বলি গোমাংস খাই । তোমাকে প্রথম এই দেখিনু নয়নে । আহারে দারুণ চোর আসিলে কেমনে । হৃদয় সিন্দুক মোর তুমি যে খুলিয়া । প্রাণধন লইয়াছ হরণ করিয়া । কহ চোর কহ শুনি পরিচয় মোরে । কোনো জাতি হও তুমি ঘর কোথাকারে । মাতা পিতা কেবা তোর কিবা নাম তাহার । কহ চোর কহ আর নাম আপনার ।

এমন সুন্দর রূপ তোমার অঙ্গেতে । এক তিল নাহি আমি পারি পাসরিতে । খাইবে দক্ষিণা রায় প্রভাতে আসিয়া । কেমনে আমার প্রাণ রাখিব বান্ধিয়া । আহা আহা কেন আসিলে হেথায় । আপনি মরিতে আর মারিতে আমায় । শুনিয়া কন্যার বাণী অনেক ভাবিয়া । কহিতে লাগিল গাজি সাহস করিয়া ।

গীত তাল আদ্ধা

আহা মরি প্রাণ প্রিয়া ওগো বিধুমুখী । একি রীতি বিপরীত
তোমার চরিত্র । কত ভয় দেখাইলা, যেমন শিশুর খেলা,
করিতেছ মোর সঙ্গে, অঙ্গে ধুলা মাখি । বিনা শ্রমে পেলে রত্ন
কে করে তাহার যত্ন, ভালো নহে ভালো নহে অত বকাবকি ।

www.pathagar.com

পয়ার। চাম্পা বলে ধন্য চোর সাহস তোমার। আসিয়া মান্দিরে মোর এত অহঙ্কার। গাজি বলে প্রাণ প্রিয়া চোর নাহি আমি। আমাকে করিয়া চুরি আনিয়াছ তুমি। কেমনে আসিনু নৈলে তোমার মন্দিরে। উলটিয়া চোর বলে চুরি করে মোরে। চাম্পা বলে হারে চোর নাহি তোর ভয়। রজনী প্রভাতে হলে যাবে যমালয়। গাজি বলে প্রাণ মোর তোমার কাছেতে। কাহার ক্ষমতা আছে আমাকে মারিতে। তুমি যদি মার তবে মরণ আমার। পীরিতে ডুবিছে প্রাণ ভয় কার আর।

গীত তাল আদ্ধা

মরিব মরিব আহা মরি২। কি কহ২ প্রাণেশ্বরী।
পড়িয়াছি প্রেম বাণে যায় যায় প্রাণ যাবে
তার দায় চিন্তা নাহি করি। মরি সে বিশেষ আর
তিলেক হইয়া পার, মিশে রব অঙ্গেতে তোমার।

পয়ার। চাম্পা বলে শুন চোর ভাবিছ কি মনে। রজনী প্রভাতে বল বাঁচিবে কেমনে। রাখিবার ঠাঁই নাই কোথায় রাখিব। তোমাকে রাখিলে সত্য আমিও মরিব। তোমার আজি মরণ নিশ্চয়। চরণে ধরিয়া কহি দেহ পরিচয়। এই কথা চাম্পাবতী যখন কহিল। প্রাণ ভয়ে শাহা গাজি কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে২ কহে চাম্পার সাক্ষাতে। আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গীতে।

গীত তাল আদ্ধা

উপায় দেখি নারে প্রাণ উপায় দেখি না। কি করিব
কি করিব হায় হায় কি করিব বল না। পড়েছি তোমার হাতে
যাই বল কোন পথে ঠেকিনু বিষম দায় বুদ্ধিত খাটে না।

পয়ার। চাম্পা বলে কেন তুমি ভাবিতেছ মিছে। জন্মিলে মরণ জান এক দিন আছে। তোমার আমার আজি সে দিন নিশ্চয়। ভাবিলে কি হবে আর দেহ পরিচয়। শুনিয়া সাহেব গাজি হাত দিয়া গালে। ধীরে২ মধুস্বরে কেন্দে২ বলে।

ভয়। আহা আহা মরি২। কি করিব ও সুন্দরী।

ত্রিপদী। মুছিয়া কোমল আঁখি, বিধু মুখে সুধা মাখি, কহে গাজি মধুর বচনে। কি কহিব পরিচয়ে, প্রাণ মোর কাঁপে ভয়ে, শুন যদি সাধ থাকে মনে। বৈরাট নগরে ঘর, পিতা শাহা সেকান্দর, অজুপা সুশীল সতী মাতা। মোর নাম জান গাজি, তোমার মন্দিরে আজি, মীন মতো হৈছে জালে গাঁথা। আমার বাপের ডরে, কাঁপে জমি থরে২ আর কাঁপে সর্ব্ব দেবগণ। মাতা মহারাজা বদি পিতার ভয়েতে চলি, গেল রাজা পাতাল ভবন। শুন চাম্পা বলি তোমারে, দক্ষিণা রায়ের মোরে, ভয় যে দেখাও বার২। মোর বাপ যিনি কাল, পাইলে করিত লাল, কান দুটি মলিয়া তাহার। শুন সতী হৈয়া ধৈর্য, করিবারে রাজ কার্য, মোরে ডাকি কহিলেন পিতা। আমি তাহে অস্বীকার, কৈল কত বার, আজ্ঞা দিল কাটিবার মাথা। না ধরিল হাতিয়ারে, তবে পিতা ক্রোধ ভরে, পাড়াইল দশ হাতি দিয়া। ইহাতে বাঁচিনু যবি, অগ্নিকুণ্ড করি তবে, দিল বাপে তাহাতে ফেলিয়া।

www.pathagar.com

বাঁচিলাম অগ্নি হৈতে, তবে ফেলে সাগরেতে, শিলা এক বান্ধিয়া গলেতে। তাহাতে উদ্ধার হই সাগরে ফেলিয়া সুই, বলিলেন উঠাইয়া দিতে। সুই আমি দিনু যদি তবু পিতা নিরবধি, কহে মোর রাজত্বের কথা। অতএব নিশি কালে জননীকে ঘুমে ফেলে, দেশ ছাড়ি মনে পাইয়া ব্যথা। কালু নামে ভাই এক, মায়ে তারে পুষিলেক, সেহ মোর চলিল সঙ্গেতে। বেড়াইয়া নানা দেশে, বাঙ্গালাতে অবশেষে, বসিলাম সুন্দরবনেতে। সাত সাল থেকে বনে, পরে দুই ভাই জনে, ছাপাই নগর মধ্যে গিয়া। শ্রীরাম রাজার তরে, সবংশে স্বজাতি করে, সোনুরে গেলাম চলিয়া। বন ছিল সোনপুরি, তাহাকে উদিত করি, শাহা পরী দ্বারায় তাহার। হাজার দালান তাতে, দিয়া গেছে পরীজাতে, দিল এক মসজিদ আর। সেই মসজিদ পরে, ছিলাম ঘুমের ঘোরে, দুই ভাই দুই পালঙ্কেতে। কে মোরে এখানে আনে, কিছু নাহি জানি মনে, কহিলাম তোমার কাছেতে।

পয়ার। চাম্পা বলে হারে চোর এত শক্তি তোর। উপনীত হইলে আসি ব্রাহ্মণা নগর। যবনের সাধ্য নাহি দেশে দিতে পাড়া। একবারে মধ্য ঘরে বসিয়াছ চোর। কেমনে যবন তুমি আসিলে মন্দিরে। রাম রাম জাতি মোর গেল একেবারে। মরণের সাধে তুমি এ দেশে আসিলে। এখনি বান্ধিয়া লিবে প্রহরী সকলে। দক্ষিণা রায়ের ভাগ্যে আসিয়াছ এথা। অম্বল খাইবে তোর দায়ে কাটি মাথা। জীবনের আশা কভু না কর কখন। মৃত্যুকালে ঝপ কর নাম নিরঞ্জন। তোমার সাহস ধন্য আসিলে মন্দিরে। ত্বরায় বাহিরে যাও না ছুঁইবে আমারে।

গীত তাল আদ্ধা

আহা মরি মরি চোর কি করি কি করি কও।
মরিতে গগন শশী হাত গগনে বাড়াও।
গোবরিয়া পোকা হৈয়া পদ্ম মধু খেতে চাই।
যাওরে যাওরে চিত্ত চোর মোর প্রাণ লিয়া যাহ।

পয়ার। চাম্পার বচনে গাজি কাঁপে থর২। কাঁপিয়া২ কহে হইয়া কাতর। শুন মোর প্রাণ প্রিয়া কি বল গো তুমি। স্বপনেও কভু নাহি দেখিয়াছি আমি। তোমার মন্দির আর ব্রাহ্মণা নগর। এইখানে মৃত্যু বুঝি লিখিয়াছে তোমার জীবনের আশা নাহি জানি মনে মনে। না করি ভাবনা কিছু তাহার কারণে। দক্ষিণা রায়ের আমি নাহি রাখি ভয়। কি কহিব প্রাণ প্রিয় বিদরে হৃদয়। কেবল ভরসা এই মনে মনে করি। কেমনে প্রিয়সী আমি তোমাকে পাসরি। বিকাইছে প্রাণধন তোমার রূপেতে। মরিলে রূপ গাথা রহিবেক দিতে। এরূপ যৌবন মোর করিছে উদাসী। স্থির না হইতে পারি শুন গো প্রিয়সী। আহা২ প্রাণ প্রিয়া কি করি উপায়। যে দাগ দিয়েছ চিত্তে মুছা নাহি যায়। তুমি যদি নিজ হাতে কেটে ফেল মাথা। তবে আর কিছু মোর না রহিবে ব্যথা। এখনি কাটহ প্রাণ ধরি তোর পায়। মনের আবেশ তবে সব ঘুচে যায়। নতুবা করহ কিছু উপায় আমার। পড়েছি তোমার হাতে কি করিব আর। সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি নন্দিনী রাজার। জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে দেখ ভাগ্যে কি কাহার। এ বলিয়া শাহা গাজি করেন রোদন। নয়নের জলে

www.pathagar.com

যায় ভাসিয়া বদন। তবে সতী চাম্পাবতী খড়ি লয় হাতে। দুই নাম যুক্ত করে লাগি গণিতে। গণিয়া দেখিল কন্যা লেখেছে বিধাতা। গাজির সঙ্গেতে চাম্পা এক সুতে গাথা। হইবে সাহেব গাজি প্রাণেশ তাহার। গাজি বিনে সংসারেতে পতি নাহি আর। গণাতে জানিয়া চাম্পা ভাবে মনে মনে। আমিত ব্রাহ্মণ জাতি সে হয় যবন। তাহার সাথে মোর বিয়া কেমনে হইবে। বিধির কলম কভু বৃথা নাহি যাবে। এ মতে ভাবিয়া চাম্পা কি করে তখন। হাত বাড়াইয়া ধরে গাজির চরণ। ধরিয়া গাজির পদে রাজার নন্দিনী। শাড়ির অঞ্চল দিয়া মুছে মুখখানি। মুছিয়া গাজির মুখ কহে চাম্পাবতী। উঠ২ প্রাণনাথ স্থির কর মতি। বিধির লিখন নাহি হইবে খণ্ডন। তুমি মোর প্রাণপতি নির্ব্বন্ধ লিখন। আমিই তোমার দাসী নহে ছাড়াছাড়ি। এক সুতে গাথা যেন হর আর গৌরী। শুপিনু যৌবন ধন তোমার চরণে। না করিও চিন্তা আর আপনার মনে। হাসি মুখে একবারে কহ নাথ বাণী। পরাণ জুড়াই আর শ্রবণেতে শুনি। শুনিয়া সাহেব গাজি হরষিত মনে। কহেন কন্যার কাছে মধুর বচনে। শুন২ প্রাণ প্রিয়া মোর নিবেদন। কোথায় রাখিবা মোরে করিয়া কেমন। হয়েছি মীনের মতো আটক জালেতে। বাঁচিবার পথ কিছু না দেখি চোখেতে। চাম্পা বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন। কপালে লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন। তোমাকে লইয়া কাল বাপ কাছে যাব। যাইয়া ভাগ্যের কথা সকলি কহিব। তবে বাপ সাথে তব দিবে মোর বিয়া। নৈলে মোরা দুই জনে ফেলিবে কাটিয়া। নহেত হৈয়া ক্রোধ খেদারিয়া দিবে। এর বেশি প্রাণনাথ আর কি করিবে। দোরিয়া দেয় যদি মোরা দুই জনে। বড়ই বিশেষ বয়ে যাব তব সনে। তুমিত ফকির, আমি ফকিরানি হইয়া। ভিক্ষা মাগি খাব গিয়া গলে ছালা লইয়া। না ছাড়িব তব সঙ্গ জীবন থাকিতে। কণ্ঠ কাটিলেও আমি যাব সাথে২। এ বলিয়া রাজ সুতা গাজির চরণে দুই হাত ধরি কান্দে সজল নয়নে। হেনকালে শাহা গাজি মুখে চুমা দিয়া। মুছে তার চক্ষু মুখ কোলে বসাইয়া। তবে সতী চাম্পাবতী মেলিয়া নয়ন। বলে শুন প্রাণনাথ আমার বচন। যৌবন অমূল্য ধন শুপিনু তোমারে। যাহা ইচ্ছা হয় নাথ কর তুমি মোরে। গাজি বলে শুন প্রিয়া মোর প্রাণধন। যত দিন নাহি হয় বিবাহ বন্ধন। ততদিন তব সাথে না করিব রতি। কিছু দিন ধৈর্য হইয়া থাক চাম্পাবতী। কুণ্ড কার্যেতে কভু তুমি নাহি দিও মন। মোর রূপ ধ্যান করি ভাব নিরঞ্জন। দুনো কার্য সিদ্ধি তবে তোমার হইবে। আমাকে পাইবা আর খোদাকে পাইবে। আসন জিকির গাজি সব শিখাইল। চারিটি কালেমা আর শিখাইয়া দিল। তৎপরে চাম্পাবতী পাটে দাঁড়াইয়া। ঝাড়ে শিরের কেশ কবরী খুলিয়া। চরণে পড়িল কেশ দীর্ঘ সে এমনি। কালো হতে কালো যিনি কালো ভোজঙ্গিনী। দুই হাতে কেশ সেই দুই ভাগ করিয়া। মুছেন গাজির পদ পদে মুণ্ড দিয়া। মুছিয়া চরণ দুটি বান্ধিয়া কেশেতে। কান্দিয়া২ চাম্পা লাগিল কহিতে আমি যে তোমার দাসী জানিবে নিশ্চয়। দুঃখিনী দাসীরে নাথ ছেড়ে নাহি যাবে। আমাকে ছাড়িয়া প্রিয় তুমি যদি যাও। ঈশ্বরের দিব্য আর মোর মাথা খাও। মাতা পিতা ভাই বন্ধু সব মোর পর। তোমা বিনে মোর কেহ নাহি প্রাণেশ্বর। শুপিলাম মনপ্রাণ তোমার চরণে।

www.pathagar.com

অধিনীর প্রতি দয়া থাকে যেন মনে। গাজি বলে শুন যত্নের রতন। ছাড়াছাড়ি না হইবে থাকিতে জীবন। আমি দেল তুমি মোর প্রাণ বিধুমুখী। ছাবিড়ার পথ কিছু চক্ষে নাহি দেখি। তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমি চলে যাই। খোদার দোহাই আর দুটি চক্ষু খাই। এত শুনি চাম্পাবতী হরষিত মনে। বসিল গাজির বামে প্রফুল্ল বদনে। দোহার রূপেতে হেন হইল উজ্জ্বলিত। তাহার উপমা নাহি সংসারে কিঞ্চিৎ। কোটি২ রবি আর কোটি২ শশী। চাম্পার মন্দিরে যেন পড়িয়াছে খসি। রূপেতে করিয়া আলো বসে দুই জন হেন কালে শাহা গাজি অঙ্গুরী আপন। চাম্পার আঙ্গুল মধ্যে দিল পড়াইয়া। চাম্পার অঙ্গুরী চাম্পা তখন খুলিয়া। গাজির আঙ্গুল ধরি নিজ হাতে দিল। দোহার পালঙ্ক দোহে বদল করিল। তৎপরে চাম্পাবতী পান বানাইয়া। পতির মুখেতে সতী দিলেন তুলিয়া। গাজিও পানের খিলি তার মুখে দিল। আতর গোলাব আর অঙ্গে ছিটাইল। কস্তুরী চন্দন চুয়া তামাকেতে দিয়া। কনকের হুক্কা আনি দিল সাজাইয়া। তামাক তাম্বুল দোহে হরষিতে খায়। প্রদর কৌতুকে চক্ষে ধরিল নিদ্রায়। গাজির পালঙ্কে চাম্পা শুইল যখন। চাম্পার পালঙ্কে গাজি করিল শয়ন। শুইয়া পালঙ্ক পরে সুখে নিদ্রা যায়। বাগানেতে পরীগণ ফলমুল খায়। হঠাৎ গাজির কথা হইল স্মরণ। এক পরী বলে শুন ওহে ভগ্নীগণ। গাজিকে আনিয়া রাখি চাম্পার মন্দিরে। একেলা রহিল কালু দেশ সোনাপুরে। রজনী প্রভাত হইলে প্রমাদ ঘটিবে। না সহে বিলম্ব আর শীঘ্র চল সবে। তখনি উঠিয়া চলে সব পরীগণ। চাম্পার মন্দির মধ্যে গিয়া সেইক্ষণ। দাঁড়াইয়া তারা সবে কাতারে২। দেখেন দোহার অঙ্গ পালঙ্ক উপরে। গাজির অঙ্গুরী কন্যা দিল আঙ্গুলেতে। কন্যার অঙ্গুরী সেই গাজির করেতে। দোহার পালঙ্ক আর করিছে বদল। দেখিয়া হাসেন পরী করি খল২। এক পরী ওঠে বলে কিবা দেখ আর। জাগিয়া করিছে এরা দুজনে বিহার। এ কন্যা গাজির জুড়ি নির্ব্বন্ধ লিখন। দোহার প্রেমেতে দোহে হইছে বন্ধন। দেখ২ কিবা রূপ আহা মরি২। যেমন সুন্দর গাজি তেমন সুন্দরী। মিলিলে এমন জোড় তনে আর মনে। এ জোড়া ভাঙিয়া মোরা নিবেগো কেমনে। কি করি উপায় বুদ্ধি কেবা দিবে বলি। গাজিকে লইয়া মোরা যদি যাই চলি। মরিবেক চাম্পাবতী আক্ষেপ করিয়া। না দিলে মরিবে কালু গলে রশি দিয়া। করিলাম মহাপাপ আনিয়া গাজিরে। আগেতে জানিলে কেবা হেন কাজ করে। এক পরী বলে তোরা শুনগো সকলে। মিলিবে চাম্পার সাথে থাকিলে কপালে। যদিগো দোহার থাকে নির্ব্বন্ধ লিখন। কিছু দিন পরে হবে অবশ্য মিলন। কালুর কান্দন কার বরদাস্ত না হবে। সাপ দিয়া মোর সবে ভস্ম করে দিবে। যেখানের পাপ চল সেখানে রাখিয়া। আপনার ঘরে মোরা যাইগো চলিয়া। যার কর্ম্মে যেই থাকে অবশ্য ঘটিবে। তার জন্যে আমাদের কিছু না হইবে। এ যুক্তি গ্রহণ করি যত পরীগণ গাজির পালঙ্ক গিয়া ধরিল তখন। শুইছে সাহেব গাজি পালঙ্ক উপরে। তাহাকে লইয়া পরী উড়ে শূন্য ভরে। উড়িয়া নিমিষে গেল সোনাপুর দেশে। যেইখানে দুই ভাই ছিলেন উল্লাসে। শুয়ে আছে কালু শাহা পালঙ্ক মাঝার। রাখিল গাজিকে নিয়া কাছেতে তাহার। তৎপরে পরীগণ গেলেন চলিয়া।

www.pathagar.com

মসজিদে দুই ভাই রহিল শুইয়া। আবদুর রহিম বলে মধুর পাঁচালি। চাম্পার বিলাপ শুন ত্রিপদীতে বলি।

ত্রিপদী। রজনী প্রভাব হইল, অন্ধকার ঘুচে গেল, পাখি সব ডাকে বসি ডালে। উদয় হইল ভানু, হাম্পা২ করে ধেনু, সাজিয়া রাখালগণ চলে। চাম্পাবতী নিদ্রা যায়, ডাক দিয়া বলে মায়, কেন মাগো এত ঘুম আজি। নিদ্রা ভঙ্গ হইল ডাকে, হঠাৎ জাগিয়া দেখে, পালঙ্ক সহিত নাহি গাজি। হায় হায় নাথ বলি, অমনি পড়িল ঢলি, একেবারে অজ্ঞান হইয়া। ধুলায় লুটায় কায়, মুখে বলে হায় হায়, ক্ষণে২ ওঠে দাঁড়াইয়া। অঙ্গের বসন আর, যত ছিল অলঙ্কার, দিল সব ফেলিয়া দূরেতে। উলঙ্গ হইয়া ধনী, ভেবে কান্ত গুণমণি, উচ্চৈঃস্বরে লাগিল কান্দিতে। নেত্র জলে গাত্র ভাসে, লোটন পড়িছে খসে, বেশ করি কেশ নাহি বান্ধে। অবলা সরলা বালা, সইতে নাহি পারে জ্বালা, মস্তকে হানিয়া হাত কান্দে। গাজির পালঙ্ক আর, হাতের অঙ্গুরী তার, দেখে চাম্পা আপনার হাতে। আহা২ মুখে বলি, অমনি পড়িল ঢলি, পড়িয়া সে লাগিল লোটিতে। ক্ষণে ওঠে ক্ষণে লোটে, যেমন হইল পেটে, সন্তান প্রসবের ব্যথা। কেন্দে বলে চাম্পাবতী, আহা২ প্রাণপতি, তব দেখা পাব গিয়া কোথা। অঙ্গুরী পালঙ্ক দিয়া, গেল আর জ্বালাইয়া, দেখিতেই প্রাণ জ্বলে ওঠে। আহা২ মরি২, ধৈর্য না ধরিতে পারি, যায় প্রাণ যায় বুক ফেটে। এ বলিয়া রাজ বালা, অঙ্গেতে মাখিয়া ধূলা, কান্দিতেছ উলঙ্গিনী হইয়া। দাসী দুই তিন জন, আসিয়া যে সেইক্ষণ, এইরূপ চক্ষেতে দেখিয়া। মুখে কার নাহি বাণী, যথা ছিল লীলা রানি, কহে গিয়া লীলাবতী কাছে। শুন মাগো লীলাবতী, দেখ গিয়া শীঘ্র গতি, কন্যা তোর পাগল হয়েছে। লীলা রানি এত শুনে, শিহরিয়া ওঠে প্রাণে, চলে চক্ষু মুছিতে২। দেখে গিয়া লীলাবতী, শোকাকুলি হইয়া অতি, চাম্পাবতী পড়িছে ভূমিতে। অঙ্গের বসন আর যত ছিল অলঙ্কার, সব দিছে দূরেতে ফেলিয়া। হৈয়া ধনী পাগলিনী, কান্দে শিরে হাত হানি, গাজি২ মুখেতে বলিয়া। হেন সমে লীলাবতী, মমতা করিয়া অতি, তুলিয়া লইল সতী কোলে। মুছিলেন নাক মুখ, বুকেতে লাগায়ে বুক, দুই হাত থরি তার গলে। জিজ্ঞাসিল লীলা রানি, কহ মাগো কহ শুনি, কি কারণে করিছ রোদন ত্রিপদী এখানে বয়, আবদুর রহিম কয়, গীতে কিছু করিয়া বচন।

গীত তাল আড়া খেমটা

গুমরি গুমরি কান্দে রাজার কুমারী
কেশ এলো চক্ষে জল, পড়ে ঝর ঝরি
ত্যাজে শাড়ি, ভূমে পড়ি, গড়াগড়ি
ক্ষণে ওঠে, ক্ষণে লুটে, হইয়া দিগম্বরী।

পয়ার। এই রূপে কান্দে চাম্পা শোকাকুলি হৈয়া। লীলাবতী সতী মাতা তাহার আসিয়া। চাম্পাকে লইয়া কোলে জিজ্ঞাসেন বাণী। কি কারণে কান্দ মাগো কহ কহ শুনি। পালঙ্ক ত্যাজিয়া কেন শুইয়া ধরায়। তোমার কান্দনে মোর বুক ফেটে যায়। নয়নের তারা তুমি অঞ্চলের ধন। প্রাণের অধিক মোর যত্নের রতন। সাত পুত্র মধ্যে

মাগো তুমি আদরিণী। সেই সমে ডাক মোরে বলিয়া জননী। অন্তর জুড়ায়ে যায় তোমার ডাকেতে। দুঃখ ক্লেশ যত মোর পালায় দূরেতে। কি কারণে কান্দ মাগো কি হইল তোমার। কহ সে মনের কথা শুনি একবার। জিন পরী নাহি কিছু দেখিছ নয়নে। কিম্বা কিছু নিশা কালে হেরিয়া স্বপনে। বার বার কত মনে জিজ্ঞাসেন রানি। না দেয় উত্তর বালা নাহি কহে বাণী। প্রতিবেশী নারীগণ সকলে আসিয়া। জিজ্ঞাসে চাম্পার কাছ শিরে হাত দিয়া। কি দেখিলা কহ শুনি রাজার নন্দিনী। গুপ্ত কথা হইলে বল কৈরে কানাকানি। না দেয় উত্তর কিছু না কহে বচন। কার দিকে নাহি চায় মেলিয়া নয়ন। আসিল মুকুট রাজা জনক চাম্পার। সাত ভাই নয় মামা আসিলেন আর। সাত ভাজু নয় মামি যত দাস দাসী। আসিয়া কান্দেন সবে হেট শিরে বসি। চাম্পাকে লইয়া কোলে মুকুট রাজন। জিজ্ঞাসেন প্রিয়ে ভাসে মুছিয়া নয়ন। কি কারণে কান্দ মাগো কহ সত্য কথা। না দেয় জওয়াব কন্যা নাহি তোলে মাথা। সাত ভাই বলে শুন প্রাণের ভগিনী। যাহা চাহ বল মোরা সবে গিয়া আনি। মা বলিয়া নয় মামা ডাকে ঘন২। না দেয় উত্তর চাম্পা না মেলে নয়ন। নয় মামি ডেকে কয় চাম্পাবতী শুনগো। চোখ মেল কও কথা বাচাল বলগো। সাত ভাই বধূ তারা বসিয়া কাছেতে। কানাকানি করে কহে চাম্পার কানেতে। গোপনের কথা কিছু মনে থাকে যদি। আমাদের কাছে তাহা বলগো ননদী। না দেয় উত্তর চাম্পা নাহি মেলে আঁখি। নীরবেতে মনে২ কান্দে বিধুমুখী। ঔষধ কবজ কত করে বৈদ্যগণ। কোনো মতে নাহি চাম্পা হইল চেতন। এরূপ দেখিয়া রাজা আক্ষেপ করিয়া। চাম্পা২ বলে কান্দে শিরে হাত দিয়া। সাত ভাই কান্দে তারা বোন২ বলি। নয় মামা, কান্দে আর মামীরা সকলে। সাত ভাজু হেট শিরে কান্দে ধীরে ধীরে। নগর বাসিনীগণ কেন্দে২ মনে। ধুলায় কান্দে লীলাবতী রানি। মুখে জল দিয়া তুলে দাসীগণ টানি। এইরূপে তিন দিন গত হইয়া যায়। এর মধ্যে অন্ন জল কেহ না খায়। তবে সতী চাম্পাবতী নয়ন মেলিয়া। কহেন মায়ের কাছে কান্দিয়া২। সকলে চলিয়া গেল এখান হইতে। কহিব মনের কথা তোমার সাক্ষাতে। এ কথা শুনিয়া সবে চলিল তখন। বাপ ভাই মামা মামি আর বন্ধুগণ। গেলেন চলিয়া সবে বিরষ বদনে। রাজা গিয়া বসিলের রাজ সিংহাসনে। হেন কালে লীলাবতী চাম্পাকে কহিল। বল বাছা যাদু ধন মোর কাছে বল। চাম্পা বলে শুন মাগো ধরি তেরা পায়। সে কথা কহিতে মোর বুক ফেটে যায়। কৈলে জানি কিবা আর কহ তুমি মোরে। অতএব মনে মোর ভয় অতি করে। শুন মাগো আগে দিব্য কর তুমি। তবেত মনের কথা সব কব আমি। লীলা বলে যদি আমি কাহারে জানাই। মোর মাথা খাই আর শিবের দোহাই। গোস্বা যদি হই বাছা কথাতে তোমার।

তবে মুই দুই চক্ষু খাই আপনার। নির্ভয়েতে বল মাগো কোনো ভয় নাই। কুলটা হলে কিবা করে বাপ ভাই। চাম্পা বলে শুন মাগো কহ যদি এত। কহিব মনের কথা আজি মোর যত। দশ মাস উদরেতে আমাকে যেমন। রাখিয়া ছিলেন মাগো করিয়া যতন। সে মতো কথা মোর উদরে রাখিবে। ভালো মন্দ কার কাছে কিছু না কহিবা।

www.pathagar.com

লীলা বলে শুন বাছা নাহি কিছু ভয়। আপনার ঘরের কথা কেবা কোথা কয়। চাম্পা বলে কি কহিব কৈতে লাজ করে। দেহ প্রাণ জ্বলে আর মুখে নাহি স্বরে।

গীত তাল আদ্ধা

মরি২ মরি আহা মরি লাজে মরি যাই। দুঃখানলে প্রাণ
জ্বলে কব কার ঠাঁই। নয়নের তারা হইয়াছি হারা,
কি কহিব, কোথায় যাব, কোথায় গিয়া পাই। পাইলে সে
ধন, করিয়া যতন, ধরি গলে, রব মিলে, ছেড়ে দিব নাই।

পায়ার। ধীরে ধীরে কহে চাম্পা মায়ের কাছেতে। কি কহিব জননীগো লাজ করে কৈতে। সেদিন রাত্রে আমি আপন মন্দিরে। একেলা আছিনু শুইয়ে পালঙ্ক উপরে। নিশিকালে চোর মোর ঘরেতে আসিল। দুয়ারি প্রহরী যত কেহ না হেরিল। না ধরিয়া চোর তারা কিসের লাগিয়া। কাটিব সবের মুণ্ড বাপকে কহিয়া। এমন দুর্জ্জন চোর কোথায় আছিল। বুকে সিন্দ দিয়া প্রাণ চুরি কৈরে নিল। বুক খালি করে মোর গেছে প্রাণ চোরা। জিয়ন্তে মরেছি আমি যেন প্রাণ হারা। আহা২ জননীগো কব কার কাছ। যেমন পাগল চোর আমাকে করেছে মনের কপাট খুলি বলা নাহি যায়। কি দেখিনু কি হইল হায়২ হায়। মনে মোর সদা তার জাগে মুখ খান। সে মুখে কহিয়া কথা হরিয়াছে প্রাণ। দুটি চোখ তার যেন রত্ন যিনি জ্বলে। সে চোখে আমার চোখ লয়ে গেছে চলে। লক্ষ কোটি রবি যিনি বুক তার ছিল। সে বুকে আমার বুক খালি করে গেল। এইরূপ সর্ব্ব ধন চোরে মোর লিয়া।

শোকের সাগরে ফেলি গেলেন চলিয়া। কি দোষ করিণু আমি বিধি হইল বাদি। কাড়িয়া নিলেন মোর হাতে দিয়া নিধি। তাহার উদ্দেশ্যে আমি কোন দেশে যাব। কে মোরে বলিয়া দিবে সে চোর কোথায় পাব। আসিয়া বিদেশি চোরে করে গেল চুরি। তাহার উদ্দেশ্য আমি কোথা গিয়া করি।

গীত তাল আদ্ধা

আহারে বিদেশি বন্ধু রহিলি কোথায়। ভাসাইয়া দুঃখানলে
অবলা বালায়। বিদেশিরে দিয়া, প্রাণ গেছে মোর কুলমান,
তবু না পাইনু মন, ছাড়িল আমায়। বিদেশি এমন বৈরী,
জানিলে কি প্রেম করি, ঠেকিয়াছি প্রাণ দিয়া কি করি উপায়
যদি সে চোরেরে পাই, মুখে তার দিব ছাই, না দেখিব চক্ষে
আর পুরুষের কায়। পুরুষ নিঠুর অতি, না জানে প্রেমের রীতি,
জানিলে কি প্রাণ চুরি করে পালায়।

পয়ার। কান্দিয়া কহেন চাম্পা মায়ের নিকটে। কি কহিব জননীগো কৈলে বুক ফাটে। যেরূপ দেখেছি চোখে না পারি ভুলিতে। উড়ু২ করে প্রাণ উড়িয়া যাইতে। কি কহিব জননীগো কহিতে চোরের কথা প্রাণ যে বিদরে। সংসারেতে নাহি আর পুরুষ এমন। লক্ষ কোটি শশী যিনি তাহার বদন।

www.pathagar.com

তার রূপ অপরূপ ত্রিভুবনে নাই। হুর পরী মানিবেক তাহারে গোসাঁই। গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব ছাড়া তার কাছে। অপরূপ রূপ সেই বিধাতা গড়িছে। এক পল নাহি পারি পাসরিতে। মন মধ্যে জাগে রূপ গাঁথা কলেজাতে। কি কহিব জননীগো মরি আমি লাজে। যে দাগ দিয়েছে চোর অন্তরের মাঝে।

গীত তাল আদ্ধা

সহেনা২ মোর প্রাণে আর। কোথা রৈলে প্রাণ
নাথ দেখা আসি দিল না। আহা মরি তাহা বিনে,
যে করে যে করে প্রাণে, কোন মতে শান্ত প্রাণে
করিতে পারি না। যায় যায় সদা করে, একেবারে
কায়া ছেড়ে, পাপীর পরান কেনে চলিয়া যায় না।

পয়ার। কান্দিয়া২ চাম্পা কহে ধীরে ধীরে। কি কহিব জননীগো মুখেনাহি স্বরে। পরান ছেদিয়া যায় সে কথা কহিতে। শুন২ শুন মাগো শুন এক চিতে। পালঙ্ক উপরে আমি ছিলাম নিদ্রায়। কেমনে আসিল নাহি দেখিনু তাহায়। তাহার পালঙ্ক মোর পালঙ্কের সাথে। মিলাইয়া মনচোর ছিলেন নিদ্রাতে। হঠাৎ চোরের হাত বুকে লাগে মোর। চমকিয়া উঠিলাম ধরে তার কর। দাসী হেন জ্ঞান আমি করিয়া মনেতে। কাটিবারে দাঁড়াইনু খাড়া লয়ে হাতে। হেন সমে দেখি দুটি নয়ন মেলিয়া। যেমন শরৎ শশী পড়িছে খসিয়া। কোটি শশী জিনিয়াগো সে বিধু বদন। দেখিয়া ঢলিয়া পড়ি হইয়া অচেতন। কতক্ষণ পরে আমি চেতন হইয়া। জাগাইনু সেই চোরে চরণে ধরিয়া। দেখাইনু কত ভয় নিদারুণ চোরে। কান্দিতে লাগিল তবে অতি ধীরে২। তাহার কান্দনে মোর ফেটে যায় বুক। শাড়ির অঞ্চল দিয়া মুছে দিনু মুখ। জিজ্ঞাসা করিনু পরে সেই মনচোরে। কেমনে আসিলে বল আমার মন্দিরে। কি নাম তোমার বটে হও কোন জাতি। জনকের কিবা নাম কোথায় বসতি। এত শুনি হাতে মুছি কোমল চরণ। মৃদু স্বরে মোর কাছে কহিল তখন। বৈরাট নগরে ঘর গাজি নাম মোর। আমার পিতার নাম শাহা সেকান্দর। অজুপা জননী হয় জাতে মুসলমান। সোনাপুরে থাকি আমি ছেড়ে জন্মস্থান। কালু নামে ভাই এক সাথ লয়ে মোর। শুয়েছিনু মসজিদে পালঙ্ক উপর। কেমনে আসিনু হেথা না পারি কহিতে। এ দেশের নাম নাহি শুনিছি কানেতে। কেবা মোরে এই খানে আনিল কেমনে। আনিয়াছে যম দূতে বুঝি অনুমানে। এখনি হরিবে প্রাণ রক্ষা নাহি আর। এ বলিয়া কান্দে নাথ করি হাহাকার। তাহার কান্দনে মোর চক্ষে ঝরে জল। অমনি পড়িনু পদে হইয়া চঞ্চল। চরণে পড়িয়া আর লাগিনু কান্দিতে। মমতা করিয়া অতি লইল কোলেতে। পরে মোরা দুই জনে শান্ত করি মন। ধর্ম্মকে করিয়া স্বাক্ষী করিলাম পণ। সেই মোর প্রাণপতি আমি তার নারী। জীবন থাকিতে নাহি হয় ছাড়াছাড়ি। এই মতো শক্তাশক্তি কথা সে কহিয়া। অঙ্গুরী পালঙ্ক নিল বদল করিয়া। এই দেখ হাতে মোর তাহার অঙ্গুরী। রয়েছে পালঙ্ক তার এই দেখ পড়ি। আহা২ মরি মরি কি করি উপায়। কি দোষে গেলেন নাথ ত্যাজিয়া আমায়।

www.pathagar.com

গীত তাল আদ্ধা

আহা মোর প্রাণনাথ গেলা কোথাকারে।
আকুল সাগরে ফেলি অবলা দাসীরে।
আগে যদি জানি আমি, পালাইয়া যাবে তুমি,
তবে কি ছাড়িতাম প্রাণ ও প্রাণ তোমারে।
কাল নিদ্রা পরিহরি, রাখিতাম গলে ধরি,
দেখিতাম কেমন করি, যাও তুমি ছাড়ি মোরে।

পয়ার। কান্দিয়া২ চাম্পা বলে পুনরায়। পেয়ে নিধি হারায়েছি হায় হায় হায়। তাহার উদ্দেশে আমি কোথায় যাইব। না পাইলে আপনার গলে ফাসী দিব। আহা মোর প্রাণনাথ কঠিন হইয়া। অবলা দাসীরে গেল সাগরে ফেলিয়া। বিরহ সাগর হেন কূল নাহি যার। পার কর প্রাণনাথ না জানি সাতার। কোথায়রে প্রাণের গাজি প্রাণের দোসর। অভাগিনী চাম্পা ডাকে হইয়া কাতর। স্বীকার দেখা দিয়া শান্ত কর মন। নহেত তোমার শোকে ত্যাজিব জীবন। পর যদি দিত বিধি ডানায় আমার। উড়িয়া উদ্দেশ আমি করিতাম তোমার।

গীত ঠ্যাস কাওয়ালী

নাথের উদ্দেশে আমি যাই যাইগো।
পরাণ বান্ধিতে আর পারি নাই নাইগো
যোগিনী সাজিয়া তাহাকে খুঁজিয়া, আনিব বান্ধিয়া,
যদি দেখা পাই২ পাইগো। দেখা না পাইলে,
ফাঁসি দিয়া গলে, নৈলে ডুবে জলে, প্রাণ দিব কৈ২ কৈগো।

পয়ার। চাম্পা বলে আহা নাথ কোথায় যাইব। না পাইলে তব দেখা প্রাণ হারাইব। এক তিল রাহি আমি পাসরিতে পারি। ভাবিতে২ হায় কবে জানি মরি। চক্ষু প্রাণ তুমি মোর গেছরে লইয়া। খালি তনু রহিয়াছে জীতে মরা হইয়া। তোমার বিচ্ছেদানলে আর না বাঁচিব। এই হুতাশনে আমি পুরিয়া মরিব। তোমার পালঙ্ক আর অঙ্গুরী তোমার। দেখিতেই জ্বলে জান অগ্নির আকার। মরণের রোগ এই পালঙ্ক অঙ্গুরী। দেখিতে দেখিতে জানি কোন সমে মরি। দাউ দাউ করে অঙ্গ জ্বলে সর্বক্ষণ। এক তিন জ্বালা সেই না হয় বারণ।

গীত তাল আদ্ধা

অনন্ত অনলে মোর প্রাণ জ্বলে যায়। হইলাম কাল বর্ণ
জ্বালায়২। প্রেম জ্বালায় কলেবর, কাঁপিছে থর থর,
শক্তি নাহি অঙ্গে আর চিন্তায়২। উথলিছে কাম সিন্ধু,
এলো না প্রাণের বন্ধু, করিবেন শান্ত কেবা যাইব কোথায়।

পয়ার। কান্দিয়া২ চাম্পা পুনরায় বলে। কি করি২ পরাণ অহরহ জ্বলে। একি কাটা বুকে আমার ফুটিল যে হায়। সর্ব অঙ্গ জর২ তাহার ব্যথায়। আহা নিদারুণ নাথ হে

www.pathagar.com

আমার। এত বাদ ছিল যদি মনেতে তোমার। প্রতিজ্ঞা করিলে কেন না ছাড়িবা বলি। কিবা দোষে পালাইয়া দুঃখিনীকে ফেলি। কোথারে প্রাণের গাজি যত্নের রতন। তোমা বিনে দেখা যায় কায়া ছাড়ি মন।

গীত তাল আদ্ধা

এলোনা২ বন্ধু আমার বন্ধু এলো না। ফুলের মধু ফুলে রৈল বন্ধু
আসি খাইল না। কমল কলি ভেসে যায়, হায় মধু কেবা বন্ধু
মরি২ একি জ্বালা প্রাণে আর সহে না। আবদুর রহিম বলে,
গাঁথিয়া তোমার গলে, দিব তারে কেন তুমি করগো ভাবনা।

পয়ার। এইরূপে খেদ চাম্পা অনেক করিয়া। আহা২ বলি ভূমে পড়িল ঢলিয়া। হেনকালে লীলাবতী কান্দিতে২। চাম্পাকে তুলিয়া রানি লইল কোলেতে। মায়ে ঝিয়ে কান্দে তারা গলাগলি করি। নয়নের জলে ভিজে দুজনার শাড়ি। তৎপরে লীলাবতী মুছিয়া নয়ন। চাম্পাকে লইয়া সতী উঠিল তখন। গোলবারে জল আনি মুখ ধোওয়াইল। কেশ ঝাড়ি বেশ করি লোটন বান্ধিল। কহিতে লাগিল পরে রানি লীলাবতী। শুন মাগো শান্ত হও স্থির কর মতি। মাতা পিতা জন্মদাতা আর কিছু নয়। বিধাতা কর্ম্মের কর্ত্তা সর্ব শাস্ত্রে কয়। বিধি যদি লিখে থাকে কপালে তোমার। তাহা কি খণ্ডাতে পারে শক্তি আছে কার। তোমার তাহার যদি থাকেগো লিখন। অবশ্যই দুই জনে হইবে মিলন। শিব আরাধ্যের ধন তুমিগো আমার। সাত পুত্র মধ্যে যিনি প্রদীপ সবার। এই সব কথা মাগো রাখ মনে মনে। জাতি নষ্ট হবে যদি আর কেহ শুনে। সাবধান কার কাছে কিছু না কহিবে। আরাধনে থাক তারে ঘরে বসে পাবে। শুনিয়া মায়ের বাণী ধনী চাম্পাবতী। নিরলে বসিয়া ধ্যান করে প্রাণপতি। ভাবিতে ভাবিতে চাম্পা হইল এমন। যে দিকে যখন চায় মেলিয়া নয়ন। দেখেন গাজির রূপ করে ঝিকিমিকি। নয়ন ভরিয়া মুখ দেখে চন্দ্রমুখী আকাশ পাতাল আর চতুর্দ্দিকেতে। গাজি বিনে কিছু আর না দেখে চক্ষেতে। ভাবিতে২ চাম্পা রূপ মনোহর। পার হৈয়া গেল চাম্পা রূপের সাগর। আপনার কায়া ছায়া সব পাসরিয়া। একেবারে চাম্পাবতী গেল গাজি হইয়া। গাজি হইয়া বিধুমুখীভাবে আপনার। কেবা ছিল চাম্পাবতী খুঁজিয়া না পায়। ডুব দিয়া চাম্পাবতী প্রেম সাগরেতে। উঠাইয়া প্রেম নিধি লইলেন হাতে। ধন্য ধন্য চাম্পাবতী যে রত্ন পাইলে। পরম যতনে রাখ বান্ধিয়া অঞ্চলে। ত্রিভুবনে শূন্য নাহি হইবে ইহার। এখানে সেখানে জয় হইবে তোমার। থাক২ চাম্পাবতী আর ভয় নাই। গাজিকে সংবাদ দিতে আমি চলে যাই। চলরে কমল চল বিলম্ব না সাজে। ত্বরায় যাইতে হবে সোনাপুর মাঝে। শুনহ পাঠকগণ শুন এক চিতে। গাজিকে রাখিয়া পরী কালুর কাছেতে। আপনার দেশে তারা গেলেন চলিয়া। মসজিদে দুই ভাই রহিল শুইয়া। কেহ নাহি জাগে দোন আছয় নিদ্রাতে। রজনী প্রভাত হইল এমন সমেতে। পাখি সব ডালে বসি ডাকে ঘন ডাক। ঘরে২ মোরগেতে দেয় আর বাগ। নামাজ পড়িতে কালু তখনি উঠিয়া। গাজিকে দিলেন ডাক তামাক সাজিয়া। উঠরে প্রাণের ভাই

www.pathagar.com

কত নিদ্রা যাও। নামাজের ওয়াক্ত যায় চক্ষু মেলি চাও। শুনিয়া কালুর ডাক জাগিয়া তখন। চারিদিকে চেয়ে দেখে মেলিয়া নয়ন। কোথা সে মন্দির কোথা রাজার কুমারী। কেবল দেখেন চক্ষে পালঙ্ক অঙ্গরী। হঠাৎ মস্তকে যেন পড়ে বজ্রাঘাত। চাম্পা২ বলি বুকে হানে দুই হাত। অধীর হইয়া বীল পড়ি ভূমিতে। ভেসে যায় সর্ব অঙ্গ চোখের জলেতে। হায়২ করি ছাড়ে এককে নিশ্বাস। বাহির হয় যেমন হুতাশ। বিরচিল দীন হীন আবদুর রহীমে। ময়মনসিংহ জেলা বিচে গলাচিপা গ্রামে।

লঘু ত্রিপদী। রজনী প্রভাতে, জাগিয়া নিদ্রাতে, চেয়ে দেখে চক্ষু মেলি। ডাকে কালু ভাই, চাম্পাবতী নাই, অমনি পড়িল ঢলি। পড়িয়া ধরাতে, লাগিল লুটিতে, জ্ঞান শক্তি নাহি রয়। কতক্ষণ পড়ে হাত দিয়া শিরে, কান্দিয়া২ কয়। আহা চাম্পাবতী, মনপ্রাণ সাথি নাহি জানি তুমি কোথা। তোমার মন্দিরে, কে নিল আমারে, কেবা পুনঃআনে এথা। কিছু জানি নাই, দুটি চক্ষু খাই, যদিস্যাৎ জানি আমি। তোমাকে ছাড়িয়া, আসিনু চলিয়া, কিবা জানি কহ তুমি। তোমার কারণ, ত্যাজিব জীবন, যদি নাহি দেখা পাই। আহা মরি২, কি করি২, প্রাণ কেমনে জুড়াই। তোমার লাগিয়া, পাগল হইয়া, ব্রাহ্মণা নগরে যাব। দেখা না পাইলে, রশি দিব গলে, আপনার প্রাণ দিব। শুন প্রাণেশ্বরী, পাসরিতে নারি, অহরহ বুক ফাটে। কেমনে পাসরি, পালঙ্ক অঙ্গুরী, দেখে অগ্নি জ্বলে ওঠে। হায়২ হায় কি করি উপায়, যায় প্রাণ চলে যায়। দেখা দিয়া মোরে, যাহ শান্ত করে, নিশ্চয় মরিব নৈলে। এতেক বলিয়া, কান্দিয়া২, ঢলে পড়ে ভূমেতে। দেখে কালু শাহা, করে আহা২, তুলিয়া লয় কোলেতে। কোলেতে লইয়া, আদর করিয়া, কালুশা দেওয়ান পুছে। কেন কান্দ ভঅই, কহ মোট ঠাঁই, কি দুঃখ মনে উঠেছে। না দেয় উত্তর, আর যে বিস্তর, উচ্চে কান্দিতে লাগিল। চরণে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, কত মতে জিজ্ঞাসিল। নাহি বলে কথা, নাহি তুলে মাথা, কান্দে বসে হেট শিরে। প্রতিবেশীগণ, আসিয়া তখন, জিজ্ঞাসিল পায় পড়ে। কিছু নাহি বলে, দেখিয়া সকলে, করে বসি হায়২। দিল বৈদ্যগণ, ঔষধ তখন, কিন্তু তাহা নাহি খায়। গ্রামবাসী যত, আসিল তাবত, মেয়ে ছেলে সাথে করি। গাজিকে দেখিয়া, কান্দিয়া২ যায় গড়াগড়ি। তিন দিন পরে, ডাকিয়া কালুরে, কহে গাজি ধীরে২। থাকিতে, নাহি লয় চিত্তে, যাই চল দেশান্তর।

ধুয়া।

সোনাপুরে শূন্য করি যায় গাজি যায়।
কান্দেন নগরবাসী কান্দে উভয়।

পয়ার। গাজিকে দেখিয়া যত নগরের লোক। কেহ না বান্ধিতে পারে আপনার বুক। তিন দিন নগরেতে নাহি চড়ে হাঁড়ি। হায়২ হায় করি সবে কান্দে বাড়ি২। ধরিয়া গাজির পদ কালু শাহা পির। জিজ্ঞাসা করেন অতি হইয়া অস্থির। বলহ মনের কথা কেন কান্দ ভাই। নাহি যদি বল তবে খোদার দোহাই। খোদার দোহাই যবে কালু শাহা দিল। কান্দিয়া২ গাজি উঠিয়া বসিল। তিন দিন বাদে শাহা নয়ন মেলিয়া। কহেন

www.pathagar.com

কালুর কাছে হাসিয়া। শুন২ ভাই কালু প্রাণের দোসর। এখানে থাকিতে আর ইচ্ছা নাহি মোর। এদেশ ছাড়িয়া আমি অন্য দেশে গিয়া। কহিব মনের কথা সকলি ভাঙিয়া। একথা শুনিয়া যত গ্রামবাসীগণ। কান্দিয়া২ তারা কহেন তখন। হায়২ শাহা গাজি কি কথা বলিলে। না হেরিলে তব মুখ মরিব সকলে। কেমনে রহিব মোরা তোমাকে পাসরি। অন্ধকার হইয়া যাবে দেশ সোনাপুরি। গাজিকে বেড়িয়া সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। যত লোক মাঠে ঘাটে আর ঘরে২। কেহ নাহি পারে তারে বান্ধিয়া রাখিতে। আসিল গাজির কাছে কান্দিতে২। নারী সব কেন্দে বলে আউলায়ে কেশ। ছাড়িবে সাহেব গাজি সোনাপুর দেশ। কেমনে বাঁচিব মোরা গাজি হারা হইয়া। এই বলিয়া কান্দে সব ধুলায় লুটিয়া। কোলের বালক কান্দে দুধ নাহি খায়। বালকের দর্দ্দ ছাড়ি কান্দে তার মায়। ঘরে বসি বধূগণ কান্দে ধরে২। হাহাকার শব্দ এই হইল সোনাপুরে। দেখিয়া সাহেব গাজি কহেন তখন। তোমরা সকলে ভাই শান্ত কর মন। রহিবে চক্ষেল কাছে শুন কহি সবে। যে সময় ধ্যান কর তখনি দেখিবে। এ বলিয়া শাহা গাজি ভেবে নিরঞ্জন। কালুকে লইয়া সাথে চলিল তখন। যাত্রাকালে পায় স্বর ডাহিন কানেতে। এস বলি ডাক আর শুনে সম্মুখেতে। বাহির হইয়া পুনঃ গিয়া কত দূর। সম্মুখে দেখিল হাতি মাহুত উপর। আর যে ফুলের ডালি মালিনি লইয়া। গাজির সম্মুখে দিয়া যায়েন চলিয়া। দধি দুগ্ধ লবে বলে ডাকে গোয়ালিনী। ভরা কুম্ভ কক্ষে আছে সধবা রমণী। বর্ণ গাভী বলে বৎস দেখে আর। জানিল কি কার্য সিদ্ধ হইবে আপনার। শুভ যাত্রা দেখে গাজি আপন চক্ষেতে। চলিলেন পথে অতি হরষিত চিত্তে। চলিয়া সমস্ত দিন ভানু অস্তকালে। রহিলেন দুই জন এক বৃক্ষ তলে। করেন খোদার স্তব কালু এক মনে। চাম্পা বলে কান্দে গাজি সজল নয়নে।

গীত তাল আদ্ধা

> কোথায় রহিলা প্রিয়া দেখা হীনে। কায়া ছাড়ি প্রাণ দেখ যায় তোমা বিনে। আগে হেন জানি নহে, ভিন্ন হব তোমা দোহে, জানিলে ত্যাজিয়া নিদ্রা রৈতাম চেতনে। আহা চক্ষু তোরে বলি, কেন তুই নিদ্রা দিলি, তোর দোষে হারাইনু সে প্রাণ রতনে।

পয়ার। এ বলিয়া কান্দে গাজি হাত দিয়া গালে। বদন ভাসিয়া যায় নয়নে জলে। হেন কালে কালু শাহা জিজ্ঞাসা করিল। কি কারণে কান্দিতেছ মোর কাছে বল। গাজি বলে ভাই কালু প্রাণের দোসর। সে কথা কহিতে মুখে নাহি স্বরে মোর। যে দুঃখ আমার মনে তুমি কি জানিবে। কহি যদি তবে আর গালি মোরে দিবে। কালু বলে কহ ভাই নাহি দিব গালি। দুটি চক্ষু খাই যদি কিছু আমি বলি। নিশ্বাস ছাড়িয়া গাজি কান্দিতে কান্দিতে। ধরিয়া কালুর হাত লাগিল কহিতে। সে রাত্রে আছিনু শুয়ে পালঙ্ক উপর। কেমনে গেলাম আমি ব্রাহ্মণা নগর। দেখিলাম কন্যা এক পরমা সুন্দরী। চাম্পাবতী নাম হয় রাজার কুমারী। সেই আর আমি একই করিলাম পণ। কেহ না ছাড়ি কারে

www.pathagar.com

থাকিতে জীবন। অঙ্গুরী পালঙ্ক আর বদল করিয়া। কন্যার পালঙ্কে আমি ছিলাম শুইয়া। কেবা পুনঃ মসজিদে আমাকে আনিল। প্রাণের দোসর চাম্পা কোথায় রহিল। এক পল নাহি আমি পাসরিতে পারি। এই দেখ হাতে মোর তাহার অঙ্গুরী। হায়২ তার দেখা পাইব কোথায়। এ বলিয়া শাহা গাজি কান্দে উভরায়। কালু বলে হও তুমি আল্লার ফকির। হিন্দু আর মুসলমানে সবে মানে পির। কেমনে এমন কথা বদনেতে বল। রাজস্ব করিতে তবে কিবা দোষ ছিল। মিছামিছি কামে কেন ফকিরী ধরিলে। কাম ক্রোধ লোভ মায়া যদি না ত্যাজিলে। গাজি বলে কি করিব অদৃষ্টের লিখন। কার শক্তি আছে তাহা করিতে খণ্ডন। কালু বলে এই সব মনের দুর্ব্বাই। কপালে এমন লেখা কভু লেখে নাই। সংসারেতে কত শত হইল পির ওলি। বিধির কলমে বুঝি নাহি ছিল কালি। তাদের কপালে দিল লিখিয়া এমন। কান্দিতে পাগল হইল নারীর কারণ। গাজি বলে দেখ গিয়া কোরআনেতে লেখা। করিছে খোদায়তালা ইউসুফ জোলায়খা। আদমের বৃত্তান্ত না শুনিয়াছি আর। ইব্রাহীম যার পুত্র কুতুব আল্লার। প্রবোধ বচন মোরে নাহি বল ভাই। আমাতে জানিবা আর আমি কভু নাই। কালু বলে সেই হিন্দু তুমি ত যবন। কেমনে তাহার সনে হইবে মিলন। গাজি বলে পারে সব খোদায় করিতে। কত বড় কাজ এই খোদার কাছেতে। কালু বলে নারী দিয়া কিবা লাভ হবে। মায়ার জঞ্জাল আর গলায় পরিবে। গাজি বলে প্রাণ চোখ মোর কাছে নাই। কাড়িয়া রেখেছে চাম্পা কেমনেতে পাই। কালু বলে পাবে মন চিন্তা দেহ ছাড়ি। গাজি বলে শান্ত আমি হইতে না পারি। কালু বলে নারী ধ্যানে খোদাকে হারাবে। গাজি বলে এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে। কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার। গাজি বলে যত মূর্ত্তী সকলি তাহার। চাম্পাকে পাইবে কবে কালু শাহা বলে। গাজি বলে দুই মন এক হইয়া গেলে। কালু বলে কি করিবা পাইলে তাহারে। গাবি বলে মিশে যাব সে রূপ সাগরে। কালু বলে চাম্পাবতী কোথায় এখন। গাজি বলে আমি মেলিয়া নয়ন। কালু বলে এই ভাবে কত দিন রবে। গাজি বলে ছাড়াছাড়ি আর না হবে। কালু বলে এই প্রেমে প্রাণ যদি যায়। গাজি বলে স্বর্গে গিয়া পাইব তাহায়। কালু বলে সংসারেতে যদি হয় বিয়া। গাজি বলে গেল তবে কার্য সিদ্ধি হইয়া। কালু বলে কিবা কহ না পারি বুঝিতে। গাজি বলে সোজা পথ নাহি ইহা হইতে। কালু বলে বিয়া করি ভাবিয়া কাহারে। গাজি বলে গাঁথা যেই আমার অন্তরে। কালু বলে তুমি খালি চাম্পা২ বল। সে নাহি তোমার লাগি পাগল হইল। গাজি বলে সে কভু অন্ন নাহি খায়। দিবানিশি মোর লাগি করে হায়২। কালু বলে ক্ষমা দেহ এই সব কথা। জপ আল্লাহর নাম দূর হবে ব্যথা। শুনিয়া সাহেব গাজি কেন্দে২ বলে। আর যদি বল পুনঃ অসি দিব গলে। কেটে যদি কেহ মোরে খণ্ড২ করে। তবু নাহি আমি কভু ছাড়িব তাহারে। যেই রূপ দেখিয়াছি চোখে আপনার। কি কহিব ভাই কালু কাছেতে তোমার। কোটি২ রবি আর কোটি শশী জিনি। দেখিতে সুন্দড়র অতি তার মুখখানি। মধুর মাখা যার মিষ্ট বচন মুখের। তাহার কাছেতে তুচ্ছ

www.pathagar.com

বোল কোকিলের। ঝলমল দুটি চোখ যেই সমে চায়। বুক ফেটে প্রাণ তার সাথে চলে যায়। ভ্রমরের বর্ণ যার লম্বা কেশ শিরে। টলিবে মুনির মন কেশ যদি হেরে। কিবা হস্ত কিবা পদ আহা মরি মরি। তাহার সদৃশ্য নাহি ত্রিজগৎ জুড়ি। তার মধ্যে পড়িয়াছে রত্ন অলঙ্কার। সে রূপের কাছে রত্ন লোহার আকার। মণি মুক্তা পড়ে থাক তার পদ তলে। কোটি রবি জিনি রূপ অঙ্গে সদা জ্বলে। হেন রূপ দেখে মন কে পারে বান্ধিতে। এ বলিয়া কান্দে গাজি পড়িয়া ধরাতে। কালু বলে শুন ভাই শান্ত কর মন। কন্যার উদ্দেশে কালি করিব গমন। কোন দিগেতে থাকে কন্যা পারিবা বলিতে। উত্তর দক্ষিণ কিবা পশ্চিম দিগেতে। গাজি বলে নাহি দজানি কহিব কেমনে। সে দেশ দক্ষিণ দিকে বুঝি অনুমানে। কহেন দেওয়ান কালু কালি যাব চৈলে। চলিল দক্ষিণ দিকে গাজিকে লইয়া। নানা দেশ নদী নালা এড়াইয়া যায়। হইল বৎসর তিন সেই স্থান পায়। তৎপরে তিন মাস চলিলেন আর। বড়২ নদী কত হইয়া গেল পার। ব্রাহ্মণা নগর তবে দেখিল চোখেতে। চারি দিকে নদী জল দুগ্ধ বর্ণ তাতে। সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে ঘাট চারি খান। রাজ বাড়ি দেখা যায় অগ্নির সমান। দালান মন্দির মঠ সকলি সোনার। ঝলমল করে সদা দেখিতে বাহার। সোনার পতাকা সব পুরি মধ্যে উড়ে। পাখিগণ ডাকে আর ভ্রমণ গুঞ্জরে। উত্তরে বান্ধা ঘাট তাহার সে কূলে। কদম্বের গাছ এক জলে আর স্থলে। হয় সে গ্রামের নাম কান্তপুর বলি। সেইখানে দুই ভাই আসিলেন চলি। দেখেন কদম্ব গাছ অতি সু-সুন্দর। ফুল পত্র পড়ে তার সলিল উপর। বসিলেন দুই ভাই কদম্বের তলে। নগরের নারীগণ আসে হেন কালে। ঝুরি হাভে আর কাঁখে সোনার কলসি। ঝলমল করে রূপ যিনি পূর্ণশশী। পড়িয়াছে সকলেতে রত্ন অলঙ্কার। মণিমুক্তা জ্বলে যেন সূর্যের আকার। কালু বলে বলিহারি সেই মতো নারী। সেপারেতে দেখা যায় যেই মতো পুরি। দেখে কালু রাজপুরীতে তাজ্জব বেপার। বলে হেন পুরি নাহি দেখিয়াছি আর। এলেমের বাগ যিনি সুন্দর দেখিতে। মনুষ্য এমন পুরি গড়িল কি মতে। পাগল হইল ভালো তনুজ আনার। কেমনে যাইব এই পুরীর মাঝার। হেন শক্তি আছে কার পুরী মধ্যে যায়। শুনিয়াছি বড় বীর দক্ষিণা সে রায়। প্রাণ ভয়ে পূজে তারে ব্রাহ্মণ সকলে। জীবিত না ছাড়ে কেহ যবন পাইলে। কালু বলে গাজি তুমি বুদ্ধির সাগর। তোমাকে বুঝাই ভাই যোগ্যতা কি মোর। রাজ ভোগে আছে চাম্পা চিন্তা নাহি তার। তোমাকে স্মরণ নাহি করে একবার। মিছামিছি কেন তুমি কর তার আশা। কোন গৃহে থাকে চাম্পা নাহি দিশা। মুসলমান নাহি পারে সে পারে যাইতে। বল দেখি তুমি তারে পাইবে কিমতে। ছাড়িয়া চাম্পার আশা চল যাই ভাই। এখানে থাকিয়া আর কিছু কাজ নাই। গাজি বলে ভাই কালু কিবা বল মোরে। ভয় কিছু নাহি আছে আমার অন্তরে। রাজপুরী কিবা যদি অগ্নি কুণ্ড হয়। তাহাতে পড়িতে মোর নাহি কিছু ভয়। শুন ভাই কালু তুমি মোর কথা শুন। আজি কালি এইখানে থাকি দুই জন। যদি কপালে মোর থেকে থাকে লেখা। অবশ্যই কন্যার সাথে ঘাটে হবে দেখা। নৈলে মোরা দুই জন এইখানে থাকিয়া।

www.pathagar.com

ছাড়িয়া চাম্পার আশা যাইব চলিয়া। কালু বলে ভাই তুমি যথার্থ বলিলে। রাজার নন্দনী যদি আসে ঘাটে কুলে। তবে ত জানি সত্য কলম খোদার। বিবাহ চেষ্টায় আমি চলিব তোমার। যদি হেথায় নাহি আসে রাজার কুমারী। তবে ত ছাড়িবা আশা কহ সত্য করি। গাজি বলে সত্য বটে কি আর কহিব। কখন চাম্পার নাম মুখে নাহি লিব। কালু বলে বাঁচিলাম জঞ্জাল হইতে। ভ্রমিয়া আল্লার সৃষ্টি দেখিব চোখেতে। একথা কহিয়া ঘাট সম্মুখে করিয়া। আল্লা ভাবি দুইজনে রহিল বসিয়া। অনন্ত খোদার লেখাকে পারে বুঝিতে। চাম্পাবতী স্বপ্নে দেখে সে দিন রাতে। শোকাকুলা রাজ বালা ছিলেন শুইয়া। আবদুর রহিম বলে গীত বিরচিয়া।

গীত তাল আদ্ধা

বিরহে২ মোর প্রাণ আর বাঁচে না২। আহারে২ নাথ দেখা দিলে না২
পঞ্চশরে জজের, করিয়াছ কলেবর,
পাপীয়ার জ্বালা আর অঙ্গে সহেনা সহে না।

ত্রিপদী। কদম্ব গাছের তলে, দুই ভাই শোপাকুলে, চাম্পার আশে আছেন বসিয়া। সেখানেতে চাম্পাবতী, কান্দে সদা দিবা রাতি গাজি২ বদনে বলিয়া। অন্ন নাহি রুচে মুখে, নিদ্রা নাহি আসে চোখে, কান্দে সদা পাগলের বেশে। গাজি বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে না পারে বালা, প্রাণ জ্বলে বিরহ হুতাশে। সেই রাত্রে চাম্পাবতী, স্মরিয়া প্রাণের পতি, কান্দে সতী লুটায় ধরণী। কেন্দে হৈয়া সারা, ভেবে সেই প্রাণ চোরা, চোখে নিদ্রা হইল অমনি। প্রভুর আদেশে হেথা, আসিয়া এক ফেরশতা, দেখাইল এমন স্বপন। ফেরেশতা শিরানে বসি, চাম্পাকে কহেন আসি, দুঃখ তব যাইবে এখন। শুন২ চাম্পাবতী তোমার ভাসুর ও পতি, সে পারেতে দুজনা আসিয়া। উত্তরের বান্ধা ঘাটে, বসিয়াছে জলের তটে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া। কালি যদি তোমা সনে, দেখা হইলে দুই জনে, তবে তারা আসিবে পুরিতে। না হলে চলিয়া যাবে, তব নাম নাহি লিবে, যাহা গাজি আপন মুখেতে। শুন চাম্পা তোরে বলি, চলিয়া যাইবে কালি, গাজি পতি যদি থাকে মন উত্তরের ঘাটে যাবে, সেইখানে গিয়া পাবে, গাজি আর কালুর দরশন। এই মতো স্বপন দেখি, চমকিয়া বিধুমুখী, ততক্ষণে উঠিল জাগিয়া। জাগিয়া হরিষ মনে, ভাবে বসি কতক্ষণে, যাবে এই রাত পোহাইয়া। নিদ্রা নাহি যায় আর, ক্ষণেক পরেতে তার, হইয়া গেল রজনী প্রভাত। পাখিগণ বৃক্ষে ডাকে, আকাশের পূর্ব দিকে দেখা আসি দিল দিননাথ।

ধুয়া।

হাসিতে হাসিতে বালা ঘাটের দিকেতে।
যায় যায় চাম্পা যায় বন্ধুকে দেখিতে।

পয়ার। রজনী প্রভাত হইল ভানুর উদয়। হেন কালে চাম্পাবতী মাকে ডেকে কয়। শুনগো জননী নিবেদন মোর। নাথের চিন্তায় তনু হইল জর২। রহিতে না পারি আর আপনার ঘরে। যাইব নদীতে আজি স্নান করিবারে। বহু দিন হইল আমি নদীতে না

www.pathagar.com

যাই। বল মাতা গিয়া সেথা এ পরাণ জুড়াই। লীলা বলে ওগো মাগো যাইবা ঘাটেতে। মানা নাহি করি বাছা যাওগো নিশ্চিতে। তবে সতী চাম্পাবতী চলিল তখন। পঞ্চ দাসী সাথে চলে মামি নয়জন। সাত ভাইয়ের বধূ চলে হাসিতে২। বালিকা সকলে চলে নাচিতে২। পাড়ার পড়শী আর যত নারীগণ। সাজিয়া চাম্পার সাথে করিল গমন। কেহত লইছে হাতে সুবর্ণের ঝারি। সুগন্ধি ফুলের তৈল তাতে ভরি ভরি। সোনার কলসি কক্ষে হেলাইয়া বুক। খঞ্জরের মতো কেহ চরণ চালায়। কেহত চলিয়া যায় হেলিয়া দুলিয়া। একেবারে পড়ে যেন আটখানা হইয়া। দৌড় দিয়া চলে কেহ কেহ ধীরে২। ঘুমটা কাহার মাথে কেহ লাঙ্গা শিরে। লোটন বান্ধিছে কেহ কার কেশ খোলা। গলাতে গাথিয়া কেহ দিছে পুষ্প মালা। চক্ষেতে কাজল কার কপালে সিন্দুর। চরণে দিয়াছে কেহ সোনার নূপুর। রত্ন অলঙ্কার জ্বলে অঙ্গেতে সবার। পড়িছে পাটেলা শাড়ি মরি কি বাহার। লিয়াছে সকলেতে মুখে দিয়া পান। ঝলমল করে রূপ অগ্নির সমান। তার মধ্যে চাম্পাবতী সেরূপ কেমন। তারাগণ মধ্যে চন্দ্র জ্বলিছে যেমন। গাজির বিচ্ছেদ বালা ভাবিয়া২। একেবারে গেছে অঙ্গ মলিন হইয়া। অঙ্গেতে মৈলে ধুলা এমনি লাগিছে। যেমন বাদলে সূর্য ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তৈল কাকৈ বিনে কেশ হৈয়া গেছে জটা। তবু ত তাহার রূপ যিনি শশী ছটা। সেরূপ হেরিলে কারে প্রাণ নাহি রবে। পশ্চাতে তার কেন্দে কেন্দে যাবে। রূপেতে করিয়া আলো রাজার নন্দিনী। পতিকে দেখিতে যায় লইয়া সঙ্গিনী। আগে চলে চাম্পাবতী দাসীরা বামেতে। ডাহিনেতে ভাজুগণ মামীরা পশ্চাতে। ঘাটের কুলেতে চাম্পা দাঁড়াইল আসি। ঝলমল করে রূপ যেন কোটি শশী। সেপারে বসিয়া গাজি কদম্ব তলায়। হাতেতে ইশারা করি কালুকে দেখায়। হেরে দেখ ভাই কালু ভাই সেপারেতে। আইল রাজার কন্যা বুঝি ভাবেতে। শুনিয়া তখনি কালু ওঠে লম্ফ দিয়া। উঠিয়া সেপার দিকে দেখে তাকাইয়া। দাঁড়াইছে ঘাট কুলে চাম্পা বিধুমুখী। দেখিয়া দেওয়ান কালু করে সূর্য সাক্ষী। তৎপরে কহে কালু গাজির কাছেতে। পরীক্ষা ফলিল ভাই থাকহ নিশ্চিতে। হেন কালে রাজকন্যা সখীগণে বলে। থাক২ দূরে থাক তোমরা সকলে।

গীত তাল আদ্ধা

শুনগো তোমরা শুন ওগো সখী। থাক২ দূরে থাক হৈয়া হেট মুখী

ধুয়া।

দেখিগো দেখিগো আমি একবার দেখি
সে কূলে কদম্ব তলে মনচোরা নাকি
সখীগো সখীগো সখী ওগো ওগো সখী।
দেখিগো বন্ধুরে আমি দেখি২ দেখি।

পয়ার। এ বলিয়া রাজ বালা ঘাটে দাঁড়াইয়া। সে পারে করিল দৃষ্টি নয়ন মেলিয়া। বসিলেন দুই ভাই কদম্ব তলে। সেই পারে চাহিতেই প্রাণ গেল চলে। কাঁপিয়া২ বালা

www.pathagar.com

জ্ঞান শূন্য হইয়া। অমনি মৃতিকা মধ্যে পড়িল ঢলিয়া। সঙ্গের সঙ্গীগণ আসিয়া তখন। মাথে মুখে জল দিয়া করিল চেতন। কোলেতে লইয়া পরে মামীরা সকলে। অঞ্চলে মুছিয়া মুখ খেদ করি বলে। হাসিয়া২ কহে করিয়া কৌতুক। কি কারণে কান্দ মাগো ফেটে যায় বুক। চাম্পা বলে শুন মামি না কান্দিব আর। গঙ্গাকে করিব আমি গিয়া নমস্কার। তোমরা তফাতে থাক কাছে না আসিবে। কাছেতে আসিলে গঙ্গা দেখা নাহি দিবে। এতক শুনিয়া সবে দূরেতে বসিল। চাম্পাবতী গিয়া পরে জলেতে নামিল। জলেতে নামিয়া সতী গলে বস্ত্র দিয়া। পতিরে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হৈয়া। প্রণাম উত্তর গাজি দিল এই মতে। থাকরে প্রাণের প্রাণ থাক কুশলেতে। চাহিয়া গাজির দিকে চাম্পা বিধুমুখী। ধীরে২ কান্দে নীরে টলমল আঁখি। কান্দিয়া বলে শিরে হানি হাত। পাখা যদি দিত বিধি আমার ডানাতে। উড়িয়া গিয়া পড়িতাম নাথের চরণে। কহিতাম যত দুঃখ আছে মোর মনে। না থাকে জলেতে কন্যা উপরে ওঠে। গাজির দিকেতে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে। দুইটি চোখের জলে বুক ভেসে যায়। আর কোন দিকে নাহি বদন ফিরায়। এক মামি ডাক দিয়া কহে চাম্পাবতী। মার্জন করিয়া বাছা চল শীঘ্র গতি। সেপারের দিকে তুমি কেন বা তাকাও। শীঘ্র২ স্নান কর মোর মাথা খাও। হাসি খুশি করে কত ঘাটেতে আসিল। হঠাৎ এমন তুমি কেনবা হইলে। চাম্পা বলে পারি মামি কহিতে এখন। কার কাছে না কহিবা কর যদি পণ। শুনিয়া বলেন তবে যতেক ব্রাহ্মণী। কহ কহ শুনি ওগো রাজার নন্দিনী। কার কাছে কহি যদি শিবের দোহাই। আর মোরা আপনার শির চোখ খাই। মামি সবে চাম্পাবতী কহে এই কথা। কথা যদি লড়ে তবে মামা তোর পিতা। তৎপরে চাম্পাবতী কান্দিয়া কান্দিয়া। কহেন মনের কথা সকলি ভাঙিয়া। যেরূপ গাজির সাথ হইল মিলন। কোন দেশে ঘর আর কাহার নন্দন। একে একে আদি অন্ত সকলি কহিয়া। দেখাইল সেই পারে হাত উঠাইয়া। ঐ দেখ বসিয়াছে মোর মনচোর। বসিয়াছেন দেখ আর আমার ভাসুর। যাহার কারণে আমি দিবানিশি ঝুরি। এই চোর মন মোর করে নিছে চুরি। আহা২ মরি২ বুক ফেটে যায়। মনে লয় উড়ে গিয়া পড়ি তার পায়। শুনিয়া চাম্পার বাণী যত ব্রাহ্মণী। গাজিকে দেখিতে ওঠে করে কানাকানি। দাঁড়াইয়া দেখ সবে কদম্বের তলে। লক্ষ কোটি শশী যিনি ঝলমল জ্বলে। দেখিয়া গাজির রূপ করে হায়২। মুর্চ্ছিত হইয়া কেহ পড়িল ধরায়। কেহ বলে কিবা রূপ আহা মরি২। যেমন সুন্দর গাজি কেমন সুন্দরী। এক তনু দুই ভাগ বিধাতা গড়িছে। চাম্পার কপাল ভালো যে বরে পাইছে। কেহ বলে ধন্য২ তারা দুই ভাই। এমন সুন্দর আর সংসারেতে নাই। বন্ধুগণ তারা যেন সকলি চঞ্চল। ননদ জামাতা দেখে হইল পাগল। সকলে গাজির সাথে উপহাস করে। কেহ যে দেখায় হাত কেহ আঁখি ঠারে। জলেতে নামিয়া কেহ জল লয়ে হাতে। ছিটাইয়া দেয় কেহ গাজির দিকেতে। জিহ্বাতে কামড় দিল মামীরা দেখিয়া। পিছ দিয়া দাঁড়াইল ঘুমটা টানিয়া। হেন কালে কালু শাহা গাজির কাছে কয়। এই নয় মাগি ভাই কেবা জানি হয়। দিয়াছে

www.pathagar.com

পিছ্ দেখ আমাদের দিগে। নারীদের পিছ্ দেখা ভালো নাহি লাগে। সম্পর্ক কেহ্বা হবে শাশুড়ি তোমার। শুনরে প্রাণের ভাই ভয় নাহি আর। আমার মনের সন্ধ ঘুচিল এখন। এ কন্যা তোমার জুড়ি নিশ্চয় লিখন। দেখিলাম আছে কন্যা তোমার ভাবেতে। আর কিছু চিন্তা নাই থাকহ নিশ্চিতে। এ বলিয়া রহে বসি ভাই দুই জন। হেন কালে রাজকন্যা লয়ে বন্ধুগণ। স্নান করিবার জলে নামিল আসিয়া। জলে নামি গাজি দিকে চাহিয়া২। হাত মাজে পদ মাজে মাজে আর মুখ। গাজিকে দেখায়ে মাজে কুচ আর বুক। কবরী খুলিয়া কেশ দিল আওলাইয়া। কাল মেঘ কুচ যেন ফেলিল ঢাকিয়া। কালি হইতে কাল কেশ উড়ায় বাতাসে। গাজির দিকে চায় বালা হাত দিয়া কেশে। লোটন বান্ধিতে কেশ যখন ঝাড়িল। শিলা বৃষ্টি গগনেতে যেমন গর্জিল। পরে সতী চাম্পাবতী নামে কণ্ঠ জলে। কোটি রবি যিনি অঙ্গ জল মধ্যে জ্বলে। উপরেতে মুখ খান শোভিত যেমন শরৎ শশী লক্ষ কোটি যিনি। মার্জ্জন করিয়া কত সঙ্গী নারীগণ। উপরে উঠিয়া তারা পড়েন বসন। তবুত বহেন চাম্পা নামিয়া জলেতে। হেন কালে বলে গাজি হাত ইশরাতে যাওরে প্রাণের প্রাণ গৃহে যাও তুমি। মিলন হইবে শীঘ্র শীঘ্র আসিতেছি আমি। বসন বান্ধিয়া গলে তবে চাম্পাবতী। পতিকে প্রণাম করি চলিলেন সতী। যায় আর পিছে দিকে ফিরে ফিরে চায়। নয়নের জলে দুটি গাল ভেসে যায়। চাম্পাকে লইয়া সবে চলে শীঘ্র গতি। চতুর্দ্দিকে সখীগণ মধ্যে চাম্পাবতী। ত্বরায় আসিলেন সবে আপনার ঘরে। চাম্পাবতী চলে গেল চণ্ডির মন্দিরে। ভিজা পরিধান বস্ত্রে ঝাড় তাতে দিল। পূজার সামগ্রী সব দাসীরা আনিল। আতশ তণ্ডুল ধুপ ঘৃত চিনি। চন্দন সিন্দুর যত দিল সব আনি। তৎপরে ভিজা বস্ত্রী চাম্পা ত্যাগ করি। কারচুবি মাণিক্যের পরিলেন শাড়ি। পরিয়া মাণিক্যের শাড়ি পূজাতে বসিল। শুদ্ধ কায়ে শুদ্ধ চিত্তে পূজিতে বসিল। প্রথমে পূজিল কন্যা প্রভু নিরাকার। এ তিন ভুবন হয় সৃজন যাহার। পশ্চাতে গাজির পদ করিয়া বন্দন। ভক্তি ভরে ভবানীকে করেন স্মরণ। সদয় হইয়া দেবী তাহার উপর। বর দিতে চলে চণ্ডিরথে করি ভর। আসিয়া চাম্পার কাছে ঘরের ঘরণী। মিষ্টস্বরে কহে শুন রাজার নন্দিনী। কি জন্যে আমাকে তুমি করিয়া স্মরণ। চাম্পা বলে ডাকিয়াছি পতির কারণ। করুণা করিয়া মাগো দেহ তুমি বর। মনের মানস যাহা পূর্ণ কর মোর। চণ্ডিবলে শুন বাছা শান্ত কর মন। বিধাতে লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন। পাইবে সুন্দর পতি জাতে যে যবন। হয় বটে সেই মোর ভগ্নির নন্দন। জানিবা তাহার নাম গাজি জিন্দা পির। রাজস্ব ছাড়িয়া ফিরে হইয়া ফকির। তাহার পিতার নাম শাহা সেকান্দর। সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে বৈরাট নগর। বলি রাজার সে কন্যা অজুপা সুন্দরী। আমার ভগিনী সেই তোমার শাশুড়ি। গাজি মোর ভীগ্ন পুত্র আমি তার মাসী। কার্ত্তীক গণেশ হৈতে তারে ভালবাসি। শুন শুন চাম্পাবতী বর দিনু আমি। আমার ভগ্নি পুত্র হোক তোমার স্বামী। এ বলিয়া ভগবতী চলিল সত্বর কৈলাসে চলিয়া যায় রথে করি ভর। তখনি দেখিল চক্ষে কদম্ব তলায় বসিয়াছে শাহা গাজি কালু নিদ্রা ভর। হেন কালে

www.pathagar.com

বিশ যায় রথ নামাইয়া। গেলেন গাজির কাছে হাসিয়া২। চণ্ডিকে দেখিয়া গাজি সম্ভাষণ করিল। আশীর্বাদ করে চণ্ডিকহিতে লাগিল। তোমার শাশুড়ি বাড়ি গিয়াছিনু আমি। উপহাস করি বলে শুন বাছা গাজি। মাতুল শাশুড়িগণ সকলি তোমার। পুরুষ পাইলে ধরে জোকের আকার। মনে২ চিন্তা অতি করিতেছি আমি। যেমন সকল গোপী এক কৃষ্ণ তুমি। টানাটানি করি বাছা তোমাকে মারিবে। কামিনীর দেশে গিয়া প্রাণ হারাইবে। লীলাবতী হবে বাপ তোমার শাশুড়ি। সাত পুত্র হইছে তবু যেমন কুমারী। আলস্য করেন বুঝি শ্বশুর তোমার। নহিলে কতে পুত্র হইত যে আর। উপহাস করি চণ্ডি এই মতো কয়। লজ্জায় সাহেব গাজি হেট শিরে রয়। মমতা করিয়া দেবী কহিলেন পর। কি কারণে চিন্তা কর ভয় কিরে তোর। কখন বিধির লেখা বৃথা যাবে নাই। চাম্পাকে পাইতে তুমি আমি কয়ে যাই। আমিও সহায় আছি কারে কর ভয়। হারিবে মুকুট রাজা তোর হবে জয়। কালুকে পাঠাও কালি ব্রাহ্মণা নগর। এতক বলিয়া দেবী চলিল সত্ত্বর। রহিলেন দুই ভাই বৃকেষর তলাতে। পর দিন শাহা গাজি উঠিয়া প্রভাতে। বিনয় বচনে কহে কালুর গোচর। শুন২ ভাই কালু প্রাণের দোসর। চাম্পা বিনে প্রাণ মোর ছটফট করে। এই বেলা যাহ তুমি ব্রাহ্মণা নগরে। কহিবা রাজার কাছে সকল বৃত্তান্ত। কি আর কহিব তুমি জান আদি অন্ত। কালু বলে যাব আমি রাজার বাটীতে। এক কথা ভাই কহি তোমার সাক্ষাতে। বিপদ পড়িলে কোন উপরে আমার। কেমনে সংবাদ তুমি পাইবে আমার। গাজি বলে ভাই কালু শুন মন দিয়া। সাহেব আল্লার নাম মুখেতে লইয়া। মনে২ ডাক মোরে দিও তিনবার। শিবের পাগড়ি তবে খসিবে আমার। দুঃখেতে পড়েছ তুমি অন্তরে জানিব। তোমার উদ্দেশ্যে আমি তখনি চলিব। শুনিয়া দেওয়ান কালু বিছমিল্লা বলি। ব্রাহ্মণা নগরে যায় ততক্ষণ চলি। খেওয়া ঘাটে গিয়া কালু পৌছিল ত্বরায়। ছিরা ডোরা দুই ভাই পাটনি তথায়। কহিতে লাগিল কালু পাটনির তরে। নদী পার করে দেহ যাইব সেপারে। ছিরা বলে হেন বুদ্ধি কে তোমাকে দিছে। মরণের বাঞ্ছা বুঝি মন মধ্যে আচে। মরণের সাধ যদি থাকেত মনেতে। কলসি বান্ধিয়া গলে পড়হ জলেতে। তবু না যাইত তুমি ব্রাহ্মণা নগরে। শূদ্রের ক্ষমতা নাহি যাইতে সেপারে। দৈব যোগে শূদ্র কেহ সেপারে গেলে। মার২ বলি তারে দৌড়ায় সকলে। দেও এক আছ নাম দক্ষিণা সে রায়। যবন পাইলে কাচা চিবাইয়া খায়। সেপারের আশা ছাড়িয়া বহাড়িয়া যাও। আর২ দেশে গিয়া ভিক্ষা মাগি খাও। কালু বলে বলে যাব আমি করে দেহ পার। কপালেতে যাহা থাকে হইবে আমার। ছিরা বলে যদি তুমি পার হইতে চাহ। ঘাটের মাশুল কড়ি আগে মোরে দেহ। সোনার একশ বুড়ি দেহ যদি কড়ি।

তবে আমি নদী পার করি এই কড়ি। শুনিয়া তখনি কালু নৌকায় উঠিয়া। ঝুলিতে দিলেন হাত আল্লাকে স্মরিয়া। কেরামতে দিল কালু কড়ি যে সোনার। তবেত পাটনি নদী করে দিল পার। সেপারেতে গিয়া কালু কোমর কাচিয়া। রাজার বাটীর দিকে চলিল ধাইয়া। অবিলম্বে উপস্থিত হইল পুরিতে। একেবারে চলে গেল রাজার কাছেতে।

www.pathagar.com

বসিয়াছে মুকুট রাজা রত্ন সিংহাসনে । পাত্র মিত্রগণ লয়ে আনন্দিত মনে । সাত পুত্র নয় শালা বসিয়াছেন আর । সোনালি চান্দুয়া উড়ে উপরে সবার । নানা ইতি আলাপ সবে বসি করে । ভারত পুরাণ কেহ পড়ে মিষ্ট স্বরে । নাটুয়া করিছে নৃত্য বিদ্যা ধরি যিনি । মিলাইয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী । করিতেছে গান তার হেন তালে মানে । তানসেন বৈজুবাওরা হারিয়ে সেখানে । হেন কালে কালু শাহা দসভাতে যাইয়া । রাজার সম্মুখে খাড়া ইল্লাল্লাহ বলিয়া । দেখিয়া মুকুট রাজা ক্রোধেতে জ্বলিল । কোথারে কোতওয়াল বলি ডাকিতে লাগিল । শুনিয়া কোতওয়ালগণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া কি আজ্ঞা মহারাজ জিজ্ঞাসে আসিয়া । রাজা বলে হেরে দেখ যবন ফকির । ঠেলা দিয়া দেহ একে করিয়া বাহির । যবনের মুখ আমি দেখিনু চোখেতে । তিন দিন উপবাস হইল থাকিতে । শীঘ্র করি যবনের দেহ খোদারিয়া । দক্ষিণা রায়ের নৈলে কহ ডাক দিয়া । শুনিয়া কালুকে তারা ধরিল তখন । কালু বলে মহারাজ এক নিবেদন । রাজা বলে রাখ দেখি কি বলে বেটায় । তবেত কোতওয়ালগণ ছাড়িল তাহায় । কালু বলে শুন রাজা নিবেদন মোর । বৈরাট নগরে ঘর শাহা সেকান্দার । তাহার সমান রাজা নাহি সংসারেতে । মেদিনী কাঁপিয়া ওঠে যাহার ভয়েতে । তার সাথে বলি রাজা সমরে হারিয়া যাচিয়া আপন কন্যা দিয়াছিল বিয়া । মহা পুণ্যাবান রাজা শাহ সেকান্দর । সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে বৈরাট নগর । তাহার তনয় শাহ গাজি জিন্দা পির । রাজ্য পাট তেজ্য করি হইয়াছে ফকির । কেরামত দেখে তার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ । হইয়াছে মুসলমান ছাড়িয়া লগুন । ছাপাই নগরে রাজা শ্রীরাম নামেতে । পড়িল কালেমা সেই গাজির কাছেতে । কেরামতে সোনাপুরে নগর বসাইয়া । মসজিদে দুই ভাই ছিলাম শুইয়া । চাম্পাবতী নামে নাকি তোমার নন্দনী । গাজিকে করিয়া যাদু আনিয়া সে ধনী । পালঙ্ক অঙ্গুরী তার রাখিয়াছ কাড়ি । হরিয়া চাম্পা কাছেতে পালঙ্ক অঙ্গরী । স্নান করিবার ছলে চাম্পাবতী গিয়া । আসিছে গাজির সাথে সাক্ষাৎ করিয়া । আর যে তোমার পূজা খাইয়া ভবানী । সাহেব গাজিরে বর দিয়া গেছে তিনি । কল্য যে গাজির কাছে চণ্ডিগেছে কৈয়া । প্রাপ্ত হও চাম্পাবতী যাই বর দিয়া । অন্ন জল শাহা গাজি কিছু না খায় । চাম্পাবতী কারণে সদা করে হায় হায় । দিবা কিনা দিবা বিয়া কহ এক কথা । শুনিয়া লজ্জায় রাজা নাহি তুলে মাথা । এই সব কথা বলিলেন যবে । ঠারাঠারি করি বলে পাত্র মিত্র সবে । যে কথা ফকির কহে কিছু নহে মিছে । এর লাগি রাজ কন্যা পাগল হইছে । কালুর বচনে রাজা ক্রোধ হৈলো । ডাকিয়া কোতওয়াল সবে কহিতে লাগিল । ঠেলা দিয়া ফকিরের নিয়া কারাগারে । হস্তে আর পদে বান্ধি লোহার জিঞ্জিরে । দশ মণি শিলা দেহ বুকের উপর । ইহার কথা অঙ্গ জ্বলে গেল মোর । শুনিয়া কালুরে তারা তখনি ধরিয়া । কারাগারে গিয়া যায় ধাক্কা ঠেলা দিয়া । কালু বলে ধাক্কা কেন মোরে দাও ভাই । আমি নাহি আমি নাহি রাজার জামাই । ঘটক হইয়া কিবা দোষ হইল মোর । যে চায় করিতে বিয়া তারে গিয়া ধর । না শুনে কোতওয়ালগণ ধরিয়া কালুরে । রাজার আজ্ঞায় লয়ে গেল কারাগারে । বিষম লোহার

www.pathagar.com

ঘর ছেদ নাহি তাতে এক হাত দ্বার খুলি দক্ষিণ দিকেতে। দিবসেতে দেখা যায় হেন অন্ধকার। অমাবশ্যা রাত্রি নহে সমান তাহার। সাহেব আল্লার নাম লইয়া মুখেতে। গাজিকে ডাকিয়া কালু লাগিল কান্দিতে। এখানে মুকুট রাজা ক্রোধ হইয়া অতি। অন্তঃপুরে গেল যথা থাকে চাম্পাবতী। গাজির পালঙ্ক গিয়া দেখিল মন্দিরে। কুড়াল মারিয়া তাহা খণ্ড২ করে। পালঙ্ক ভাঙিয়া রাজা ক্রোধিত হইয়া। কন্যাকে মারিতে যায় খাড়া হাতে লৈয়া। দেখিয়া তরাসে চাম্পা উঠে দৌড় দিল। সাত ভাই বধূ তারা যেইখানে ছিল। তাহাদের কাপড়ের অঞ্চল ধরিয়া। অঞ্চলের আড়ে চাম্পা রহে লুকাইয়া। তবেত মুকুট রাজা ক্রোধ ক্ষমা দিয়া। রাজ্য পাটে এসে গিয়া নিঃশব্দ হইয়া। আবদুর রহিম বলে ত্রিপদী রচিয়া। কালুর বৃত্তান্ত সবে শুন মন দিয়া।

ধুয়া।
ত্রাণ কর ত্রাণ কর ত্রাণ কর মোরে।
সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু ডাকিগো তোমারে।

ত্রিপদী। বন্দি হইয়া কারাগারে, কান্দে কালু উচ্চস্বরে, ডাকে আর গাজি২ বলি। কোথা রৈল গাজি ভাই দেখা হইল নাই, যায়২ প্রাণ মোর চলি। এমন নিদান কালে, ভাই তুমি কোথায় রৈলে, তত্ত্ব আসি না করিলা তুমি। মনে রৈল এই শোক, মৃত্যু কালে তব মুখ, চোখে নাহি দেখিলাম আমি। কান্দে কালু শোকাকুলে, গাত্র ভাসে নেত্র জলে, শাহা গাজি জানিল ধ্যানেতে। শিরের পাগড়ি আর, খসিয়া পড়িবে তার, কহে গাজি কান্দিতে২। হায়২ কালু ভাই, আমরা বুদ্ধিতে ছাই, পাঠাইনু কেনবা তোমারে। আগে যদি জানি আমি, সঙ্কটে পড়িবে তুমি, গিয়া ভাই ব্রাহ্মণা নগরে। তবে কি পাঠাই তোরে, মোর লাগিয়া ভাইরে, বুঝি তুই প্রাণ হারাইলি। আছে কি না আছে ভাই, তাহার সংবাদ নাই, কান্দে গাজি ভাই২ বলি। কান্দিয়া কান্দিয়া পরে, চলিয়া বাতাস ভরে, গেল সুন্দরবনেতে। সুন্দরবনেতে গিয়া, বৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়া, বাঘ সবে লাগিল কহিতে। শুনিয়া গাজির ডাক, বাঘ সবে ঝাকে ঝাক, এসে তারা সালাম করিল। সালাম করিয়া পরে, জিজ্ঞাসিল জোর করে, কালু শাহা কোথায় রহিল। চোখে কেন দেখি নীর, কি হইল কহ পির, কহে গাজি কান্দিয়া২। যেইরূপে গেলেন তথা, আদি অন্ত যত কথা, শুনাইল সকলি ভাঙিয়া। বাঘ সবে বলে পির, মন তুমি কর স্থির, চিন্তা কিবা আমরা থাকিতে। এই বেলা মোরা যাব, আর নাহি পানি খাব, চল২ বলে সকলেতে।

ধুয়া।
সাজিল সাজিল ও বাঘা সাজিল।
তর্জ্জনে গর্জ্জনে মেদিনী কাঁপিল।

পয়ার। বাঘ বলে শুন পির শান্ত কর মন। এত২ দাস মোরা কিসের কারণ। এই বেলা যাই মোরা ব্রাহ্মণা নগরে। দেখিব মুকুট রাজা কত শক্তি ধরে। বংশ পুরি সব তার বিনাশ কলিয়া। চাম্পাকে তোমার কাছে দিব আনি বিয়া। এ বলিয়া বাঘ সব সাজিতে

www.pathagar.com

লাগিল। খান্দেওয়ারা বাঘ সে প্রথমে সাজিল। সেই বাঘ হয় সব বাঘের প্রধান। রাক্ষস ধরিয়া খায় ভাঙিয়া গরদান। সাজে বাঘ বেড়া ভাঙা বৃহৎ ভীষণ। মারিয়া অসুর সিংহ করেন ভক্ষণ। সাজে বাঘ দানেওয়ারা চলে লম্ফ দিয়া। আকাশের সূর্য চায় খাইতে ধরিয়া। সাজে বাঘ ভৃঙ্গরাজ পর্ব্বত আকার। পাতালে বাসুকি কাঁপে গর্জ্জনে তাহার। সাজে বাঘ কালকুট ধাব২ চলে। হাতি লয়ে দৌড় দেয় দন্তে ধরি গলে। সাজে বাঘ ছিলা চক্ষু ঘোড়াইয়া চায়। মনুষ্য ধরিয়া সেহ ঘাড় ভেঙে খায়।

সাজিল কেন্দুয়া বাঘ লেজ তার খাড়া। দিবসে ধরিয়া খায় ছাগ আর ভেড়া। সাজে আর মেচি বাঘ চায় আড়ে আড়ে। কুকুর দেখিলে তার ঘাড়ে গিয়া ধরে। সাজে বাঘ লোহাজুরি ধীরে ধীরে চলে। পাইলে গরুর গন্ধ প্রবেশে গোশালে। পেচা মুখা ঘাড় বেকা সাজে বাঘ খেরি। এখড়া মেখড়া আর সাজে নাগেশ্বরী। সাজিল যতেক বাঘ নাম কব কত। সমুদয় নয় হাজার আর শত শত। সাজিয়া চলিল সবে ব্রাহ্মণা নগরে। পিছে২ শাহা গাজি আশা লয়ে করে। শহর বাজার কত যায় ছাড়াইয়া। দেখিয়া বলেন লোকে ত্রাসিত হইয়া। ফকির বেটায় এই বড় যাদু জানে। এ জন্যে বলেন বাঘ এর পোষ মানে। এই কথা লোক সবে যখন কহিল। শুনিয়া সাহেব গাজি লজ্জিত হইল। লজ্জিত হইয়া হবে গাজি জিন্দাপির। বিছমিল্লা বলিয়া ফুক দিল বাঘ পরে। বাঘের উপরে ফুক যেই সমে দিল। যত বাঘ ছিল সব ভেড়া হইয়া গেল। বাঘ সবে বানাইয়া ভেড়া আর ভেড়ী। সুবর্ণের আশা দিয়া চলেন খেদারিয়া। গ্রামের লোক সবে আসিয়া২। কহেন গাজির কাছে মিনতি করিয়া। ভেড়া ভেড়ী যদি ভাই বিক্রী করে যাহ। এখনি আনিয়া দেই যত মূল্য চাহ। আর যদ নাহি বেচ বড় ভেড়া ধিয়া। পথের খরচ কিছু যাহ না লইয়া। গাজি বলে শক্তি নাহি বেচিতে আমার। এই সব ভেড়া ভেড়ী মুকুট রাজার। এ বলিয়া লোক সব যায় ভাড়াইয়া। কত দিন কান্তপুরে গেলেন চলিয়া। সে পারে চাহিয়া দেখে ব্রাহ্মণা নগর। খেওয়া ঘাটে যায় গাজি চলিয়া সত্বর। ছিরা ডোরা দুই ভাই পাটনি আছিল। ভেড়া ভেড়ী দেখে তারা কহিতে লাগিল। ছিরা বলে চোখ মেলি দেখ ভাই ডোরা। ফকির বেটায় আনে কতগুলি ভেড়া। ভেড়ার পাড়ায় নৌকা খণ্ড২ হবে। হারাইব নৌকা খান কড়ির যে লোভে। সেই পারে চল মোরা যাই নৌকা লইয়া। তবেত ফকির বেটায় যাইবে ফিরিয়া। এ বলিয়া নৌকা তারা বায় ধীরে২। রাখ২ বলি গাজি ডাকে উচ্চস্বরে। শুনিয়া গাজির ডাক লাগাইল তরী। তখনি আসিল গাজি লয়ে ভেড়া ভেড়ী। গাজিকে দেখিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল। কোথা হইতে আসিয়াছ যাবে কোথা বল। গাজি বলে ভাই ছিরা শুন সমাচার। ব্রাহ্মণা নগরে যার করে দেহ পার। ছিরা বলে মরণের সাধ বুঝি আছে। একটি ফকির বন্দি আছে কি মরিছে। সাধেতে যমের বাড়ি যাহ খুঁজিবারে। এখনি দক্ষিণা রায় খাইবেন ধরে। গাজি বলে শুন ছিরা তোমাকে জানাই। যেই ফকির বন্দি হয় সেই মোর ভাই। মোরা দুই জনে টাকা মহারাজ দিল। গত সনে ভেড়া ভেড়ী দিতে কথা ছিল। বিলম্ব দেখিয়া রাজা

www.pathagar.com

ভাইকে আমার। কারাগরে দিয়া রাখে কারণ ইহার। শুন ভাই ছিরা ডোরা মোর কথা লও। বেলা গেল শীঘ্র শীঘ্র পার করে দেও। ছিরা বলে দেও আগে সুবর্ণের কড়ি। এক কড়া কম নহে এক বিংশ বুড়ি। গাজি বলে কড়ি আজি মোর কাছে নাই। বিক্রয় করিয়া শেষে কল্য দিব ভাই। ছিরা বলে বেটা তোর কথা বড় ভালা। পার যদি হবে মোর শীঘ্র কড়ি ফালা। গাজি বলে ভাই ছিরা কিছু নাই হাতে। সুবর্ণের আশা রাখ কড়ি পরিবর্ত্তে। শুনিয়া বলিল ছিরা হয়ে অতি রাগ। এই মতো আছে কত চইরের আগ। ঠগের গোসাঁই তুমি কাজে গেলে জানা। হরিদারার রং লাঠি বল কাঁচা সোনা। গাজি বলে শুন চিরা মোর কথা লেহ। গলার খিলক দেই প'র করি দেহ। এয় শুনিয়া বলে ছিরা মুখ করি কালা। এই মতো আছে কত ছিরা ়রা ছালা। গাজি বলে কেন মুখ করিয়াছ ভার। সোনার জিঞ্জির রাখি করি দেহ পার। ছিরা বলে না খাটিবে ঠগামি এখানে। পিতল জিঞ্জির এই কেবা নাহি চিনে। গাজি বলে কেন ভাই করিতেছ গৌণ। সুবর্ণের তার দেই করহ তারণ। ছিরা বলে আমি নাহি অজ্ঞান কেবল। হরি তালের রং এই করে ঝলমল। বার বার বল কেন ঠগামির কথা। এই মতো তার নিয়া ছিলাইছি খেতা। হাসিয়া বলে গাজি কিবা দিব আর। পরনের ইজার রাখি করে দেহ পার। ছিরা বলে ভাই ডোরা কি কহে বেটায়। হাগা মুতা বন্ধ করি মারিবারে চায়। ইজার পিন্দিলে পেট ফুলিয়া মরিব। বনিতার কাছে আর যাইতে নারিব। গাজি বলে ভাই ছিরা দেহ পার করি। কারচুবি মাণিক্যের লাখিয়া পাগড়ি। ছিরা বলে ছোট বধি খেওয়া দিয়া খাই। এই মতো শট আর কভু দেখি নাই। কড়ার ফকির হইয়া কি কহে এখন। বাপে না দেখিছে ভার মাণিক্য কেমন। দুর্গাপূজা করিয়া কে বর্জ্জন করিছে। বাদলার বস্ত্র সেই হরিয়া আনিছে। ইহাকেই বলে শঠ মাণিক্য বসন। স্বপ্নে নাহি দেখিয়াছি মাণিক্য কেমন। গাজি বলে শুন ছিরা মোর কথা লেও। দুই গোট ভেড়া রাখি পার করিয়া দেও। ছিরা বলে কি কহিব কহ ভাই ডোরা। ডোরা বলে দিয়া যদি যায় দুই ভেড়া। বৎসর অন্তর শ্রাদ্ধ আসিল পিতার। জ্ঞাতি সেবা করাইতে লেঠা নাহি আর। গাজি বলে যাহ শীঘ্র চলিয়া পাতালে। দুই মেষ রাখ গিয়া বান্ধিয়া গলেতে। আরা সব ভেড়া ভেড়ী দেহ পার করি। শুনিয়া তখনি তারা লাগাইল তরী। হাতে রশি কান্দে বৈঠা দুই জনে লৈয়া। মেষের পালের মধ্যে সান্ধাইল গিয়া। যত মেষ ছিল পালে আনিয়া সকল। খাইতে ভেড়ার মাংস মুখে ওঠে জল। খান্দেওয়ারা ভেড়াভাঙা প্রধান আছিল। দুই ভাই দু-বাঘের গলায় ধরিয়া। বট বৃক্ষ ছিল এক ঘাটের কুলেতে। বান্ধিয়া রাখিল মেষ গাছের ডালাতে। পশ্চাতে করিল পার সাহেব গাজিরে। ভেড়াভেড়ী যত সব দদিল পার করে। হরষিতে জিন্দা গাজি হরষিতে চলে। ব্রাহ্মণা নগর মধ্যে গিয়া রাত্রি কালে। উত্তরে বান্ধা ঘাটে লয়ে বাঘগণে। বসিলেন শাহা গাজি ভেতে নিরাঞ্জনে। আর কিছু সমাচার শথুন মন দিয়া। উপস্থিত পরীগণ কিরূপে আসিয়া। যে দিন কালুকে রাজা কারাগারে দিল। ব্রাহ্মণা নগরে এক পরী এসে ছিল। কালুর বিপদ সেই চক্ষেতে দেখিয়া। শাহা পরী

সান্নিধানে কহিলেন গিয়া। কালুর সংবাদ কানে যখন শুনিল। আফসোস করিয়া পরী অনেক কান্দিল। তৎপরে তিন শত পরী লয়ে সাথে। ব্রাহ্মণা নগর। বাঘ লয়ে শাহা গাজি ছিল সেই ঘাটে। পরীগণ গিয়া সব তাহার নিকটে। সালাম করিয়া খাড়া রহে জোর হাতে। আশীর্বাদ করি গাজি বসায় কাছেতে। নিশান পালঙ্ক সেই পরী সব দিল। হরষিতে জিন্দা গাজি পালঙ্কে বসিল। বসিল সাহেব গাজি পালঙ্ক উপরে। সোনার নিশান উর্ধ্বে চারিদিকে উড়ে। ভেড়াভেড়ী দিকে গাজি চাহিয়া তখন। তিন বার ফুক দিল ভেবে নিরঞ্জন। যত ছিল ভেড়া সব বাঘ হইয়া গেল। বাঘ হইয়া খাপ ধরি সকলে বসিল। দুই বাঘ ছিল সেই পাটনির ঘরে। শুন বলিয়া পাটনিরা কোন কাজ করে। দুই বাঘে লয়ে তারা গোসালে বান্ধিয়া। আটী দুই ঘাস দিল সম্মুখে আনিয়া। ঘাস জল দিয়ে তারা ঘরে চলে গেল। ঘরে গিয়া ছিরা ডোরা খাইতে বসিল। এখানেতে দুই বাঘে ঘাস জল হেরী। কহিতে লাগিল তারা কানাকানি করি। বেড়াভাঙা বলে শুন ভাই খান্দেওয়ারা। ঘাস পানি খাও কিছু হইয়াছে ভেড়া। এত গুণ জানে গাজি মরি যে হাসিয়া। দেখাইল ঘাস পানি ভেড়া বানাইয়া। গোশালে রাখিয়া বাঘ পাটনি দুজন। প্রভাতে নৌকায় তারা করিল গমন। হেন কালে বুড়ী বেটী ডোরার জননী। দেখিবারে ভেড়া সেই চলিল তখন। লাঠি ভর দিয়া বুড়ি নুয়ে২ যায়। গোয়াইল ঘরেতে গিয়া মাথা তুলে চায়। ভেড়াটি দেখিয়া বুড়ি হাসে খল২। ভক্ষণ করিতে মাংস মুখে ওঠে জল। হেন সমে ভেড়া ভাঙা করে উপহাস। মারিলেক কুড়ির কপালে ঢুস ঢাস। ঢুস খেয়ে বৃদ্ধা বুড়ি উঠিল রাগিয়া। বাঘের মাথায় বুড়ি মারে ঝাটা দিয়া। খাইয়া ঝাটার বারি বাঘ ক্রোধ ভরে। ধরিয়া বুড়ির গালে চড় মারে। বড় মারে কিল মারে, মাসে আর ঢুস। গড়াগড়ি দিয়া বুড়ি কাশে খুস২। একেবারে প্রাণে নাহি বুড়িকে মারিল। জীবনের দশা কিন্তু শেষ করে দিল। গোশাল হইতে বুড়ি বাহির হইয়া আসিয়া শুইল ঘরে খাতা গায় দিয়া। সেই সমে ছিরা ডোড়া আসিল বাটীতে। কহিতে লাগিল বুড়ি কাঁপিতে২। ভেড়ার কিলেতে গায় আসিয়াছে জ্বর। উঠিতে বসিতে আর শক্তি নাই মোর। কোন সমে কারে ভেড়া করে জানি খুন। অদ্য মধ্যেই শ্রাদ্ধের কর আয়োজন। শুনিয়া তখনি গিয়া ছিরা আর ডোরা। করিলেন নিমন্ত্রণ তের খান পাড়া। পাইয়া সে নিমন্ত্রণ কতে পাটনি। আসিল ডোরার বাড়ি চলিয়া তখন। বেছু আর মেছু দুই পুরোহিত ছিল। সংবাদ পাইয়া আসি উপস্থিত হইল। ভেড়াভেড়ী দেড়খি নিজে কাঁচা খেতে চায়। ডাকিয়া ডোরার কাছে মেছুদের কয়। বড় ভেড়াটার দিও অণ্ডকোষ মোরে। অভিশাপ দিব যদি দেহ আর কারে। শুনিয়া ঠাকুর বেছু কহে পাটনিকে। আমি নিব অণ্ডকোষ না দিব মেছুকে। কহিছে ব্রাহ্মণী মোর তিনি গর্ভবতী। অণ্ডকোষ খাইবারে অভিলাস অতি। বেছু বলে মেছুদেব অণ্ডকোষ মোর। বেছু বলে শুন মেছু গালে খাবি চড়। বকাবকি দুইজনে অনেক করিয়া। কিলাকিলি লাগে পরে কোমর কাচিয়া। পাটনিরা সবে বলে জোর করি কর। আমাদের বাক্য এক শুন দ্বিজবর। ভেড়ার মধ্যে আছে অণ্ডকোষ চারি। বিভাগ

www.pathagar.com

করিয়া নাও দুই২ করি। দুই যে ভেড়ার এই দুই অণ্ডকোষ। মেছুদেব লইয়া যাহ হইয়া আপোশ নিস্পত্তি করিল দ্বন্দ্ব দুই দ্বিজবর। পাটনিরা দাও খর্গ আনিল সত্বর। বিলম্ব দল ফুল ধুপ ঘৃত কলা চিনি। তৈল সিন্দুর যত দিল সব আনি। দুই ভেড়াকে পরে স্নান করাইয়া। কাঠগড়া মধ্যে বান্ধে গলে দড়ি দিয়া তৎপরে দুই দ্বিজে মন্ত্র পড়ি মুখে। বেল পত্র দিয়ে নেয় বাঘের মস্তকে। খান্দেওয়ারা বলে ভাই কার মুখ চাহ। উৎসর্গ করিলে কষ্ট হইবেক দেহ। এ বলিয়া আল্লা ভাবি হুঙ্কার মারিয়া। ধরিয়া নিজের রূপ চলিল গর্জ্জিয়া। খান্দেওয়ারা বলে শুন ভেড়াভাঙা ভাই। মনুষ্য মারিতে আজ্ঞা সাহেবের নাই। দুই ব্রাহ্মণের কাছে অণ্ডকোষ দিয়া। নগরের গরু কোথা চল দেখি গিয়া। নেজ খাড়া করি বাঘ চলে ক্রোধ ভরে। লম্ফ দিয়া ধরে সেই দুই ব্রাহ্মণের। ঠোকর চাপর মারি ফুলাইল গাল। মুচরিয়া নাক কান করিল যে লাল। একেবারে প্রাণে নাহি মারিল ব্রাহ্মণা। পশ্চাতে করেন কিবা বাঘ দুই জনে। নগরের মধ্যে গরু যার যত ছিল। ধরিয়া ধরিয়া বাঘে সকলি খাইল। বারশো বলদ মারে তের শত গাই। বাছুর মারিল কত লেখা জোখা নাই। তরাশে পাটনি কাঁপে থর২ করি। পলাইয়া যায় সবে করে দৌড়াদৌড়ি। বাঘ দেখি ছিরা ডোরা তারা দুই ভাই। দৌড়ে আর বলে সেই ফকিরের দোহাই। পুত্র পরিবার তার যত জন ছিল। কাটিয়া ঘরের বেড়া বাহির হইল। ঘর বাড়ি ছাড়ি তারা পালাইয়া যায়। ছিরা ডোরা যায় আর পিছু দিকে চায়। ছিরা বলে যত দিন বাঁচিয়া থাকিব। মুসলমান ফকিরের কড়ি নাহি লিব। এত কেরামত তার আগে জানি নাই। তবে কি তাহার কাছে কড়ি আমি চাই। আসিলে ফকির কেহ ঘাটিতে আমার। মাথে বয়ে তারে নিয়ে করে দিব পার। বাটী হইতে দুই ভাগ যায় যদি চলি। আল্লার নামেতে শিন্নি দিব মোরা কালি। মোহাম্মদী দীন সত্য বিশ্বাস করিব। দুই খান ঘাট আর বান্ধাইয়া দিব। এইরূপে মানসিক ছিরা ডোরা করে। শুন বলি বাঘে কিবা করে তৎপরে। দাঁড়াইয়া দুই বাঘে লাগিল কহিতে। পিরের হুকুম নাহি পাটনি মারিতে। বিলম্ব করিয়া আর কিছু কাজ নাই। সাহেবের কাছে চল এই বেলা যাই। এ বলিয়া তবে সেই বাঘ দুই জন। গর্জ্জিয়া পবন আগে চলিল তখন। ডাক মারি লাফ দিয়া নদী পার হইয়া। সাহেব গাজির কাছে অবিলম্বে গিয়া। সালাম করিয়া খাড়া সম্মুখে হইল। আশীর্বাদ করি গাজি জিজ্ঞাসা করিল। কি রূপে আছিলা বল পাটনিল বাড়ি। কহিতে লাগিল তারা জোর হাত করি। যেরূপ গোওয়াল ঘরে বান্ধিয়া রাখিল। একে২ আদি অন্ত সকলি কহিল। শুনিয়া সাহেব গাজি হরষিত হইয়া। বাঘ পরী যত ছিল সকলে ডাকিয়া। কহিতে লাগিল শুন বলি সবাকারে। প্রাণে নাহি মারে মোর ভাই কারাগারে। তোমাদের কাছে আমি কি বলিব আর। এই কাজ কর যাতে হয় সে উদ্ধার। বাঘ পরী বলে পির আশীর্বাদ চাই। বসিয়া তামাসা দেখ মোরা সবে যাই।

ধুয়া।

গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বাঘ লম্ফে চলে
যেমন বেড়িল লঙ্কা বানর সকলে

www.pathagar.com

পয়ার। হুঙ্কার মারিয়া বাঘ চলিল সত্বর। মহাবেগে যায় করি দন্ত কড়মড়। ব্রাহ্মণা নগর মধ্যে ছিল যত বাড়ি। বাড়ি২ গিয়া বাঘ রহিলেক বেড়ী। পথে ঘাটে সবে আর কাতার বান্ধিয়া। চলাফিরা করে কেহ গার্জ্জিয়া২। সমস্ত নগর বেড়ী রহে বাঘগণ। নগর নিবাসীগণ কেহ নাহি জানে। প্রভাতে উঠিয়া তারা ঝাড়া ফিরিবারে। লোটা হাতে লয়ে পথে যায় ধীরে ধীরে। বাহির হইয়া দেখে বাঘের কাতার। দৌড় দিয়া ঘরে গিয়া মরে চিৎকার। সোনার কলসি লয়ে ব্রাহ্মণী সকল। নদীতে চলিছে তারা ভরিবারে জল। বাঘ দেখি ওমা ওমা সকলে বলিয়া। দৌড় দিয়া ঘরে যায় কলসি ফেলিয়া। কাঁপিতে লাগিল সবে হইয়া অস্থির। ঘর হইতে লোক সবে হইয়া বাহির। রাখাল না লয় গরু রহিল গোসালে। ঘরে বসি ঝাড়া লগগি ফিরেন সকলে। হাঁড়ি ও পাতিল ঘরে যার যত ছিল। হাগিয়া মুতিয়া, সবে ভরিয়া ফেলিল। বাঘের গর্জ্জনে যায় ফাটিয়া মেদিনী। থর থর কাঁপে যত ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণী। কেহ বলে দূর২ কেহ বলে নিল। কেহ বলে ওরে বাবা মোর প্রাণ গেল। কেহত কহেন গিয়া কাছেতে রাজার। ব্রাহ্মণা নগর গেল হইয়া উজার। কারাগারে রাখিয়াছ এক যে ফকির। আসিল তাহার ভাই গাজি জিন্দা পির। কত শত বাঘ জানি দিছে পাঠাইয়া। খাইতেছে মানুষ গরু ধরিয়া ধরিয়া। বসিছেন শাহা গাজি রত্ন সিংহাসনে। সোনার নিশান খানি উড়ে চারি কোণে। মাণিক্য চান্দুয়া হেসে শিরের উপর। দাঁড়াইয়া পরীগণ ঢুলার চামর। শীঘ্র গিয়া মিল রাজা সঙ্গেতে গাজির। না হলে খাইবে বাঘে সকলের শির। রাজা বলে হেন কথা না বলিও আর। থাকিতে দক্ষিণা রায় ভয় কি আমার। এখনি দক্ষিণা রায় শুনিলে কানেতে। মারিবে সকল বাঘ ফকির সহিতে। এ বলিয়া চলে রাজা বাঘ দেখিবারে। উঠিলেন গিয়া এক মহলের পরে। মহলেতে চরি রাজা দেখের চক্ষু মেলি। কাতারে২ বাঘ করে চলাচলি। এক গুণ বাঘ রাজা শত গুণ দেখে। অন্তর শুখায়ে গেল বাক্য নাহি মুখে। ভয়েতে কাঁপেন রাজা করি থর২। যেমন আসিল গায়ে কত শত জ্বর। কাঁপিয়া রাজা কি করে তখন। দক্ষিণা রায়ের কাছে করিল গমন। খাইবার বস্তু কত লইলেন সাথে। হইবে দক্ষিণা রায় সন্তুষ্ট যাহাতে। দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি কলা নারিকেল। শশা বাঙ্গি আনারস যত ইতি ফল। মহিষ ছাগল মৃগ কবুতর হাঁস। গোটা দশ বারো আর রুহিত মাছ। এই সব দ্রব্য আগে পাঠাইয়া দিল। দেখিয়া দক্ষিণা রায় মহাতুষ্ট হইল। সকলি করিয়া পাক খায় একেবারে। খাইয়া বসিল বীর হরিষ অন্তরে। হেন কালে গেল রাজা কান্দিয়া২। প্রণাম করিল গিয়া চরণে ধরিয়া। দেখিয়া দক্ষিণা রায় জিজ্ঞাসা করিল। কিকারণে কান্দ রাজা মোর কাছে বল। রাজা বলে কি কহিব শুনহ গোসাঁই। জাতি প্রাণ সব যাবে আর রবে নাই। কালু নামে এক বেটা ফকির আসিয়া। যে কথা কহিল তাহা শুন মন দিয়া। গাজি শাহা আছে বলে ভাই এক তার। মোর কন্যা চায় সেই বিয়া করিবার। আসিলেন কালু তার ঘটক হইয়া। রাখিয়াছি কারাগারে তাহাকে বান্ধিয়া। এখন তাহার ভাই বাঘ লয়ে সাথে। আসিয়াছে দেখ গিয়া মোর নগরেতে। আনিয়াছে কত বাঘ সংখ্যা নাহি তার।

www.pathagar.com

নিমিষে করিবে এই দেশ ছারখার। প্রজাগণ ঘরে২ বাহির না হয়। বাঘের গর্জ্জনে কারো প্রাণ স্থির নয়। গো-মানুষ ধরি২ খাইতেছে বাঘে। পালাইতে পথ নাহি বাঘ চারি দিকে শুনিয়া দক্ষিণা রায় হেসে২ কয়। এর লাগি কান্দ রাজা নাহি কিছু ভয়। এখনি চলিব আমি থাকহ নিশ্চিতে। মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে। এ বলিয়া ওঠে বীর রাখিয়া তখন। সমরে যাইতে অঙ্গে পরেন বসন। প্রথমে পড়িল ধুতি লম্বা আশি হাত। দশ মণি লোহার টোপ দিলেন মাথায়। চল্লিশ মণের এক জিঞ্জির কোমরে। আটিয়া বান্ধিয়া বীর পুতির উপরে। শত মণ খাড়া খান বগলে লইল। আমি মণ ঢাল আনি গরদানে বান্ধিল। তিনশ মণের গদা হাতেতে লইয়া। যাত্রা করি যায় বীর সমরে চলিয়া। যাত্রাকালে হাচি তার বামেতে পড়িল। চোখেতে আসিয়া মাছি উড়িয়া বসিল। চলিতে পড়িল বীর উষ্টা খায় পায়। দেখে আর কাঠুরিয়া কাষ্ঠ লয়ে যায়। রহ রহ তিন ডাক শুনিল পশ্চাতে। সম্মুখেতে মরা আর দেখেন চোখেতে। অযাত্রা দেখিয়া বীর ভাবে মনে২। ফিরিয়া না আসে বীর লজ্জার কারণে। চিন্তাযুক্ত হইয়া বীর করিল গমন। ঘরে২ হুলাহুলি দেয় রামাগণ। শংখ শিঙ্গা বাজে আর বাজে করতাল। ভুম২ করি কেহ বাদ্য করে গান। বসিলেন মুকুট রাজা দালানের ছাদে। দক্ষিণা রায় বীরের সমর দেখিতে। সাত পুত্র নয় শালা সভাসদ লিয়া। বসিয়া দেখের রাজা গালে হাত দিয়া। সাজিয়া দক্ষিণা রায় রণস্থলে গেল। দূরে থাকি শাহা গাজি তাহাকে দেখিল। দেখিয়া সাহেব গাজি কহে বাঘগণে। দেখহ দক্ষিণা রায় আসিতেছে রণে। চারিদিকে বেড়া দিবে কাতার বান্ধিয়া। শুনিয়া চলিল বাঘ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া। তখনি দক্ষিণা রায় চক্ষু মেলি দেখে। লম্ফে২ বাঘগণ আসে লাখে লাখে। এক গুণ বাঘ বীরে সাত গুণে হেরে। বদন শুকিয়ে গেল বাক্য নাহি স্বরে। ভয়েতে দক্ষিণা রায় কাঁপে থরথরি। মনে২ ভাবে বীর একা কিবা করি। এক বাঘ মারি যদি গদা উঠাইয়া। দশে বিশে একেবারে ধরিবে আসিয়া। এ ভাব দেখিয়া বীর ক্ষান্ত দিয়া রণ। নদীর দিগেতে গেল চলিয়া তখন। নদীর কূলেতে গিয়া আসন করিয়া। গঙ্গাকে ডাকেন বীর কান্দিয়া২। তাহার ডাকেতে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। দেখিয়া দক্ষিণা রায় প্রণাম করিল। আশীর্বাদ করে দেবী জিজ্ঞাসে তখন। কহ বীর কেন মোরে করিলা স্মরণ। কহেন দক্ষিণা রায় কান্দিতে২। শুন মাগো কি কহিব তোমার সাক্ষাতে। মুকুট রাজায় মোরে সেবে ছোট বধি। সেবিয়া আনিছে তার পিতামহ আদি। সে রাজার জাতি মাগো আজি দেখা যায়। আসিয়া ফকির এক তার কন্যা চায়। নাহি জানি বাঘ কত ফকির আনিছে। ব্রাহ্মণা নগর সব বেরিয়া রাখিছে। তুমি যদি দয়া করি দেহগো কুম্ভীর। তবেত দেখিতে পারি কেমন ফকির। গঙ্গা বলে বীর বলহ সত্বর। কি নাম ফকির সেই কোন দেশে ঘর। কহেন দক্ষিণা রায় শুনগো জননী। সাহেব গাজি নাম তার লোক মুখে শুনি। পশ্চিম দেশেতে ঘর বৈরাট নগর। তাহার পিতার নাম শাহা সেকান্দর। অজুপা বলির সুতা তাহার জননী। শুনিয়াছি লোক মুখে আমি নাহি চিনি। গঙ্গা বলে তবে আর সন্দেহ কি ইহাতে। ব্রাহ্মণ

www.pathagar.com

চলিয়া গেলে তাহাদের জাতে। শুনহ দক্ষিণা রায় নাজি জান তুমি। গাজি মোর ভগ্নিপুত্র তারে আমি চিনি। একই রক্তের মাংস নাহি হয় পর। পুত্র হইতে অতি দয়া গাজির প্রতি মোর। আলী আর দুর্গাদেবী সহায় তাহার। ফিরায় চাম্পার বিয়া শক্তি আছে কার। সংসারে সব লোক আসে একেবারে। তবু না গাজির সাথে পারিবে সমরে। মুকুট রাজাকে তুমি কহ বুঝাইয়া। মিলুক গাজির সাথে কন্যা রিয়া দিয়া। শুনিয়া দক্ষিণা রায় কহেন তখন। কেন মা তোমাকে তবে করিনু স্মরণ। প্রাণ ভয়ে পালাইলে হাসিবেক লোকে। আর ধরিয়া ধরিয়া বাঘে খাইবে আমাকে। জয় পরাজয় আমি তাহা নাহি চাই। কুম্ভীর আমাকে দিবা তোমার দোহাই। গঙ্গ বলে নাহি দিব কুম্ভীর তোমারে। বিরক্ত হইয়া গাজি গালি দিবে মোরে। কান্দিয়া দক্ষিণা রায় কহিলেন তবে। তুরুক সহায় হয়ে কি ফল পাইবে। তুরুক কি সেবা পূজা করিবে তোমার। নিদয়া হইলা মাগো অভাগা আমার। যদি নাহি দিবা তুমি কুম্ভীর আমাকে। এখনি মরিব আমি তোমার সম্মুখে। এ বলিয়া তৎপরে গদা লইয়া হাতে। আপন মস্তকে গদা উঠায় মারিতে। হেন কালে কহে গঙ্গা রাখ২ বীর। এখনি আনিয়া দেই তোমাকে কুম্ভীর। এক কথা কহি কিন্তু শুন সাবধানে। এ সব বৃত্তান্ত যেন গাজি নাহি শুনে। তবেত ত্বরায় গঙ্গা গিয়া পাতালেতে। কুম্ভীর ভাসায়ে দিল পাতাল হইতে। দশ হাজার কুম্ভীর উঠিল ভাসিয়া। হরিষে দক্ষিণা রায় চলিল হইয়া। ভাঙিয়া বনের মাথা কুম্ভীর চলিল। পেটেতে ঘসাতে কত খাল বিল হইল। ভাঙিয়া বনের মাথা কুম্ভীর চলিল। পেটের ঘসাতে কত খাল বিল হইল। কুম্ভীর হইয়া বীর রণস্থলে যায়। দালানে বসিয়া রাজা সবাকে দেখায়। দেখহ গোসাঁই মোর আনিছে কুম্ভীর। বাঘ লয়ে পালাইবে এখনি ফকির। কুম্ভীর দেখিয়া গাজি পরীগণ কাছে। কহে দেখ গঙ্গা মাসী কুম্ভীর দিয়াছে। ভালো মাসী মুখে মুখে আশীর্বাদ কেবল। কাটিয়া বৃক্ষের মূল পাত্রে ঢালে জল। এই সব আলাপন করেন বসিয়া। আসিল দক্ষিণা রায় ক্রোধিত হইয়া। কুম্ভীর হুলায়ে দিল বাঘ ধরিবারে। হেন কালে শাহা গাজি কহে উচ্চৈস্বরে। যত বাঘ আছে সব চলহ সাজিয়া। কুমীরের মাথা গিয়া ফেলহ কাটিয়া। গাজির আজ্ঞায় বাঘ চলিল তখন। কুমীরের সাথে গিয়া আরম্ভিল রণ। বাঘের ডাকেতে কাঁপে ব্রাহ্মণা নগর। ব্রাহ্মণী সকল কাঁপে করি থর থর। কাঁপেন দক্ষিণা রায় হইয়া অস্থির। মুকুট রাজার পড়ে দুই চোখে নীর। গর্জ্জিয়া২ বাঘ লেক ঘুরাইয়া। কুম্ভীর উপরে বাঘ পরে লম্ফ দিয়া। হুঙ্কার ছাড়িয়া মারে কামড় দন্তেতে। নাহি বিন্ধে দাঁত নখ কুম্ভীর অঙ্গেতে। কাঠের সমান শক্ত কুম্ভীরের তক। কামড় থাপায় কিছু কষ্ট নাহি পায়। বাঘের ভাঙিল দাঁত নখ ভাঙ্গে আর। কাতর হইল বাঘ শক্তি নাহি তার। তখন কুম্ভীর সব গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া। ধরেন বাঘের পদে ঠোঁটে চিপা দিয়া। কাহার ভাঙিল ঠেং কার ভাঙ্গে শির। ভাগিয়া চলিল বাঘ হইয়া অস্থির। আসিয়া দক্ষিণা রায় বলে মার২। সকল বাঘের আজি ভেঙে দেহ হাড়। কুম্ভীরের ভয়ে বাঘ পালাইয়া চলে। গাজির নিকটে যাইয়া কেন্দে২ বলে। কুম্ভীরের অঙ্গ শক্ত লোহার আকার। হেরে দেখ দাঁত মুখ ভাঙিল

www.pathagar.com

সবার। শক্তি নাহি অঙ্গে মোর সমরে যাইতে। পালাইয়া আসিলাম তোমার কাছেতে। শুনিয়া সাহেব গাজি হইয়া কাতর। কহেন ধোকার কাছেতে জোর করি কর। এত সঙ্কট হইতে দেহ মোরে ত্রাণ। দয়া করি দেহ রৌদ্রে অগ্নির সমান। যে বাঞ্ছা করিল মনে পুরিত হইল। অগ্নির সমান রৌদ্র তখন উঠিল। রৌদ্রের তাপেতে তবে যতেক কুম্ভীর। লেট পোট করে সবে হইয়া অস্থির। জল কাদা বিনে বুক শুকাইয়া গেল। জল২ করি তারা সকলি ভাগিল। পিছে২ বাঘগণ খেদারিয়া চলে। মার২ ধর ধর শাহা গাজি বলে। দৌড়িয়া২ লাফে কুম্ভীর সকল। সাগরেতে পড়ে গিয়া হইল চঞ্চল। পালাইয়া গেল তারা পাতাল নগরে। এখানে দক্ষিণা রায় হায় হায় করে। আসিয়া সকল বাঘে তাহাকে ঘেরিল। সঙ্কটে পড়িয়া বীর কান্দিতে লাগিল। কান্দিয়া২ বলে কি করি উপায়। এমনি বিপদে আসি কে মোরে ত্বরায়। কপালেতে ছিল বুঝি এমন লিখন। ফকিরের বাঘ হাতে আমার মরণ। প্রাণ লয়ে পালাইলে হাসিবেক লোকে। মুকুট ভূপতি আর ছাই দিবে মুখে। এ ভাব ভারিয়া বীর কি করে তখন। কান্দিয়া২ করে চণ্ডিকে স্মরণ। ভক্তি ভাবে ডাকে বীর কোথাগো ভবানী। অধীনেরে ত্রাণ কর গণেশ জননী। দুর্গতি আসন। অন্তরে জানিয়া দুর্গা রথে করি ভর। দক্ষিণা রায়ের কাছে আসিল সত্বর। শূন্য মধ্যে রথ খান হেলিতে লাগিল। দেখিয়া দক্ষিণা রায় প্রণাম করিল। রথে বসি শিব জায়া জিজ্ঞাসেন তায়। কি কারণে বল বীর ডাকিলা আমায়। কহেন দক্ষিণা রায় কান্দিতে২। কি কহিব দেখ মাগো আপন চোখেতে। যবনের বাঘ মোরে বেড়িয়া রাখিছে। নগরের লোক আর কতবা মারিছে। অতএব করি মাগো এই নিবেদন। ভূত প্রেত তুমি মোরে দেহ কতজন। মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে। এই ভিক্ষা মাগো আমি মাগি চরণেতে। চণ্ডিবলে শুন বাছা ক্ষান্ত দেহ রণ। চাম্পাকে পাইবে গাজি নির্বন্ধ লিখন। মুকুট রাজাকে তুমি কহ বুঝাইয়া। মিলুক গাজির সাথে কন্যা বিয়া দিয়া। গাজি মোর ভগ্নিপুত্র আমি মাসী তার।

বিয়া যদি নাহি দেয় রাজায় তোমার। ব্রাহ্মণা নগর দিবে ভাসায়ে জলেতে। না রাখিব এক প্রাণী বংশে বাতি দিতে। কার্ত্তিক গণেশ মতো গাজি বাছা মোর। আমার মাসত্ত্ব ভাই নাহি হয় পর। চাম্পাকে গলায় হায় আপনার দিয়া। নমস্কারি লয়ে যাব কৈলাশে চলিয়া। যাও তুমি কহ গিয়া মকুট রাজারে। ভালো যদি চাহে কন্যা দেউক গাজিরে। কত বড় রাজা সেই এত অভিমান। সকল রাজার নহে দারে সমান। বলি রাজা তার সুতা গাজির জননী। সকল রাজার তারা হয় চূড়ামণি। তার কাছে বিয়া দিতে কিছু দোষ নাই। টাকা দিয়া পাবে কোথা এমন জামাই। শুনিয়া দক্ষিণা রায় মুখ শুখাইয়া। কহেন চণ্ডির কাছ কান্দিয়া২। শুন মাগো কেন তবে ডাকিলাম আমি ভূত প্রেত যদি মোরে নাহি দাও তুমি। এখনি মরিব আমি গদা হানি মাথে। এ বলিয়া তুলে গদা মস্তকে মারিতে। রাখ রাখ বলি দেবী ধরিল গদায়। কহিলেন দিব ভূত প্রেত যে তোমায়। এ সব সংবাদ যেন গাজি নাহি শুনে। শুনিলে বিরক্ত বাছা হবে মনে মনে। এ

www.pathagar.com

কথা কহিয়া দেবী হুঙ্কার মারিল। ডাকিনী যোগিনীগণ সাজিয়া আসিল। দেও দানব ভূত প্রেত চৌষট্য যোগিনী। আসিয়া সমর স্থলে যথায় ভবানী। দম্ভ কিচিমিচি করি জিজ্ঞাসা করিল। কি কারণে জননীগো ডাকিয়াছি বল। রণ করিবার আজ্ঞা তাহা দিকে দিয়া। কৈলাশ শিখরে দেবী গেলেন চলিয়া। এখানে দানব গণ সাজিয় তখন। চলির বাঘের সাথে করিবারে রণ। পর্বত হইতে তারা আনিয়া পাথর। শূন্যেতে বসিয়া মারে বাঘের উপর। চারিদিকে চায়ে বাঘে কিছু নাহি দেখে। যেমন আকাশ হইতে পড়ে লাখে২। কোন দিকে পালাইয়া না পারে যাইতে। একেক বাঘের গায়ে পড়ে শতে২। কাহার ভাঙিল পদ কার ভাঙ্গে মাথা। দৌড় দিয়া কহে গিয়া শাহ গাজি যথা। কহেন গাজির কাছে কান্দিয়া২। কি কর সাহেব গাজি কি কর বসিয়া। মারিবে সকল বাঘ রক্ষা নাহি আর। উঠিতে বসিতে নাহি শক্তি যে কাহার। না জানি থাকিয়া শূন্যে কে মারে পাথর। তাহাতে সকল বাঘ হইল কাতর। হেন শক্তি নাহি কার উঠিতে বসিতে। শুনিয়া সাহেব গাজি লাগিল ভাবিতে। ধ্যায়ান করিয়া পির অন্তরে জানিল। দেওদানব ভূত প্রেত দুর্গ দেবী দিল। তখনি সাহেব গাজি কালেমা পড়িয়া। ফুক দিল চারিধার চারিদিক চাইয়া। যেমন ভূতের গায়ের লাগিল আগুন। যেই দিকে চায় ভূত মেলিয়া নয়ন। সেই দিকে জ্বলে অগ্নি ধাউ ধাউ করি। দৌড়াদৌড়ি করে সবে হইয়া দিগাম্বরি। ঈশান কোণের দিকে দেখে কিছু পথ। তাহা দিয়া সকলেতে চালাইয়া রথ। প্রাণ লয়ে পালাইল দানব সকল। ভাবেন দক্ষিণা রায়ের বেড় করিল আসিয়া। মনে মনে ভাবে রায় রক্ষা নাহি আর। নিশ্চয় বাঘের হাতে মরণ আমার। ভাবিয়া চিন্তিয়া বীর কোমর কাচিয়া। মারিলেক ডাক এক ক্রোধিত হইয়া। তাঁহার ডাকেতে জমি কাঁপে থর থর। কাঁপিল বাসুকি নাক পাতাল নগর। ইন্দ্র আদি দেবগণ উঠিল কাঁপিয়া। গর্ভিণীর গর্ভ কত গেলহ পড়িয়া। যত বাঘ ছিল সব ঢলিয়া পড়িল। প্রাণ ভয়ে পিরগণ পালাইয়া গেল। একেলা বসিয়া গাজি ভাবে মনে মনে। হেথায় দক্ষিণা রায় সাজিয়া তখনে। গর্জিয়া চলিল বীল গাজিকে মারিতে। হেন কালে শাহা গাজি আসা হাতে। আসাকে কহেন পির কার মুখ চাহ। দক্ষিণা রায়ের সাথে লড়িবারে যাহ। বিসমিল্লাহ বলিয়া আসা দিলেন ছাড়িয়া। গর্জিয়া চলিল আসা ঘুরিয়া২। লাফ দিয়া আসা পুনঃ পড়িলেক শিরে। ক্ষণে পড়ে নাকে মুখে ক্ষণে পড়ে ঘাড়ে। ভূজঙ্গের মতো ক্ষণে ধরে পেঁচ দিয়া। আছাড় খাইয়া বীর পড়িল হাতে। মারিল আসার পরে গড়া উঠাইয়া। দুইখান হইয়া আসা পড়িল ভাঙিয়া। দুই খান আসা বীর লয়ে দুই হাতে। ফেলিয়া দিলেন লিয়া মধ্যে সাগরেতে। যে সমে গাজি আসা সাগরে ফেলিল। সাগরের জল যত শুখাইয়া গেল। তখনি জানিয়া গঙ্গা আপন অন্তরে। পাঠাইয়া দিল আসা চাম্পার মন্দিরে। যেই মাত্র চাম্পার ঘরে আসা নিয়া দিল। যেই জল ছিল পূর্বেই সেই জল হৈলো। এখানে দক্ষিণা রায় গদা লয়ে হাতে। রুষিয়া চলিল বীল গাজিকে মারিতে। তবেত সাহেব গাজি তখনি উঠিয়া। কেহ নাহি চারিদিকে দেখল চাহিয়া। মনে মনে ভাবে কারে করিব হুকুম।

www.pathagar.com

অমনি দেখিল চোখে পায়ের পড়ম। খড়মের শাহা গাজি কহেন তখন। দক্ষিণা রায়ের সাথে কর গিয়া রণ। গর্জিয়া খড়ম তবে চলিল উড়িয়া। রায়ের মস্তকে গিয়া পড়িল ঘুরিয়া। মস্তকে পড়িয়া তার ধুম২ করে। চাটুর চুটুর আর নাকে মুখে মারে। ক্ষণে২ শূন্যে উড়ে ক্ষণে পড়ে গায়। ভূমেতে পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়। বার২ খড়ম যে পড়ে আর ওঠে। যেমন ধানের চিড়া নারী লোকে কুটে। অশক্তি হইয়া রায় পড়িল ভূমেতে। হেন সমনে শাহা গাজি আসি লয়ে হাতে। বুকে বসি দুই কান কাটিল টানিয়া। রাম রাম বলে বীর কানে হাত দিয়া। পরে গাজি অস্ত্র তার দিতে চাহে গলে। খোদার দোহাই দিয়া কেন্দে২ বলে। নাহি কাট গলা মোর ধরি আমি পায়। কাটিয়া কান মেতার সেইত লজ্জায়। রক্ষা কর মোরে নাহি মারিও প্রাণেতে। সেবক হইব আমি তোমার কাছেতে। মুকুট রাজারে আমি এখনি কহিয়া। চাম্পাকে তোমার কাছে আজি দিব বিয়া। শুনিয়া সাহেব গাজি নাহি কাটে আর। দড়ি দিয়া দুই হাত বান্ধিয়া তাহার পশ্চাতে লইয়া চলে ধলিয়া টিকিতে। বার হাত ছিল লম্বা টিকি তার সাথে। ভয়ঙ্কর অঙ্গ অতি পর্বত আকার। হাতির কানের মতো কান দুর তার। বাম হাতে গাজি তার টিকিতে ধরিয়া। পালঙ্কের খুরা সাথে বান্ধিল আটিয়া। হেন সমে পরীগণ সকলে আসিল। আসিয়া গাজির কাছে সালাম করিল। গাজি বলে ভালো২ চিনেছি সকলে। একাকী ফেলিয়া মোরে পালাইয়া গেলে। পরীগণ বলে শোন শাহা জিন্দাপির। যে ডাক মারিয়া ছিল এই দুষ্ট বীর। আমাদের প্রাণ নাহি আছিল কায়াতে। মরণের ভয় জান রাখে সকলেতে। ক্ষমা কর অপরাধি আছি পদ তলে। না করিব হেন কাজ আর কোন কালে। শুনিয়া সাহেব গাজি হাসিয়া হাসিয়া। বসাইল সবাকারে আপনি উঠিয়া। ধন্য ধন্য শাহা গাজি ধরিলা যে বীর। এখন উহার দেহ বিভাগ করিয়া। আমরা সকলে খাই উদর ভরিয়া। বেড়াভাঙা বলে মোর ভাগ কলিজার। খান্দেওয়ারা বলে দেল ফেপড়া আমার। শুনিয়া দক্ষিণা রায় কাঁপে থর থর। হাত বাড়াইয়া কহে গাজির গোচর। বাঘ সবে নাহি দিও আমাকে কাটিয়া। দিবহ চাম্পার বিয়া এইক্ষণ গিয়া। শুনিয়া সাহেব গাজি হাসেন তখন। পরীগণ হাসে দিয়া মুখেতে বসন। হাসিয়া বলেন গাজি বাঘ সকলেরে। খাইতে নাহিক দিব দক্ষিণা রায়েরে। চাম্পারে আমার সাথে বিয়া দিতে বলে। ইহা শুনি বাঘ পরী হাসেন সকলে। বাঘ পরী লয়ে গাজি রহে আনন্দেতে। কি করে মকুট রাজা সকলেতে। যখন দক্ষিণা রায় হইল বন্ধন। হায়২ করে রাজা করেন ক্রন্দন।

ধুয়া।

হায় মরি হায়২ কি হৈল২ কি হৈল
কেমনে এমন বীর তাহাকে ধরিল!

ত্রিপদী। দক্ষিণা রায়ের জন্য ভাবে রাজা মনে২, নম্র শিরে হাত গালে দিয়া। আছিল এমন বীর, ধরিয়া হাতির শির, দিছে হাতি দূরেতে ফেলিয়া। তাহাকে যবনে ধরে, কেবা যুদ্ধে আর পারে, কোথা যাব ঠেকিলাম দায়। জাতি কুল সব যাবে, বাঘে আর ধরে

www.pathagar.com

খাবে, হায় হায় কি করি উপায়। মাত্র মিত্র সব কয়, নাহি ভাব মহাশয়, কি করিবে একাকী ফকির। সেনাগণ এত এত, তিন কোটি সাত শত, বার লক্ষ তোপ আর তীর। তিন লক্ষ ঘোড়া হাতি, যবনের, কিবা শক্তি, সমরেতে পারে তব সাথে। তোপে আর তীরে তার বাঘ সব ছারখার, করে মোরা দিব নিমিষেতে। তবে রাজা শান্ত হইয়া, কহে সবে ডাক দিয়া, বিলম্বের কাজ নাহি আর। শীঘ্র চল সাজি, রণস্থলে গিয়া আজি, বাঘ সব করিয়া সংহার। ধরে সেই ফকিরেরে, আনিয়া চণ্ডির ঘরে, বলি দিব ছাগলের মত। রাজা আজ্ঞা পেয়ে তবে, সাজিতে লাগিল সবে, হাতি ঘোড়া সাজায় সব মাহুত। হাতি সব সাজাইয়া, তোপ ধনু পৃষ্ঠে দিয়া, খাড়া করে কাতারে কাতার। কেহ লয় তলওয়ার, পৃষ্ঠে বান্ধে ঢাল কার কার হাতে গোর্জ্জ যে লোহার। সেনাগণ রণে সাজে, নানা হাত বাদ্য বাজে, শব্দে তার যায় কান ফেটে। মৃদঙ্গে ধুমাধুমি, তবলের ধুমাধুমি, টেন টেনাইয়া ঘণ্টা বাজি ওঠে। ঢোল বাজে তিন লাখ, দুই লক্ষ ঢাক, রাম কারা বাজে কত কত। ঝাজ ডঙ্কা যায় বাঁশি, ভেউর দামামা কাশি, বাজে আর কত শত।

ধুয়া।

বাজিল বাজিল বাদ্য কতবা বাজিল।

সাজিল সাজিল সেনা সাজিয়া চলিল।

পয়ার। বাদ্য বাজাইয়া সেনা চলে যায় রণে। ঘরে২ হুলাহুলি দেয় রামাগণে। তিন শত হাতি ঘোড়া কাতারে চলিল। পদাঘাতে বসুমতি কাঁপিতে লাগিল। চলিছে মকুট রাজা হরিষ অন্তরে। হেন সমে কালু শাহা থেকে কারাগারে। কহিতে লাগিল কালু রাজাকে ডাকিয়া। আমাকে লইয়া যাহ সঙ্গতি করিয়া। নহেত তোমার আজি না বাঁচিবে প্রাণ। ধরিয়া গাজির বাঘে ভাঙিবে গরদান। মনে২ গর্ব করি লয়ে সেনাগণ। হেলায় সাহেব গাজি জিতিবেক রণ। সংসারে লোক যদি আসে একেবারে। তবু না গাজির সাথে পারিবে সমরে। মিছামিছি সব লোক মরিবে প্রাণেতে। কন্যা দিয়া মেল গিয়া ফকিরের সাথে। শুনিয়া মুকুট রাজা ক্রোধ হইয়া কয়। এত বড় কথা তার নাহি আছে ভয়। ভাবিছ কি মনে মনে ওরে দুরাচার। কল্য যে বাপের বিয়া দেখাব তোমার। এই ক্ষণ গিয়া বাঘ সকলি মারিয়া। গাজিকে আনিব হাতে রশি লাগাইয়া। তব দুইজনে কল্য পূজার সমেতে। জোড়া বলি দিব নিয়া চণ্ডির ঘরেতে। শুনিয়া সাহেব কালু হেট শিরে রয়। মনে২ ক্রোধ অতি কিছু নাহি কয়। চলিয়া মুকুট রাজা গেল রণস্থলে। হেথায় সাহেব গাজি মনে মনে বলে। খোদা বিনে নাহি আর ভরসা আমার। অবশ্য করিবে রক্ষা কৃপায় তাহার। বাঘ সব লয়ে কাছে আর পরীগণ। মনে মনে করে গাজি আল্লাকে স্মরণ। হেন সমে লোক সবে আসিয়া রাজার। সাজাইল তোপ ধনু বান্ধয়া কাতার। বসিয়া আছেন বাঘ পরী লৈয়া। চারিদিকে বেড়িলেক তোপ ধ্বনি দিয়া। তৎপরে কহে রাজা ডাকিয়া সবারে। ফায়ার করহ তোপ সব এক বারে। তবে তারা তীর গুলি ছাড়িতে লাগিল। তাহার শব্দেতে ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। গাছপালা যত কিছু আছিল

www.pathagar.com

মাঠেতে। ভস্ম হৈয়া গেল সবে গুলির আঘাতে। ছাড়িল সকল তোপ তীর যত আর। ধুয়াতে সংসার গেল হইয়া অন্ধকার। অন্ধকার হৈয়া ধুয়া তিন দণ্ড রয়। ডাকিয়া মুকুট রাজা লোক সবে কয়। মরিল ফকিরের বাঘ গিয়াছে বালাই। হরি ধনি দিয়া সবে ঘরে চলে যাই। ক্ষণেক পরেতে গেল পসর হইয়া। বাঘ সব খাড়া দেখে কাতার বান্ধিয়া। এক লোক তাহাদের মারা নাহি গেছে। জীবমানে আছে গাজি পরীগণ কাছে। দেখিয়া মুকুট রাজা হাত দিয়া গালে। অস্থির হইয়া অতি কেন্দে২ বলে। এই যে ফকির বুঝি এয়ছা মন্ত্র জানে। বার লক্ষ তোপ বান গেল অকারণে। তিন কোটি সেনা আমি আনিলাম, সাথে। ফকিরের এক বাঘ পারিনু মারিতে। না পারিব যুদ্ধে আর ফকিরের সাথে। মিছামিছি আসিয়াছ প্রাণ হারাইতে। এ বলিয়া ভয়ে রাজা যায় পালাইয়া। বাঘ সবে কহে গাজি তখনি উঠিয়া। পালাইয়া যায় রাজা লয়ে সেনাগণ। বেড়িয়া সকল সেনা মারহ এখন। তবে বাঘ লাফ দিয়া পড়িল সেনাতে। মারিতে লাগিল লোক হাতে আর দাঁতে। ক্রোধিত হইয়া সবে অগ্নির আকার। মারিয়া চলিল সেনা হাজার২। প্রাণ ভয়ে কত লোক পালাইয়া যায়। নাচিয়া২ বাঘে তাহাকে ফিরায়। হাউ হাউ শব্দ করি কাছে যায় যার। না ছুইতে প্রাণ আগে চলি যায় তার। খান্দেওয়ারা বেড়াভাঙা কালকূট বাঘ। যাহার ডাকেতে কাঁপে পাতালেরা নাগ। গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বাঘে মারিতে লাগিল। হাতি ঘোড়া যত ছিল সকলি মারিল। কত লক্ষ লোক মারে সংখ্যা তার নাই। সব লোক পালাইয়া গেল ঠাঁই ঠাঁই। শিরের পাগড়ি আর গায়ের চাদর। ফেলিয়া মুকুট রাজা উঠে দিল দৌড়। ত্বরায় বাটীতে গিয়া কপাট লাগায়। খুঁজিয়া মানুষ আর বাঘে নাহি পায়। চলিলেক বাঘ সবে রণ করি জয়। গাজরি নিকটে গিয়া হরষিতে কয়। কি করে মুকুট রাজা শুন সমাচার। মৃত্যু জীব কুণ্ডা এক আছিল তাহার। তুলির কুণ্ডার পানি কলসি ভরিয়া। রাত্রি কালে জল লয়ে রণস্থলে গিয়া যত সেনা হাতি ঘোড়া রণেতে মরিল। সবার অঙ্গেতে জল ছিটাইয়া দিল। তবেত সকল মৃত্যু পাইল জীবন। যত সেনা হাতি ঘোড়া উঠিল তখন। পশ্চাতে তাহার পুনঃ সাজিল সত্বর। গাজিও বাঘের সাথে করেন সমর। সময় করিয়া লোক নাশ হয়ে যায়। জল ছিটাইয়া পুনঃ জিয়া ওঠে তায়। এই রূপে নিত্য নিত্য করিতেছে রণ। আঠার দিবস হইল তবে বাঘ গণ। অশক্তি হইল আর না পরে লড়িতে। মুখে ঘাও হইল লোক মারিতে মারিতে। দাঁত নখ সকলের ভাঙিয়া পড়িল। আসিয়া গাজির গাছে কহিতে লাগিল। নাহি জানি কত লোক মুকুট রাজার। যত মারি তত বাড়ে নাহি পারি আর। ভাঙা গেল দাঁত নোখ মুখে ঘাও হইল। অঙ্গে আর শক্তি নাহি করিব বল। শুনিয়া সাহেব গাজি দু-আঁখি মুছিয়া। মৃত্যু জীব কুপ দেখে ধেয়ান করিয়া। গাজি বলে বাঘগণ শুন সকলেতে। মৃত্যু জীব কূপ আছে রাজার বাটিতে। অমুক স্থানেতে কুণ্ডা শুন সমাচার। গোবধ করিয়া যদি পার ফেলিবার। তবেত দণ্ডে তে রণ জয় হইয়া যাবে। বাঁচিবার শক্তি আর কার নাহি হবে। তবে বাঘ বেড়াভাঙা ওঠে ফাল দিয়া। আনিলেক গরু এক তখনি মারিয়া। এক চাক্কা মাংস তার

www.pathagar.com

লয়ে এক পরী। কুণ্ডাতে ফেলিয়া সেই আসিলেক উড়ি। তৎপরে বাঘ আর যত পরী চিল। একেবারে সবে সাজি সমরে চলিল। যত২ সেনা ছিল মুকুট রাজার। বাঘ আর পরী গিয়া মধ্যেতে তাহার। হাতে দাঁতে বাঘগণ লক্ষ২ মারে। খাড়া হাতে লয়ে পরী কাটে শূন্যভরে। কাটিয়া চলিল লোক হাজার হাজার। মানুষের রক্তে হইল বাঘের সাঁতার। সাঁতারিয়া বাঘগণ চারিদিকে ঘুরে। জীবিত যাহারে পায় ঘাড়ে গিয়া ধরে। তিন কোটি লোক ছিল মুকুট রাজার। বার লক্ষ্য হাতি ঘোড়া ছিল বেশুমার। পরী আর বাঘে সবে মারিয়া ফেলিল। একটি জীবিত নাহি সে দিন রহিল। তবে ত মুকুট রাজা সে জল লইয়া মরা সবের অঙ্গে পানি দিল ছিটাইয়া। ভরিয়া তাবত রাত্র জল ছিটাইল। তবুত নাহি এক প্রাণী উঠিয়া বসিল। মনে মনে বলে রাজা শিরে হাত দিয়া। কুণ্ডাতে গোমাংস গেছে যবনে ফেলিয়া। হায়২ কোথা যাব কি হবে আমার। আসিয়া খাইবে বাঘে রক্ষা নাহি আর। এ বলিয়া ভয়ে রাজা কোন কাজ করে। পালাইয়া গেল তবে শীতল মন্দিরে। লোহার কপাট আঁটী লাগাইল তাতে। যেইরূপে না পারে বাঘ ভিতরে যাইতে। সেইখানে বাঘ সবে জয় করি রণ। কারাগারের দিকে সবে করিল গমন। দুয়ারী প্রহরী যত সেইখানে ছিল। ধরিয়া২ বাঘে সকলি মারিল। মারিয়া প্রহরীগণে গিয়া কারাগারে। কালুকে দেখিয়া বান্ধা লোহার জিঞ্জিরে। অমনি পড়িল বাঘ কালুর চরণে। লুটিয়া লুটিয়া ভূমে কান্দে জনে জনে। কালু শাহা সকলেরে করিলেন স্থির। তবেত ভাঙিয়া বাঘে লোহার জিঞ্জির। খান্দেওয়ারা বাঘে ধরি কালুর পায়েতে। উটাইয়া লইলেন আপন পৃষ্ঠেতে। কালুকে লইয়া পৃষ্ঠে চলে খান্দেওয়ারা। নাচেন সকল বাঘ লেজ করি খাড়া। দূরে থাকি শাহা গাজি কালুকে দেখিয়া। ভাই২ বলি শাহা ধরিল আসিয়া। হায়রে প্রাণের ভাই কালুরে আমার। আছিল এতেক দুঃখ কপালে তোমার। মোর লাগি ভাই তুমি কারাগারে গেলে। কান্দিয়া ধরিল গাজি কালু শাহার গলে। গলাগলি করি তারা দুই ভাই কান্দে পাগড়ি খসিয়া পড়ে তুলে নাহি বান্ধে। দোহার কান্দন দেখি যত বাঘ পরী। কান্দিতে লাগিল সব হেট শির করি। তৎপরে মন শান্ত করে দুইজনে। বসিলেন সিংহাসনে প্রফুল্ল বদনে। দক্ষিণা রায়ের দেখি কালু শাহা বলে। এমন দারুণ দেও কেমনে ধরিলে। হাসিয়া বলেন কালু ধন্য গাজি ভাই। রাখিয়াছ পালঙ্ক নিচে রাজার গোসাঁই। হেন সমে শাহা গাজি হরিষ অন্তরে। খান্দেওয়ারা বেড়াভাঙা দুইটি বাঘেরে। ডাকিয়া কহেন অতি করিয়া পিয়ার। পুত্রের সমান বাছা তোমার আমার। রাজাকে আনিয়া দেহ ত্বরিত করিয়া। তোমাদের নাম রবে জগত জুড়িয়া। শুনিয়া তখনি বাঘ গর্জ্জিয়া চলিল। অবিলম্বে রাজপুরে লাফ দিয়া গেল। লোহার কপাট দাঁতে সকলি ভাঙিয়া। একেবারে অন্তঃপুরে গেলেন চলিয়া। দেখিয়া বাটী শোভা বাঘ দুই জন। আশ্চর্য হইয়া রহে মেলিয়া নয়ন। সোনার মন্দির মঠ অট্টালিকা যত। তার মধ্যে মণি মুক্তা গাঁথিয়াছে কত। আর তাতে নানা চিত্র অতি মনোহর। জিনিয়া ইন্দ্রের পুরী দেখিতে সুন্দর। কত শত অট্টালিকা সংখ্যা নাহি তারই

www.pathagar.com

ফিরোজা পাথর দিয়া গাথিয়াছে দ্বার। হীরার কপাট আর কত সারি সারি। তার মধ্যে গাথিয়াছে মাণিক্যের জুরি। আশ্চর্য হইয়া বাঘ লাগিল কহিতে। মানুষে এমন পুরি গড়িছে কি মতে। দেখিয়া বাড়ির ঠাট বাঘ দুইজনে। রাজাকে খুঁজিয়া ফিরে দালানে২। সকল দালানের মধ্যে দিয়াছেন দ্বার। না পায় কুজিয়া বাঘ উদ্দেশ রাজার। উচ্চ এক অট্টালিকা দক্ষিণেতে ছিল। তাহার কপাট গিয়া প্রথমে ভাঙিল। কপাট ভাঙিয়া বাঘে দেখে দাঁড়াইয়া। চাম্পার ভাজুরা সব আছেন বসিয়া। বাঘ দেখে ভয়ে তারা কাঁপিতে লাগিল। লজ্জিত হ্য়িা বাঘ ফিরিয়া আসিল। পশ্চিম কপাট গিয়া ভাঙিলেন পরে। তার মধ্যে দুই বাঘ দেখে আড়ে২। চাম্পার মামীরা সব আছেণ তাহাতে। হেন সমে খান্দেওয়ারা লাগিল কহিতে। সাহেবের মামি শ্বাস এরা সব হয়। উপহাস করি কিছু মোর মনে লয়। শুন ভাই বেড়াভাঙা বসি দেখ তুমি। তাহাদের সাথে ঠাট্টা করি কিছু আমি। মারিল বিজলী এক লেজ খাড়া করি। ওমা২ বলি সবে করে দৌড়াদৌড়ি। পরন বসন কার পড়িল খসিয়া। ভয়েতে দিলেন কেহ হাগিয়া মুতিয়া। বেড়াভাঙা বলে শুন খান্দেওয়ারা ভাই। ক্ষেন্ত দিয়া এস শীঘ্র আর কাজ নাই। তৎপরে গিয়া তারা উত্তর দালানে। কপাট ভাঙিয়া দেখে বাঘ দুইজনে। চাম্পা আর লীলাবতী বসিছেন খাটে। বাঘ দেখে ভয়ে চাম্পা মার কোলে ওঠে। হেন কালে কহে সেই বাঘ দুই জনে। না করিও ভয় কিছু আপনার মনে। আমরা সেবক মাতা হইগো তোমার। সাহেবের সাহেবানী তুমি যে আমার। ধরিয়া চাম্পার পদে বাঘ দুই জনে। সালাম করিয়া তারা চলিল তখনে। কপাট ভাঙিয়া দেখে শীতল মন্দিরে। বসিয়া মুকুট রাজা কাঁপে থরে২। রাজাকে ধরিয়া বাঘে হইয়া পৃষ্ঠেতে। লাফ দিয়া চলে যায় গাজির কাছেতে। দূরে থাকি কালু শাহা রাজাকে দেখিয়া। পাদুকা ফেলি পির যায় দৌড় দিয়া। বাঘ হইতে ছাড়াইয়া লইয়া রাজারে। অনেক সম্মান করি আনে হাত ধরে। কালুর কাছে কহে রাজা কান্দিয়া কান্দিয়া। গাজিকে কহিবা বাবা তুমি বুঝাইয়া। প্রাণ রক্ষা যদি তিনি করেন আমার। দিব যাহা কয় তিনি সে কথা মানিব। রাজাকে লইয়া কালু গিয়া যে তখন। কহেন গাজির কাছে এমত বচন। অপরাধ ক্ষমা কর মুকুট রাজার। চাম্পাকে দিবেন বিয়া জাতি দিবে আর। শুনিয়া সাহেব গাজি রাগ ক্ষমা দিয়া। রাজাকে বসান কাছে আপনি উঠিয়া। হেন সমে বাঘ আর পরী সকলেতে। উপহাস করি বলে রাজার সঙ্গেতে। পরীগণ বলে রাজা মনে কিবা ভাব। দক্ষিণা রায়েল মতো কান কেটে দিব। এক পরী হেসে২ বলে এই বাণী। না জানি তোমার রানি কেমন রান্ধনী। কহ শুনি রান্ধে রানি অম্বল কেমন। আরনি সাগের মধ্যে দিতে পারে নুন। মেরা পিঠা বানাইতে পারেনি সে আর। কহ গুণ রান্ধনের কাছে জামাতার। এক পরী বলে রানি রান্ধে বড় মজা। বিনা তৈলে মাছ আর বড়া করে রাজা। এইরূপে উপহাস করে পরীগণ। লজ্জায় মুকুট রাজা না তুলে নয়ন। কালুকে ডাকিয়া রাজা কহিলেন পরে। ছড়িয়া দেহরে বাছা দক্ষিণা রায়েরে। বিলম্ব করিয়া আর কিছু কাজ নাই। বাঘ পরী ছুটি দিয়া গৃহে চলে যাই।

www.pathagar.com

গাজিকে কহেন রাজা মধুর ভাষায়। শুন২ বাবা ধন বলিহে তোমায়। বড় আহ্লাদের কন্যা মোর চাম্পাবতী। সাত পুত্র মধ্যে সেই আদরের অতি। তার প্রতি দয়া তুমি সর্বদা রাখিবা। অনিষ্ট করিলে কোন মার্জ্জনা করিবা। চাহিয়া খোদার পানে পালিও তাহায়। দুঃখ ক্লেশ কোনোমতে নাহি যেন পায়। তবেত সাহেব গাজি উঠিয়া তখন। দক্ষিণা রায়েরে দিল ছাড়িয়া বন্ধন বাঘ পরী সবাকারে কহেন ডাকিয়া। পাইলে অনেক কষ্ট আমার লাগিয়া। এই সব মনে কেহ কিছু না রাখিবে। এমন দিবাই দেই যাহ চলি সবে। শুনিয়া সকল বাঘ আর পরীগণ। সালাম করিয়া তারা চলল তখন। চলিল মুকুট রাজা আপন বাটিতে। গাজি আর কালু শাহা চলে সাথে। বাটিতে গেলেন সবে চলিয়া ত্বরায়। শীতল মন্দিরে নিয়ে রত্ন সিংহাসনে। বসাইল দুইজনে হরষিত মনে। রাজা প্রজা যত আর পাত্র মিত্র ছিল। আসিয়া গাজির কাছে কালেমা পড়িল। তৎপরে বিবাহের করে আয়োজন। আনিলেন জাতি গোষ্ঠী করি নিমন্ত্রণ। আনন্দের সীমা নাই পুরীতে তাহার। আবদুর রহিম বলে পাচালি পয়ার।

ধুয়া।
আজি কি আনন্দ রাজার ভুবন মাঝে
ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি নানা বাদ্য বাজে
নর্ত্তকী কামিনীগণ শতে শতে সাজে
গাইতে নাচিতে আজ্ঞা দিল মহারাজে।

পয়ার। নাটুয়া করেন নৃত্য বাইরে করেন গান। নানা জাতি বাদ্য বাজে মধুরা সমান। ডগর মৃদঙ্গ ঘণ্টা দামামা কর্ণাল। ভেউর ঝাঞ্জার কারা মাদল বিশাল। রাম খাড়া জয় ঢাক বীণা বাঁশি। তুমি ভেরী পাখওয়াজ ঢোল বেহাল বাঁশি। ঠেমাক খেমছা আর সানাই সেতারা। খোওয়ারি খমখ তাসা তবল তাম্বুরা। সারঙ্গ সারিন্দা কাজে মন্দির পাঞ্জরি। টিকারা ডম্বল ডঙ্কা বাজে সারি২। ঢপ ও রৌশনী চৌকি বাদ্য যত আর। ভিন্ন২ শব্দে বাজে ভুবনে রাজার। নানা জাতির বাজি আর ছাড়ে কত২। একেবারে জ্বলে ওঠে অজুত২। সপ্ত দিবস ভরিয়া গান বাজা হয়। যতেক তামাসা আর নাহিক নির্ণয়। নগরেতে কার ঘরে নাহি চরে হাঁড়ি। স্ত্রী পুরুষ মিলে সবে খায় রাজবাড়ি। পশ্চাতে মুকুট রাজা সভাসদ লৈয়া। শুভদিন শুভক্ষণ গণিয়া বাছিয়া। বর কন্যা সাজাইতে আদেশ করিল। প্রথমে নাপিত আসি উপস্থিত হইল নাই বেটা বড় ঠেটা এক নখ কাটি। তিন বোঝা শিদা সেই বান্ধিলক আটি। তবু বেটা বলে বাকী রহিলেক দাল। দাল দাল করি সেই ফুলাইল গাল। দাল পেয়ে বলে পুনঃ রহিলেক নুন। নুন২ করি বেটা হইতে চায় খুন। নুন লয়ে গেল তবে বিদায় হইয়া। পশ্চাতে জামাই কন্যা সকলে মিলিয়া। প্রথমে সাজায় সবে সাহেব গাজিরে। আনিয়া সুগন্ধি তৈল দিল অঙ্গ পরে। আতর গোলাপ চুয়া কস্তুরী কুমকুম। আর কত পুরুতল উত্তম। মাণিক্য বসন পরে অঙ্গে পড়াইল। কোটি শমী যিনি গাজি আসিয়া বসিল। অন্তঃপুরে রামাগণ সাজায় চাম্পারে।

www.pathagar.com

প্রথমে হরিদ্রা তৈল দিল অঙ্গ পরে। গোলাপের জল দিয়া স্নান করাইয়া। দিলেন সুগন্ধি তৈল পশ্চাতে মাখিয়া। উচ্চ করে বান্ধিলেক মস্তকে লোটন। তাহাতে গাথিয়া দিল সেইত রতন। পড়াইল কত আর রত্ন অলঙ্কার। কোটি শশী যিনি রূপ অঙ্গে জলে যার। রত্ন মণি থাকে তার পদ তলে পরে। দেশ চার মতো তব হয় পরিবারে। পরশ মাণিক গাঁথা বসন পড়িল। সূর্য যিনি ঝলমল করিতে লাগিল। হরষিতে চাম্পাবতী বসিল সাজিয়া। হেন কালে কালু শাহা সময় বুঝিয়া। ত্বরিৎ উকিল সাক্ষী পাঠাইয়া দিল। উকিরেল কাছে চাম্পা কবুল করিল। পশ্চাতে সাহেব গাজি করিল স্বীকার। বিবাহ বন্ধন দৃঢ় হইল দোহার। বিবাহ করিয়া গাজি হরিষ অন্তরে। দেখিতে চাম্পার মুখ গেল অন্তঃপুরে। চাম্পার মন্দিরে গাজি যেই সমে গেলো। তাহার রূপেতে পুরী হৈয়া গেল আলো। রূপের সাগর গাজি রূপ বেয়ে পড়ে। মনোহর রূপ সেই মন চুরি করে। দেখিয়া গাজির রূপ যত রমণীগণ। গালে হাত দিয়া ভাবে পাসরিয়া মন। কেহ নাহি পারে চিত্ত বান্ধিয়া রাখিতে। অভিলাস দাসী হয় সে পদ সেবীতে। চাম্পার ভাজুয়া সবে গাজিকে দেখিয়া। হাত পায় পড়ে ভূমে দিগাম্বরী হৈয়া। কতক্ষণ পরে তারা হইল চেতন। উঠিয়া বসিল আটি পড়িল বসন। পশ্চাতে চাম্পার কাছে তাহারা বসিয়া। দেখিয়া চাম্পার মুখ ঘুমটা টানিয়া। গাজি চাম্পা চারি চক্ষে যখন চাহিল। চোখ মেলি চোখে২ চাহিয়া রহিল। হইলেন মত্ত দুই দুয়ের রূপেতে। বধূগণ উপহাস লাগিল করিতে। নারিকেল কচু কেহ কাটি এক সাথে। গাজির সম্মুখে আনি দিলেন খাইতে। কেউ ঝাউ বিচি সব কাটিয়া২। সুপারির সাথে আনি দিল মিলাইয়া। আর আনি যুই পাতা দিল পান সাতে। হুক্কাতে গোবর গাজি দিলেন সাক্ষাতে। খৈ সাথে দিয়া তার কুসুম চুত্রার। কাছে আনি খাও২ বলে বার বার। দেখিয়া সাহেব গাজি চিনিয়া সকল। কহিতে লাগিল ধরি তাহার অঞ্চল। শুনল সুন্দরী সব লাগে মরি যাই। কি কহিব আমি নতুন জামাই। পুরুষের হাতে নাহি পড়িছ কখন। স্বপ্নের নাহি দেখিয়াছ পুরুষ কেমন। পুরুষের বশীভূত যেই সব নারী। তারা নাহি ভালবাসে হাস্যতা চাতুরি। তোমাদের পতিগণ সকলি বর্বর। রমণী হইয়া কর রমণীর ঘর। রতি শাস্ত্র নাহি তারা করিয়াছ পাট। রতির পণ্ডিত হইলে ভেঙে দিত ঠাঁই। এ কথা সাহেব গাজি যখন কহিল। মুখেতে পাড়ক দিয়া সব দৌড় দিল। ভালো২ দ্রব্য কত পশ্চাতে আনিয়া। খাওয়ান গাজিকে তারা সকলে মিলিয়া। খাইয়া শুইল গাজি চাম্পার ভবনে। হেন কাল চাম্পাবতী প্রফুল্ল বদনে। সুগন্ধি পানের খিলি স্বহস্তে গড়িয়া। পতির মুখেতে সতী দিলেন তুরিয়া। হরিষে পালঙ্ক করে করিয়া শয়ন। চুম্বিলেক দুই জনে দোহার বদন। কোলাকোলি মিলামিলি করিলেন আর। নিভিল মনের অগ্নি ছিল যত যার। আনন্দ দিল দেখা নিরানন্দ গেল। পাইল যতেক কষ্ট সব পাসরিল। ডুব দিয়া দুইজনের সুখের সাগরে নানা মতে খেলা নিত্য২ করে। এইরূপে এক পক্ষ গত হইয়া গেল। আনন্দেতে নিরানন্দ এসে দেখা দিল। মহা সুখে রহে গাজি চাম্পার মন্দিরে। একাকী থাকেন কালু বাটির বাহিরে। মনে২ ভাবে কালু কি

www.pathagar.com

করি উপায়। বন্দি হইল ভাই মোর ভাবের মায়ায়। এ জাল কাটিতে তার সাধ্য নাহি আর। ফকির হইল মিছা নামেতে আল্লার। এই সব লোব যদি মনে তার ছিল। রাজত্ব ছাড়িয়া কেন ফকির হইল। কেমনে দেখাব মুখ খোদার কাছেতে। এ বলিয়া কালু শাহা লাগিল কান্দিতে। অমনি আসিয়া গাজি উপস্থিত হলো। কান্দিতেছে কালু শাহা স্বচোখে দেখিল। তবেত সাহেব গাজি গলায় ধরিয়া। জিজ্ঞাসা করেন অতি মিনতি করিয়া। কি কারণে কান্দ ভাই কহ মোর ঠাঁই। নাহি যদি কহ তবে খোদার দোহাই। কালু বলে কান্দি ভাই তোমার কারণ। মায়ার জালেতে তুমি হৈলা বন্ধন। মায়া রাক্ষসিনী হয় জান নারী জাতি। তাহার সঙ্গেতে ভাই যে করে পিরিতী। ভবের বেপার যত সকলি হারায়। রাক্ষসিনী নারী তার মূলধন খায়। এদিক সেদিক নয় রহিলেন মধ্যেতে। তাহার দৃষ্টান্ত এক শুন খায় চিত্তে এক নারীর হয় যদি দুই পতি তার। বল দেখি মন সেই রাখিবে কাহার সেই মতো এক প্রেম তোমার অন্তরে। নারীকে দিবেন দিবা দিবেন খোদারে। হইলে সন্তান মায়া লাগাইবে বেড়ী। মিটিবে খোদার প্রেম পুত্র মুখ হেরি। ঘাটেতে বান্ধিয়া নৌকা পুজি ভেঙে খাবে। সকল হারায়ে ভবে খালি হাতে যাবে। শুন এক ইতিহাস কোরআণের বাণী। মরিয়ম সতী ছিল ঈসার জননী। খোদার প্রেমেতে হেন মন মজাইল। একেবারে আপনাকে পাসরিয়া গেল। সদয় হইয়া প্রভু তাহার কাছেতে। পাঠাইল হুরগণ বেহেশত হইতে। বেহেশতের ফল মেওয়া দ্রব্য যত আর। আনিয়া দিতেন হুর মুখে তুলে তার। তার পরে ঈসা নবী যখন জন্মিল। মমতা করিয়া পুত্র কোলেতে লইল। কোলেতে লইয়া স্তন দিতেন মুখেতে। তখনি কহেন প্রভু আকাশ বাণীতে। এতদিন এক প্রেমে আমাকে ডাকিলে। এখন পাইয়া শিশু মোরে পাসরিলে। দুই ভাব হইয়া এবে গেলগো তোমার। এখন খাইতে বসি না পাইবে আর। এখান হইতে তুমি চলিয়াগো যাও। পাড়িয়া বনের ফল বনে গিয়া খাও। আর না পাইবে হুর জীবন থাকিতে। নাহি চিনতা পাবে পুনঃ মারিলে বেহেশতে। শুন২ ভাই গাজি কি করিব আর। বুঝাকে বুঝায় হেন শক্তি আছে কার। এই কথা কালু শাহা যখন কহিল। হাসিয়া বলেন গাজি কিবা মোরে বল। বন্ধন নাহিক আমি নারীর পিরীতে। নারী কী ধরিয়া মোরে পারিবে রাখিতে। শুন ভাই রাত্রি কালে আমি চলে যাব। রাজা রানি কার কাছে কিছু না বলিব। নিন্দ্র গেলে চাম্পাবতী নিশিরাত কালো। চাম্পাকে নিদ্রায় ফেলি মোরা যাব চলে। এ বলিয়া শাহা গাজি কালুকে লইয়া। চাম্পার মন্দির মধ্যে আসিল চলিয়া। রাত্রি কালে মন্দিরের মধ্যে ঘেরা দিয়া। এক দিকে কালু শাহা রহিল শুইয়া। আর দিগে গাজি আর সগি চাম্পাবতী। শুইলেন পালঙ্ক পরে শীঘ্র শীঘ্র অতি। ভাঙা ভাঙা মন চাম্পা দেখিয়া গাজির। ভাবিতে লাগিল ধনি হইয়া অস্থির। নিশ্চয় প্রাণের নাথ ছাড়িবে আমায়। মনে২ কান্দে শুয়ে নিদ্রা নাহি যায়। দ্বিতীয় প্রহরে রাত্রি গেল গত হইয়া। হেন কালে শাহা গাজি নিদ্রাতে জাগিয়া। চুপে চুপে জাগাইয়া কালুরে তখন। চলিলেন ধীরে ধীরে ভেবে নিরঞ্জন। হেনকালে চাম্পাবতী এলো মেলো কেশে। দৌড়

www.pathagar.com

দিয়া ধরে গিয়া পাগলিনীর বেশে। ধলিয়া গাজির পদে পড়িয়া ধরাতে। কোলাকুলি হৈয়া কহে কান্দিতে২। দাসীরে ছাড়িয়া নাথ কোথা তুমি যাও। একবার ফিরে চাও মোরা মাথা খাও। গাজি বলে প্রাণ প্রিয়ে না চাহিব আর। জাননা কি হই আমি ফকির আল্লার। ফকিরের নাহি আছে এইমত বিধি। নারী লয়ে গৃহবাস করা নিরবধি। চাম্পা বলে জ্ঞান নাহি আছিল পূর্বেতে। নমস্কার করি কান মলন পশ্চাতে।

গীত তাল আদ্ধা

এমন পিরীতি বন্ধু শিখিলে কোথায়। ধিক তারে
প্রেম শিক্ষা যে দিল তোমায়। আহা মরি একি
রীতি, যেমন ভৃঙ্গের প্রতি, খাইয়া ফুলের মধু ফুল
ছাড়িয়া যায়। বসে গিয় অন্য ফুলে, তেমনি ধারা
যাও চলে, অন্য নারী কাছে বুঝি ত্যাজিয়া আমায়।

পয়ার। এ বলিয়া চাম্পাবতী কান্দে উভরায়। ধীরে ধীরে কহে গাজি মধুর ভাষায়।

গীত তাল আদ্ধা

মন্দ কি তোমারে বাসী চিন্তা কেন মনে।
কিছু দিন ধৈর্য ধরি থাক নিকেতন। কপালে থাকিলে লেখা,
পুনরায় হইবে দেখা, তুমি আর আমি যদি থাকি জীবমানে
শুন শুন প্রাণ প্রিয়া, মনেরে প্রবোধ দিয়া,
থাক তুমি যাই আমি তীর্থ পর্যটনে।

পয়ার। এ বলিয়া চলে গাজি কালুরে লইয়া। চরণে ধরিয়া চাম্পা কহেন কান্দিয়া।

গীত তাল আদ্ধা

যেওনা২ বন্ধু যেওনা। এমন মধুর পিরীতে গরল দিও না।
কিঙ্করী ছাড়িয়া নাথ, কেন অকস্মাৎ, করে থাকি
অপরাধ করহ মার্জ্জনা। মোরে করি জলাঞ্জলি,
যাইতেছ কোথা চলি, দাসীরে লইয়া যাহ করিয়া করুণা।

পয়ার। আহা২ মরি২ হায়২ হায়। কি কহিব প্রাণনাথ বুক ফেটে যায়। কিঞ্চিৎ নাহিক মায়া তোমার অন্তরে। কেমনে ছাড়িয়া চাহ যাইতে আমারে। তোমার কারণে আমি হইয়া পাগল। লাজ ভয় জাতি কুল ত্যাজিনু সকল। মোর লাগি জাতি দিল বাপ ভাই সবে। কি দোষে আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইবে। ত্যাজে যদি যাও নাথ অবলা দাসীরে। কল্য বাপে বলি নিয়া দিবে চণ্ডিঘরে। তোমার চরণে আর হাতে আমি ধরি। নাহি যাও প্রাণনাথ মোরে পরিহরি। বনে গেলে রঘুনাথ সীতা লয়ে সাথে। গঙ্গাকে রাখিল শিব আপনার সাথে। আমাকে ছাড়িয়া চাহ যাইতে কেমনে। নারীর রক্ষক কেবা আছে পতি বিনে। যাও যাও প্রাণনাথ মোরে যাবে লইয়া। তব সাথে যাব আমি যোগিনী সাজিয়া। আমাকে ছাড়িয়া প্রভু যদি তুমি যাও। খোদার দোহাই আর মোর মাথা খাও। এই দিব্ব

www.pathagar.com

চাম্পাবতী যেই সমে দিল। শনিয়া সাহেব গাজি ভাবিতে লাগিল। গাজি বলে ভাই কালু কি করি উপায়। রাজার নন্দিনী সাথে যাইবারে চায়। কালু বলে কি করবা মইল অঙ্গের। যেতে চাহে লহ সাথে ভাবনা কিসের। লাগাইছ সাথে মইল আপনা অঙ্গেতে। এতক্ষণ আট মাস হবে ছাড়াইতে। তবেত সাহেব গাজি ভেবে নিরঞ্জন। চাম্পাকে লইয়া সাথে চলিল তখন। রাতারাতি ছাড়াইল ব্রাহ্মণা নগর। উপস্থিত হইল এক কানন ভিতর। এখানে মুকুট রাজা প্রভাতে উঠিয়া। দেখিলেন তিন জন গেছেন চলিয়া। আক্ষেপ করিয়া অতি লাগিল কান্দিতে। কান্দে রানি লীলাবতী হাত দিয়ে মাথে। সাত ভাই কান্দে আর দাসীগণ। কান্দিয়া রহিস সবে ভেবে নিরঞ্জন। এইখানে গাজি আর কালু চাম্পাবতী। চলিলেন তিনজনে হরষিত অতি। কানন ছাড়িয়া এক নগরেতে গেল। হেন কালে শাহা গাজি কহিতে লাগিল। শুন২ ভাই কালু প্রাণের দোসর। হইল জঞ্জাল এক চাম্পাবতী মোর। কোন মতে না পারিনু ছাড়িয়া আসিতে। এখন ইহারে লয়ে যাইব কিমতে। নগরের লোক সবে কহিবে হাসিয়া। কেমন ফকির এরা যায় নারী লৈয়া। এইত জঞ্জাল আমি কি কহিব ভাই। কালু বলে যাহা ইচ্ছা কর তুমি ভাই। এত শুনি শাহা গাজি কি করে তখন। চাম্পাকে দিলেন ফুক ভেবে নিরঞ্জন। চাম্পার অঙ্গেতে গাজি ফুক যবে দিল। হরিদ্রার ফুল হইয়া ততক্ষণ গেল। বান্ধিয়া রাখিল তাহা পাত্র মার্জ্জনিতে। পশ্চাতে নগর দিকে চলে হরষিতে। নগরেতে গিয়া ভিক্ষা করিয়া দুজনে। চলিয়া গেলেন এক নির্জন কাননে। কাননেতে গিয়া গাজি ফুল হরিদ্রার। বাম হাতে দিয়া ফুক দিল তিন বার। তবে সতী চাম্পাবতী মানুষ হইয়া। আনিলেন দাল চাল যে কিছু মাগিয়া। রন্ধন করিয়া তাহা দুই জনে দিল। পশ্চাতে কিঞ্চিৎ আর আপনি খাইল। রাত্রে শুইল গাজি চাম্পাকে লইয়া। কালু শাহা দূরে গিয়া রহিল শুইয়া। প্রভাতে উঠিয়া গাজি ফুকিয়া চাম্পারে। করিয়া দরিদ্রার ফুল বান্ধিল কাপড়ে। কখন২ আর অঙ্গুরী করিয়া। হাতের অঙ্গুরে মধ্যে রাখিতেন দিয়া। রন্ধনের কালে আর নিশ্চির কালেতে। করিয়া মানুষ গাজি শুইতেন সাথে। এই রূপে তিন অব্দ গত হইয়া যায়। মনে২ ভাবে গাজি কি করি উপায়। কত দিন বোঝা আর নারীর বহিব। এইত জঞ্জাল আমি কেমনে এড়াব। এ বলিয়া শাহা গাজি কোন কাম করে। আবার তিন ফুক দিলেন চাম্পারে। হৈয়া গেল চাম্পাবতী গাছ সেউড়ার। এ দশা করিল গাজি কালু শাহা আর। দুই ভাই যায় তারা চলিয়া তখন। হেন কালে কহে চাম্পা করিয়া রোদন। কোথা যাও প্রাণনাথ ছাড়িয়া আমারে। সঙ্গে করি লয়ে যাও অবলা দাসীরে। কি দোষে আমাকে তুমি গাছ বানাইয়া। বিদেশে ফেরিয়া যাহ আপনি চলিয়া। নির্দ্দয় অতি নাথ হে তোমার নাহি যাও মোরে ছাড়ি দোহাই আল্লার।

গীত তাল আদ্ধা

আহারে নির্দ্দয় নাথ আছিলে কোথা। কি দোষে
ছাড়িয়া যাহ আমি অবলায়। মজিয়া তোমার প্রতি

www.pathagar.com

বৈষ্ণুবী সাজিয়া সাথী, আসিলাম মাতা পিতা ছাড়িয়া সবায় ।
আমাকে বিদেশে ফেলি, যাইতেছ কোথা চলি,
এই কি প্রেমের ধর্ম, কি কব তোমায় ।

পয়ার । এ বলিয়া চাম্পাবতী অস্থির হইয়া । কহিলেন পুনরায় কান্দিয়া কান্দিয়া ।

গীত তাল আদ্ধা

পিরীত এমন কষ্ট জানি কি আগেতে । জর২ হৈল
তনু ভাবিতে২ । ভাবি আমি যার দায়, সে মোরে
ছাড়িয়া যায়, হায় দুঃখ কব কায়, বাঁচি না দুঃখেতে ।
রাজার নন্দিনী হৈয়া, করেতে করঙ্গ লইয়া, বিভূতি
অঙ্গে মাখিয়া, ভ্রমিলাম সাথে২ । তবু না হইল দয়া,
নাথের পাষাণ হিয়া, ঠেকিয়াছি প্রাণ দিয়া, রহিব
কিমতে । কুলমান পরিহরি হইনু কিঙ্করী তারি,
তব মোরে যায় ছাড়ি, ধিকরে পিরীতি । আবদুর
রহিম বলে, কোথা নাথ যাবে চলে, ফাঁদ দিছ
গলে, পারে কি যাইতেছে । কেন হও তুমি রুষ্ঠ, জান না
কেমন কষ্ট, তাহার দ্বিগুণ মিষ্ট, আছেগো পশ্চাতে ।

পয়ার ।

এত শুনি কহে গাজি মধুর বচনে । আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গানে ।
ছি ছি ছি ও প্রাণেশ্বরী কেন বল এত । আমি কি ফুলের
অলি, অন্য ফুলে যাব চলি, লম্পট পুরুষ যারা তাহাদের
মত । চুকা কথা বেকা মুখে, এই জানে নারী লোকে
তোমাদের রীতি আমি বলি কত শুন । ক্ষণে নারী কানে
ধরে, ক্ষণে ক্ষণে পায়ে পড়ে, তিলেরে, যত নারী তারে নিন্দে,
এমন নারীর হবে নরকে বসত ।

পয়ার । এই সব কথা চাম্পা শুনিয়া গাজির । হেট শিরে ভাবে সতী হইয়া অস্থির । গাজি বলে কেন চাম্পা ভাবহ অন্তরে । খোদার শপথ না ছাড়িব তোমারে । কিছু দিন আসি আমি করিয়া ভ্রমণ । নিশ্চিতে বসিয়া কর আল্লাহে স্মরণ । এই কথা শাহা গাজি চাম্পাকে কহিয়া । কালুরে লইয়া সাথে গেলেন চলিয়া । নানা দেশে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া । দেখেন খোদার সৃষ্টি ভরিয়া নয়ন । আবদুর রহিম বলে পাচালি পয়ার । গলাচিপা গ্রাম মাঝে নিবাস যাহার ।

ধুয়া ।

গাই গীত সুললিত মৃদু স্বরে গাই ।
চলে গাজি জিন্দা গাজি সঙ্গেতে কালু ভাই ।

www.pathagar.com

পয়ার। এক দিন গাজি কালু যায় পথ দিয়া। দেখে এক গোদা আছে পথেতে পড়িয়া। জামালিয়া নাম তার গোদ দুই পায়। চলিতে না পারে গোদা গোদের জ্বালায়। তার বৃক্ষ তুল্য গোদ বড়২ বিচি। যেমন আশির পাক্কা সোয়াসেরী খুচি। মাঠে গেলে রাখালেরা মারে ধাক্কা ঠেলা। ঘরেতে গৃহিণী তার বলে গোদা শালা। গোদের জ্বালায় গোদা দুঃখিত অন্তরে। আসিয়া শুইল পথে প্রাণ ত্যাজিবারে। হেন সমে গাজি আর কালুশা আসিয়া। গোদাকে দেখিয়া পথে কহে ডাক দিয়া। কে তুমি শুইছ পথে পথ ছাড়িয়া দেহ। গোদা বলে মুখে মোর লাগি মারি যাহ। বড়ই দুঃখী আমি পড়িয়াছি পথে। আমার সমান পাপী নাহি ত্রিজগতে। দারুণ গোদের দায় চলিতে না পারি। যমে ছাড়ি গেছে মোরে এই গোদ হেরি। শুনিয়া সাহেব গাজি কহেন তখন। ঘুচিবে তোমার দুঃখ শান্ত কর মন। এ বলিয়া দুই হাতে ধরিয়া গোদাকে। দুই জনে দুই পদ লাগিল চিপিতে। চিপিয়া তাহার জল পদ্ম পাত্রে লইয়া। বিক্রমপুরের দিকে দিলেন ফেলিয়া। এক ছিটা পরে তার বাদ্য মৃজাপুর। আর ছিটা পরে নদীয়া শান্তিপুর। কিঞ্চিৎ পড়িল তার তাবত মহীতে। অর্দ্ধেক পড়ল ঢাকা বিক্রমপুরেতে। কবিরী কলা পাতি লেবু এক সাথ করি। খাইলে বিক্রমপুরে মাস তিন চারি। জন্মিবেক গোদ কিংবা বাড়িবেক পোতা। শুন শান্তিপুর নদীয়ার কথা। সেই স্থানে নারীদের স্তন বেড়ে যায়। যুবাকালে দেখা যায় বৃদ্ধা নারীর ন্যায়। তৎপরে গাজি কার কালু শাহা পির। আরোগ্য করিয়া সেই জামালিয়া গোদারে। আশীর্বাদ করি পির কহিলেন পর। শুনহ জামাল তুমি হবে সওদাগর। এইখানে খুদে দেখ আছে বহু ধন। হইবে মানাই সাধু তোমার নন্দন। তাহার বংশেতে ধনী হইবে বিস্তর। সপ্তমত পুরুষ বধি দিয়া যাই বর। এই বলিয়া চলে গাজি কালুকে লইয়া। লিয়া কতেক দেশ যায় এড়াইয়া। এক দিন দেখে এক সাগরের তীরে। বসিয়া তিনশত যোগ তথা জপ করে। গাজি কালু গিয়া সবের তপস্যা ভাঙিল। ক্রোধ হইয়া যোগীগণ মারিতে আসিল। বাঁশ লয়ে যায় তারা গাজিকে মারিতে। হেন কালে শাহা গাজি লাগিল কহিতে। কহ সবে তপস্যা কর তোমরা কাহার। তারা বলে তপস্যা মোরা করিত গঙ্গার। গাজি বলে মোর কথা শুন যোগীগণ। করাইতে পারি যদি গঙ্গার দরশন। হইবানি মুসলমান করহ স্বীকার। তারা বলে পাই যদি দরশন গঙ্গার। তবেত তোমার কথা করিব পালন। করাও গঙ্গার সাথে এখনি দরশন। তবে গাজি তাহাদিগকে সঙ্গেতে লইয়া। নদীর তীরেতে শাহা ততক্ষণ গিয়া। মাসী মাসী বলি গাজি তিন ডাক দিল। মকর বাহনে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। উঠিয়া জিজ্ঞাসে কহ ভগ্নির নন্দন। কি কারণে বাছা করিলে স্মরণ। গাজি বলে শুন মাসী নিবেদন করি। এই সব যোগীগণ বহু দিন ধরি। করেন তোমার জপ করিতে দরশন। তাহাদের বাঞ্ছা পুরা করহ এখন। পদ্ম পাত্রে মাসী তুমি বৈসহ উঠিয়া। দেখুক ইহারা সবে নয়ন ভরিয়া। তবে গঙ্গা পদ্ম পত্রে উঠিয়া বসির। সর্ব অঙ্গ যোগীগণে তাহারে দেখিল। গাজি বলে যাহ মাসী চলিয়া এখন। তবে গঙ্গা পাতালেতে করিল গমন। যোগীগণ বলে ধন্য২ শাহা গাজি। যাহার

www.pathagar.com

অধীন গঙ্গা মোরা তাকে পুজি। যবনের তুল্য আর নাহি আছে জাতি। যাহাকে করেন মান্য গঙ্গা ভাগিরথি। তখন গাজির কাছে সকলে আসিয়া। হইলেন মুসলমান কালেমা পড়িয়া। তৎপরে শাহা গাজি লয়ে সাধুগণে। গড়িলেন মসজিদ এক সেই খানে।

ত্রিপদী। সাধুগণ সবাকারে, লয়ে গাজি জিন্দা পিরে, গড়িলেন মসজিদড় সেখা। ফিরোজা আকিক দিয়া, দিল তাহা বানাইয়া, মধ্যে তারা হীরা মুক্তা গাঁথা। কতদিন সেইখানে, রহে গাজি হর্ষ মনে, কহে পরে কালুর গোচর। আর না এখানে রব, পাতাল নগরে যাব, যথা আছে জ্যেষ্ঠ সহোদর। এ বলিয়া শাহা গাজি, যখন চলিল সাজি, সাধুরা মসজিদে রহিল। গাজি কালু দুই পীরে, গিয়া সেই কত দূরে, মৃত্তিকা ডাকিয়া কহিল। শুন মাগো বসুমতি, পথ দেহ শীঘ্র অতি, যাব আমি পাতাল নগরে। তবেত সরিল মাটি, পথ হইল পরিপাটি, গোড়া পাব তথা যাইবারে। গাজি কালু হরষিতে, চলিল সুরঙ্গ পথে, মনে মনে ভেবে নিরঞ্জন। দুই জন চলিয়া যায়, কত দূরে গিয়া পায়, জঙ্গরাজা তাহার ভবন। দেখিয়া পাতালপুরী, বলে গাজি আহা মরি, হেন পুরী না দেখেছি আর। সুবর্ণের বর্ণ মাটি, যেমন সুবর্ণ খাঁটি, বৃক্ষ বন বরণ সোনার। কীট আদি যত জীবী, সকলি সোনার ছবি, দেখে গাজি গালে হাত দিয়া। গালে হাত দিয়া পরে, দুই ভাই ধীরে২ চলিয়া নগর মধ্যে গেল। শোভিত নগর খানি, ইন্দ্রের উদ্যান যিনি, হীরা লাল গড়াগড়ি যায়। নগরের শোভা দেখে, দুই ভাই হেটমুখে, বসে এক বৃক্ষের তলায়। অশেষ ক্রিয়া খোদার, জানে কত মায়া আর, সে রাত্রে জুলহাস দেখেন স্বপন। দেখাইল এ প্রকার, গাজি নামে ভাই তার, আসিয়া সে পাতাল ভবন। অমুর গাছের তলে, বসিলে শোকাকুলে, ভাই তার কালুর সঙ্গেতে। এমন স্বপন দেখি, কান্দিয়া ভাষায় আঁখি, মাতা পিতা সবার শোকেতে। রজনী প্রভাব হইল, দিন নাথ দেখা দিনু, অমনি জুলহাস চলিল।

দুই ভাই যথা আছে, যাইয়া তাহাদের কাছে, মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল। তোমাদের ঘর কোথা, কেবা হয় মাতা পিতা, শাহা গাজি কহেন তখনি। বৈরাট নগরে ঘর, পিতা মোর সেকান্দর, অজুপা হয় মোর জননী।

গীত তাল আদ্ধা

ডাকিগো কাতরে ত্রাণ কর দীনে। তোমা বিনে
কেহ মোর নাহি ত্রিভুবনে। পাপ বোঝা লিয়া মাথে,
দাঁড়াইয়াছি জোর হাতে, ভাগোড়া কিঙ্কর আমি
আসিয়া সদনে। কর পাপ পরিহার, পতিত পবন
আর, দয়াল তোমার নাম শুনেছি শ্রবণে।

পয়ার। গাজি বলে পিতা মোর শাহা সেকান্দর। অজুপা জননী ঘর বৈরাট নগর। শুনিয়াছি ভাই মোর আছে এই দেশে। আসিলামত রসাতলে তাহার উদ্দেশ্যে। এ কথা সাহেব গাজি যখন কহিল। দুই হাতে জুলহাস গলা ধরিল। ধরিয়া গাজির গলে কহেন

www.pathagar.com

কান্দিয়া। হই যে তোমার ভাই আমি অভাগিয়া। কহ ভাই মাতা পিতা আছেণ কেমন। গাজি বলে শোকাকুলে তোমার কারণ। আছে কিনা আছে তাহা না পারি কহিতে। চল ভাই দেশে চল যদি লয় দিতে। জুলহাস বলেন ভাই কিবা কহ আর। মনে লয় উড়ে যাই দেশে আপনার। তৎপরে জুলহাস লয়ে দুই জনে। ত্বরিৎ চলিয়া গেল আপন ভবনে। দুই জনে লয়ে যবে বাটি মধ্যে গেল। দেখে দোহে জঙ্গীরাজা জিজ্ঞাসা করিল। কোথা হইতে আসিয়াছে এই জন। দেব উপদেব কিংবা পরীর নন্দন। হেন রূপ চক্ষে নাহি দেখিয়াছি আর। জুলহাস কহিলেন সাক্ষাৎ রাজার। হই এই দুই জন মোরা সহোদর। আসিয়াছে আমার জন্যে পাতাল নগর। শুনিয়া পাতাল পরী তখনি উঠিয়া। বসাইল দুই জনে আদর করিয়া। অন্তঃপুরে পাচতোলা চন্দ্রিমা বদনী। জুলহাসের স্ত্রী সেই রাজার নন্দিনী। শুনিলেন গাজি কালু দেওর তাহার। আসিয়াছে পাতালপুরে উদ্দেশ্যে ভ্রাতার। মনে২ প্রফুলিত হইয়া তখন। আপনি গেলেন অন্ন করিতে রন্ধন। রন্ধন করিয়া অন্ন সমাচার দিল। তবে তারা দুই জনে অন্তঃপুরে গেল। ধরিয়া গাজির হাতে রাজার দুহিতা। মধু স্বরে ধীরে২ কহে এই কথা। শুন২ ভাই গাজি প্রাণের দেওর। মনে নাহি জানি হেন ভাগ্য হবে মোর। তুমিত আসিয়া এই পাতাল ভবনে। বৈরাট লইয়া যাবে মোরা দুইজনে। মা বাপের ঘরে প্রায় কাল কাটাইনু। শ্বশুর শাশুড়ির সেবা কিছু না করিনু। মোর সম অভাগিনী নাহি সংসারেতে। তোমাদের পদে পানি না পারিনু দিতে। শুনহ বান্ধব গাজি দেওর আমার। বিলম্ব করিয়া কিছু কাজ নাহি আর। শীঘ্র২ অন্ন খেয়ে বাপকে কহিয়া। এইক্ষণ যাই চল এ রাজ্য ছাড়িয়া। এ বলিয়া ততক্ষণে অন্ন আনি দিল। হরষিতে দুই জনে খাইতে বসিল। পরে গিয়া কহে গাজি রাজার কাছেতে। না সহে বিলম্ব আর যাইব দেশেতে। ভাই আর ভাতৃবধূ উভয়ে যাইবে। আপনি করিলে আজ্ঞা যাই মোরা সবে। রাজা বলে বাপ ধন নাহি কিছু দায়। হরষিতে যাহ সবে দিলাম বিদায়। তিন শত লোক রাজা দিলেন সঙ্গেতে। পথে সম্বল আর অনেক খাইতে। ধন রত্ন দিবে কিবা তারা কি কাঙ্গাল। কড়ীর সমান গণে হীরা মুক্তা লাল। পঞ্চ দাসী সাথে লয়ে সতী পাচতোলা। সুবর্ণের মাহাফায় বসিলেন বালা। এক মাহাফা খালি আর কাহারে লইয়া। সাজ২ বলি সবে সাজিতে লাগিল। গাজি কালু পাচতোলা সবে এক সাথে। রাজাকে প্রণাম করি চলিলেন রথে। ছাড়িয়া নগর সেই কত দূর যায়। সুরঙ্গের পথ গিয়া সম্মুখেতে পায়। তিন শত লোক সযে গাজি সঙ্গেত লইয়া। চলিলেন সুরঙ্গ পথে আল্লাকে স্মরিয়া। চলিলেন কতেক দিন সুরঙ্গের পথে। মসজিদে উপস্থিত হইল পশ্চাতে। গড়িয়া ছিলেন শাহা লইয়া যোগীগণ। তিন শত লোক আর ভাই তিন জন। বসিলেন মসজিদে মহা হরষিতে। কাহারও কোন চিন্তা নাহিক মনেতে। হেন সমে কহে গাজি কালুরে ডাকিয়া। চাম্পাবতী আছে যথা সেওড়া হইয়া। পঞ্চ দাসী পাচতোলা সবে লয়ে সাথে। আনহ চাম্পাকে গিয়া আমার কাছেতে। শুনিয়া তখন তারা করিল গমন। চলে আর পাচতোলা লয়ে দাসীগণ। মাহাফার

www.pathagar.com

আরোহিয়া রামাগণ যায়। সেইখানে চাম্পাবতী গিয়া যে তথায়। সেওড়া গাছের তলে সকলে বসিল। হেন সমে কালু শাহা ডিন ডাক দিল। নিজ নাম ধরি কালু ডাকিল যখন। হইলেন চাম্পাবতী তখনি চেতন। সেওড়া আকার ছাড়ি বাহির হইল। রূপের প্রতাপে তার বন হইল আলো। দেখিয়া চাম্পার রূপ পাচতোলা সতী। ঢলিয়া পড়িল ভূমে হারাইয়া মতি। জিজ্ঞাসিল চাম্পাবতী কালু শাহার কাছে। এ রমণী কোথাকার ভূমিতে পড়িছে। কালু বলে পাচতোলা এই চন্দ্র বদনী। পাতালেতে জঙ্গরাজা তাহার নন্দিনী। ইহাকে করিয়া বিয়া জুলহাস বীর। তোমার ভাসুর সেই সহোদর গাজির হয় তব বড় জাল শুন চাম্পাবতী। তবে সতী চাম্পাবতী অতি শীঘ্র গতি। বিদনে সলিল দিয়া করিয়া চেতন। তাহাকে প্রণাম চাম্পা করিল তখন। জিজ্ঞাসেন কালুর কাচে সতী পাচতোলা। এমন সুন্দর এই কাহার মহিলা। কালু বলে কন্যা ইনি মুকুট রাজার। গাজির বনিতা হয় জালগো তোমার। তবে সতী পাচতোলা উঠিয়া ত্বরায়। বহিন বলিয়া মিলে ধরিয়া গলায়। দুই জন আলাপন অনেক করিয়া। মাহাফা ভিতর শেষে বসিলেন গিয়া। মাহাফা লইয়া তবে তাহারা চলিল। গাজির নিকটে যবে উপস্থিত হইল। হেন সমে শাহা গাজি লয়ে লোকজন। মসজিদ ছেড়ে ভেবে নিরঞ্জন। দিবা রাত্র চলে পথে বিশ্রাম না করে। কতেক দিবসে গেল ব্রাহ্মণা নগরে। নয় দিবা নয় রাত্রি এমন সময়। ব্রাহ্মণা নগরে গিয়া উপস্থিত হয়। শ্বশুরের দেশে গাজি যখন আসিল। বিনয় বচনে অতি কালুরে কহিল। শুন ভাই কালু তুমি শীঘ্র চলি যাও। আমার সংবাদ গিয়া রাজাকে জানাও। গাজির আজ্ঞায় কালু তখনি চলিল। রাজার সম্মুখে গিয়া কহিতে লাগিল। আসিল সাহেব গাজি ভাই আর তার। আদি অন্ত শুনাইল সব সমাচার। শুনিয়া মুকুট রাজা হরিষ অন্তরে। আগে বাড়াইয়া সবে যায় আনিবারে। কত জাতি বাদ্য সব বাজিতে লাগিল। বাতি জ্বালাইয়া পুরি উজ্জ্বল করি। লণ্ঠন ফারুস ঝাড় জ্বলে শত২। নানা জাতি নানা বাজি আর ছাড়ে কত। হইল দিনের মতো ব্রাহ্মণা নগরে। নৃত্য গীত হুল ধ্বনি সব ঘরে২। আসিল সাহেব গাজি লয়ে সাথে ভাই। মাণিক্য মন্দিরে রাজা দিল নিয়া ঠাঁই। শত শত লোক আর সঙ্গেতে আছিল। যোগ্যমতো শয্যা পরে সবে বসাইল। খাইতে আনিয়া দিল নানা দ্রব্য জাতি। লিখিলে সবের নাম বেড়ে যায় পুথি। শুনি কিবা অন্তঃপুরে করে নারীগণ। চাম্পাবতী পাচতোলা আসিল যখন। ফুল দুর্ব্বা পান চিনি নারীগণ আনি। করাইল মিষ্টি মুখ মুখে দিয়া পানি। সাত ভাই বধূ তারা হাসিতে হাসিতে। ধান্য ধুব্বা ফুল দিয়া দুজনার মাথে। লইয়া গেলেন শেষে ঘরের মাঝার। হেন সমে পাচতোলা চাম্পাবতী আর। লীলাকে প্রণাম তারা দুজনে করিল। আশীর্বাদ দিয়া লীলা কোলেতে লইল। দুজনের কোলে লয়ে রানি লীলাবতী। মনে মনে প্রফুল্লিতা হইতে অতি। নানা জাতি খাদ্য দ্রব্য দিলেন খাইতে। খাইলেন দুইজনে বসি একসাথে। খাইয়া যে তারা যাহা ঝুটা করে ছিল। সাত ভাই বধূ তাহাই খাইল। সাত ভাজু নয় মামি একাসনে বসি। দুইজনে লয়ে কত করে হাসি খুশি। এইরূপে তিন তিন

www.pathagar.com

গেল গত হইয়া। তবেত সাহেব গাজি রাজাকে কহিয়া। বিদায় হইয়া চলে লইয়া চাম্পারে। হঠাৎ আকাশ হেন পড়িলেক শিরে। রাজা কান্দে, রানি কান্দে, কান্দে দাসীগণ। সাত ভাই সাত বধূ করে ক্রন্দন। নয় মামা কান্দে আর মামীরা সকলে। কান্দিয়া২ কেহ পিছে২ চলে। চাম্পাকে লইয়া গাজি চলিল ত্বরায়। ব্রাহ্মণা নগর তারা নিমিষে ছাড়ায়। চলিয়া বৎসর দিন সোনাপুর গেল। সোনাপুর গিয়া তিন দিবস রহিল। সেখান হইতে পরে হইয়া বিদায়। ছাপাই নগর গিয়া তিন দিবস রহিল। সেখান হইতে পরে হইয়া বিদায়। ছাপাই নগর গিয়া কত দিনে পায়। ছাপাই নগরে যবে উপস্থিত হইল। নগরের লোক সবে দেখিতে আসিল। আসিয়া শ্রীরাম রাজা সালাম করিয়া। আপন বাটিতে সবে গেলেন লইয়া। থাকিয়া দিবস চারি ছাপাই নগর। তুরিত চলিয়া পার হইল সাগর। পালঙ্কেতে বসে আছে শাহা সেকান্দর। হেন সমে কালু শাহা জোর করি কর। সালাম করিয়া খাড়া সম্মুখে হইল। কান্দিয়া কালুকে শাহা জিজ্ঞাসা করিল। কহ পুত্র এত দিন কোথায় আছিলে। গাজিকে লইয়া গেলে তারে কি করিলে। কালু বলে আসিয়াছে কব এক সাথে। রহিলেন শাহা গাজি নামিয়া গ্রামেতে। সংবাদ কহিতে মোরে দিল পাঠাইয়া। শুনিয়া বৈরাট পতি হাসিয়া২। কালুকে লইয়া সাথে গেল অন্তঃপুরে। যেখানে অজুপা রানি ছিলেন মন্দিরে। কালুকে দেখিয়া সতী কান্দিয়া বলিল। আহা বাছা কোথা ছিলে গাজি কোথা বল। কালু বলে জননীগো চিত্ত কর স্থির। আসিয়াছি লয়ে আমি সংবাদ গাজির। আসিল সাহেব গাজি জুলহাস আর। আর মাগো দুই বধূ আসিল তোমার। বসিয়া রানির কাছে কহে কালু পির। যেরূপ গেলেন তারা হইয়া ফকির। যেইরূপে পার গিয়া হইল সাগর। যেইরূপে গেলেন চলি ছাপাই নগর। যেইরূপে ত্যাজিল জাতি শ্রীরাম রাজায়। যেউরূপে সোনাপুরে নগর বসায়। যেইরূপে গিয়াছিল ব্রাহ্মণা নগর। যেইরূপে মুকুট রাজা করিল সমর। যেইরূপে বিবাহ গাজি চাম্পাকে করিল। যেইরূপে পাতাল দেশে দুই ভাই গেল। যেইরূপে জুলহাস আসিল লইয়া। কহিল রানিল কাছে সকলি ভাঙিয়া। শুনিয়া অজুপা রানির হরিষ অপার। কাঙ্গাল পাইল যেন সিন্দুক সোনার। আনন্দের সীমা নাহি বৈরাট নগরে। জয়২ বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে। পুত্রবধূ আনিবারে বৈরাট পতি। আগু বাড়াইয়া চলে হরষিত অতি। লক্ষ লক্ষ লোক যায় বাদ্য বাজাইয়া। হাতি ঘোড়া খাড়া করে কাতার বান্ধিয়া। তখন গাজির কাছে মহিপাল গেল। আসিয়া সাহেব গাজি চরণে পড়িল। জুলহাস পুত্র আর বধূ দুইজনে। সালাম করিল আসি ধরিয়া চরণে। একে২ সবাকারে বৈরাটের পতি। তুলিয়া লইল কোলে স্নেহ করি অতি। পুত্র বধূ লইয়া তখনি চলিল। বাটি মধ্যে উপস্থিত সকলে হইল। হেন সমে জুলহাস গাজি দুইজনে। সালাম করিল গিয়া মায়েল চরণে। পুত্র পুত্র বলি সতী কোলেতে লইল। যত দুঃখ ছিল মনে সব পাসরিল। চাম্পাবতী পাচতোলা আসিয়া ত্বরায়। সালাম করিল ধরি শাশুড়ির পায়। পুত্র থুয়ে তাহাদেরে লইয়া কোলেতে। বলিল অজুপা সতী হাসিতে হাসিতে। পুত্র বধূ লয়ে রানি

www.pathagar.com

অজুপা সুন্দরী। আমোদ প্রমোদে রহে দিবস সর্ব্বারী। আর শাহা সেকান্দর আনন্দে রহিল। পাঠককে প্রণাম পুথি সমাপ্ত হইল। আবদুর রহিম আমি হীনের বচন। পরিচয় শুন মোর কোথায় ভবন। ময়মনসিংহ জিলা বাস গলাচিপা গ্রামে। আশুত্যার বাজারের উত্তর পশ্চিমে। বাটির দক্ষিণে নদী সুসন্দা নামেতে। মহকুমা কিশোরগঞ্জের অধীনেতে। জোয়ার হোসেন পুর তার অন্ত পাতি। আছি দীন হীন আমি করিয়া বসতি।

পয়ার। আর কিছু বিবরণ শুনাই সবায়। সাহেব গাজির হইল মাঝার কোথায়। বঙ্গ দেশে মুসলমান না ছিল পূর্ব্বেতে। তখন আছিল হিন্দু সকল বঙ্গেতে। সোলতান মাহমুদের সময় তাহার। ফারেছ দেশের লোক এক২ হাজার। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দিল পাঠাইয়া। নির্মাণ করেন বাড়ি ঠাঁই২ গিয়া। শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে বাড়ি সাত খান। নির্জন কাননে এক করিয়া নির্মাণ। বসতি করে তারা হরষ অন্তরে। তার মধ্যে একজন মানসিক করে। যদি এক পুত্র হয় ঔরসে তাহার। গরু জবে করে দিবে নামেতে খোদার। যত হয় মাংস তার দিবে সে বাটিয়া। তৎপরে কত দিন যায় গত হইয়া। তবে এক পুত্র তার ঘরেতে জন্মিল। তখনি আনিয়া গরু জবে কৈরে দিল। জবে করে মাংস তার দিল ঘরে ঘরে। আশ্চর্য খোদার কাজ দেখ কিবা করে। এক চাক্কা মাংস তার চিলে এক লৈয়া। উড়িয়া চলিয়া যায় চিল শূন্য দিয়া। গৌর গোবিন্দ রাজা ছিল শ্রীহট্টেতে। আছিল অনেক দেশ তাহার তাবেতে। মুসলমান গেলে কেহ তাহার দেশেতে। তাহাকে না দিত কভু নামাজ পড়িতে। সেই দিন রাজা সেই বসিয়া ঘাটেতে। স্নান করি শিব পূজা আছিল করিতে। মাংস চাক্কা লয়ে চিল যায় উড়া দিয়া। রাজার সম্মুখে গেল হঠাৎ পড়িয়া গোমাংস দেখিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিল। ডাকিয়া কোতওয়ালগণে কহিতে লাগিল। দেখ যবনে কোথা গোবধ করিছে। ত্বরায় ধরিয়া তারো আন মোর কাছে। জানিত কোতওয়ালগণ তাদের খবর। আনিল বান্ধিয়া সবে রাজার গোচর। সাত বাড়ি মুসলমান সবাকে আনিল। রাজা সেই তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল। গোবধ করিছ কেবা কহ সত্য কথা। নহেত সবার আজি কাটা যাবে মাথা। করে ছিল জবে সেই কহিতে লাগিল। আমা হইতে সেই কার্য নিশ্চয় হইল। মানসিক কৈরে ছিনু মনে আপনার। পুত্র যদি হয় এক ঘরেতে আমার। গরু এক জবে করে খোদার নামেতে। বেটে দিব মাংস তার এ সাত বাড়িতে। এত শুনি রাজা সেই অতি ক্রোধ হৈয়া। মারিল চল্লিশ বেত তাহাকে গনিয়া। আর যে জন্মিল শিশু আনাইয়া তায়। তাহার পিতার হাতে তাহাকে কাটায়। কাটাইয়া মাংসগুলি কুচি২ কৈরে। কাকে আর চিলে তাহা দিল খাইবারে। এমত শীদ্দত করি দিল তারে ছেড়ে। সেই পুরুষ আর ঘরে নাহি ফিরে। চলিল পশ্চিম দিকে ভাবিয়া খোদায়। চলিয়া বৎসর তিনে গেলেন মক্কায়। চল্লিশ আবদাল ছিল ঘরেতে কাবার। কহিল বৃত্তান্ত সব কাছেতে তেনার। শুনিয়া তিনিরা সব অতি ক্রোধ হৈয়া। তখনি বাঙ্গালা দেশে চলিল সাজিয়া। সাহেব জামাল পির শাহা সোলতান। কুতুব আলাম পির সাহেব মাস্তান মহৎ সমেশ পির শাহা বদর

আর। বাঘ লয়ে চলে গাজি সাথেতে তেনার। চলিল মিছকিন শাহা নিজামুদ্দীন পির। চলিল কামান শাহা হেলাইয়া শির। চল্লিশ পিরের সাথে কত পির চলে। পুথি বেড়ে যায় নাম সবের লিখিলে। না করে বিশ্রাম পথে চলিল ত্বরায়। উপস্থিত হইল আসি শ্রীহট্ট জেলায়। গৌর গোবিন্দ রাজা শ্রীহট্টে আছিল। করিয়া অনেক যুদ্ধ তাহাকে মারিল। লিখি যদি বিবরণ সকল তাহার। দ্বিতীয় পুস্তক হইয়া যাবে এক আর। বড়২ হিন্দু যত সেই দেশে ছিল। পির সবে জাতি নাশ তাদের করিল। হিন্দু লোক যত ছিল নোওয়াইল শির। বলে সবে ছিল কোথা এমন যে পির। দীন মোহাম্মদী এত প্রবল করিল। স্বইচ্ছায় জাতি কত হিন্দু লোকে দিল। অনেক বৎসর পির জালাল বাঁচিয়া। তৎপরে স্বর্গ দেশে গেলেন চলিয়া। সেই শ্রীহট্টে দিল তাহার কবর। মৃত্যু হইয়াছিল তার বহু কাল পর। সেকান্দর নগরে এক আছিলেন ওলি। ডাকিত লোকেরা মিয়া খোন্দকার বলি। সর্ব্বদা করিত জপ নাম নিরঞ্জন। বেশি কথা মুখে তার না আছিল কখন। এক্ দিন চলে তিনি শ্রীহট্ট দিগেতে। পির শাহা জালালের মাঝারে দেখিতে। দেখিলেন গিয়া তার মাজারের কাছে। নতুন কবর এক সেই দিন দিছে। যাহার কবর সেই মহাপাপী ছিল। মারিতে তাহারে দুই ফেরেশতা আসিল। লইয়া মুগর হাতে ফেরেশতা দুইজনে। মারিবেক তারে এই করিয়াছে মনে। দেখিয়া জালাল শাহা লাঠি হাতে লইয়া। দৌড়ায় ফেরেশতা দোহে অতি ক্রোধ হইয়া। আর পির ক্রোধ অতি লাগিল কহিতে। আসিয়াছে এই পির আমার কাছেতে। যখন লইছে আশ্রয় নিকটে আমার। ইহাকে মারিতে কেহ না পারিবে আর। পুনর্ব্বার যদি তোরা এখানে আসিবে। আমার লাঠির বারি তখনি খাইবে। মিয়া খন্দকার দেখে হাসিতে লাগিল। তখনি খাদিম লোকে জিজ্ঞাসা করিল সাহেবের হাসি মোরা কভু দেখি নাই। আজি কেন হাসিলেন শুনিবারে চাই। কি কারণে তিনি তবে কহিতে লাগিল। এমন ক্ষমতা আল্লা মানুষের দিল। নতুন কবর এই দেখ যে চক্ষেতে। আছে এক মহাপাপী কবর মধ্যেতে। মারিতে তাহাকে দুই ফেরেশতা আসিল। হযরত জালাল দোহে দৌড়াইয়া দিল। অতএব হাসিলাম শুন বলি ফের। এই দেশি লোক যত উচিত সবের। মরিলে এখানে মরা করিলে দাফন। কবরের আজাব তার না হবে তখন। হযরত জালাল পির হইয়া সদয়। আজাব হইতে তারে বাঁচাবে নিশ্চয়। পির শাহা জালালের কেরামত যত। হইবে লিখিলে এক পুস্তক তাবত। বাঘ লয়ে শাহা গাজি গেলেন কোথায়। সেই কথা সংক্ষেপে বলি যে সবায়। বিশগাঁও আছে সেই শ্রীহট্ট জিলায়। বাঘ লয়ে শাহা গাজি রহিল তথায়। কেহ২ বলে নাম গাজিপুর আর। হইয়াছে সেই খানে গাজির মাজার। সর্ব্বদা লোকেরা যায় সেই মাঝারে। হিন্দু মুসলমান যত মান্য সবে করে। অদ্যাবধি থাকে বাঘ মাজারেতে সেই। শুনিয়াছি লোক মুখে চক্ষে দেখি নাই। বড় বড় হিন্দু লোক সেই দেশে ছিল। একে২ ওলিউল্লা সেইখানে গেল। সাহেব বদর পির গেল চাটি গায়। কেহ গেল বরিশাল কেহত ঢাকায়। গেলেন সমেশ্ব পির গ্রাম কুড়ি গাথি। মাঘ

www.pathagar.com

মাসে মেলা এক জমে সেই ঠাঁই। সাহেব সোলতান গেল মদনপুরেতে। গেলেন কামাল শাহা মন্দির গঞ্জেতে। গুপাই নগরে পির নিজামুদ্দীন গেল। শাহা মিছকিন গিয়া মুখেতে বসিল। চলিল মস্তান শাহা রংপুর দিগেতে। পরশুরাম ক্ষত্রি রাজা শাহাকে দেখিতে গরুর ছালেতে পির নামাজ পড়িত। কখন২ আর তাহাতে শুইত পরশুরাম রাজার কাছে সেই পির গিয়া। এক ছাল ভূমি ভিক্ষা মাগিয়া লইয়া। বসিয়া ছালাতে পির বাড়িতে বলিল। পিরের হুকুমে ছাল বাড়িতে লাগিল। শত ছিল ভূমি বাটিতে রাজার। বাড়িয়া সমস্ত বাড়ি খালে বেড়ে তার। ভয়ে রাজা পরশুরাম করে পলায়ন। পাত্র মিত্র পুত্র তার ছিল যত জন। সবাকারে মুসলমান করিলের পিরে। সেখানে থাকিয়া পির বহুকাল পরে। ছাড়িয়া মাটির দেহ স্বর্গে চলি গেল। তাহার মাজার খান সেখানে হইল। প্রতি সনে পৌষ মাসে মেলা সেথা হয়। মস্তানের মেলা বলি লোক সবে কয়। কহিলাম সংক্ষেপে অনেক কথন। আবদুর রহিম বলে পুথি সমাপন।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

১. শোলার কাজ

বরগুনা অঞ্চলের প্রায় গ্রামেই মালি আছে। হিন্দু জমিদার বাড়ি ও তাদের কাছারিবাড়িতে তারা নিযুক্ত থাকত। মালিরা হিন্দু সম্প্রদায়ের। একেকটি মালি পরিবারের একেকটি মহাল আছে। এই মহালের মধ্যে অন্য মালিরা কাজ করতে পারে না। মালিরা জমিদার ও তাদের কাছারিবাড়িতে ফুলের পরিচর্যার পাশাপাশি শোলা দিয়ে নানা রকম জিনিসপত্র বানাত। এমন দুটি পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেছে–উত্তর কাকচিড়ার কাছারিবাড়ির মালি চিত্তরঞ্জন মালাকার আর সরকার হাওরার অমূল্য মালাকার। চিত্ত মালাকার এখনো শোলার কাজ করে থাকেন। বর্তমানে প্রকৃতিক শোলা তেমন পাওয়া যায় না। ককসিট দিয়ে কাজ চালাতে হয়। এখন নিজেদের পুকুরে ও খালে শোলার চাষ করে থাকেন। তবে সাতলার বিলে যে শোলা পাওয়া যায় তাই ব্যবহার করছেন। চিত্ত মালাকারের বাবা উপেন মালাকার কাছারিবাড়িতে কাজ করতেন।

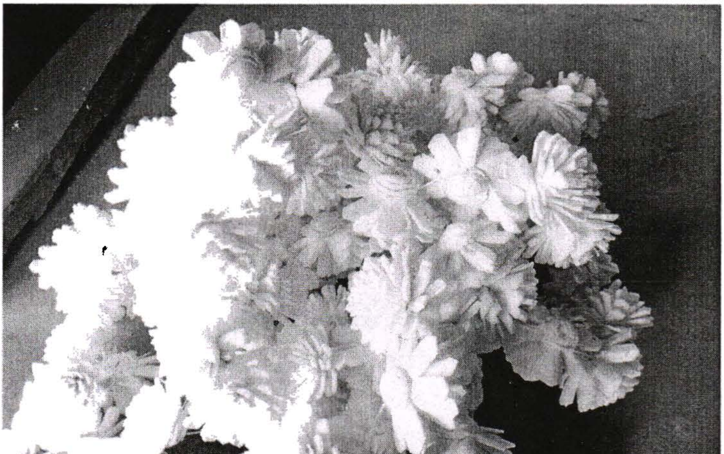

শোলার তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফুল

www.pathagar.com

তিনি গ্রামের নানা প্রয়োজনের কাজ করছেন। হিন্দুদের বিয়ের টোপর, ধান ক্ষেতে চৌকারি, পূজার উপকরণ হিসেবে কদম ফুলসহ বিভিন্ন ফুল ও বিভিন্ন দেবদেবীর গলার মালা, নানা উৎসবের মাঙ্গলিক উপকরণ তৈরি করে থাকেন। যে কোনো শুভকর্মে চিত্ত মালাকার মালা নিয়ে উপস্থিত হন। মালায় জয় লাভ, পরীক্ষায় পাস, বিয়ে, নতুন জামাই কিংবা কেউ চাকরি পেলে সে তাদের মালা পরিয়ে দেয়। যার যেমন খুশি তাকে বকশিস দেয়। ঈদের সময় মুসলমান বাড়ি থেকে চালডাল সিদা ও টাকা পয়সা বকশিস পায়।

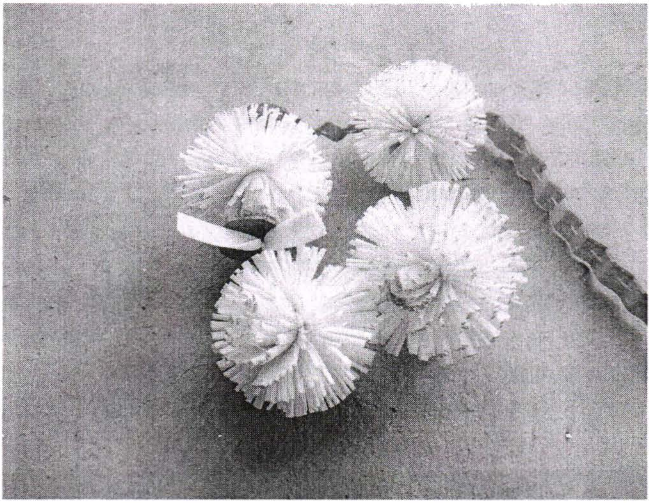

শোলার কদম ফুল

শোলা ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নানা আকার করে তাতে রঙ দিয়ে তারপর আঠা দিয়ে জোড়া দেয়। আঠা সংগ্রহ করে ডুমুর ও বহই গাছ থেকে। বর্তমানে রঙিন কাগজের ও বিদেশ থেকে নানা রকম ফুল ও মালা বাজারে পাওয়ায় শোলার মালার চাহিদা কমে গেছে।

২. নকশি কাঁথা ও শিকা

এ অঞ্চলে নকশি কাঁথা ও শিকা মহিলারাই তৈরি করে থাকে। নকশি কাঁথা তৈরির উপকরণ পুরনো বা নতুন কাপড়, সুই ও সুতা। মহিলারা অবসর সময়ে কাঁথা সেলাই করে থাকেন। অঞ্চলভেদে নকশার ধরনের বিভিন্নতা রয়েছে।

দুধ, দই, মিষ্টি, গুড় ও আচার ঝুলিয়ে রাখার জন্য নানা রকম নক্‌শি শিকা এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তৈরি হয়। শিকা তৈরির মূল উপকরণ হলো পাট। এতে নানা রকম নক্‌শি ও রং ব্যবহার করা হয়। মহিলারাই শিকা তৈরিতে দক্ষ।

www.pathagar.com

সুচিকর্ম

সেলাই ফোঁরাই সুচিকর্ম বরগুনা অঞ্চলের মেয়েদের একটি বিশেষ দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত। মেয়েদের সুচিকর্মের গুণপনা আছে কি না এ সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই বিয়ের আগে মেয়েদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয় সুচিকর্মের গুণপনা সম্পর্কে।

নকশি কাঁথা তৈরির প্রথম ধাপে কাজ করছেন দুই জন নারী

সুচিকর্মের গুণপনার মধ্যে রয়েছে—নকশি কাঁথা সেলাই, পর্দায় ফুল তোলা, বালিশের কভারের কোনায় ফুল তোলা, রুমালে কাজ করা এবং টেবিল ক্লথের কোনায় ফুলের নকশা করা।

রুমালে বা ব্যবহৃত অন্যান্য কাপড়ের গায়ে ফুল তোলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পাখি, হরিণ, প্রজাপতি সুইসুতার সাহায্যে তোলা হয়। লেখাগুলো হয়—'যাও পাখি বল তারে সে যেন ভোলে না মোরে।' 'মোর যদি থাকতো পাখা উড়ে গিয়ে করতাম দেখা।' 'গাছের পাতা লড়ে চড়ে তোমার কথা মনে পড়ে' ইত্যাদি।

৩. আলপনা

এ অঞ্চলে আলপনা শিল্পেরও বেশ কদর আছে। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর বেশি প্রচলন দেখা যায়। হিন্দুদের লক্ষ্মী পূজা, বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলপনা

www.pathagar.com

আঁকা হয়। আজকাল সাধারণত লক্ষ্মী পূজার সময় দেবির আগমন বোঝানোর জন্য পায়ের ছাপ আঁকতে হয়। এই পাযের ছাপ আঁকতে চালের গুঁড়ার গোলা ব্যাবহার করা হয়। হাতে কিছুটা ন্যাকরা নিয়ে বাটিতে রাখা গোলায় হাত চুবিয়ে আলপনা আঁকা হয়। তারপর সেখানে পাচঁটি আঙুলের ছাপ দিয়ে পা আঁকা হয়। এছাড়া মঙ্গল ঘটে সিঁদুর দিয়ে সাতটা চিহ্ন আঁকা হয়। ঘটটা যেখানে রাখা হয়তার চারপাশে একটু চালের গুঁড়া দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। অজকাল বিয়ে বাড়িতে সিঁড়ি ও মেঝোতে নানা রংঙের আলপনা আঁকা হয়। বরগুনায় এ আলপনা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ আঁকে তেমনি কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত হিন্দু-মুসলিম ঘরেও আঁকে। তবে যুগ যুগ ধরে মেয়েরা কাদা দিয়ে ঘর লেপে আসছে। হাতে জাল কাটা নিয়ে তারা লেপে। তাতেও এক ধরনের আলপনা তৈরি হয়।

আলপনা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

মানুষের সভ্যতা বিকাশের পথ ধরে মৌলিক চাহিদার অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্ত্র বা পোশাক-পরিচ্ছেদ। এমন এক সময় যখন ছিল গাছের ছাল পরে মানুষের বস্ত্রের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করত। কালক্রমে দেশ ভেদে, অঞ্চল ভেদে পোশাকের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা। এক সময় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ধুতি ব্যবহার করত। এ ক্ষেত্রে সম্প্রদ্রায়গত কোনো বিভাজন ছিল না ধুতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমান ধুতি কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই পরে। তবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ধুতির ব্যবহার দেখা যায়। লুঙ্গি, গামছা, ফতুয়া, পায়জামা-পাঞ্জাবি, শাড়ি সালোয়ার-কামিজ, ওড়না প্রভৃতি লোকপোশাক হিসেবেই ব্যবহৃত।

এ অঞ্চলের পুরুষদের পোশাক লুঙ্গি, উদোম গা, ঘাড়ে গামছা, খালি পা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব মেয়েরা শাড়ি পরে। তারাও চুল মোছার জন্য গামছা ব্যবহার করে। তবে হিন্দু মেয়েদের শাড়ি পরার ধরন আলাদা। মেয়েদের আনুষ্ঠানিক পোশাক শাড়ি-ব্লাউজ। কেউ কেউ সালোয়ার কামিজও পরে।

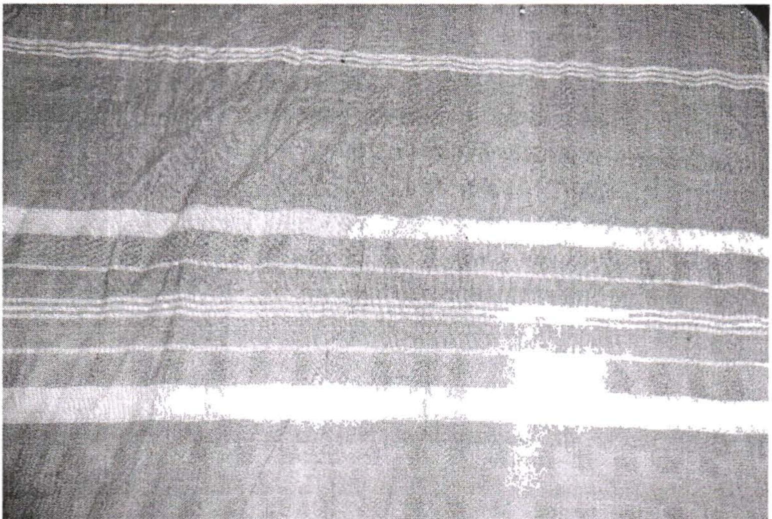

গামছা

www.pathagar.com

রাখাইনেরা পোশাক-আশাকে খুব বৈচিত্র্যময়। পোশাকে তারা বাহারি ও ঝলমলে রঙের ব্যবহারের পাশাপাশি লতা-পাতা, ফল-ফুল ও পশু-পাখির নকশা ব্যবহার করে। রাখাইনদের হস্তচালিত তাঁতে বোনা কাপড়ে বাহারি ও ঝমমলে রঙের হয়ে থাকে।

লোকপোশাক পরা দুই রাখাইন নারী কর্মরত

তালতলীর রাখাইন তাঁতি মাচেজেন বলেন, রাখাইনেরা ঐতিহ্যগতভাবেই সব কিছুতেই রঙের জৌলুস, প্রকৃতি ও জীবজন্তুর প্রতি বেশি সংবেদনশীল। তাই তাঁদের পোশাক-আশাক ও সংস্কৃতিতে এর রেশ পরিলক্ষিত হয়। এজন্যে তাঁতে বোনা কাপড়ে ছয় থেকে আট ধরনের রঙ আমরা ব্যবহার করি। এসব রঙ কৃত্রিম নয় প্রকৃতি থেকে নেওয়া। যেমন সুতায় বিভিন্ন রঙ করতে আমরা শাল, বকুলসহ বিভিন্ন গাছের পাতা ও বাকল ব্যবহার করি। এতে কাপড়ের রঙ খুব টেকসই হওয়ার পাশাপাশি বাজারের অন্য যেকোনো কাপড়ের সঙ্গে আমাদের কাপড়ের রঙে ও বৈচিত্র্যে ভিন্নতা থাকে। রাখাইন পুরুষেরা লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে। মাথায় বাঁধে গেরুয়া রঙের পাগড়ি যা তাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। নারীরা লুঙ্গির ওপর ব্লাউজ পরে। এটাকে রাখাইন ভাষায় 'থামি ' বলে। নারীরা হাতে বালা, কানে বাহারি কানবালা ও দুল, গলায় হাড়, কোমড়ে বিছা, পায়ে মল ও নূপুরসহ নানা অলংকার পরে।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

ঘরবাড়ি

দখিন দুয়ার খোলা

বরগুনা অঞ্চলের ঘরবাড়ি তৈরির আগে বংশপরম্পরা কতগুলো রীতি মেনে চলা হয়। বাড়িগুলো সাধারণ নদী ও খালের পাড়ে অবস্থিত। দক্ষিণ দিক খোলা রাখা হয়, যাতে দখিনা বাতাস পাওয়া যায়। বাড়ির সামনের দিকটাকে দরজা বলা হয়। যে সব বাড়িতে দক্ষিণ দিকে খাল না পাওয়া যায়, কিংবা খানকিটা দূরে, একটা পুকুর খনন করা হয়। ঘরে পেছনের মেয়েদের জন্য আলাদা পুকুর থাকে, যাতে মেয়েরা গেরস্থালি কাজকর্ম, হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া ও গোসলের কাজ করতে পারে। বাড়ির পেছনে, সাধারণ উত্তর দিকে বাগান থাকে, সুপারি ও অন্যান্য ফলফলাদির বাগান। বাড়ির পশ্চিম দিকেও অনেকে বাগান করে থাকে।

নবে আষ্ট

ঘর যে ভিটিতে তোলা হয় তাকে স্থানীয় উপভাষায় পোতা বলা হয়। খুব কম ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও পুব পোতায় ঘর বানানো হয়। বাড়ি বাগান যত বড় হোক, মূল ঘর যে চৌহদ্দির মধ্যে করা হয় তাকে 'নবে আষ্ট' বলা হয়। অর্থাৎ ঘর ও তার সামনের উঠানোর সীমানা নির্ধারণের রীতি আছে। মূল সীমানা নবে আষ্টর মধ্যে সীমিত রাখা হয়। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৮ × ৯ নল। স্থানীয়ভাবে প্রতি নলে ৮ হাত, প্রতি হাত ১.৫ ফুট। একটি বাড়ির চৌহদ্দি হবে প্রস্থ ৬৪ হাত বা ৯৬ ফুট, দৈর্ঘ্য হবে ৭২ হাত বা ১০৮ ফুট।

পোতা

বাড়ির পোতা উঁচু করে বাঁধা হয়, যাতে বৃষ্টির পানি না উঠতে পারে, জোয়ারের জল না ওঠে। পোতা বাঁধার পর তার মধ্যেখানে একটা বাঁশের মাথায় তির ধনুক স্থাপন করা হয়। সাধারণ ওঝা ফাকিরেরা কিছু মন্ত্রতন্ত্র পড়ে দেয়। যাতে কোনো অশুভ কিছু ঘরের ওপর দিয়ে না যায়। অনেকে ওঝা ফকির ডেকে বাড়ির নবে আষ্ট যা চৌহদ্দির চার কোনে কবজ তাবিজ পুঁতিয়ে রাখে, যাতে অশুভ কোনো শক্তি বাড়ির সীমানায় না ঢুকতে পারে।

কাঠামো বিন্যাস

ঘর তোলার সময় যে কাঠামোর বিন্যাস তা হলো মাঝখানে মূলঘর, সামনে আইতনা বা বারান্দা, যেখানে বসার ঘর করা হয়, পেছনে বারিন্দা যা বারান্দা, যেখানে উগইর বা কাঠের উঁচু পাটাতন করে, চাল ডাল ইত্যাদির ডোলা রাখা হয়। এই বারান্দার এক পাশে অনেক সময় খাবারের জায়গা করা হয়। অনেকে সময় ঘরের দুপাশে সামনে বাড়তি বারান্দা করা হয়। এসব বারান্দায় মেহমানদের শোবার চৌকি, খাট, খাবারের জায়গা করা হয়। কিছুদিন আগেও এ অঞ্চলে বাড়িতে খাবার টেবিল চেয়ার ছিল না। মুসলিম সম্প্রদায় হোগলা বিছিয়ে তাতে বসে খেত।

www.pathagar.com

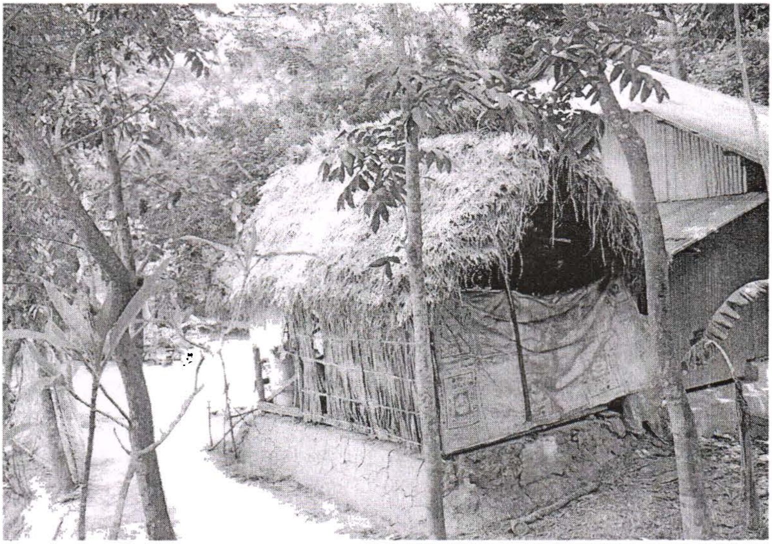

নারার (খড়ের) রান্নাঘর

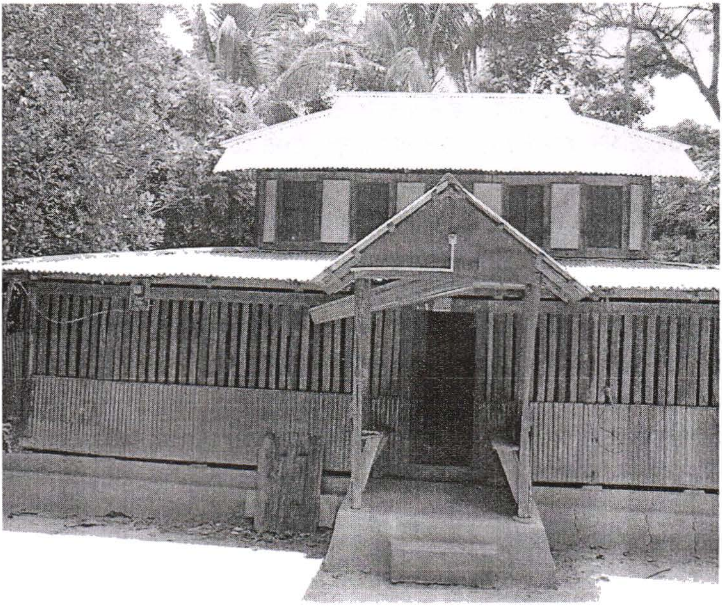

কাঠ ও টিনের নির্মিত দোতলা ঘর

www.pathagar.com

মেহমান এলে ফরাশ বিছাত। হিন্দু সম্প্রদায় কাঠের বড় বড় পিড়িতে কাঁসার থালায় খেত। মুসলিমরা মাটির বাসন বা সানকিতে খেত। মেহমান এলে কাচের বাসন ব্যবহার করত। গত ১০-২০ বছরে এই চিত্র পাল্টে গেছে। এখন সম্প্রদায় ভেদে প্রতি বাড়িতে খাবার টেবিল চেয়ার বেঞ্চের ব্যবস্থা আছে। টিন, কাচ, চিনামাটির প্লেট, মেলামাইন, স্টিলের থালা বাটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঘরের ধরন

দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সব ঘরই কাঠের তৈরি। আর্থিক সঙ্গতি ভেদে ঘরগুলো হয় দোচালা, চৌচালা, আটচালা ও দোতালা। সাধারণ সঙ্গতি সম্পন্ন ও গরিবজনেরা দেশীয় কাঠ রেনট্রি, শিরিষ, কড়ই, জাম, বাঁশ, বেত ইত্যাদি ব্যবহার করে নিম্ন বিত্ত ও গরিবজনেরা গোলপাতা, গোলাপাতার টাট্টি, ধানগাছের নাড়া, ছন চালের ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করে। আর ধনী যারা তারা চালা ছাইতে টিন ব্যবহার করে থাকে। তাদের ঘর হয় দোতলা। দোতলায় টক বা বারান্দা থাকে। সামনে থাকে নাক-বারান্দা। যেখানে বসে বাড়ির লোকজন বিশ্রাম ও গল্পগুজব করে থাকে। ধনীরা শাল, সেগুন ও লোহাকাঠ ঘরের খুঁটি ও চৌকাঠে ব্যবহার করত। এসব আসত বার্মা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে।

বর্তমানে এসব টেকসই কাঠ দুষ্পাপ্য হওয়ায় সবাই ইটের বাড়ি বা দালানের দিকে ঝুঁকেছে। আজকাল নিম্নবিত্ত উচ্চবিত্ত সবাই ইটের দেয়াল ও টিন দিয়ে ঘর তৈরি করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই অঞ্চলের কাঠের ঘরের বৈশিষ্ট্য হলো, কপাট ও আইতনার বেড়ার কারুকার্য সুতার বা হুনারিয়া মাসের পর তার যন্ত্রপাতি দিয়ে ঘরের কপাট ও বেড়ায় কারুকাজ ফুটিয়ে তোলেন।

নানা ফুললতা, পাখি, বাঘ, হরিণ আর নানা জ্যামিতিক নকশা থাকে এসব কপাট ও বেড়ায়, অনেক বাড়ির জানালার উপরের ভেন্টিলেটরে কারুকাজ দেখা যায়। অনেক বাড়ির জানালায় ঘুলঘুলি করা হয়।

আদর্শ বাড়ি

একটি আদর্শ বাড়ি এরকম—বাড়ির সামনে শানবাঁধানো পুকুর, তার এক দিকে বাঁধানো কবরস্থান। দোতলা টক ও নাক বারান্দা দেয়া চৌচালা যা আটচালা টিনের ঘর। ঘরের সামনে বড় উঠান। উঠানের এক দিকে ধানের গোলা। ঘরের পেছনে মেয়েদের পুকুর। উত্তরে সুপারি আর ফলফলাদির বাগান। বাড়ির সীমানায় বাঁশ ও বেতের ঝাড়। এলাকার বেশির ভাগ বাড়ি বর্তমানে টিনের। একদা মাটির ঘর আর সুন্দরবনের গোল পাতাই ছিল বাড়ি নির্মাণের প্রধান উপকরণ। তবে শহরে অফিস, আদালত ও কিছু ব্যক্তিগত বাড়ি দালান। রাখাইন সম্প্রদায়ের ঘরগুলো বেশিরভাগ টোং বা কাঠের পাটাতন দেয়া।

ঢেঁকিঘর

বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতোই এ অঞ্চলেও রয়েছে আলাদা ঢেঁকিঘর। ঢেঁকিঘর নির্মাণের ক্ষেত্রেও রয়েছে লোকস্থাপত্যেও বৈশিষ্ট্য। সাধারণত খড়ের তৈরি চাল এবং খড়ের বা বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া দিয়েই ঢেঁকি ঘর তৈরি হয়ে থাকে। এই

www.pathagar.com

ধরনের ঢেঁকিঘর নির্মাণের পেছনে অন্যতম কারণ হতে পারে ঘরটিকে শীতল রাখা। ঢেঁকিঘরে সাধারণ নারীরাই কাজ করে থাকেন। যথেষ্ট শ্রম দিতে হয় এবং ঘাম ঝরাতে হয় তাদের এই ঢেঁকিঘরে।

ঢেঁকিঘরে ঢেঁকিতে চাল কোটা হচ্ছে

www.pathagar.com

লোকসংগীত

ক. অষ্টক গান

বরগুনা অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায় বাংলা বর্ষ বিদায় ও নতুন বৎসরকে বরণ করে নিতে নানা উৎসবে মেতে ওঠে। চৈত্রসংক্রান্তিতে ও পহেলা বৈশাখে সর্বজনীন মেলা বসে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঘনিয়ে এলেই অষ্টক গান আর নীল পূজারিদের দল নানা সাজে সেজে বেরিয়ে পড়ে।

নানা গানবাদ্যে গ্রামগুলো মুখরিত করে তোলে। উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে বরগুনা শহর ও গ্রাম-গঞ্জের মহাজনী দোকানগুলো সাজে বাহারি রঙিন কাগজের ঝালর আর ঝলমলে জরিতে। দোকানগুলোতে ধুমধামে চলে পুরোনো দেনা পরিশোধের পালা 'হালখাতা উৎসব'। দেনাদারদের মিষ্টিমুখ, পান ও বাহারি জর্দা দিয়ে আপ্যায়নের পালা। সব মিলিয়ে বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

বরগুনার গ্রামগুলোতে চৈত্র মাসের শেষ এক সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকটি অষ্টক দল ও নীল পূজারী দল গান-নৃত্য পরিবেশন করে। এ উৎসবে যোগ দিতে বরগুনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় গত ২০ চৈত্র থেকে কমপক্ষে ৪০টি অষ্টক গানের দল গ্রামেগঞ্জে, হাটে-বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচ-গান করে আনন্দ দেয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই উপভোগ করেন নীল নৃত্য আর গানের এই উৎসব। পুরোনো বছরের গ্লানি মুছে বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে শুদ্ধভাবে পথ চলার আহ্বান জানাতেই চিরায়ত বাংলার একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব নীল নৃত্য। সনাতন ধর্মের ভাষায় নীল পূজারী দলকে বলা হয় অষ্টক গানের পূজারী।

বরগুনা সদরের খাজুরতলা, লাকুরতলা, বদরখালী, গৌরিচন্নাসহ বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বাহারি রঙে রঙিন হয়ে এবং রাধা-কৃষ্ণ ও হনুমানের আকৃতি ধারণ করে গ্রামগুলোতে ঢোল-বাদ্যি নিয়ে নৃত্যে মেতে ওঠে অষ্টক পূজারীরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় এলাকার নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ সব ধর্মের লোক। এ যেন এক মহামিলন মেলা। যেখানে ধর্মের জাতপাত ভুলে সবাই একাকার হয়ে যান আনন্দ-উৎসবে। নীল নৃত্য আবহমান বাংলার ঐতিহ্য হলেও তা ক্রমে বিলুপ্ত হতে বসে বলে জানালেন বরগুনার অষ্টক গানের শিল্পীরা।

www.pathagar.com

অষ্টক গান পরিবেশনা

অষ্টক গানের তালে নৃত্যরত রাঁধা-কৃষ্ণ জুটি

www.pathagar.com

সদর উপজেলার বদরখালী গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা নারায়ণচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেন, আগে চৈত্র মাস শুরু হলেই ঘরে ঘরে অষ্টক গান ও নীল নৃত্য হতো। আয়োজন করা হতো নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। কত ফুর্তি ছিল তখন গ্রামে! এখন এর কিছুই অবশিষ্ট নেই, মানুষ যান্ত্রিক হয়ে গেছে।

বরগুনা নদর উপজেলার অষ্টক গানের দলনেতা উমেশচন্দ্র গাইন (৫৫) জানান, অষ্টক গানের বিষয় হচ্ছে মূলত শিব। এ গানে রাধা-কৃষ্ণের লীলা ও নিমাই সন্ন্যাস প্রসঙ্গও থাকে। এছাড়া গৌরী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চণ্ডিদাস-রজকিনী, বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গও থাকে। অষ্টক গানের নামকরণ, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে দলনেতা উমেশ গাইন বলেন, এ ধরনের গানে অষ্ট চরিত্রের সমন্বয় ঘটে বলে এ গানের নাম অষ্টক হতে পারে। অষ্ট বা আটটি চরিত্র হলো রাধা, কৃষ্ণ, সুবল, বিশাখা, ললিতা, বৃন্দা, বড়িমাই ও বলরাম।

বরগুনা অঞ্চলে অষ্টকের আরেক শিল্পী রতন পাটনি (৪৫) বলেন, কৃষ্ণ অষ্ট বা আট সখী নিয়ে লীলা করতেন বলে এ গানের নাম অষ্টক হতে পারে। যেভাবেই নামকরণ হোক, বর্তমানে অষ্টক গানের চরিত্রসংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তার কথার ব্যাপ্তিও। অষ্টক গানের ভাষা আটপৌরে, কিন্তু এর আবেগ ও প্রেরণা অত্যন্ত ব্যঙ্গময়। খেয়ালের ঢঙে গাওয়া এ গানের স্থায়ী ও অন্তরা দুটি অংশ বা স্তবক থাকে। ভগ্ন ত্রিপদীর আঙ্গিকে অন্তরা রচিত হয়। শিব সম্পর্কে গাওয়া গানগুলোতে হালকা রসের প্রাধান্য দর্শকদের বিনোদনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। গানের মধ্যে শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব ও ভালোবাসা দিয়ে লৌকিক জীবনের ওপর ছায়াপাত করা হয়।

অষ্টক গানের দলনেতা পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানি ইউনিয়নের বাসিন্দা সুরেনচন্দ্র গাইন জানান, অষ্টক গানের দল গঠিত হয় ১০ থেকে ১২ জন শিল্পী নিয়ে। শিল্পীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গান পরিবেশন করেন। একজন সূত্রধর গানের শুরু এবং গানের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন। সূত্রধরকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় সরকার। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শিল্পীরা রীতিনীতি ও ভাব-গাম্ভীর্য রক্ষা করে গান পরিবেশন করেন। কখনো চটুল, কখনো ধীর লয়ে চলতে থাকা গানের মধ্যে থাকে তরুণ-তরুণীদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য।

অষ্টক পরিবেশনে বাঁশি, ঢোল, হারমনিয়াম, মন্দিরা ও খোল এবং এক ধরনের স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন, 'পৃষ্ঠপোষকতা নেই বলে অষ্টক গানের দলগুলো এখন প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। আমরা অনেক কষ্টে ও আর্থিক টানাপড়েনে এই দলটি ধরে রেখেছি। জানি না আর কতদিন তা পারবো।'

বাংলা নববর্ষকে বর্ণিলরূপে বরণ ও চৈত্রসংক্রান্তিকে বিদায় জানানোর চিরায়ত রেওয়াজ অনুসারে বাঙালি সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে এভাবেই সজীব ও আনন্দমুখর রেখেছেন এ অঞ্চলের অষ্টক গান ও নীল উৎসবের পূজারীরা।

www.pathagar.com

খ. হয়লা

বরগুনার মেয়েলি গানকে বলা হয় হয়লা। বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় মেয়েলি গীত বা হয়লার প্রচলন রয়েছে। গ্রামে নারীদের সুখ-দুঃখ-বেদনার বাস্তব প্রতিচ্ছবি হলো হয়লা। নানা অনুষ্ঠানে এ হয়লা গাওয়া হয়। নিরক্ষর পল্লীর নারী সমাজের কল্পনার রঙে রঞ্জিত এ সংগীত নানা মাধুর্য বয়ে আনে। এলাকার বিভিন্ন উৎসবে হয়লা গান গাওয়া হয়। যেমন :

বিয়ের আগে যে গান

গোসল করতে গেলো ও সাধন
দেখলাম অনাব্যিয়াত ময়নারে
সেই না ময়নারে আনতে ও সাধনরে
কত লাগবেরে সিঁদুর
যত লাগে দেবরে সরবানু
তুমি বিয়া কর।

সেই না ময়নারে আনতে ও সাধনরে
কত লাগবেরে জেওর।
যত লাগে দেবরে সরবানু
তুমি বিয়া করো।

সেই না ময়নারে আনতে ও সাধনরে
কত লাগবেরে কাপড়।
যত লাগে দেবেরে সরবানু
তুমি বিয়া করো।

সেই না ময়নারে আনতে ও সাধনরে
কত লাগবেরে টাকা।
যত লাগে দিবরে সরবানু
তুমি বিয়া করো।

বিয়ের ঘটক আসলে যে গীত

কলসি ভইর‍্যা আনছি দুগ্ধ
দেও দেও মামা সাব
কোলের রাজনরে বিয়ে নারে।

www.pathagar.com

কলসির দুগ্ধ ছিটাইয়া ফেলবো
কলসির দুগ্ধ ভাইল্যা ফেলবো
তেওনা দিবো কোলের রাজনরে বিয়ানারে।

কাগজ ভইর‍্যা আনছি সিন্দুর
দেও দেও চাচাজনেরে
কোলের রাজনরে বিয়ানারে।

কাগজের সিন্দুর ছিটাইয়া ফেলমু
কাগজের সিন্দুর ঢাইল্যা ফেলমু
তেওনা দিমু কোলের রাজনরে বিয়ানারে।

কাগজ ভইর‍্যা আনছি মাজন
দেও দেও ফুফাজানরে
কেলের রাজনরে বিয়ানারে।

কাগজের মাজন ছিটাইয়া ফেলমু
কাগজের মাজন ঢাইল্যা ফেলমু
তেওনা দিমু কোলের রাজনরে বিয়া নারে।

বিয়ের পয়নামা পাঠাতে গান

মামুজান যে জোটাইছেন কামও
জমিদারের বেটি কি নবাবি কোকিলা,
সেইখান থেইকে পাটাইছেন চিঠি
আসমান তারার সিন্দুর কি
নবীন কোকিলা।

কোথায় পাবো কোথায়রে যাবো
আসমান তারার সিন্দুর কি নবীন কোকিলা।
চাচাজান যে জোটাইছেন কামও
তালুকদারের বেটি কি নবীন কোকিলা
সেখান থেইকে পাঠাইছেন চিঠি
ফুলজানের মা জননী
নবীন কোকিলা।

www.pathagar.com

কোথায় যাবো কোথায় পাবো
ফুলজানের মাজন কি নবীন কোকিলা।
ফুলজান যে জোটাইছেন কামও
মাতবরের বেটি কি নবীন কোকিলা,
সেখান থেইকে পাঠাইছেন চিঠি
কুট্টি বড়ুর জেওর কি নবীন কোকিলা।

নিমন্ত্রণ করে গাওয়া গান

বিবির মায়েরে কইও খবর
খাট পালং সাজাইতে,
আইসুক আইসুক সাহেবের দামান
বাঁশ বাগান ঘুইর‍্যা,
পথের সামনে দিয়া থুইছি
আলম টুঙ্গির ঘরটি
সেইনা ঘরে লাগাইয়া থুইছি
শাল সুন্দরির কপাট
ঐনা কপাট ভাঙ্গ দামান
একই লাথি দিয়া
ভাঙ্গ একই থাবর দিয়া।

হ্যাওন্যা যাবি বিবির চকিতে পাশা না খেলিয়া
ভালো যুয়া না খেলিয়া,
দামান লইগ্যা থুইছি
একতারির না কুত্তা,
ঐ না কুত্তা কাটবিরে দামান তরলার দিয়া।

নয়া অতীত আসলে ঠেসকা গান

অতীত বিছানা বিছানা
মন্দ বলবেন না।
পাও ধুইতে দেলাম পানি
গলায় ঢালবেন না।
পাও মুছতে দেলাম গামছা
গলায় বানবেন না।

www.pathagar.com

নাস্তা করতে দেলাম পিরিচ
ব্যাগে লইবেন না।
ভাত খাইতে দেলাম পেলেট
কাশ ফালাইবেন না
যুয়ান যুয়ান মাইয়া দেইখ্যা
চউখ মারবেন না।
যারে তারে বেয়াইন ডাইক্যা
চাইপ্যা ধরবেন না।
ঘুমাইতে দেলাম ফুল বিছানা
মুইত্যা মারবেন না।

বিয়ের সময় ঠেডলা গান

ডাউকরা ওরে ডাউকরি ওরে
বাবরি ওরে বায় ওরে মেয়া
বাবরি ওরে বায়।

পোলার মায়রে দেইখ্যা আইছি
দারোগা পুলিশের নায়।
দারোগা পুলিশে পাইয়া মাগিরে
বিছানা লাছতে কয়।

পোলার বুইনেগো দেইখ্যা আইছি
মিশশারিগো নায়
মিশশারিরা পাইয়া মাগিরে
লগি খোচতে কয়।

পোলার চাচিরে দেইখ্যা আইছি
ওছি সাইবের নায়
ওছি সাইবে পাইয়া মাগিরে
আঢ়া চুমা দেয়
ওরে মেয়া আঢ়া চুমা দেয়।

পোলার বাড়িতে ঠেসকা গান

পান নাইলো পোলার মা পানের করবি কি?
ছাইচে আছে চৈ পাতা তাই আইন্যা দি

www.pathagar.com

এলো ছি এমন বজ্জাতের বাড়ি গান করতেছি।
চুন নাইলো পোলার মা চুনের করবি কি?
দুয়ারে আছে বগের ছেইর তাই আইন্যা দি

এলো ছি এমন পেত্নির বাড়ি গান করতেছি।
সুপারি নাইলো পোলার মা সুপারির করবি কি?
দরোজায় আছে ইডের কুচা তাই আইন্যা দি
এলো ছি এমন কিরপিনের বাড়ি গান করতেছি।

হাদা নাইলো পোলার মা হাদার করবি কি?
চুলার পিডে ধোন কাডাইন্যা হেইয়া আইন্যা দি
এলো ছি এমন অসভ্যের বাড়ি গান করতেছি।
মিষ্টি নাইলো পোলার মা মিষ্টির করবি কি?
পায়খানায় আছে গুয়ের দলা হেইয়া আইন্যাদি
এলোছি এমন পিশাচের বাড়ি গান করতেছি।

দই নাইলো পোলার মা দইর করবি কি?
খাডের নিচে কাশের আউত্তা হেইয়া আইন্যা দি
এলো ছি এমন গিদারের বাড়ি গান করতেছি।

আমিরতি নাইলো পোলার মা আমিরতির করবি কি?
দরোজায় আছে গোবরের ঘশি হেইয়া আইন্যাদি
এলো ছি এমন হগুনের বাড়ি গান করতেছি।

কন্যা জাগানো গীত
ওঠো ওঠো মিরজান বডু
উঠো ডুলির মাঝে কি নারে
আমি যাবো ঐনা পরের ঘরে রে
কি কি দেবেন সাথেরে
থালা দিবো, বাটি না দিব মিরজান বডু
পাকশি খাতারে দিব সাথে নারে।

অত ব্যাবার চাই না রে বাপজান
আমি মাধন নিবো সাথে নারে।

www.pathagar.com

তোমার দ্যাশের মাইনষি কইবেরে মিরজান বড়ু
বান্দি আনছি সাতে নারে।
উঠো উঠো মিরজান বড়ু
উঠো ডুলির মাজে কিনারে
আমি যাবো ঐনা পরের ঘরে রে।
কি কি দিবেন সাথে নারে
গাই দিবো, বাছুর দিবো মিরজান বড়ু
রাখাল দিবো সাথে নারে।

অত ব্যাবার চাইনারে চাচাজান
আমি চাচিরে নিব সাতে নারে,
তোমার দ্যাশের মাইনষি কইবেরে মিরজান বড়ু
বান্দি আনছে সাথে নারে।

কন্যা-ছেলে স্নান করানো গান

মইওরা মইওরী সনে
নিত্য নতুন ফুল বাগানে
আমার মাইয়ার এই বাসনা
হলইদ বেগর গোসল করে না
আমার পেয়ার এই বাসনা
গিলা বেগর গোসল করে না
মইওরা মইওরী সনে
নিত্য নতুন ফুল বাগানে
আমার মাইয়ার এই বাসনা
সাবান ছাড়া গোসল করে না
আমার পোয়ার এই বাসনা
গামছা ছাড়া গোসল করে না
মইওরা মইওরী সনে
নিত্য নতুন ফুল বাগানে।

হলুদ গিলার গান

ঘরে বসে সাত রানি গিলার বিচার করে
রানি বলে গিলারে তোর জনম কিসে?
গিলা বলে, আমার জনম সুন্দরবনের মাঝে।

www.pathagar.com

ঘরে বসে সাত রানি হলদির বিচার করে
রানি বলে হলদিরে তোর জনম কিসে?
হলদি বলে আমার জনম হালিয়ার চাষে।

ঘরে বসে সাত রানি সন্ধ্যারে জিজ্ঞাস করে
সন্ধ্যারে তোর জনম কিসে?
সন্ধ্যা বলে, আমার জনম ক্ষীর নদী তীরে।

দোয়া করার গান
পাঁচ কাপড় পইরারে ছাওয়াল সিপাই
খাড়ায় মুরুব্বির আগে
ভালো দোয়া দেওরে বাপজান
বিয়ার সাজন গো ভালো সাজি
বিয়া কইর‍্যা বাড়ি আসি।
ভালো দোয়া দিছিরে ছাওয়াল সিপাহি
তুমি বিয়ার সাজনগো ভালো সাজো
তুমি বিয়া কইর‍্যা বাড়ি আসো।

আন্দার রাইতে যাওরে ছাওয়াল সিপাহি
তুমি হলক রাইতে বাড়ি আসো।
কাটাবন দিয়া বাড়ি যাওরে সিপাহি
তুমি ফুল বন দিয়া বাড়িতে আস
তুমি দোসর লইয়া বাড়ি আসো।

এ সময় মেয়ের কান্না
মাগো মা, আমারে কেমনে দেবা বিয়া
একলা ঘরে ক্যামন কইর‍্যা
থাকবা আমারে থুইয়া গো।
বুইনগো, আমারে কেমনে দেবা বিয়া
একলা একলা ক্যামোন কইর‍্যা
খেলবি আমারে থুইয়াগো।

বাপগো, আমারে কেমনে দেবা বিয়া

www.pathagar.com

একলা বাড়ি কেমন কইর‍্যা
থাকবা আমারে থুইয়া গো।
দাদাগো, আমারে কেমনে দেবা বিয়া
বুড়াকালে কেমন কইর‍্যা
থাকবা আমারে থুইয়াগো।
দাদি গো,আমারে ক্যামনে দিবা বিয়া
এই বাড়িতে কেমন কইর‍্যা
থাকবা আমারে থুইয়া গো।

মেয়ের বিলাপ

ঐনা কোলার মাঝেরে
বাজান কিসের বাদ্য বাজে।
ঐনা কোলার মাজেরে ময়না
তোমার বিয়ার বাদ্য বাজে।
আমারে যে দেবেন বিয়া
বাজান কয়শো টাকার করাল।
পাঁচশো টাকার সেল করাল
আর বাক্স ভরা অলংকার।

মায়ের কান্না

পরের ঘরে যাও রে কন্যা, কন্যা, আরে কইয়া দেই তোর আগে,
দুঃখিনী জননীর কথা, মাগো, তোমার মনে যেন থাকে।
কত কষ্টে লালন করলাম, কন্যা, আরে করলাম আলা ঝালা,
না চাইতে হাতে তুইলা দিলাম কত সোহাগের ডালা,
দশ মাস দশ দিন, কন্যা, আরে গর্ভে ধরলাম তোরে,
খাইতে শুইতে চলতে ফেরতে মরলাম কত দুশ্চিন্তা করে।

কত নিয়ম পালন করলাম, কন্যা, বইস্যা ঘরের কোণে,
ভোগলাম কত বিষ বেদনা কেউর কাছে না কইয়া গোপনে,
নিদ্রা নাই গেছিরে কন্যা, দিছি, কন্যা, পেট ভইরা না দানা,
অসুখে বিসুখে আমি তোমার লইগা হইছি দেওয়ানা।

কত মন্ত্রে কত ঔষধ দিছি আইন্যা কত মুলুক খুইজ্জা,
এত বড় করলাম তোরে কত নারে পির মুর্শিদ পূইজ্জা।

www.pathagar.com

বর ভালো, ঘর ভালো পাইয়া, কন্যা তোরে করলাম কোল ছাড়া
তুই যে আমার নিধি তুই যে আমার নয়নের তারা।

দিবা নিশি ভাবতামরে, কন্যা, কন্যারে তোর সোনা মুখখানি,
ঘরের বস্তু পরকে দিয়া কাইন্দা মরবে অভাগী জননী।
মনে অইলেই মরতামরে, কন্যা, তোমার লইগ্যা জ্বলিয়া পুড়িয়া,
পাখ থাকিলে পঙ্খি অইয়া পড়তাম যাইয়া তোর কাছে উড়িয়া।

যাওয়ার কালে একটিরে কথা, কন্যা কইয়া দেইরে তোরে,
বিষ খাইয়া বিষ অজম কইর‍্যা, কন্যা, তুমি থাইকো জামাইর ঘরে।
শাশুড়ি ননদির কথা, কন্যা, তুমি শুইন্য মন দিয়া,
হইও না যে কলঙ্কিনী, কন্যা, তোমার গর্ভেতে ধরিয়া।

গায়ে মেহেদির গান

মুন্দির লইগ্যা পড়াইলাম নাও
নাও আইতাছে শায়মানা টানাইয়া
মুন্দি তোমার জন্ম কোথায়
আমার জন্ম পায়রা নদীর তীরে
মুন্দি তোরে দেলে কি হয়
মোর দেলে বিয়ার রঙ্গো হয়।

বিয়ার সাজানো গান

সাজাও সাজাও আঁখিরে
হেলে দুলে ধীরে ধীরে
দেশি শাড়ি ঘরে রইয়া
বিদেশি শাড়িতে সম্মান গিয়েছে। ঐ

দেশি গয়না ঘরে রইছে
বিদেশি গয়নায় সম্মান গিয়েছে। ঐ
দেশি আলতা ঘরে রইয়াছে
বিদেশি আলতা সম্মান গিয়াছে। ঐ
দেশি কাজল ঘরে রইয়াছে
বিদেশি কাজল সম্মান গিয়াছে। ঐ

www.pathagar.com

দেশি পাউডার ঘরে রইয়াছে
বিদেশি পাউডারে সম্মান গিয়াছে। ঐ
দেশি নখ মালিশ ঘরে রইয়াছে
বিদেশি নখ মালিশে সম্মান গিয়াছে। ঐ

বিয়ের সময় বর আসলে গান

তারে নারে প্রাণ আমার উড়ু উড়ু করে
আরো আইছে পোলার বাপ ডেকে আনো তারে
অল্প স্বল্প মিডাই আনছে দিব না তোমারে।
আরো আইছে পোলার বোনাই ডাইকা আনো তারে
পান আনছে অল্প স্বল্প দিব না তোমারে।
আরো আইছে পোলার কাকায় ডাইকা আনো তারে
সুপারি আনছে অল্প স্বল্প দিব না তাহারে।
আরো আইছে পোলার মামু ডাইকা আনো তারে
জর্দা আনছে অল্প সল্প দিব না তাহারে।

আরো আইছে পোলার খালু ডাইকা আনো তারে
বিড়ি আনছে অল্প স্বল্প দিব না তাহারে।
আরো আইছে পোলার দাদু ডাইকা আনো তারে
দই আনছে অল্প স্বল্প দিব না তাহারে।

নয়া অতীত আসলে গান

নয়া অতীত আইছে
রিক্সা দিমু যাইতে
মাতাডা রাইখ্যা দিমু
ফুটবল খেলাইতে
নয়া অতীত আইছে
সাইকেল দিমু যাইতে
হাত দুখান রাইখ্যা দিমু
বেলইন বানাইতে
নয়া অতীত আইছে
চক্ষু দুইডা রাইখ্যা দিমু
মারবল খেলাইতে

www.pathagar.com

নয়া অতীত আইছে
নৌকা দিমু যাইতে
পাও দুখানা রাইখ্যা দিমু
জলচকি খিলাইতে
নয়া অতীত আইছে
গরু দিমু যাইতে
চুল দুগাছ রাইখ্যা দিমু
সিকা বানাইতে।

নয়া অতীত আইছে
ছাগল দিমু যাইতে
চামড়াডা রাইখ্যা দিমু
ডুগ ডুগি বানাইতে।

শুভদৃষ্টির গান

ও রাম বিয়া করতে আইলো
শ্বশুর বাড়িতে
চিকন শক্তি রাশ পেয়েছে
সিতারে পেতে
ওরাম সিতা তরুণী
ও রাম বৈঠা লও কিনি
আস্তে ধীরে বাইও বৈঠা
তুফান হয় ভারী
শুভদৃষ্টির কালে
পড়লো মায়ারই জালে
ভুবন মোহন রূপ
মাধুরী ভজ জুগাইলে

দুই দিন দুই রাত্র পরে
যাইও প্রেমের বাজারে
বিনা সুধে বিনা ঋণে
বেধে লও তারে
অধম ছিমতি বলে

www.pathagar.com

যদি যেতে চাও পারে
কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইও
সদায় গুরুর কাছে।

বিয়ে বাড়িতে সবাই খেতে বসলে গান

তোমরা খাওসে খাওসে আরো কিছু আছে
পোলার মায়ের পাছ দুয়ারে ভাল্লুক দুইডা নাচে।
তোমরা খাওসে খাওসে আরো কিছু আছে
পোলার কাকির পাছ দুয়ারে কেডি দুইডা নাচে।

তোমরা খাওসে খাওসে আরো কিছু আছে
পোলার বুইনের পাছ দুয়ারে বান্দর দুইডা নাচে।
তোমরা খাওসে খাওসে আরো কিছু আছে
পোলার মামির পাছ দুয়ারে পাতি হিয়াল নাচে।
তোমরা খাওসে খাওসে আরো কিছু আছে
পোলার দিদির পাছ দুয়ারে হগুন দুইডা নাচে।

তোমরা খাওসে খাওসে আরো কিছু আছে
পোলার মাসির পাছ দুয়ারে বিলই দুইডা নাচে।
তোমরা খাওসে খাওসে আরো কিছু আছে
পোলার পিসির পাছ দুয়ারে গুইলের ডিম আছে।

গ. কর্মসংগীত

সারি গান

১.

হেইয়ো জোয়ান হেইয়ো
আরো জোরে হেইয়ো
সামনে চল হেইয়ো
আগে চল হেইয়ো
সাবাস জোয়ান হেইয়ো
আগে নাও পাচে গেলো
হেইয়ো জোয়ান হেইয়ো।

www.pathagar.com

২.

গুরুমান পথ চেন কেন বেড়াও ঘুরে
হাট করতে এসেছো বান্দা ভবের হাটুরে
ভবের হাটে এসে বান্দা বেচো-কেনো খাও
আলিস্যা করো না বান্দা, আল্লার নাম লও।

৩.

বাইচা টান দেওরে
ভরায় যুইয়া পাও
বারো আনির নাও
বাইচা টান দেওরে।

ছাদ পেটানো গান

১.

হোক সে কালো, আমার বড় লাগে ভাল
কাঁঠাল গাছের আঠার মতো জড়িয়ে ধরেছে।
মুচকি হাসি হাইস্যা আবার চাক্কু মেরেছে
কাঁঠাল গাছের আঠার মতো জরিয়ে ধরেছে।

২.

ছাদ পিটাইতে গেলাম আমি
কেরাত আলাদার বাড়ি
নিচের তলায় নাইম্যা দেহি
ব্যাট ক্লাইন্না এক বুড়ি
ছাদে আইলোরে বয়াতি নাগর
গালের চামরা ধোতরা দেছে
চউক ভরা ক্যাতর।

ঘ. হয়ালি

ভারী কোনো কিছু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে কিংবা নিচ থেকে উপরে তুলতে শ্রমিকরা দলগতভাবে যে ধ্বনি ব্যবহার করে থাকে তাকে এ অঞ্চলে 'হয়ালি' বলে। এতে একজন–যিনি দলপ্রধান প্রথম বোল বলে অন্যেরা সমবেত স্বরে বলে 'হেইও'।

www.pathagar.com

ঠেলাগাড়ির বোল

১.

এই আল্লার নাম, হেইও
বুকে কালাম, হেইও
কালামের বাণী, হেইও
আমরা মানি, হেইও
বাণীর ধাপ, হেইও
বাপরে বাপ, হেইও
বাপের গলায়, হেইও
মাদুলী, হেইও
চাইয়া রইচে, হেইও
হাদুলী, হেইও
হাদুলীর মায়, হেইও
ভেটকি, হেইও
বইয়া থাকলে, হেইও
উটকি, হেইও।

২.

এই মাইয়ারে মাইয়া, হেইও
দেখরে চাইয়া, হেইও
দেখা মেলে, হেইও
দেখপি কি, হেইও
ল্যারের ঝি, হেইও
ল্যার জোটে না, হেইও

জোটে কি, হেইও
জোটে চাউল, হেইও
বাজে আউল, হেইও
আউল বাজে না, হেইও
বাজে পিরিত, হেইও
পিরিতে চোটে, হেইও
ভাতার জোটে, হেইও
আবুল কালাম, হেইও।

www.pathagar.com

৩.

এই বলরে মমিন হেইও
মমিন ভাই, হেইও
উপায় নাই, হেইও
বাজারে গ্যালে, হেইও
টাহা নাই, হেইও
পয়সা নাই, হেইও
পয়সা আছে, হেইও
চান নাই, হেইও
চান আছে, হেইও
তারা নাই, হেইও
আরে মোর, হেইও
ভায়রা ভাই, হেইও
তারা রে তারা, হেইও
ঐ খানে, হেইও
খারারে খারা, হেইও
দেখপি বাড়া, হেইও
বাড়া দেখপি না, হেইও
দেখপি ধোন, হেইও
কলা পাবি, হেইও
ষোল পোন, হেইও
ষোল আলি, হেইও
বৌ পাবি না, হেইও
পাবি হালি, হেইও
মোনেরে তোর, হেইও
লাগবে কালি, হেইও
কালি লাগে না, হেইও
লাগে রোং, হেইও
পিরিত করলে, হেইও
লাগে ঢোং, হেইও
পিরিতের খাতা, হেইও
কইলে যাতা, হেইও
যাতা কবা না, হেইও

www.pathagar.com

অইবে দোষ, হেইও
বেজাগায় তোর, হেইও
পড়বে ঠোস, হেইও
যত দোষ, হেইও
নন্দ ঘোষ, হেইও।

৪.
এই বোলরে বোল, হেইও
কাছা খোল, হেইও
মারবি পাছা, হেইও
বাইর অইবে পাছা, হেইও
মারবি পাছা, হেইও
পাছায় কইলো, হেইও
দুর্গন্দ, হেইও
হাতে মাখবি, হেইও
সুগন্দ, হেইও।

৫.
মাইয়া রে মাইয়া, হেইও
সব ফালায় খাইয়া, হেইও

আরে ছেরি, হেইও
বয়স হইয়াছে, হেইও
বছর কুড়ি, হেইও
বছর কুড়ি, হেইও
হইছে বুড়ি হেইও
বুড়ির পায় হেইও
বানছে নায় হেইও
বছর কুড়ি হেইও
বছর কুড়ি হেইও
হইছে বুড়ি হেইও
বুড়ির পায় হেইও
বানছে নায় হেইও

www.pathagar.com

বছর কুড়ি হেইও
বছর কুড়ি হেইও
হইছে বুড়ি হেইও
বুড়ির পায় হেইও
বানছে নায় হেইও
বছর কুড়ি হেইও
হইছে বুড়ি হেইও

বুড়ির পায় হেইও
বানছে নায় হেইও

গাছ টানা হয়ালি
সাবাস যোয়ান–হেইও
আরো জোরে–হেইও

রেনডি গাছের–হেইও
হোগার মইদ্যে–হেইও
বান্দো কাছি–হেইও
প্যাডের পোলা–হেইও
বাইর অয়না ক্যা–হেইও

রেনডি গাছের–হেইও
মায়েরে বোলাও–হইও
মাসিরে বোলাও–হেইও
বুইনেরে বোলাও–হেইও

জাগইর/রণহুংকার

কাজিয়া বা প্রতিপক্ষকে আক্রমণের জন্য সমবেত ধ্বনি। এ অঞ্চলের উপভাষায় একে বলে জাগইর। দলপ্রধান হাঁক দিয়ে বলে–খবরদারিরে
তার সঙ্গীরা বলে–হেইও।
কোন যৌথ কাজে গ্রামবাসীকে সমবেত হওয়ার জন্য জোরে চেঁচিয়ে বলে–কেডা কোম্মে আচ–
অন্যেরা বলে–আইসো।

www.pathagar.com

নৌকা নামানোর ধ্বনি–

নৌকা তীর থেকে নদী বা খালে নামানোর সময় সমবেত ধ্বনি–এই–ই ই–হেইও।

ঙ. কীর্তন গান

শ্রী গুরু বন্দনা

১.

আশ্রয় করিয়া বন্দো শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হইতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥

জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হলো গুরু রূপ ধরি।
মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান।

সত্য জ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস।
যার প্রতি গুরুদেব হয় পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন।

২.

কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু ছাড়া এ সংসারে নাহি আর গতি।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ।
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু নিন্দা তথা না যাইবে।

গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন।
গুরুপাদ পদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।

www.pathagar.com

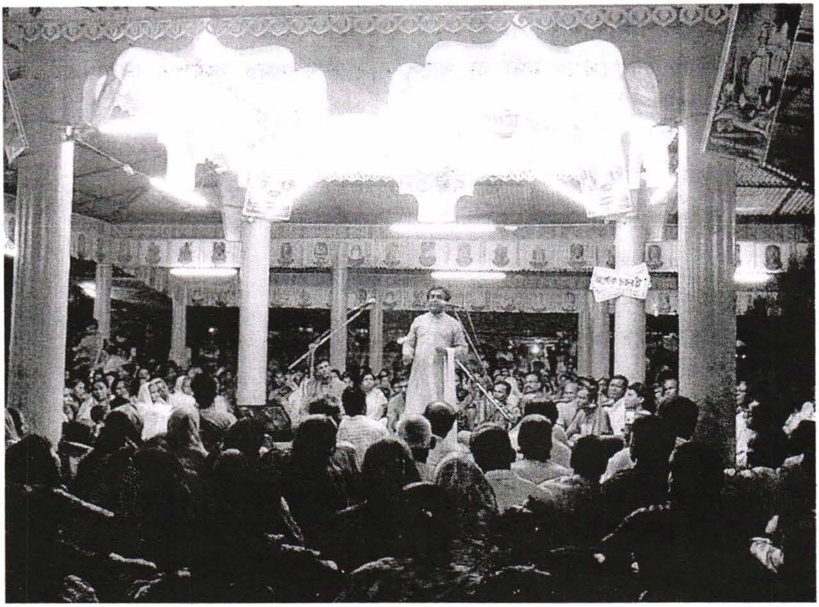

বরগুনার আখড়া বাড়িতে কীর্তন গান

উত্তর কাকচিড়া গোপালের আশ্রমে নাম-কীর্তনের আসর

www.pathagar.com

জগত তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি।
হেন গুরুপাদ পদ্ম করহ বন্দনা।
যাহ হইতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥

গুরুপাদ পদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ।
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস।
শ্রী শ্রী নাম ভজন।

৩.
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
সবে মিলি জপ গিয়া করিয়া নির্বন্ধ।
ইহা হৈবে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।
দশে পাঁচে মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'
কীর্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে।
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'

৪. নামকীর্তন
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

বাউল সুর
মিশ্র ভাটিয়ালি—একতালা

গুরু ভজন করিবি বলে মন, এ ভবে এসেছিলি।
(এবার) গুরু দত্ত প্রেম রত্ন ধন, বেহুশে সকল হারালি।

www.pathagar.com

১.
পাসরিয়ে পরম তত্ত্ব, হয়ে বলি কামে মত্ত ভুল করিলি।
(এবার) হারান ধন পেতে হলে মন, জানতে হবে তত্ত্ব বলি।
২.
চতুরবিংশ তত্ত্ব জেনে; বিকার শ্রী গুরুর শ্রীচরণে আনন্দ মনে।
(এবার) গুরু সেবায় হলে অধিকার, নিরান্দ যাবি ভুলি ॥
৩.
শ্রী গুরু হরিচাঁদে ভেবে বলে, হয় না সে প্রেম ভাব দেখালে, চির কালে।
ব্রজেশ্বর তুই পারবি কেনে, মূলতে শূন্য হলি ॥

বাউল সুর

প্রাণ পাখি যেদিন চলে যাবে।
খালি খাঁচা পড়ে রবে ॥
১.
পাখির আশা ছিল মনে, আনন্দ করবে নিশি দিনে গো।
আনন্দের চাদ নিরানন্দে কয়দিন খাঁচায় কাটাবে ॥
২.
পাখি আর এক কর্ম্ম করে, গুন গুন করে গুন গান করে গো।
খাঁচা যে দিন জীর্ণ হবে, ভয় পেয়ে পাখি পালাবে ॥
৩.
ব্রজেশ্বর তোর কর্ম্ম মন্দ, পাখির সনে নাই সম্বন্ধ গো।
শ্রী গুরু হরিচাঁদের কৃপানন্দ, যেদিন কপারে ঘটিবে ॥

বাউল সুর

ভবের হাটে সকল পাগল
পাগল চেনা সহজ নয় ॥
১.
এক পাগল নারায়ণ নামে, লক্ষ্মীকে রাখেন তাহার বামে গো।
শঙ্খ চক্র গদা, পদ্ম, হাতেতে তার দেখা যায়। ॥
২.
শ্রীরাম চন্দ্র পাগল হলো, সীতাকে নিয়ে বনে গেল গো।
রাক্ষসে তাকে হরণ করল, প্রমাণে তার সতীত্ব রয় ॥
৩.
আর এক পাগল কৃষ্ণ বেটা, শ্রীরাধাকে নিয়ে ভীষণ লেটা গো।
স্বামী তাহার আয়ান বেটা, কলঙ্কের হার অলংকার হয় ॥

www.pathagar.com

৪.
শ্রীগৌরাঙ্গ পাগল হইয়া, বিষ্ণু প্রিয়াকে করেছেন বিয়া গো
তার্কীক পাষণ্ড দলন লাগিয়া, ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেয়।
৫
শ্রী গুরু হরিচাঁদ পাগল হইয়া, কত পাগল গেছে বানাইয়া গো।
ব্রজেশ্বর এখন কান্দে বইয়া, পাগল পাড়া স্থান না পায় ॥

বাউল সুর

পরকে যেদিন করবি আপন।
পর পারের মানুষ পাবি দর্শন ॥
১.
মানুষ হাওয়ায় আসে হাওয়া যায়, হাওয়ার সন্ধান জানতে হয়গো।
মানুষ কুম্ভুকেতে পরবে ধরা, চিবুকেরী প্রয়োজন ॥
২.
স্বতঃ রজঃ তমঃ গুণ ধরে, আসা যাওয়ার খেলা কয় তারে গো।
মানুষ ধরতে হলে খেলা ছেড়ে দ্বিদল উপরে কর গমন ॥
৩.
মূলাধার পরিষ্কার হলে যাবি চলে গো।
শ্রীগুরু হরিচাঁদের কৃপার পাথারে, ব্রজেশ্বর সাঁতার দেও এখন ॥

দরবেশি

দয়াল গুরুধন বাবা আমার নালিশ কি মঞ্জুর হবে না।
আমি নালিশ করি শ্রীচরণ ধরি, ভবে আমি পাতকি একজনা ॥
১.
পাতকি ত্বরাতে আসিলে ভবেতে, পাতকি খুঁজিয়া পাও না।
এখন লইলাম শরণ, আমি অভাজন, দয়াল কর আমায় করুণা ॥
২.
গুরুবাক্যে নেইকো বিশ্বাস, দয়া পেতে মনেতে আশ, শুধু কল্পনা।
আমি সদা করি হুতাশ, আমার কি কোনো উপায় হবে না ॥
৩.
অধম ব্রজেশ্বর বলে কেন্দে,
পড়িয়াছি ভীষণ ফান্দে কোথায় রইলা হরি চান্দে।
এখন কৃপা কর নিজানন্দে, নইলে উপায় দেখি না।

www.pathagar.com

মনহর সই

কি করিব গুরু উপায় দেখি না ।
আমার মনের ব্যথা ঘুচাইতে, তুমি বিনে কেউ পারবে না ॥
১.
মনের ব্যথা হৃদয় গাথা, তুমি বিনে বলবো কোথা ।
পঞ্চরসের পাচন না দিলে, এ ব্যথা মোর যাবে না ॥
২.
তুমি আমার আদি মূল, সকল ব্যাধি করবে নির্মূল ।
তুমি আমার অকূলের কূল, এবার আমায় ভাসাইও না ॥
৩.
শ্রী গুরু হরিচাঁদ কর আপদ শান্তি, ঘুচাও আমার সকল ভুল ভ্রান্তি
ব্রজেশ্বরের এই মিনতি, এবার বাকি যেন কিছু থাকে না ॥

ধানীশ্রী

পিরীতি জানে কয় জনে, পিরীতি জানে কয় জনে ।
করতে হয় গোপনে, গোপনে, গোপনে ॥
১.
পিরীতির এমন রীতি, হৃদয়ে তার হয় বসতি ।
প্রকাশ হয় তার নয়নে, নয়নে, নয়নে ॥
২.
পিরীতির এমনি করণ, চণ্ডী রজকিনীর সাধন ।
থাকে ধেয়ানে, দেয়ানে, ধেয়ানে ॥
৩.
পিরিতের আর এক ধরন, অধরামৃত রস আস্বাদন ।
ব্রজেশ্বর পায় না আস্বাদ, সুকৃতি বিহনে, বিহনে, বিহনে ॥

ভায়ালি

বেড়াব তোমার নাম নিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
তুমি কৃপা কর দীন বন্ধু, আমায় পাতক জানিয়া ।
১.
পাতকি তাড়াবে বলে, এ ধরাধামে এসেছিলে গো ।
ভবে আমি একজন মহা পাতক, দিও না অকূলে ডুবাইয়া ॥
২.
তোমার যারা ভক্ত আছে, তুমি থাক তাদের কাছে কাছে গো ।
দয়াল আমার কপাল পুড়ে গেছে, কামানলে দগ্ধ হইয়া ।

www.pathagar.com

৩.

ব্রজেশ্বর কেন্দে বলে, সাধের সাথি যখন যাবে চলে গো।
আমার মহা যাত্রার কালে,দয়াল দেখা দিও আসিয়া ॥

শিল্পী পরিচিতি : শ্রী ব্রজেশ্বর দাস, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গোস্বামীর পোষ্য। গ্রাম : বড় সিঙ্গা, উপজেলা : মঠবাড়িয়া, জেলা : পিরোজপুর। তিনি শতাধিক কীর্তন গানের রচয়িতা ও সুরকার। তিনি গ্রাম গঞ্জে প্রতিনিয়ত কীর্তন গান গেয়ে বেড়ান।

ভোর কীর্তন

ভোর হইলো নিশি জাগরে নগরবাসী
জাগিয়া লও কৃষ্ণের নাম রে ॥
প্রভাতে লইলে নাম সিদ্ধি হবে মনস্কাম
আরো হবে শরীরের কুশল রে ঐ
যত ছিল ব্রজবাসী সবে আসি কুঞ্জ বসি
হরি নাম লয়রে ঐ

চ. দেহতত্ত্ব গান

দয়ালরে দয়াল, ওরে আমি ব্লগদ পাইলে খুশি হব
বাকি পাওয়ার আশা নাই
বান্দারে না জানিয়া না বুঝিয়া দিতেছি দোহাই ॥
দরদিরে মায়ের পেটে ভাইয়ের সাথে তর্ক হলে
যে ফালাইলে লকেং লয়ে এ দুঃখ কাহারে জানাই ॥
আমার মায়ের পেটে নানীরগো জন্ম
আমায় আবার রাখতে দেনায় গো
দরদি মায়ের পেটে দয়াল নারীর জন্ম
আমার চালান শূন্য, দাঁড়াবার তো জাগা নাই
বান্দারে না জানিয়া না বুঝিয়া দিতেছি দোহাই ॥
চিনির চাইতে চিরতা মিঠা
মুরগিতে আজ শিয়াল খায়
তাই দেখিয়া হাঁসের মজা
বগির হবে কি ॥

বান্দারে নাজানিয়া নাবুঝিয়া দিতেছি দোহাই ॥
সরকার রিপন বলে, বোঝাই তার মাইনি
দরদি উপায় কি করি

www.pathagar.com

বান্দারে না জানিয়া না বুঝিয়া দিতেছি দোহাই ॥
নগদ পাইলে খুশি হব বাকি পাবার আশা নাই ॥

দয়াল, কোনবা পথে কোন রাস্তাতে পাইব তোমার চরণ ।
কবে দুই মন হবে এক মন আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন ।
চার যুগেতে উদয় আমি বিশ্বাস করি কার কথায় ।
কোন যুগেতে কি নাম ধরে ডাকি তোমায় ভেঙে বল এখন ॥
সাধক সিদ্ধি কোনো দেশে হয় কি বর্ণন ।

কোন দেশেতে কি রূপ হয় মোর খুলে বল এখন ।
কোন রূপেতে আশ্রয় করে কোনো শক্তিতে নামকরণ ।
খালি কলসি বাজে বেশি প্রবাদ বক্তব্যের হয় বচন ॥
থাকলে তুমি আমার মধ্যে চুরি করে কোন চোরায় ।
রিপন সরকার চোরকে পাইলে শিক্ষা দিবে তাই এখন ।

তথ্যদাতা : মো . রিপন সরকার, পিতা : মো . মতিয়ার রহমান, মাতা : খাদিজা বেগম, ঠিকানা : বরগুনা সদর উপজেলার নয়াকাটা, পুলিশ লাইনের কাছে । পেশা : বাউল গান গাওয়া ।

ছ. বরগুনার আঞ্চলিক গান

১.

কওছেন দেহি এহন মুই
এলহা এলহা কি হরি,
হাত দিন ধইরা ম্যাবাই যে মোর
উইড্ডা রইছে হউর বাড়ি ।

বাজান হরে রাগারাগি
ম্যাবাইরে কয় আনতে
ম্যাবাই মোরে কইয়া গ্যাছে
গরু বাছুর বানতে
আর কোলার কামে নামতে ।

ম্যাবাই বড় আনাড়া
হরতে চায় না কোনডা
কেবল কেবল মাজাই গো মোর
হাজাইর লগে দেয় আড়ি ।

www.pathagar.com

২.

ওহ গেদু তুই কোম্মে গেলি?
তড়াতড়ি আয় তোর নানা আইছে
সালুন নিয়া, ভাত খাতি বুলায়।
মুড়া-মুড়কি কিনি আনছে
আরো আনছে আম
কতফড় এউক্কা কাডাল আনছে
হতর টাহা দাম
আরো জানি কি কি আনছে (২)
তুই দেখি যা আয় ... ঐ

কাইল বিয়ানে দেওরের লেইক্কা
কাডবি রেন্টি গাছ
পুহুরতনে ধরবি এউক্কা
ডাংগর কাতল মাছ
বুড়া মানু গুস্ত খা না (২)
মাছ খাতি মুলায়... ঐ
ওহ গেদু তুই ... ...

জ. বিচ্ছেদ গান

আহা শোনেন শোনেন সভাজন
শোনেন দিয়া মোওওন।
আহা শোনেন দিয়া মোওওন।
বেউলাগো দুঃকের কতা করিব বর্ণন।
আহা শোনেন দিয়া মোওওন।

বেউলাগো দুঃকের কতা কত কব আর
আহা কত কব আর
অকালে মরিল বিষে গুণের ভাতার
আহা গুণের ভাতার।

গরিবের ছাওয়াল পান ঘরে নাই দানা
আহা ঘরে নাই দানা।
অন্ন জোগাইতে জলে জঙ্গলে দে হানা

www.pathagar.com

আহা জঙ্গলে দে হানা ।
আষাঢ় মাসে নয়া জলে মাছ কিলবিল করে ।
আর মাছ কিলবিল করে ।

কত মৎস্য উড়ইয়া আসে কোলারও উপরে
আহা কোলার উপরে ।
কই, চ্যাং, শিং, আর বোয়ালো চিতল,
আহা বোয়ালো চিতল ।
তার মাঝে কেলি করে বিষধর খল
আহা বিষধর খল ।

বাইন মাছ ভাবিয়া যেবা তারে মারে টেডা ।
আহা তারে মারে টেডা ।
মনসা ডাকিয়া কয় তোরে বাঁচায় কেডা
আহা তোরে বাচায় কেডা?
বিনা দোষে মার মোরে তুই মাইনসের ছাও
আহা তুই মাইনষের ছাও ।

তয় ঢালইয়া দেলাম কাল বিষ যমের বাড়ি যাও
আহা যমের বাড়ি যাও ।
এই মতো মরে মোগো কত লখিন্দর
আহা কত লক্ষ্মীন্দর ।
যুবতী বেউলারা ভাসে সংসারসাগর
আহা সংসারসাগর ।

ধান মারাইয়ের গান
আহা তোমার বিবি হুইয়া আছে
ক্যাতা মুরা দিয়া
আহা তুমি সোনার চান্দো
কেন মর ঘুরঘুরাইয়া
আহা ধান পান যা হইবে
সে সবও মালিকের
হে সগল অন্ন কি তোমার
বাল ও বাচ্চার মুখের ।

www.pathagar.com

আহা মুহাবান্দা বলদ ঘোরে
পেটবান্দা তুই ।
তোরও কাম রোওন চওন
মালিকেরও ভুই ।

তুই চইবি তুই রুইবি
তোরও হাতে দাওয়া
তম তোমার জোটবে না তো
নেত্য দুই মুইঠ খাওয়া ।

তোমার বিবি হুইয়া আছে
এ্যাহেলা ক্যাৎরাইয়া
মালিকেরও বিবি ফাউকায়
বিছানাতে হুইয়া ।
আহা, তোমার বিবির প্যাডে যদি
অইন্য ক্যারো পোনা
ঘাপটি মারইয়া বইয়া থাহে
ক্যামনে তা জানা
হেই পোনা পোষো তুমি
সরলিত মন
আহা তোমার জীবন কান্দইয়া মরে
তোমারও যৈবন ।

আহারে মুরুব্বির পোয়ার
আছ আড়ে সাড়ে
ক্যামনে উঠিয়া শোবা
মাইন্দারের খাড়ে ।

মাইন্দারের খুদা নাই
কোথায় কাড়ে রাইত
মলন্তি গো খাডতে আইবে
বেয়ানও তামাইত ।
ইতিমধ্যে তার খাড়ে
কেবা করে নীলা

www.pathagar.com

ছোমেদ আলি কয় সে জোন
নিদয়া রঙিলা
নিদয়া রঙিলার কতা
কত কব আর
মাইন্দারের খাড়ে হুইয়া
রসেরও ভাতার ।

বাস্তুঠাকুরের পূজার পুনি

ঠাকুর কুলায় বোল
ও গিরি ও ও গিরি
বাইর কইরা দেও সোনার পিঁড়ি
সোনার পিঁড়িতে বইবে কেডা
বাস্তুঠাকুর আবার কেডা
বাস্তুঠাকুর দিবেন বর
ধানে চাউলে ভরবে ঘর
ধান দিবেন না দিবেন বাড়ি
মাঝ খাড়ালে সোনার লড়ি ।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

দেশি উপাদানে তৈরি বাংলাদেশে শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্রকে আমরা লোকবাদ্যযন্ত্র বলছি। এসব যন্ত্র স্থানীয় কারিগর ও শিল্পীরা তৈরি থাকেন। প্রধানত পূজা, নানা রকম লোকউৎসব ও লোকসংগীতে যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখানে তার কয়েকটি যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল ও ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

১. ঢাক

তাল যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ঢাক। এর উচ্চতা হয় সাধারণ ২৪-২৫ ইঞ্চি, বেড় ৫-৬ ফুট। আম, রেন্ট্রি ও চাম্বর কাঠ ব্যবহৃত হয়। প্রথমকে আস্ত একটা গুঁড়ি মাপমতো করাত দিয়ে কেটে, বাকল উঠিয়ে, বাইয়ের অংশ রাঁদা দিয়ে মসৃণ করা হয়। তারপর ভেতরের কাঠ বাটালি দিয়ে কেটে ফাঁপা করা হয়। তারপর দু'পাশ ছাগলের চামড়া দিয়ে ছাওয়া হয়। বাঁধার জন্য মোষের চামড়ার দেখাইল বা ফিতে দিয়ে টানা দেয়া হয়। ঢাকের কাঠি বানানো হয় বেত ও বকুল গাছেল কাঠ দিয়ে। দুর্গা, কালী ও লক্ষ্মী পূজায় ঢাক বাজানো হয়। বহুদূর থেকে ঢাকের বাড়ি শোনা যায়। বরগুনা জেলায় বিখ্যাত ঢাক-বাদক বামনা থানার উত্তর কাকচিড়া গ্রামের নিকুঞ্জ ভুইমালি বয়সের ভারে বৃদ্ধ। ৬০ বছর ধরে তিনি ঢাক বাদক করে আসছেন।

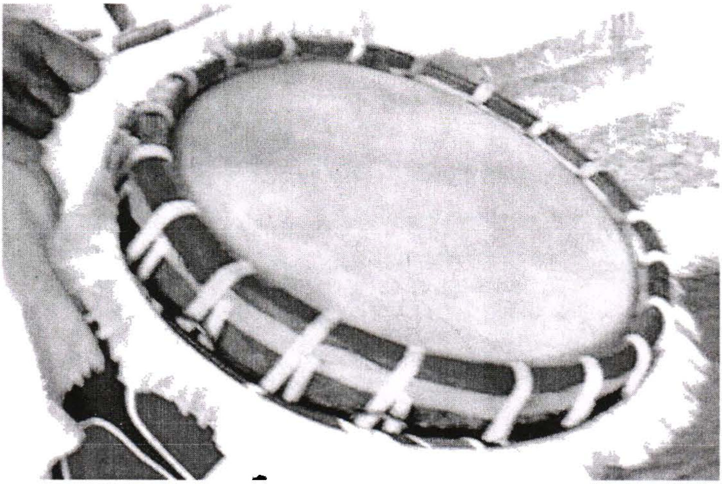

ঢাক

www.pathagar.com

২. ঢোল

ঢাকের চাইতে ছোট হলো ঢোল। ঢোল আবার দু-ধরনের–কাঠি ঢোল ও বৈঠকি ঢোল। কাঠি দিয়ে বাজায় কাঠি ঢোল। বৈঠকি ঢোল শুধু দুহাত দিয়ে বাজানো হয়। কাঠি ঢোলকে নরু ঢোলও বলা হয়। উচ্চতা হয় ১৪-১৬ ইঞ্চি, বেড় ৩-৪ ফুট। ঢোলও ঢাকের মতো আম, রেন্ট্রি ও চাম্বল কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। ছাউনি দেয়া হয় ছাগলের চামড়া দিয়ে। দোয়াইল বা ফিতা মোষের চামড়ার। টান বা সুরে কাটার জন্য পেতলের আংটা ব্যবহার করা হয়।

৩. খোল/শ্রী খোল/মৃদঙ্গ

খোলের খোল তৈরি করা হয় কুমারের মাটি দিয়ে। কুমারেরা খোলের খোল তৈরি করে। খোল পুড়ে শক্ত করা হয়। খোলকে মৃদঙ্গও বলা হয়। দুপাশের ছাউনি দেয়া হয় ছাগলের চামড়া দিয়ে।

দোয়াইল বা ফিতা দেয়া হয় মোষের চামড়ার। সুরে বাঁধার জন্য পেতলে আংটা ও নাল বা স্ক্রু ব্যবহার করা হয়। দু'পাশের চামড়ার উপরে মাটি ও লোহার গুঁড়োর প্রলেপ দেয়া হয়। নাম-কীর্তনে ও অন্যান্য গানে খোলের ব্যবহার না হলেই নয়। যারা তালবাদ্য বাজান তাদের এই এলাকায় বলা হয় বাইন। তারা নিজেদের নামের সঙ্গে পদবি হিসেবে বাইন ব্যবহার করে থাকেন।

এই অঞ্চলে নামকরা বাইন ছিলেন পরেশ মুচি ও রাখাল। এছাড়া ডঙ্কা, ডুগডুগি, বায়া, তবলাও স্থানীয়ভাবে তৈরি হয়ে থাকে।

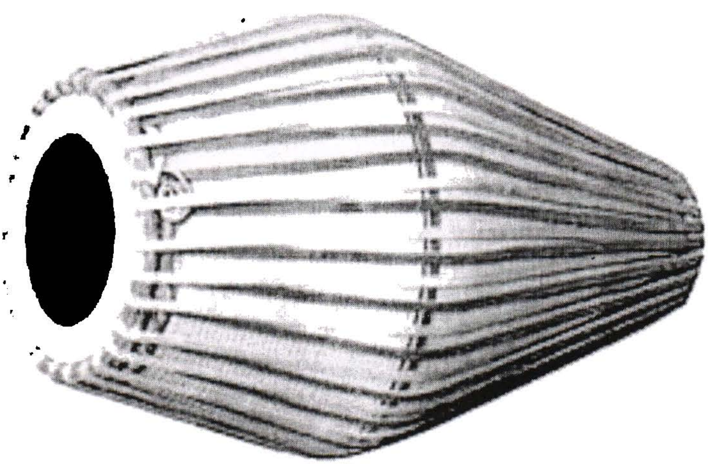

খোল

www.pathagar.com

৪. একতারা

একতারা বলতেই লাউয়ের প্রসঙ্গ এসে যায়। একতারা নিচের অংশ পাকা লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি হয়। কাঠ দিয়েও বানানো হয়। এছাড়া চামড়াও ব্যবহৃত হয় নিচের অংশে।

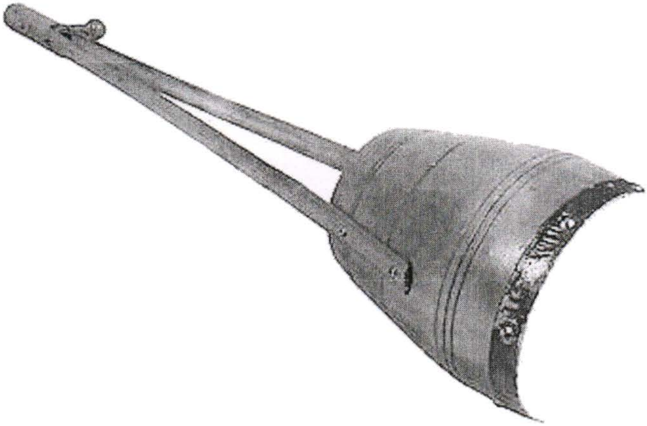

একতারা

৫. চাকি বা করতাল

ছোট গোল চাকি বা করতাল। কাঁসা দিয়ে চাকি বানানো হয়। মাঝখানে ছোট্ট ফুটো থাকে, যেখানে সরু সুতা বা দড়ি পরানো হয়। আঙুলে পেঁচিয়ে দুটো চাকি একসাথে বাজানো হয়। ঝম ঝম শব্দ হয়। ঢোল কাশ ও করতাল এই নিয়ে হয় ঐকতান। পূজা ও কীর্তনের সময় ঢোল, করতাল ব্যবহৃত হয়।

করতাল

www.pathagar.com

৬. বাঁশি

ফুঁক-যন্ত্রের মধ্যে বাঁশের বাঁশি অন্যতম। লোকসংগীতে বাঁশির ব্যবহার হয়ে থাকে। বাঁশি সাধারণত এক ধরনের পাহাড়ি বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। বাঁশি দুধরনের—আড়বাঁশি ও মোহনবাঁশি। আড়বাঁশির শব্দ মধুর। বাজাতে হয় ঠোঁটের সাথে আড়াআড়িভাবে ফুঁ দিয়ে। মোহনবাঁশি দুঠোঁটে চেপে ধরে রাখাতে হয়। আড়বাঁশির মতো শব্দ ততো তীক্ষ্ণ নয়, খানিকটা পাতলা। তাই নাম মোহনবাঁশি। বরগুনা শহরে একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান আছে। দোকানের প্রধান কারিগর নিরঞ্জন দাস, বয়স চল্লিশের মতো। নিরঞ্জন দাসের বাবার নাম ফণিদাস, মায়ের নাম রেনু, তাদের আদি বাড়ি বিক্রমপুর, বরগুনা প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আছে। তার বাবাও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজান। নিরঞ্জন দাস ছোট বেলা থেকে বাবার কাছ থেকে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা শিখেছে।

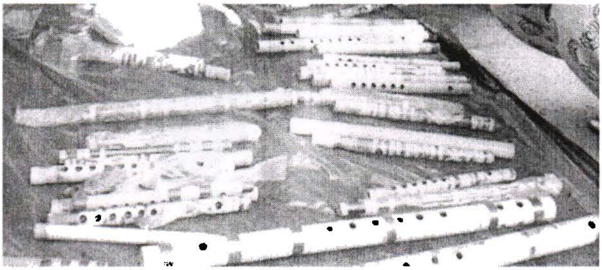

বাঁশি

৭. সারিন্দা

এ অঞ্চলে লোকসংগীত শিল্পীরা সারিন্দা ব্যবহার করে থাকে। সারিন্দা অনেকটা বেহালার মতো। ছড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। তবে শব্দ বেহালার মতো অত মিষ্টি নয়।

সারিন্দা

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. নবান্ন

এ অঞ্চলে মূলত অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব হয়ে থাকে। তবে উৎসব বলতে যা বোঝায় আজকাল আর তেমন নেই। তবুও অনেক পরিবারে, বিশেষ করে সম্পন্ন হিন্দু পরিবারে নবান্ন পালিত হয়। ব্যাপকভাবে না হলেও অবস্থাপন্ন কোনো কোনো মুসলিম কৃষক পরিবারে অগ্রহায়ণের একটা দিন নতুন চালের ভাত ও হাঁসের মাংস খেয়ে থাকে। নিদেন পক্ষে চিতা পিঠা তৈরি করে। এ অঞ্চলে মূল আমন ধান পাকে পৌষ মাসে। তার আগে অগ্রহায়ণ মাসে কিছু আগাম ধান পাকে। সেগুলো হলো রাজা শাইন, আগনি, কুটি আগনি ইত্যাদি। ধান কাটার আগে হিন্দু সম্প্রদায় মালিদের তৈরি শোলার রঙিন চৌকো মতন চৌমুহরী ক্ষেতে একটা কাঠির মাথায় টাঙিয়ে রাখে। ক্ষেত থেকে এক গোছা আমন ধানের ছড়া ঘরের চৌকাঠে লক্ষ্মী-সরার সাথে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর ধান কাটে। মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকে ক্ষেত থেকে ধানের ছড়া এনে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখে। আজকাল উচ্চ ফলনশীল ধান বলতে গেলে সারা বছরই হয়। সে কারণে নতুন ধান ও নবান্ন উৎসবের গুরুত্ব হয়তো কমেছে।

২. আমুয়ার দশোহরা উৎসব

আড়াইশ বছরের ঐতিহ্যে লালিত বরগুনার বামনা উপজেলার চালিতাবুনিয়া ও ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী আমুয়া নদীর মোহনায় প্রতি বছর দুদিনব্যাপী আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী দশোহরা উৎসব, লোকভাষায় দশোরা। ৪ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিষখালি নদীর তিনটি শাখা নদীর মোহনায় প্রতি বছর দশোহরা উৎসবে উপকূলীয় এলাকার কয়েক হাজার উৎসবমুখর মানুষ সমবেত হয়। তবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ঐতিহ্যবাহী দশোহরা উৎসব ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। দশোহরা উৎসবকে ঘিরে দূর-দূরান্ত থেকে উৎসবমুখর মানুষের উপস্থিতিতে উৎসবস্থল যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শত শত যান্ত্রিক ট্রলার আর নৌকায় চড়ে নাচ-গানের মধ্য দিয়ে এ উৎসব পালিত হয়।

এ সময় উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন দুর্গাপূজা মণ্ডপ থেকে ২৫টি দুর্গা প্রতিমা আমুয়ার এই দশোহরা উৎসবে নিয়ে আসা হয়। প্রতিমা বহনকারী নৌকা ও ট্রলার নদীর মোহনার চারপাশজুড়ে ঘুরে ঘুরে ঢাকঢোল পিটিয়ে আনন্দ-উল্লাস করে এ উৎসব পালন করে। উৎসবে সব ধর্মের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

www.pathagar.com

আড়াইশ বছর আগে তাৎকালীন জমিদার লালা বিশ্বজিৎ মিত্র আমুয়া বন্দরের এ উৎসবের সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে এ নদী মোহনায় এ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর এ উৎসব ঘিরে নৌকাবাইচ, কবি গান, জারি গান, যাত্রা, পুতুল নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া নদী মোহনার চারপাশজুড়ে দিনভর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সুনীলচন্দ্র সোম নামে আমুয়ার এক প্রবীণ ব্যক্তি জানান, আমুয়ার দশোহরা উৎসবে সরকারি-বেসরকারি কোনো সহায়তা না থাকায় আড়াইশ বছরের এ ঐতিহ্যবাহী উৎসবটি ম্লান হতে চলেছে।

মুক্তিযোদ্ধা নারায়ণ লাল জানান, এ উৎসবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। তাছাড়া উপকূলীয় এলাকার আভ্যন্তরীণ খালগুলোর নাব্যতা কম ও খালে বাঁধ দেওয়ায় নৌ-চলাচল কমে গেছে। ফলে উৎসবে নৌপথে আগের মতো প্রতিমা না আসায় এ উৎসবটি অনেকটা ম্লান হতে বসেছে। আজো বরগুনা, ঝালকাঠি উপকূলীয় এলাকার হিন্দু-মুসলমানদের মিলনমেলা হিসেবে এ উৎসবকে দেখা হয়।

৩. বিয়ে : মুসলিম বিয়ে

গ্রামাঞ্চলে বিয়ে হলো সম্বন্ধ। অর্থাৎ এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের আত্মীয়তা। সে জন্য পাত্রপাত্রী দেখেশুনে সম্বন্ধ বা বিয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। বংশ-পরিচয় ও শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। বলা হয়, জাতের মাইয়া কালোও ভালো/নদীর জল্ ঘোলাও ভালো, আবার বলা হয়, হাজার কথা খরচ না হলে বিয়ের সম্বন্ধ হয় না। এ জন্য প্রয়োজন মাঝখানে একটি লোকের। তিনি হলেন ঘটক।

ঘটক,

দুই পরিবারের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব যিনি আদান প্রদান করেন তিনি হলেন ঘটক। ঘটক বলতে আমাদের সামনে আগে যে চেহারা ফুটে উঠত, আজকের আধুনিক ঘটক তেমন নন। তবে ঘটক মানেই চটপটে, বাকপটু। ঘটকরা আজকাল ছেলেমেয়ের ফটো নিয়ে দেখান।

মোবাইলেও তাদের ছবির সংগ্রহ থাকে, যাতে চট করে পাত্র কিংবা পাত্রী পরিবারের মা-বাবাকে দেখাতে পারে। ঘটকালির যেমন ভালো হলে সুনাম, বেবার বা উপহার পেয়ে থাকেন, আবার মন্দ হলে নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, অপদস্ত হতে হয়। এই অঞ্চলে ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে ঘটকের মাধ্যমেই হয়। ছেলেমেয়েদের নিজেদের পছন্দের বিয়ে পরিবারের লোকজন পছন্দ করে না।

বাড়ি-ঘর দেখা

দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ের কথাবার্তা হলে, দুই পরিবারই উভয়ের বাড়ি ঘর দেখে আসে। তারপর সিদ্ধান্ত হয় কনে দেখা হবে কি না।

www.pathagar.com

কনে দেখা

বাড়ি-ঘর ও বর মোটামুটি পছন্দ হলে কনে দেখার তারিখ ঠিক হয়। নির্ধারিত দিনে পাত্র পক্ষ কনে দেখতে যায়। আগে শুধু বরের বাবা ও অন্য আত্মীয়রা কনে দেখতে যেত। বর্তমানে বর তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ও মা-বাবা ও আত্মীয়দের নিয়ে কনে দেখতে যায়। কনে পছন্দ হলে বর পক্ষ কনেকে আংটি কিংবা সোনার চেইন পরায়। পছন্দ না হলে কিছু টাকা দিয়ে বলে, আমাদের সিদ্ধান্ত পরে জানাব।

পণ/বেবার/যৌতুক

আগে কনেপণ ব্যবস্থা ছিল। ৫০-৬০ বছর আগেও বিয়েতে বরপক্ষ কনেকে পণ দিত। পরিবারের মর্যাদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই পণের টাকা নির্ধারিত হতো। আর বরকে সামান্য কিছু বেবার বা উপহার দেওয়া হতো। বেবার বলতে ছাতা, লাঠি, লুঙ্গি, পাজামা, পাঞ্জাবি, টুপি। কিন্তু বর্তমানে কনেপণ ওঠে গেছে। এখন যৌতুক প্রথা চালু হয়েছে। বরকে কনের বাবাকে বিপুল অঙ্কের টাকার যৌতুক দিতে হয়। যৌতুকের ভয়াবহতা এমনই—অনেক কনের বাবাকে নিঃস্ব হতে হয়।

শরা-কাবিন

পাত্র-পাত্রী পছন্দ হলে দুই পরিবারের অভিভাবকরা শরা-কাবিনের তারিখ নির্ধারণ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কনের বাড়িতে কাজি ডেকে শরা-কাবিনের ব্যবস্থা করা হয়।

আবার কাজির অফিসে উপস্থিত হয়ে শরা-কাবিনের আয়োজন করে। কনের বাড়িতে শরা-কাবিনের ব্যবস্থা হলে উত্তম ভোজের আয়োজন করা হয়। কাজির অফিসে হলে মিষ্টি মিঠাই খাওয়ানো হয়।

গায়ে হলুদ

বিয়ের প্রধান অনুষঙ্গ হলো গায়ে হলুদ। কনের বাড়িতে বরপক্ষ, বরের বাড়িতে কনেপক্ষ গায়ে হলুদের তত্ত্ব বা উপকরণ পৌঁছে দেয়। গায়ে হালুদের সময় নানা রকম আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। যেমন হলুদ, গিলা ইত্যাদি উপাচারের প্রয়োজন হয়। হলুদ বাটার সময়, কনেকে গোসল করার সময় মেয়েরা গান গায়। এই গানকে এলাকায় হয়লা বলা হয়।

গোসল করানোর সময় নানা রকম ঠাট্টা-মসকরা করা হয়। উঠোনে পানি ঢেলে পাছড়াপাছড়ি করে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আজকাল মেয়েরা আর আগের মতো হয়লা গায় না। এর পরিবর্তে মিউজিক সিস্টেম ভাড়া করে বাজানো হয়। কখনো কখনো শহর থেকে ব্যান্ড দল এনে অনুষ্ঠান করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে ঐতিহ্যবাহী মেয়েলি গীত হয়লা হারিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

গেট ধরা

বরপক্ষ বরসহ কনের বাড়িতে এলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা গেট ধরে থাকে। উভয় পক্ষের মধ্যে নানা তর্ক, ধাক্কাধাক্কির পর বরপক্ষ কিছু টাকা দিলে গেট ছাড়া হয়।

আলিস্যা পড়া

বরের আসনে একজন শুয়ে পড়ে থাকে। একে বলে আলিস্যা পড়া। অর্থাৎ সে এমন অলস যে তাকে নড়ানো যায় না। এমনকি গায়ে চিমটি কাটা, কাঁটা ঢোকানো, যা কিছু করা হোক না কেন তার দাবি অনুযায়ী টাকা না দিলে সে আসন ছেড়ে উঠবে না। পরে আপোস রক্ষা করে টাকা-পয়সা দেয়া হলে সে উঠত। আগে প্রতি গ্রামে এরকম একজন আলিস্যাদার পাওয়া যেত।

জুতা চুরি

কোনো এক ফাঁকে বরের জুতা চুরি হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তারপর বরের জুতা উদ্ধার করা হয়।

হাত-ধোয়ানি

বরের খাবার পরে দু-একজন ছেলেমেয়ে হাত ধুইয়ে দেয়। এজন্য বরকে কিছু টাকা দিতে হয়।

চাপান উতর

বিয়ের আসরে বর কনে দুপক্ষেরই কিছু লোক থাকে যারা গালগল্পে খুব চৌকস থাকে। কনেপক্ষের একজন হয় তো বলল, অমুক বছর মোগো মামু বাড়ি বত্রিশটা গরু বিয়াইছিল। বরপক্ষের চাপানদার বলল, হেইবার মোগো সাতটা গাভীর একুশটা বাছুর অইছিল। এমনি সব আজগুবি গল্প চলে বিয়ের আসরে। বিয়ের আসর মানেই মশকরা, ঠাট্টা, হুল্লোর আর নানা রকম আনন্দ আয়োজন।

শিশুদের জন্য উপহার

বিয়ে বাড়িতে শিশুদের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী থাকে। আগে বাহুতে রঙির লাল হলুদ তাগা বেঁধে দেয়া হতো। হাত আলতা দিয়ে রাঙিয়ে দেয়া হতো। ছোট গোল আয়না ও চিরুনি দেয়া হতো। বর্তমানে ছেলেদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চকলেট দেয়া হয়।

পান-সুপারি/পানের খিলি

বিয়ে বাড়ি মানে পান সুপারি থাকবেই। পানের থালা সাজানোতে গুণপনা বা রুচির পরিচয় থাকতে হবে।

www.pathagar.com

বাড়ির মহিলারা সুন্দর করে সুপারি কেটে পানের খিলি তৈরি করে থাকেন। পানের খিলি আবার লবঙ্গ দিয়ে আটকে দেয়া হয়।

ফুল-সুপারি/বিষকচু সুপারি

সুপারি কাটার উপর মেয়েদের গুণপনা প্রকাশ পায়। পানের খিলির জন্য খুব সরু করে সুপারি কাটা হয়। খুব মিহি করে ফুলের মতো সুপারি কেটে পানের থালা সাজানো হয়। একে বলে ফুল-সুপারি। এ সময় কনের বাবা কিংবা বেয়াই সম্পর্কিতদের সাথে এক রকম নিষ্ঠুর রসিকতা করা হয়। বিষকচু ভালো করে শুকিয়ে ফুলের মতো কেটে পানের থালার এক দিকে রাখা হয়। দেখে বোঝা যায় না কোনটা আসল সুপারি কোনটা বিষকচু। চিনে না খেতে পারলে ভীষণ বিপদে পড়তে হয়। আবার পানের খিলির ভেতর তীব্র ঝালের ধেনো মরিচ দিয়ে রসিকতা করা হয়।

চোতরা পাতা

এক ধরনের পাতা পাওয়া যায়, যা গায়ে লাগলে ভীষণ চুলকায়। বিয়ে বাড়িতে কোনো কোনো দুষ্টু ছেলেরা চোতরা পাতা গুঁড়ো করে বিয়ের অতিথিদের জামার ভেতর খুঁজে দেয়। ফলে লাফালাফির এক চূড়ান্ত অবস্থা হয়।

বদনিতে বোম্বাই মরিচ

দুষ্টু ছেলেমেয়েরা পায়খানা যাবার বদনিতে বোম্বাই মরিচ দিয়ে রাখে। ফলে পায়খানায় গিয়ে পানি খরচের পর মহা বিপদে পড়তে হয়।

রঙের গুঁড়া/রঙ ছিটানো

বাজারে যে রঙের গুঁড়ো পাওয়া যায়, অনেক দুষ্টু ছেলেমেয়ে এমনকি বয়স্করাও তা মেহমানদের মাথায়, গায়ে দিয়ে দেয়। আবার তরল রঙও পিচকারিতে ভরে ছিটিয়ে জামাকাপড় নষ্ট করে দেয়।

বিয়ের অনুষ্ঠান

আজকাল গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্র বিয়ের অনুষ্ঠানের ধরন পাল্টে গেছে। এখন সর্বত্র ডেকোরেটরের চল হয়েছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডেকোরেটর শামিয়ানা আর তার ডেকচি, থালাবাটি নিয়ে হাজির হচ্ছেন। খাবার ধরনও পাল্টেছে। টিকিয়া, পোলাউ, মুরগির রোস্ট, খাসির রেজালা, গরুর মাংস ভুনা, জর্দা, ফিরনি এই হলো বিয়ে বাড়ির খাবার। আগে যে বাড়ির মহিলার পরম যত্নে বিয়ের রান্না করত, আর সবাই তার রান্নার প্রশংসা করত, সে আর নেই। তবুও হাসি-ঠাট্টা, মশকারা, গান-বাজনা আর আনন্দ-হুল্লোর হলো বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রাণ।

www.pathagar.com

জানানি/বৌভাত

আগে এই অঞ্চলে বৌভাতের প্রচলন ছিল না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর কনেপক্ষ থেকে ১০-৫০ জন লোক বরের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে যেত। একে জানানি বলা হতো। মেহমানদের উত্তম ভোজন করানো হতো। সম্প্রতি এই জানানি প্রথা উঠে গেছে। এখন বৌভাত হয়। বরপক্ষ বউ তুলে নেওয়ার পর কনের বাড়ির কিছু মেহমান ও তার আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে ভোজের আয়োজন করে থাকে।

ফিরাগমন

কনের বিয়ের পর বাবার বাড়ি ফিরে আসাকে ফিরাগমন বলে। কনে শ্বশুরবাড়িতে অন্তত তিন দিন থাকা পর বাবা বা তার প্রতিনিধি যে জানানি খেতে যায় তখন বর ও কনেকে নিয়ে আসে।

দশপ্রধান

বর শ্বশুরবাড়ি কনেসহ আসার পর বরের সঙ্গে দশজন মেহমান আসে। তাদের কনের বাবা বিশেষ ভোজের আয়োজন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানকে দশপ্রধান বলা হয়।

ফুলসজ্জা

বরের বাড়িতে কনে তুলে নেবার পর, বরের বাড়ির লোকজন ফুলসজ্জার আয়োজন করে থাকে। একটি ঘরকে বিশেষভাবে সাজানো হয়, যেখানে বর কনে প্রথম মিলিত হবে। ফুলসজ্জার জন্য কনে বাড়ি থেকে নানা রকম পিঠা তৈরি করে কনের সাথে দিয়ে দেয়। বরের বাড়িতেও নানা রকম পিঠা তৈরি কারা হয়। মেয়েরা নানা রকম রঙ্গ-তামাশা করে। নানা রকম মেয়েলি গান পরিবেশিত হয়।

বুড়ি

এই অঞ্চলে কনে যখন প্রথম স্বামীর বাড়ি যায় তখন একজন বয়স্কা মহিলাকে তার সঙ্গে দেয়া হয়। সম্পর্কে দাদি-নানি ধরনের। কনের অচেনা পরিবেশে যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় হয়। এই মহিলাকে 'বুড়ি' বলা হয়। তার সাথে বরের বাড়ি লোকজন নানা রঙ্গ-রসিকতা করে।

রাখাইনদের বিয়ে উৎসব

সাধারণত ফসল তোলার মৌসুমে এরা বিয়ের অনুষ্ঠান করে থাকে। বিয়ের জন্য ছেলেপক্ষ মেয়ের খোঁজ করে। এ সময়ে নির্বাচিত হলে ছেলেপক্ষ মুরুব্বি বা পাড়ার প্রধান বা সম্মানিত কাউকে মেয়েপক্ষের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। মেয়েপক্ষ প্রস্তাব মনঃপুত হলে ছেলেপক্ষকে আলোচনা ও বাগদান করার জন্য খবর পাঠায়।

www.pathagar.com

ভালো দিন তারিখ দেখে পাড়ার মাতুব্বর, মুরুব্বি, আত্মীয়-স্বজন, ছেলে ও বন্ধুসহ মেয়েপক্ষের বাড়িতে যায়। আংটি পড়ানোর মাধ্যমে বাগদান সম্পন্ন হয়। পুরোহিত ডেকে পত্রিকা দেখে বিয়ের শুভ দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। উভয় পক্ষ ছেলেমেয়েকে কি কি দিবে তার হিসাব করা হয়। বিয়ের কয়েক দিন আগে থেকে চলে ছেলে এবং মেয়ে বাড়ি উৎসব।

মেয়ের বাড়িতেই হয় বিয়ের প্রধান আয়োজন। পাত্রপক্ষ বাজি ফুটিয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কনেবাড়ি আসে। এ সময় ঐতিহ্য অনুযায়ী বরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও একটি লম্বা দা, পাখা, তামাক খাবার পাইপ সাথে নিয়ে আসে। বিয়ের আসরে আসার পর বর-কনের জন্য সজ্জিত মঞ্চে বরকে বসতে দেয়া হয়। নাস্তা ছাড়াও এ সময় তবক দেয়া পান খেতে দেয়া হয়। বিয়ের লগ্ন শুরু হবার পূর্বে কনেকে সাজিয়ে বরের পাশে বসানো হয়। মোম জ্বালিয়ে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে পুরোহিত বিয়ের কাজ শুরু করেন। একজন বয়স্ক মহিলা বর-কনের হাত একত্রিত করে তাদের জন্য তৈরি পায়েস খাইয়ে দেয়। এরপর বর-কনে একে অন্যকে খাইয়ে দেয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী বিয়ের দিন বর পরে লুঙ্গি, ফতুয়া ও পাগড়ি এবং কনে পরে লুঙ্গি, ব্লাউজ, ওড়নার মতো একখণ্ড কাপড়। বর ৩-৪ দিন কনে বাড়ি থেকে কনে নিয়ে বাড়ি চলে যায়।

৪. ঈদ উৎসব

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদে সব পরিবারেই সাধারণত নতুন কাপড় চোপড় কেনা হয়। ঈদের সকালে সেমাই পায়েসের ব্যবস্থা থাকে। তারপর ঈদের জামাতে সবাই মিলে নামাজ পড়া। দুপুরে ও রাতে কোমরা পোলাওয়ের ব্যবস্থা। আত্মীয়স্বজন বেড়াতে আসে, বেড়াতে যায়। দূর থেকে পরিবারের লোকজন বাড়িতে আসে। ঈদুল আযহায় পশু কোরবানি দেয়া হয়। ভোজনের আয়োজন হয়।

৫. রাখাইন সাংগ্রাই উৎসব

বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে রাখাইন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অষ্টশীল পালনের জন্য মন্দিরে যান। এদিন বুদ্ধ মূর্তিকে চন্দন জলে স্নান করানোর পর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও স্নান করেন এবং নতুন পোশাক পরিধান করেন। বাড়ির আঙিনায় আঙিনায় এখনো চলে পানি খেলার আয়োজন। সঙ্গে থাকে রাখাইন সম্প্রদায়ের সব বয়সের নারী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ আর গান। মূল উৎসবে রাখাইন যুবকরা বাদ্য আর গানের তালে তালে এসে উপস্থিত হন বিভিন্ন বাড়ির আঙিনায়। সেখানে ফুলে ফুলে সুজ্জিত প্যান্ডেলের ভেতরে পানি নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন রাখাইন তরুণীরা। এখানে যুবকেরা দলবেধে কোরাস করে গাইতে থাকে সাংগ্রাই গীত–

লেঃ লেঃ লেঃ লেঃ

www.pathagar.com

মংরো মংরো
মংরো মংরো, লেঃ লেঃ লেঃ লেঃ
অহ্ মিরিসে-মিরিসে রি তাফল্যাসে-লংগামে
সাংগ্রা রি ঈরে ঈরে মিরিসে হ্লারে হ্লারে
রো-রা কো থইং থিংছিং কেপা
চেইনলা কো ম্রেংনো ক্যপা
রো-রা হিহ্মা য়েইন ক্যেপারে
চেইনলা হিহ্মা লুমিউ মেংরে।
বাংলা অর্থ–
এই শুভ দিনে সাংগ্রার হীমজল ছিটিয়ে তোমাকে শুভেচ্ছা
তারও (শীতল জলের পরশ)বেশি তুলনাহীন তুমি
এ সুন্দর ঐতিহ্যের পোশাকে এই শুভদিনে।
এ কৃষ্টিকে লালন কর
ঐতিহ্যকে ধরে রাখ
ঐতিহ্যতে মেলে পরিচয়
সভ্যতারও সাক্ষী থাকে।

এরপর চলে একে অপরকে পানি ছিটানো। পনিকে পবিত্রতার প্রতীক ধরে নিয়ে রাখাইন তরুণ-তরুণীরা পানি ছিটিয়ে নিজেদের শুদ্ধ করে নেয়। পুরনো বছরের সব কালিমা আর জীর্ণতাকে ধুয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেন তাঁরা। সাংগ্রাই উৎসব উপলক্ষে এ সময়ে সবাই নতুন পোশাক পরেন। রাখাইনদের সাংগ্রাই উৎসব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সব আদিবাসীই বর্ষবরণের এ উৎসব পালন করেন বিভিন্ন নামে। কেউ বৈসুক, কেউ আবার সাংগ্রাই আবার কেউ বিজু। তবে বরগুনা, পটুয়াখালী এলাকার রাখাইদের কাছে এটা সাংগ্রা নামেই পরিচিত। বৈসুক, সাংগ্রাই আর বিজু এই তিন নামের আদ্যাক্ষর নিয়েই বৈসাবি শব্দের উৎপত্তি।

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন : খে মংলা, সদস্য সচিব, রাখাইন-বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন, বরগুনা জেলা শাখা।

৬. শারদীয় দুর্গোৎসব

হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো শারদীয় দুর্গোৎসব। বরগুনা অঞ্চলেও শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়ে থাকে। উৎসবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনের সমাগম ঘটে। পূজা উপলক্ষে সর্বত্রই মেলা বসে। মনোহরি, পানের দোকান আর মিষ্টির দোকান, শিশুদের খেলনার দোকান থাকে। মৌসুমী ফল, বিশেষ করে জাম্বুরা, আমড়া ও পাকা তালের পশরাও বসিয়ে থাকে দোকানিরা। এ সময় সবচেয়ে বেশি চলে আখের বেচাবিক্রি। প্রতিমা বিসর্জনের দিন, দশমীর দিন আগে এই অঞ্চলে অন্তত

www.pathagar.com

তিনটি বাজারে যেখানে বড় ধরনের পূজা হতো সেখানে দশহরা বা দশেরা উৎসব হতো। এ দিন প্রচুর লোক সমাগম হতো। নৌকা বাইচ হতো। নৌকায় সারি বা সারিগান হতো। ফুলঝুরি, বদনী খালী ও আমুরা বাজারে বড় ধরনের দশহরা উৎসব হতো। বর্তমানে আমুরায় দহরা উৎসব হয়ে থাকে।

৭. কঠিন চীবরদান উৎসব

তথাগত বুদ্ধের মতে এ জগতে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি। বৌদ্ধদর্শন মতে অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বা অজ্ঞতা বলতে সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা বোঝায়। এই অজ্ঞতার কারণে পৃথিবীতে মানুষ বার-বার জন্মগ্রহণ করে এবং দুঃখ ভোগ করে। বৌদ্ধ ধর্মমতে, এটা মানুষের কৃতকর্মের ফল। কর্মবাদ হলো শর্তাধীন সৃষ্টিবাদের প্রকাশ। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, ভালো কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্য বা পারমী অর্জন করতে হবে এবং সমুদয় পারমী অর্জিত হলেই নির্বাণলাভ সম্ভব। এ নির্বাণই হচ্ছে দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বা পথ। নির্বাণ কিন্তু মৃত্যু নয়, মৃত্যুতে দুঃখের শেষ হয় না। দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য নিরন্তরভাবে মানুষের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পারমী পূরণ বা অর্জন করা এ প্রচেষ্টারই অংশ। দশটি পারমীর মধ্যে দান পারমীই শ্রেষ্ঠ।

বৌদ্ধ সাহিত্যে দানের একটি স্বরূপ আছে কাহলে, ওয়েসেংদ্রা জাতকে। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের আগে পারমী পূরণ করতে করতে পাঁচশো পঞ্চাশ (৫৫০) বার ইহজগতে জন্মগ্রহণ করেন বিভিন্ন প্রাণীরূপে। ওয়েসেংদ্রা জাতক পর্যায়ে তিনি রাজা বেসন্তররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দানশীল রাজা হিসেবে জীবনের সর্বস্ব দান করে রিক্তহস্তে বনবাসে যাওয়ার আগে তিনি প্রিয় দু-সন্তান গনা ও জালীকে যুজগা পুংন্নাহ (যোজন ব্রাহ্মণ)-এর কাছে দান করেছিলেন। রাজা বেসন্তর পরবর্তী জন্মে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে জন্মলাভ করেন এবং ঊনত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত টানা ছ-বছর কঠোর সাধনার পর বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

কথিত আছে, তথাগত বুদ্ধ এক প্রবারণা পূর্ণিমার প্রক্কালে সাওয়েথিতে (শ্রাবস্তী) অবস্থান করছিলেন। তখন মহৌপাসিকা ওয়িসাংখ (বিশাখা) বুদ্ধের কাছে জানতে চান যে, পৃথিবীতে যতরকমের দানকর্ম প্রচলিত আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানকর্ম কোনটি। বুদ্ধ জানালেন, কঠিন চীবর দানই শ্রেষ্ঠ দান অর্থাৎ মহাদান। এই দানের মাধ্যমে একজন পারমীপূর্ণ মহিলা পরজন্মে পুরুষরূপে জন্মলাভ করতে পারে। বুদ্ধের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিশাখা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা কেটে, রং করে, কাপড় বুনে এবং চীবর সেলাই করে ভিক্ষু সংঘকে দান করেছিলেন।

এ দিকে বরগুনা জেলার বৌদ্ধদের কাছে কঠিন চীবর দানের পটভূমি সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এ রকম : তথাগত বুদ্ধ সাওয়েথিতে (শ্রাবস্তী) অবস্থানকালে ত্রিশজন ভিক্ষু বর্ষাবাস শেষে বুদ্ধ দর্শনের জন্য সেখানে এসে পৌঁছান। বর্ষাবাসের তিনমাস একটানা ব্যবহারের ফলে ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র অর্থাৎ চীবর তখন একেবারে

www.pathagar.com

জীর্ণ হয়ে পড়ে। কথিত আছে, মহৌপাসিকা ওয়িসাংখার (বিশাখা) জনৈক পরিচারিকা আহারের জন্য ওই ভিক্ষুদের আহ্বান করতে বিহারে গেলে তাঁদেরকে নগ্নগায়ে স্নানরত দেখতে পায়। বিষয়টি মহৌপাসিকা বিশাখাকে জানানো হলে তিনি স্বয়ং বুদ্ধের কাছে গিয়ে ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্রের শোচনীয় জীর্ণদশার কথা জানান। তখন বিশাখা বুদ্ধের উপদেশ অনুযায়ী এক অহোরাত্রির মধ্যেই বিপুল অর্থ ব্যয়ে যথেষ্ট সংখ্যক চীবর প্রস্তুত করে ভিক্ষুদের দান করেন।

কঠিন চীবর দান করা হয় বছরে একবার। প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা অর্থাৎ কার্তিকি পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রতিটি বৌদ্ধ গ্রামে মহা কাথিং পোয়েহ (দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব) উদযাপিত হয়ে থাকে। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে বুদ্ধ-শিষ্যা মহৌপাসিকা বিশাখা প্রবর্তিত এই দানোত্তম উৎসবকে বরগুনায় বসবাসকারি বৌদ্ধরা জাঁকজমকভাবে উদযাপন করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, যে বৌদ্ধ বিহারে বর্ষাব্রত পালন করা হয়নি সেই বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসব উদযাপিত হতে পারে না।

বুদ্ধের সময় ভিক্ষুরা শ্মশানে বা পথে-প্রান্তরে ফেলে দেওয়া পুরনো কাপড় সংগ্রহ ও সেলাই করে পরতেন। বর্তমানে ভিক্ষুরা বিশেষভাবে সেলাই করা গৌরিক বস্ত্র (চীবর) পরে থাকেন। ভিক্ষুরা এক সঙ্গে তিনটি মাত্র চীবর পরতে পারেন। চীবরগুলো হলো : অন্তর্বাস বা পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরাসঙ্গ বা বহির্বাস এবং সংঘাটি বা দোয়াজিক। রাখাইন ভাষায় এই তিনটি চীবরকে বলা হয় যথাক্রমে সাংবাইং, সাংঘেং এবং ধূগউ বা কোদাং। এই তিনটি চীবরের যে-কোনো একটি বা একাধিক দ্বারা কঠিন চীবর দান করতে হয়।

কঠিন চীবর নামের তাৎপর্য হচ্ছে, চীবর তৈরি করা অর্থাৎ তুলা থেকে সুতা কাটা, কাপড় বোনা, নির্দিষ্ট নিয়মে কাপড় কেটে বিশেষভাবে সেলাই করা, রং করা ইত্যাদি কাজ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ অরুণোদয় থেকে পরদিন অরুণোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই সমাপন করা। মোট কথা, কঠিন নিয়ম অনুসরণ করে চীবরটি প্রস্তুত করতে হয় বলে এর নাম কঠিন চীবর (কাথিং সাংঘেং)।

৮. দোল উৎসব

গোপালের আখড়াকে কেন্দ্র করে বামনা থানার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের উত্তর কাকচিড়া গ্রামে প্রতিবছর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল উৎসব হয়। এলাকার নিম্নবর্গের মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। উৎসব চলে তিন দিন ধরে। প্রথম দিন হাঁটু ভাঙা গোপালকে একটা বড় কাঠের বারকোষ কিংবা পিতলের থালায় বসিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। সাথে থাকে আখড়ার বৈষ্ণব, একটি কীর্তনের দল, ঢোল, কাসর চাকি নিয়ে।

তারা 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম', কীর্তন করতে থাকে। সবাইকে আবির ছিটাতে থাকে। কোনো কোনো যুবা কিশোর বাঁশের পিচকারি বানিয়ে রঙ ও ছিটায়। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

দিন বুড়ির বাসা পোড়ানো হয়। বড় একটা গাছ মাঠের মধ্যে পুঁতে তাতে সুপারি নাড়কেলের ডগা ঝুলিয়ে তারপর আগুন দেয়া হয়। বুড়ি হলো সেই বড়াই বুড়ি যে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। তারপরের দিন আখড়ায় নাম-কীর্তন ও ভক্তিমূলক গান হয়। শেষ দিন মহোৎসব। মহাৎসবে ভাত-তরকারি, মিষ্টান্ন ও মলিদা পরিবেশন করা হয়।

৯. চরক উৎসব

গ্রামীণ বাঙালির একটি অন্যতম ধর্মীয় উৎসব চড়ক। এটি চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। শিবের গাজন আর নীল পূজার মধ্য দিয়ে চড়কের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তবে গাজন আর নীলের মধ্যেই এর আনুষ্ঠানিকতা সীমাবদ্ধ নয়। এই দুইটি স্তুতিমূলক রীতির বাইরেও চড়কের রয়েছে বহু ক্রিয়া-কৃত্য। চড়ক মূলত শিব পূজোর উৎসব। চৈত্র সংক্রন্তির ১৫ দিন বা ৭ দিন আগ থেকে শুরু হয় চড়কের প্রস্তুতি। দিন পনেরো আগ থেকেই এই উৎসবের আমেজ শুরু হয় গ্রামের বারোয়ারি তলায়, গ্রাম দেবতার থানে বা গ্রামের শ্মশানে। কখনো কখনো গৃহস্থ বাড়ির আঙিনা এর প্রস্তুতি লক্ষ করা যায়। যেখানে আর যে ভাবে এটি উপস্থাপিত হোক না কেন এর মূল আবহ জুড়ে থাকে বাঙালির কৃষি দেবতা শিবের আবাহন। শিব এই উৎসবের মুখ্য তাই তাকে সন্তুষ্ট করাই পূজারীদের লক্ষ্য।

বর্তমানে এই উৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক কালে এটি বৌদ্ধ উৎসব হিসেবে পরিগণিত হতো। এই উৎসবের সঙ্গে এককালে বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হতো। ধারণা করা হয় এই উৎসবের উৎস বৌদ্ধ ধর্ম ঠাকুরের পুজো। সমকালে শিব বা নীল পূজার মধ্য দিয়ে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা মূলত বৌদ্ধ ধর্ম ঠাকুরের পুজোর বিবর্তিত রূপ। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্থানের পর্বে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় আত্মগোপন শুরু করে। এই সময় তারা নির্জন, অরণ্য, প্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে।

ধর্মীয়ভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার স্বার্থে নিভৃতে, নির্জনে নিজেদের ধর্মাদর্শকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কখনো বা আধিপত্যবাদী ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের ক্রিয়া-কৃত্য-দেবকল্পনার সঙ্গে নিজেদের সংহতি প্রকাশ করে। কখনো মাটির ঢিবি, কাঠ, পাথরের অমসৃণ প্রতিকৃতি, গাছ ইত্যাদির মধ্যে স্বদেবতার কল্পনা করতে থাকে। এরই ফলশ্রুতি হলো চড়ক উৎসব। যা শিবের আদলে মূলত ধর্ম ঠাকুরেরই পুজো। আধিপত্যবাদী ধর্ম ও দেবতার নিছক নিজেদের পরাজয় মেনে নিয়েছে। পরবর্তীকালে পরাজিত বৌদ্ধেরা সুযোগ মতো আবার নিজস্ব দেতার অধিষ্ঠান ঘটিয়েছে। যেমন চড়কের ঠিক এক মাস পর ধর্মদেব নামে হুবহু আর একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যা চড়কের ক্রিয়া-কৃত্যের সমগোত্রীয়। এ কারণে ধারণা করা হয় আজকের চড়ক উদযাপন করা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই অশেষ।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে এরাই আবার ইসলামী সংস্কৃতায়নের ফলে মুসলমান হয়েছে। এ কারণে অর্ধশতাব্দী আগেও পূর্বের বিশ্বাস আর আচরণের ধারাবাহিকতায় মুসলান সম্প্রদায়ও চড়কের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদন করত। এখনো বাংলাদেশের যশোর-খুলনা-নড়াইল-বরিশাল-ফরিদপুর-ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া অঞ্চলে মুসলমান বালা ও অষ্টক শিল্পীর অস্তিত্ব আছে। যারা চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বে গ্রামে গ্রামে চড়কের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হিসেবে বালা গান আর অষ্টক গান পরিবেশন করে থাকে।

বাংলাদেশে যে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার কয়েকটি পর্ব রয়েছে। সেই পর্বগুলো এক এক করে পালনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের অনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। পর্বগুলো একটির সঙ্গে আর একটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিম্নে পর্বগুলো উল্লেখ করা হলো : অধিবাস–চড়ক উৎসবের সকল অনুষ্ঠানিকতার সূচনা পর্বে অধিবাস হয়। এটির মধ্য দিয়ে মূলত নীল বা গাজন উৎসবের প্রাথমিক পর্ব। এই পর্বে ধূপ-ধুনা-আতপ চাউল-কলা দিয়ে নীল পূজার সূচনা হয়। এ সময় নীলপুজোর জন্য সন্ন্যাস ব্রত পালন করার প্রতিজ্ঞা করা হয়। গ্রামের নবীন-প্রবীণেরা মিলে এই ব্রত গ্রহণ করে। ব্রত অনুষ্ঠানে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকে। তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং পৌরহিত্য করেন। মূল সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন বালা নির্বাচন করা হয়। এই বালা চড়কের সময় বালা গান পরিবেশন করেন। ব্রত অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বে সকলকে স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরতে হয়। পূজায় বসে সমবেতভাবে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। এই প্রতিজ্ঞায় শিবের অনুসারী হিসেবে কেউ পূজার আনুষ্ঠানিকতা সন্ন্যাসীদের বাইরে প্রকাশ করবে না বলে জানায়। অধিবাসের পর শুরু হয় সন্ন্যাস-ব্রত পালন।

www.pathagar.com

লোকমেলা

১. বৈশাখি মেলা

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এ অঞ্চলে নানা জায়গায় বৈশাখি মেলা হয়। সবচেয়ে বড় মেলা হয় বরগুনা শহরের শিমুল তলায়। এছাড়া বামনা থানার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের উত্তর কাকচিড়া, সরকার হাওলার গাববাড়িতে বৈশাখি মেলা বসে। পহেলা বৈশাখের মেলায় দেখা যেত বহুরূপী, এখন আর দেখা যায় না।

আগে বরগুনার কর্মকার পাড়ায় নববর্ষ উপলক্ষে হালাতার অনুষ্ঠানে হতো। ছেলে মেয়েরা বাবা ভাইয়ের হাত ধরে সে উৎসব আসত। সেই সন্দেস রসোগোল্লা খাওয়া আর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এখন কমই ঘটে।

২. থৌল

চৈত্রমাসের শেষের দিন-যাকে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়র হারইন দিন বলে, এ দিন এই অঞ্চলের নানা জায়গায় জেলা বসে। মেলায় নানা ধরনের গৃহস্থালি সামগ্রীসহ, শিশুদের খোলনা, মনোহরী দোকান, মিষ্টির দোকানের পসরা বসে। এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় থৌল বা মেলা বসে বামনা থানার উত্তর কাকচিড়া গ্রামের কাছারি বাড়ির সামনের মাঠে। সব ধর্মের মানুষের সমাগমে মেলা সরগরম হয়। মেলায় নীলের দল গান গেয়ে যায়। হাডুডু খেলা হয়। সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ঘোড়ার দৌড়।

৩. তেন্নাথের মেলা

তেন্নাথ হলো ত্রিনাথ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত রূপ। এটি ব্রতকথার মতো। পরিবেশিত হয় কীর্তন গান। একজন কথক থাকেন। তিনি ব্রতকথাটি পাঁচালি ঢঙে পরিবেশন করেন। কোনো বাড়ির বারান্দায়, উঠোনে কিংবা আখড়া বাড়ির চাতালে তেন্নাথের মেলা বসে। তেন্নাথের মেলার উপাচার আগের দিনে তিন পয়সা হলেই হতো। এক পয়সার পান সুপারি, এক পয়সার বাতাসা আর এক পয়সার গাঁজা। এজন্য প্রচলিত আছে–

আমার ঠাহুর তেন্নাথ গোসাই
কিছুই না সে চায়
এক পয়সার গাঁজা পাইলে
ডুগডুগি বাজায়।

www.pathagar.com

মেলায় নাগরদোলা

বৈশাখি মেলায় মাটির খেলনার দোকানে শিশুরা

www.pathagar.com

নিম্নবর্গের চাষি হিন্দু সম্প্রদায় মূলত কোনো বিপদ আপদে পড়লে তেন্নাথের মেলা মানত করে। কারণ ব্রতকথার আছে তেন্নাথের কৃপায় আরাইয়া যাওয়া গরু ফেরত পাওয়া যায়। বাজা গরু ডাকে। পাল দেলে গাভিনী হয়। ইত্যাদি সমস্যা সমাধান হয়। সেজন্য তেন্নাথের ওপর অসাধু বিশ্বাস। এখানে সংগৃহীত পাঁচালটি দেওয়া হলো। পাঁচালটি সংগ্রহ করেছেন উত্তর কাকচিড়া গ্রামের সমেন্দ্রনাথ মিত্র।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবনী ও ত্রিনাথের পূজা প্রচার

কলির প্রারম্ভকালে দেব নারায়ণ।
নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ করেন গ্রহণ ॥
প্রতি ঘরে দ্বারে দ্বারে নাম সংকীর্তন।
হরিবোল বিনা আর নাহিক কথন ॥
কলির নরের পাপ তবু নাহি যায়।
শ্রী হরি ভাবেন তবে কি হবে উপায় ॥
নদীয়ায় ত্রিনাথ মূর্তি পরিগ্রহ করে।
কেমনেতে জগজ্জন পূজিবে আমারে ॥
কোনোরূপে হবে ইহা ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার।
সবিস্তার পরিচয় শুন সবে তার ॥
সেই গ্রামে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অতি সে আতুর দ্বিজ না মিলে ওদন ॥
গাভী চরাইয়া ফিরে মাঠের উপর।
সহসা হইল হারা সে গাভী তৎপর ॥
অন্বেষণ করি দ্বিজ ভ্রমে স্থানে স্থান।
কোথাও না পায় দ্বিজ গাভীর সন্ধান ॥
আকুল হইয়া দ্বিজ করিছে রোদন ॥
মনে মনে ভাবিতেছে দেব নারায়ণ ॥
হেনাকালে দেখি তথা এক সরোবর।
মরিব ইহাতে মনে ভাবে দ্বিজবর।
আচম্বিতে দৈববাণী দিল নারায়ণ।
ত্রিনাথে করহ পূজা অবোধ ব্রাহ্মণ ॥
গাভী হেতু কেন মিছে জীবন ত্যাজিবে।
পুনরায় ধন-রত্ন গাভী তব পাবে ॥

তটিনীর তটে গিয়া করহ খনন।
তিন পাই প্রাপ্ত হবে শুনহ ব্রাহ্মণ ॥
এক পাই গাঁজা আর এক পাই পান।
তৈল লবে এক পাই শুনি মতিমান ॥

www.pathagar.com

বিলম্ব না কর দ্বিজ শুনহ বচন।
ত্বরা গিয়া তিন দ্রব্য কর আনয়ন ॥
এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল।
নদীর তীরেতে আসি মৃত্তিকা খুদিল ॥
সেইখানে তিন পাই পাইল দেখিতে।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্র লাগিল ভাবিতে ॥
ভাবে কোন দেব ইনি না জানি কারণ।
কখন তাহার সঙ্গে নাহি দরশন ॥
যে হোক সে হোক তারে করি নমস্কার।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যেন হয় সে আমার।
এত ভাবি দোকানেতে গমন করি।
মৃদুস্বরে দোকানীরে কহিতে লাগিল ॥
শুনহ দোকানদার লহ তিন পাই।
তিন পাই ভিতরেতে তিন দ্রব্য চাই ॥
তৈল গাঁজা দেও, আর এক পাই পান।
বিলম্ব সহিতে নারি করিব প্রস্থান ॥
দোকানী বলি শুন নির্বোধ ব্রাহ্মণ।
কিসেতে লইবে তৈল বলহ এখন ॥
তৈল পাত্র কিছু নাহি এনেছ সঙ্গেতে।
কিসে করি লইবে তৈল বলহ ত্বরিতে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন হে দোকানি ভাই।
কিসেতে লইব তৈল ঠাকুরে শুধাই ॥
এত বলি দ্রুতগতি করিল গমন।
দেখেন সেখানে আর নাহি কোনজনে ॥
না দেখিয়া দ্বিজবর করেন রোদন।
বলে প্রভু কোথা তুমি করিলা গমন ॥
কান্দিতে লাগিল দ্বিজ ভাবিয়া না পায়।
হেনকালে দৈববাণী হইল তথায় ॥
তৈল আন বস্ত্রমধ্যে করিয়া বন্ধন।
আমার বচন কভু না হবে লঙ্ঘন।
এত শুনি দ্বিজবর গমন করিল।
গিয়া তবে দোকানিরে ব্রাহ্মণ বলিল ॥
কোচার কাপড়ে তৈল বাঁধি দেও মোরে।
কি কার্য পাত্রেতে বল কহিনু তোমারে ॥
এত শুনি সে দোকানি ভাবে মনে মন।
নিশ্চয় উন্মাদ এই ব্রাহ্মণ নন্দন ॥

www.pathagar.com

ঠকাইয়া দেয় তৈল বিপ্রের কুমারে।
দেখিয়া কুপিতক হইলেন গদাধরে ॥
তৈলের কলসি লেল করিয়া হরণ।
দেখিয়া বিস্ময় মুদি হইল তখন ॥
দোকানি ভাবেন মনে এ তো ব্রাহ্মণ নয়।
বুঝিনু দেবতা ইনি হবেন নিশ্চয় ॥
ব্রাহ্মণের পদ, মুদি করিয়া ধারণ।
বলে প্রভু ক্ষম মোরে, আমি অভাজন।
ঠকায়ে দিয়েছি তৈল তোমারে আপনি।
সে দোষে ক্ষমহ মোরে শুন দ্বিজমনি ॥
ব্রাহ্মণ বলেন বাছা কিছু জানা নাই।
ইহার বৃত্তান্ত জানে ত্রিনাথ গোসাঁই ॥
মানহ তাহার পূজা পুনঃ তৈল পাবে।
তোমারে মনের বাঞ্ছা তিনি পুরাইবে ॥
মুদি বলে কোথা তিনি বলগো আমায়।
তোমার চরণে ধরি করিগো বিনয় ॥

ত্রিনাথের পূজা প্রচলন ও মাহাত্ম্য বর্ণন

শুনিয়া আকাশবাণী ব্রাহ্মণ তখন।
মহানন্দে শিষ্য গৃহে করেন গমন ॥
আদি অন্ত সমুদয় শিষ্যেরে কহিলো।
শ্রবণে ব্রাহ্মণ তবে বিস্মিত হইল ॥
ব্রাহ্মণ বলেন ভক্ত তুমি বাছাধন।
না জানিয়া তোম প্রতি কহে কুবচন ॥
এখন করহ তুমি মম প্রতিকার
তোমার কল্যাণে পাই পুত্র পরিবার ॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুরু শুনহ বচন।
বিধিমতে কর তুমি ত্রিনাথ পূজন ॥
শুনি ত্রিনাথের পূজা মানস করিল।
কঙ্কে পোড়া ভস্ম শিষ্য গুরুহস্তে দিল ॥
এই ভস্ম লয়ে যাও শীঘ্র করি গিয়া।
তাদের অঙ্গেতে তুমি দিও মাখাইয়া ॥
এত বলি কঙ্কে পোড়া ভস্ম তারে দিল।
হরষিত মনে গুরু গৃহেতে আইল ॥
মাথায় স্ত্রী পুত্র অঙ্গে করিয়া যতন।
সকলে পাইয়া প্রাণ উঠিল তখন ॥

www.pathagar.com

আনন্দে ত্রিনাথ ধ্বনি করেন ব্রাহ্মণ ।
ত্রিনাথের করে পূজা আনন্দিত মন ॥

স্থাপন করিয়া ঘট পূজা আরম্ভিল ।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ক্রমেতে হইল ॥
অনেক বসিল মেলা ত্রিনাথ পূজায় ।
অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক আসে যায় ॥
অন্ধ খঞ্জ লোকেরে ডাকিয়া ॥
কহ কহ মহাশয় কহ বিবরণ ।
বলহ করিছ সবে কোথায় গমন ॥
একজন কহে যাই ত্রিনাথ দেখিতে ।
বর মাগি লইব তাহার শ্রীপদেতো ॥
যেবা যাহা চায় সেজন তাহাই পায় ।
দানে কল্পতরু দেব অতি দয়াময় ॥
অন্ধ পায় চক্ষুদান, দরিদ্রেতে ধন ।
মানস করিলে হয় খঞ্জের চরণ ॥
শুনি দোহে মানস করিল যতনেতে ।
অন্ধ পায় চক্ষু, পদ পাইলে খঞ্জেতে ॥
আনন্দেতে নৃত্য করে তুলি দুই হাত ।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য হে ত্রিনাথ ॥
হরি হরি বল সবে যত বন্ধুগণ ।
মহেশচন্দ্র দাস ভনে শুন ভক্তগণ ॥

ইতি ত্রিনাথের পাঁচালি সমাপ্ত ।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. জোমাত/ফইত্যা/শ্রাদ্ধ

জিয়াফতের উপভাষা হলো জোমাত বা ফইত্যা। মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো মৃত নারী-পুরুষের স্মরণে ও তার আত্মার শান্তির জন্য জোমাত বা ফইত্যা খাওয়ানোর রেওয়াজ এই অঞ্চলে আছে। ধনী-গরিব যে যেমন পারে সাধ্যমতো জোমাতের আয়োজন করে। সাধারণত মৃতের পরিবারের ছেলেমেয়েরা তার মা-বাবার নামে আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসীকে নির্দিষ্ট দিনে দাওয়াত করে খাইয়ে থাকে। নিমন্ত্রিত লোকজনের সংখ্যা ২০-২৫ জন থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে। এই সংখ্যা নির্ভর করে আয়োজনকারীদের আর্থিক সঙ্গতির ওপর। জোমাত খাওয়ানোর সাথে কুলখানি বা চল্লিশার কোনো সম্পর্ক নেই। মৃত ব্যক্তির পরিবার তাদের সুবিধামতো সময়ে এ আয়োজন করে থাকে। লোকসংখ্যা কম হলে বাড়ির উঠানে–বেশি হলে খোলা মাঠে খাবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

খাদ্য তালিকায় থাকে ভাত, গরুর গোস্ত, গোস্ত-বুটের ডাল, আর সাধ্যে কুলোলে দই-বাতাসা, যা দই-গুড়। জোমাত নিয়ে একটা প্রবাদ চালু আছে–'যদি দ্যায় দই, আর কি বইয়ে রই', অর্থাৎ সব শেষে দেয় দই তাই তাড়াতাড়ি যে উঠতে হয়।

সাধারণত কলা-পাতায় পঙক্তি-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। আজকাল ডেকোরেটর হওয়ায় অনেকে তাদের কাছ থেকে রান্নার ডেক ও থালা-বাটি ভাড়া করে আনে। আগে অনেক গেরস্তের বাড়িতে রান্নার পেতল ও দস্তার ডেক পাওয়া যেত, পাওয়া যেত প্রচুর মাটির মালসা ও বাসন-খোড়া। আর রান্না করত পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অভিজ্ঞ কেউ।

২. মাইট্যাল

মৃতের দাফনের চারদিনের পর যে দোয়া অনুষ্ঠান হয় তা কুলখানি নামে পরিচিত। এই এলাকায় এই অনুষ্ঠানের আরেকটি নাম আছে। যাকে স্থানীয় উপভাষায় মাইট্যাল বলে। যাদের সঙ্গতি আছে তারা জানাজায় উপস্থিতজনদের আর যারা মৃত্যের গোর খুঁড়েছে, কাপড় বানিয়েছে, পরিয়েছে, গোসল করিয়েছে তাদের দাওয়াত করে খাওয়ায়। যাদের তেমন সম্মতি নেই তারা শুধু যারা দাফন কাফনের সাথে যুক্ত দিছ তাদের দাওয়াত দেয়।

www.pathagar.com

৩. শ্রাদ্ধ

হিন্দু সম্প্রদায়ের মৃতের স্মরণ ও আত্মার শান্তির জন্য মৃতের পরিবার যে পঙক্তি-ভোজের আয়োজন করে তাই হলো শ্রাদ্ধ, আঞ্চলিক উপভাষায় ছেরাদ্দ। আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয়–উপভাষায় নেমতন্ন। শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণে অভিনবত্ব আছে। এক থেকে সাত জ্ঞাতি পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করা হয়। ব্যাপারটি এরকম–যারা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে তারা তাদের প্রথম জ্ঞাতিদের নিমন্ত্রণ করবে। তার নিমন্ত্রিতরা তাদের জ্ঞাতিদের নিমন্ত্রণ করবে। পর্যায়ক্রমে সাত-জ্ঞাতি পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হবে। কয় জ্ঞাতি নিমন্ত্রিত হবে তা নির্ভর করে আয়োজকদের আর্থিক সঙ্গতির ওপর। আর পাড়া-প্রতিবেশী নিমন্ত্রণের বেলায় সমাজ বিবেচনা করা হয়।

পুরো গ্রামের লোকই সব সময় এক সমাজের লোক নাও হতে পারে। সমাজ এভাবে নির্বাচন করা হয়–যেমন নিবারণ হালদার বাড়ি থেকে গোপাল মিস্ত্রির বাড়ি পর্যন্ত ২০ বা ৩৫টি পরিবার নিয়ে এক 'সমাজ'। শ্রাদ্ধ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিয়ে ইত্যাদির বেলায় নিমন্ত্রণে এই সমাজ বিবেচনা করা হয়।

আবার এক সমাজভুক্ত হলেই হবে না–কাদের সাথে 'জলচল', কে কোন কারণে 'সমাজবাদ' হয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়। নিমন্ত্রণের সময় 'আসন ও পাতা' নিয়ে আসতে বলা হয়। 'আসন' বলতে যে আসনে বসে খাবে। 'পাত' বলতে কলাপাতা–যে পাতে খাবে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ভোজের যে আয়োজন করা হয় তাহল ভাত, সবজি, তরকারি ও মিষ্টান্ন।

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেও বর্ণপ্রথা আছে। 'শৌচ-অশৌচ' কত দিন পালিত হবে তা সে কোনো বর্ণের/বর্গের তার ওপর নির্ভর করে। নমঃশূদ্র, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের 'অশৌচ' পালন নির্দিষ্ট আছে। 'অশৌচ' পালনকে উপভাষায় 'অবশ্যি' পালনও বলা হয়। 'অশৌচ' পালন কালে মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাথা মুণ্ডন করে তৃর্ণের আসনে এক বসনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। শ্রাদ্ধের আগে ব্রাহ্মণ ডেকে 'শৌচ' হয়।

এ অঞ্চলে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রাদ্ধের ভোজ সাধারণত দুপুরবেলা হয়ে থাকে। আমন্ত্রিতরা সকাল থেকে আসতে থাকে। বাড়ির উঠোনে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে সকাল থেকে রামযাত্রা, ভক্ত প্রহ্লাদ কিংবা দাতা হরিশচন্দ্রের পালা পরিবেশিত হয়। পিতৃশ্রাদ্ধে সাধারণত লব কুশ অংশ, মাতৃশ্রাদ্ধে সীতার বনবাস অংশ, ভ্রাতৃশ্রাদ্ধে লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পুত্রশ্রাদ্ধে ভক্ত প্রহ্লাদ, পিতামহের শ্রাদ্ধে দাতা হরিশচন্দ্র ইত্যাদি পালা পরিবেশিত হয়। রামযাত্রার ক্ষেত্রে অনেক সময় অপেশাদার দল যাত্রা পরিবেশন করে থাকে।

যাত্রার পোশাক নিজেদের সমিতিতেই তৈরি করে রাখা হয়। বামনা থানার ঠুটাখালী গ্রামে এমনি একটি সমিতির সন্ধার পাওয়া গেছে। যাদের রামযাত্রা পরিবেশনের জন্য পোশাক আছে।

www.pathagar.com

৪. খৎনা/মুসলমানি

মুসলিম শিশুদের পাঁচ-ছয় বছর বয়সে খৎনা বা মুসলমানি করানো হয়। লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলাই হলো খৎনা। গ্রামের বেশির ভাগ পরিবারের ছেলেদের হাজাম—স্থানীয় ভাষায় ওস্তা দিয়ে খৎনা করানো হয়। ৩০-৪০ বছর আগেও ওস্তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে খৎনা করত। কখনো বাঁশের ধারি চাচারি, কখনো বিশেষ ধরনের বাঁকানো ছুরি ব্যবহার করে লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলত। তারপর কাপড়ে ন্যাকড়া পুড়ে ছাই বানিয়ে ক্ষত স্থানে লেপে দিয়ে কাপড় খণ্ড দিয়ে বেঁধে দিত। বর্তমানে শহরে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামেও হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারদের দিয়ে চেতনানাশক ঔষধ ব্যবহার করে খৎনা করানো হয়।

হাজামরাও এখন চেতনানাশক ঔষধ, এন্টিসেপটিক মলম ও গজ কাপড় ব্যবহার করে থাকে। খৎনার পরে সাত দিন কি দশ দিন পর মোটামুটি যার যেমন সাধ্য উৎসব করে। মাংস-পোলাও আত্মীয়-মেহমানদের খাওয়ানো হয়। মেহমানরাও নানা রকম উপহার সামগ্রী নিয়ে আসে।

৫. আকিকা

ইসলামি বিধান মতে আকিকা মূলত নাম রাখার অনুষ্ঠান। সন্তান জন্মের চার দিনের মধ্যে এই অনুষ্ঠান করার নিয়ম। কিন্তু এই অঞ্চলে শিশুর নাম রাখে শিশুর মা-বাবা দাদা-দাদি বা পরিবারের অন্য কেউ। আকিকা অনুষ্ঠান তারা তাদের সুবিধামতো সময় করে থাকে। ছেলে হলে দুটি খাসি ও মেয়ে হলে একটি খাসি জবেহ্ করে কিছু অংশ গরিবদের বিলিয়ে দেয়া হয়। অনেকে গরুও জবেহ্ করে থাকে। আকিকা উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের দাওয়াত করে খাওয়ানো হয়। কোরমা, পোলাও, রোস্ট ইত্যাদি উপায়দেয় খাদ্যের আয়োজন করা হয়। নিমন্ত্রিতরা নামা রকম উপহার সামগ্রী নিয়ে আসে।

৬. সন্তান জন্মের পর আজান/শঙ্খ ধ্বনি

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু পুত্র সন্তান জন্মের পর আজান দেয়া হয়। হিন্দু সম্প্রদায় ছেলেমেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই জন্মের পর শঙ্খ বাজায়। উলুধ্বনি বা জুকইর দেয়া হয়।

৭. হাতেখড়ি

সন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষা লাভের কামনায় হিন্দু মুসলিম দু সম্প্রদায়ের মধ্যে হাতেখড়ির প্রচলন আছে। আগে লেখা শেখার ক্ষেত্রে তালপাতায় অক্ষর এঁকে নারকেলের ছোবড়ার ভুষা ও খাগের কলম ব্যবহার করা হতো।

আজকাল স্লেট ও চক ব্যবহার করা হয়। সন্তানের বয়স চার পাঁচ বছল হলেই হাতেখড়ির অনুষ্ঠান করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় স্কুলের আরবি শিক্ষক ডেকে হাতেখড়ির অনুষ্ঠান করেন। এ সময় মিষ্টি পায়েসের ব্যবস্থা থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়

www.pathagar.com

পুরুত ঠাকুর ডেকে হাতেখড়ির অনুষ্ঠান করে। খই ছিটানো হয়। মিষ্টি ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা থাকে।

৮. অন্নপ্রাশন

হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদের ছেলেমেয়ে উভয়ের বয়স চার মাস পার হলেই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হয়। শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখে ভাত দেয়া হয়। আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে ভোজের আয়োজন করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্য এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে দেখা যায় না।

৯. নবজাতকের নাভিতে ছাই দেওয়া

আগে দাইয়েরা বাঁশের চাচরি দিয়ে নবজাতকের নাভি কাটত। নাভির ক্ষতস্থানে ন্যাকরা পোড়া ছাই দিয়ে অন্য একটা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিত। এখনও প্রত্যন্ত গ্রামে এ প্রথা চালু আছে।

তবে আজকাল দাইয়েরা বাঁশের চাচরির পরিবর্তে ব্লেড ও ছাইয়ের পরিবর্তে এন্টিসেপটিক মলম ব্যবহার করে থাকে।

১০. মঙ্গল প্রদীপ/আকাশ প্রদীপ

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠান বা মন্দিরে সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে। লক্ষ্মীপূজার সময় ঘরের সামনে প্রদীপ বা কুপি বাতি সারা রাত জ্বালিয়ে রাখে। আর রাতে ঘরের কপাট খোলা রাখা হয়, যাতে লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে আশীর্বাদ বা করুণা বিলিয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া কোনো কোনো বাড়িতে একটা লম্বা বাঁশের আগায় প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ির সামনে পুঁতে রাখে। এটি সারা রাত জ্বলে। একে বলে আকাশ প্রদীপ। ৪০/৫০ বছর আগে কোনো কোনো মুসলিম বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার সময় সারা রাত মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হতো—একথা অনেক মুসলিম প্রবীণরা জানিয়েছেন।

১১. বরণ/বরণডালা

বিয়ের পর নববধূ ও বরকে বরণডালা দিয়ে বরণ করা হয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে এটি একটি প্রচলিত রীতি। অনুষ্ঠানভেদে নানা উপকরণ দিয়ে বরণডালা সাজানো হয়। একটি কুলোয় ধান, দূর্বা, তেল, সিঁদুর, পান-সুপারি ও মঙ্গল প্রদীপ নিয়ে সাজানো হয়। কোনো কোনো মুসলিম পরিবারেও এ রীতি চালু আছে। সেখানে বরণডালায় থাকে শুধু ধান, দূর্বা, পান-সুপারি। কোনো কোনো সময় শুধুমাত্র এক ঘটি জল পায় ঢেলে বরণ করা হয়। এর কারণ হলো, আগে প্রায় সকলের পা নগ্ন ছিল। তাই পা ধোয়ার দরকার হতো।

অতিথিদের আপ্যায়নের সময় ঘটি ভরা জল ও পা মোছার গামছা নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকা বিশেষ সম্মান দেখানো বোঝায়। কাউকে আপ্যায়ন বা এক বেলা থেকে

www.pathagar.com

যাবার জন্য বলা হলে তাকে "গোন কর, তেল গামছা নাও" বলে অভ্যার্থনা করাও একটি রীতির মতো ছিল।

১২. উলুধ্বনি বা জুকইর

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে যে কাউকে বরণ করা হোক আর কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক অথবা সন্তানাদির জন্ম হোক মেয়েরা একত্রিত হয়ে জিহ্বা নাড়িয়ে উ লু লু লু ধ্বনি করে। এ ধরনের ধ্বনিকে উলুধ্বনি বলে। উপভাষায় উলুধ্বনিকে এ অঞ্চলে জুকইর বলে।

১৩. অতিথি সৎকার বা আপ্যায়ন

অতিথিকে আপ্যায়ন করাও এ অঞ্চলের পুরোনো রীতি। অতিথির যেন কোনো রকম অসম্মান না হয় সেদিকে বিশেষ যত্নবান থাকা এক সময় ছিল কর্তব্য। বর্তমানেও কম বেশি এ রীতি গ্রাম-গঞ্জে চালু আছে। গ্রামে কোনো বাড়িতে অতিথি এলে ডাবের পানি, খাবারের সাথে নারকেল, গুড়, দুধ ও দই দিয়ে আপ্যায়ন চোখে পড়ে।

১৪. জলখাবার/শরবত

মুসলিম সম্প্রদায় সিরাপ, চিনির শরবত, লেবুর শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকে। চা-বিস্কুট, সেমাই দিয়েও আপ্যায়ন করা হয়। অতিথি এলে হিন্দু সম্প্রদায় জলখাবার দিয়ে থাকে। বাতাসা বা সন্দেশ দিয়ে তাকে অপ্যায়ন করা হয়। ইদানীং নানা পানীয় পাওয়া যাচ্ছে যা দিয়ে অতিথি এলে অপ্যায়ন করা হয়।

১৫. পান-সুপারি/হুঁকো

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই অতিথিকে পান-সুপারি দিয়ে অপ্যায়ন করে থাকে। 'এট্টু পান-সুপারি খাইয়া গ্যালে খুশি অইতাম', অনেকেই এমন যাচনা করে থাকে। প্রেমিকাকে ছড়া বা কবিতায় কিংবা গানে 'বন্ধু পান খাইয়া যাও' বলে আহবান জানানো হয়।

এক সময় এ অঞ্চলে হুঁকোয় তামাক সেবনের প্রচলন ছিল। অতিথিকে হুঁকোয় তামাক সাজিয়ে দেয়া হতো। বর্তমানে এর প্রচলন ওঠে গেছে।

১৬. ধূপ-ধুনো, আগরবাতি

হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি, উপাসনালয় ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে একটি পাত্রে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে শুদ্ধিকরণের একটি আচার প্রচলিত আছে। তারা মনে করে এতে স্থানটি পবিত্র হয়। মুসলিম সম্প্রদায় মিলাদ মাহফিল, দোয়া অনুষ্ঠান, মৃতের কবরস্থানে, কোনো পির-মুর্শিদের মাজারে আগরবাতির কাঠি জ্বালিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

১৭. গোলাপ জলের ছিটা

মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন মিলাদ মাহফিল, বিয়ে, মৃতের মরদেহে গোলাপ জলের ছিটা দেয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোজনও কোথাও কোথাও গোলাপ জলের ছিটা দিয়ে থাকে।

১৮. সোনা-রুপার জলের ছিটা

কোনো স্থানকে শুদ্ধি ও পবিত্র করার জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কেউ কেউ একটি পাত্রে জলের সাথে সোনা-রুপার গহনা ভিজিয়ে সেই জল ছিটিয়ে দেয়।

১৯. মানতি/মানত

রোগ-বালাই থেকে মুক্তি ও অন্যান্য শুভ কাজের জন্য দরগা, মসজিদে মুসলিম সম্প্রদায় এবং মন্দিরে হিন্দুরা দেবদেবীর নামে মানত করে থাকে। মানত টাকা-পয়সা বা ফলফলাদি হতে পারে।

২০. হালখাতা

ব্যবসায়ীরা ৩০ চৈত্রের মধ্যে তাদের সারা বছরের হিসাব নিকাশ করে ফেলে। পহেলা বৈশাখ হালখাতার আয়োজন করে। সাধারণত সারা বছর যারা বাকি বকেয়া খায় তাদের হালখাতায় নিমন্ত্রণ করা হয়। ছাপানো চিঠি দিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। পুরো বৈশাখ মাস জুড়েই বিভিন্ন দোকানপাটে হালখাতার অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। হালখাতার দিন দোকান রঙিন কাগজ ও কাপড় দিয়ে সাজানো হয়। যারা দোকানে এসে দেনা-পাওনা শোধ করে তাদের মিষ্টি ও পান-সুপারি খাওয়ানো হয়। হিন্দু ও মুসলিম হালখাতা আয়োজনে কিছুটা ভিন্নতা আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দোকানে গণেশের মূর্তি কিংবা ছবি স্থাপন করা হয়। ধূপ-ধুনো ও আগরবাতি জ্বালানে হয়। সোনা-রুপার জলের ছিটা দেয়া হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের দোকানে আগরবাতি জ্বালানো হয়। কেউ কেউ কোরান তেলাওয়াতের ক্যাসেট বাজায়।

২১. রমজানে রোজা-খোলানো

আরবি রমজান মাসকে মুসলমানরা পবিত্র মাস হিসেবে মানে। সারা মাস প্রায় সবাই রোজা রাখে। সারা দিন রোজা রাখার পর সন্ধ্যায় ইফতার করা হয়। সম্পন্ন মুসলিম পরিবার রমজান মাসের যে কোনো একদিন আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও গরিবদের ইফতার করায়। এই ইফতারকে তারা 'রোজা খোলা' বলে থাকে। মৌলবি ডেকে কোরান পাঠ ও দোয়া-দরুদ ও মিলাদ পড়ানো হয়। শরবত খেজুর বুট মুড়ি থাকে ইফতারের খাদ্য তালিকায়। পরে ভাত-মাংস দিয়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

২২. মঙ্গলঘট

যে কোনো শুভকর্মে মঙ্গল কামনায় মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি একটি বিশেষ ধর্মাচরণ। একটি পেতলের ঘটের সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয়।

www.pathagar.com

তাতে জল ভরে ৭টি পান, কচি আমপাতা হরীতকী কিংবা সুপারি দিয়ে সাজানো হয়। সাধারণত গেরস্তের ঘরের সামনে উঠানে ধান দূর্বার উপরে মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। মঙ্গলঘট স্থাপন কালে বাড়ির মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়। ছেলেরা দু-হাত জোড়া করে নমস্কার দেয়।

২৩. গোপালের আখড়ায় পূজা-অর্চনা

বরগুনা উপজেলার উত্তর কাকচিড়া গ্রামে কাচারি বাড়ির গোপালের আখড়া প্রায় শত বছরের পুরনো। বরিশালের বৈদ্যনাথ সাহার কাছারি বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হবার পর কাছারি বাড়ির চারপাশে তারা ধোপা, নাপিত, ভূইমালী, মালি ও গোপালের আশ্রম ও আখড়া প্রতিষ্ঠা করে।

গোপাল হলো শ্রীকৃষ্ণের শিশুকালের নাম-পরিচয়। এখানে যে মূর্তিটি আছে সেটি কটিপাথরের। ছোট্ট গোপাল হামা দিচ্ছে (স্থানীয়রা বলে হাঁটুভাঙা গোপাল) তার পাশে ছিল রাধার ছোট পুতুল। প্রায় দু-একর জুড়ে এই আখড়া। গোপালের ছোট একটা মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে টিনের চাতাল, যেখানে ভক্তরা কীর্তন ও প্রার্থনা করে। উত্তর দিকে একটি দোচালা ঘর, রান্নাঘর, যেখানে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী থাকে। গোপালের নামে কিছু ধানী জমিও আছে। এই গোপালের আখড়া গ্রামের একটি পরিচালনা পর্যন্ত পরিচালনা করে থাকে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী আছে পূজা-অর্চনার জন্য। দিনে পাঁচবার ঘণ্টা শঙ্খধ্বনি করে গোপালকে ভোগ দেয়া হয়।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে গ্রামের লোকজন এসে এখানে নানা রকম অনুষ্ঠান করে। হরির লুট, ঠাকুরসভা ইত্যাদি প্রার্থনার আয়োজন করে থাকে। এই আখড়াকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব হয়। বৈশাখ মাস আট থেকে চৌষট্টি প্রহরের নাম কীর্তন হয়।

এই আখড়ায় যে কষ্ঠি পাথরে হাঁটুভাঙা গোপালটি ছিল তার হাতে সোনার বাজু, মাথায় সোনার মুকুট, হাতে সোনার বালা ছিল। রাধার মূর্তিটিও ছিল সোনার। ১৯৭১ সালে দুর্বৃত্তরা গোপালের সব সোনাদানা লুট করে মূর্তিটির একটি হাত ভেঙে খালে ফেলে দেয়। স্বাধীনতার পড়ে তাকে উদ্ধার করে আবার প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু দুর্বত্তরা আবারও সেটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। বর্তমানে একটি পেতলের গোপাল ও রাধার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২৪. বৃক্ষপূজা/রক্ষাতলা/রক্ষাচণ্ডীপূজা

এই অঞ্চলে অনেক গ্রামে বৃক্ষপূজা হয়ে থাকে। লৌকিক এই পূজাকে রক্ষাচণ্ডী পূজা বলা হয়। পূজাস্থলকে রক্ষাতলাও বলা হয়। একটি বট ও একটি পাকুর গাছের মধ্যে বিয়ে দিয়ে রক্ষাতলা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর প্রতিদিন তেল সিঁদুর গাছের গোড়ায় লেপে দেয়া হয়। ধূপ-ধুনো ও ঘণ্টা বাজানো প্রতি সন্ধ্যায়।

নবজাত সন্তান ও নববধূকে নিয়ে যায় রক্ষাতলায়। ঢোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম কীর্তন হয়। বামনা থানার উত্তর কাকচিড়া গ্রামে কাছারি বাড়িতে শত বছরের একটি

www.pathagar.com

রক্ষাতলা ছিল। পাকিস্তান আসলে বাড়িটি মুসলমানদের কাছে বিক্রি হবার পর সেটি কেটে ফেলা হয়।

পরবর্তীকালে কাছারি বাড়ির পাশে গোপালের আখড়ায় আরেকটি রক্ষাগাছ—বট পাকুরের সাথে বিয়ে দিয়ে স্থাপন করা হয়। এই গ্রামে নাপিত বাড়িতে একটি রক্ষাগাছ আছে। বরগুনা উপজেলার খাজুরতলা গ্রামে একটি রক্ষাগাছ আছে। একটি মেয়ে সেই গাছকে বিয়ে করায় এলাকায় বেশ হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল।

রক্ষাতলা

২৫. শীতলাপূজা

এ অঞ্চলে অনেক গ্রামেই শীতলা দেবীর মন্দির আছে। গ্রামে মগামারী বা অন্য কোনো দুর্যোগ হলে শীতলাপূজার আয়োজন করা হয়। গ্রামের যুবক-কিশোররা সন্ধ্যার পরে ঢোল-কাঁসর-চাকি বজিয়ে বিপদ তাড়ানোর জন্য গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। তারপর চাল-ডাল ভিক্ষা করে শীতলা দেবীর পূজার আয়োজন করে। গানটি হলো :

শমন পালা পালা
শমন পালা পালা
গৌর এল নিতাই এল
সঙ্গে রামানন্দ এল।

www.pathagar.com

শমন পালা পালা
যেই দ্যাশে নাই হরির নাম
সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল।
শমন পালা পালা
শমন পালা পালা।

এই গ্রাম কীর্তন সাত দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত চলে। যত দিন রোগ বালাই হিতু না হয়ে আসে।

২৬. হরিরলুঠ/ঠাকুরসভা/হরিসভা

কোনো মানত থাকলে গ্রামবাসী কোনো মন্দির বা আশ্রমে হরিরলুঠ/ঠাকুরসভা/হরিসভার আয়োজন করে থাকে। সন্ধ্যার পর ভক্তি মূলক গান-বাজনার শেষে বাতাসা খই ছিটিয়ে দেয়া হয়। সবাই তা কুড়িয়ে নেয়। এই হলো হরিরলুঠ। এ সময় ধ্বনি তোলে 'হরি হরি বল'। অনেকে চাউল-কলার প্রসাদও বিতরণ করে। কেউ কেউ মুড়ি সন্দেশও দিয়ে থাকে।

২৭. নামকীর্তন

কোনো আখড়া কিংবা মন্দিরকে কেন্দ্র করে নাম কীর্তনের আয়োজন করা হয়। এই নামকীর্তন বিরতিহীন অষ্টপ্রহর থেকে চোষট্টি প্রহর পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি কীর্তনের দল দু-ঘণ্টা ধরে কীর্তন পরিবেশন করে থাকে। দিন-রাতকে ১২ ঘণ্টায় ভাগ করে সময় উপযোগী বিভিন্ন রাগে ভাগ করে কীর্তন পরিবেশন করে থাকে। বেহাগ, ভৈরবী, শিবরঞ্জন বিভিন্ন রাগ খুবই লোকপ্রিয়, কীর্তনে যে বাণী পরিবেশিত হয় তা হলো :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।

বামনা থানার রুহিতা গ্রামের মনীন্দ্রনাথ শীলের কীর্তনের দলটি খুবই বিখ্যাত। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কীর্তনের দল এসে থাকে।

২৮. গ্রাম-কীর্তন

প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ গ্রামের যুবক-কিশোররা খুব সকাল বেলা ঢাক বাদনের পর ঢোল-করতাল চাকি বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। তাদের বোল হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। কীর্তন শেষে বাড়ি ফিরে সবাই দই-চিড়া খায়।

২৯. খোদাই ষাঁড়/ধম্মের ষাঁড়

এ অঞ্চলে বিভিন্ন বাজারে সাদা-কালো মোটা ষাঁড় ঘুরে বেরাতে দেখা যায়। কোনো ব্যক্তি খোদা কিংবা ভগবানের নামে এই ষাঁড় ছেড়ে দেয়। এই ষাঁড় মুক্তভাবে ঘুরে

www.pathagar.com

বেড়ায়। বরগুনা শহরে জেন্নাত খাঁর একটি ষাঁড় ছিল খুব বড়। পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালে সেটি মেরে খেয়ে ফেলে। তিনি স্বাধীনতার পড়ে আর একটি ষাঁড় খোদার নামে ছেড়ে দেন। কাজকর্মহীন নাদুশ-নুদুশ বেকার স্বল্পবুদ্ধির যুবককে 'খোদাই ষাঁড়' বলে নিন্দা করা হয়।

৩০. হরিকাইল্যা রাইত

ভাদ্র মাসের অমাবশ্যার রাতকে এই অঞ্চলে হরিকাইল্যা রাইত বলা হয়। মান-বাংলায় নষ্টচন্দ্রা বলা হয়ে থাকে। এই রাতে গ্রামের যুবক-কিশোররা বিভিন্ন বাড়ির শসা, আখ, জাম্বুরা ও ডাব নারিকেল চুরি করে খায়। বিশ্বাস—এতে তাদের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও রক্তবৃদ্ধি হবে।

৩১. কিরা/দিব্যি

লোকসমাজে এ অঞ্চলে কিরা বা দিব্যি একটি সাধারণ ঘটনা। কোনো কিছু বিশ্বাস করাতে কিরা কাটা হয়। মুসলমান সম্প্রদায় আল্লাহর কিরা, নবী যেন হাশরের দিন শাখায়াত না করে। মা বাবার নামে কিরা, মাটি ছুঁয়ে কিরা করে। কঠিন কিছু হলে ছেলেমেয়ের মাথায় হাত দিয়ে, কোরান ছুঁয়ে কিরা কাটে। হিন্দু সম্প্রদায় ভগবান বা দেব-দেবীর নামে, বিশেষ করে মা দুর্গার নামে দিব্যি কাটে। তামা-তুলসি নিয়ে গীতা ছুঁয়েও কেউ কেউ দিব্যি কাটে। সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে মা-বাবার নামেও কেউ কেউ দিব্যি কাটে।

৩২. তুলসি/তুলসির মালা

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সবার বাড়িতে একটি বেদির ওপর তুলসি গাছ লাগানো থাকে। তুলসি পাতা তাদের কাছে পবিত্র। পূজায় তুলসি পাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুরুষরা অনেকেই তুলসির মালা গলায় পরে থাকে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদেরও তুলসির মালা পরতে দেখা যায়।

৩৩. কুষ্ঠিনামা

হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারে সন্তান জন্মের কিছু দিন পরিবারিত গণকঠাকুর এসে নবজাতকের কুষ্ঠিনামা করেন। সন্তান জন্মের সময় ক্ষণ, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান বিচার-বিবেচনা করে কুষ্ঠিনামা তৈরি করেন। এ সময় সন্তানের নামও রাখা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কুষ্ঠিনামা করার প্রচলন নেই। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে সব ধর্মের মানুষেরই জন্মে নিবন্ধনের বিধান করা হয়েছে।

৩৪. গণকঠাকুর

হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তান জন্মের পর গণকঠাকুর এসে সন্তানের হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা কথা বলে যান। যেমন তার শিক্ষা, ধন, বিয়ে, বয়স ইত্যাদি; সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন। কুষ্ঠিনামা তৈরি করে দেন। মুসলিম পরিবারে হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যৎবাণী করার প্রচলন নেই।

www.pathagar.com

৩৫. কুলাইপূজা/কুমিরপূজা

নিম্নবর্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমিরপূজার প্রচলন আছে। সাধারণত পৌষ মাসে কুমিরপূজার আয়োজন হয়। হারইন দিন–অর্থাৎ পৌষসংক্রান্তি বা পৌষ মাসের শেষ দিন এই পূজা হয়। গ্রামের ছেলেপুলেরা একত্র হয়ে খাল বা নদী থেকে কাদা তুলে বিশাল ২০-৬০ হাত কুমির তৈরি করে। কুমিরের লেজের দিকে নারকেলের ডগা কিংবা একটা কেয়াপাতা লম্বালম্বি স্থাপন করে যে যাতে লেজটা ভয়ঙ্কর লাগে। আর চোখ বানানো হয় দুটো জলশামুক দিয়ে।

৩৬. মনসা দেবীর পূজা/মনসা মন্দির

বরগুনা জেলার সর্বত্র নিম্নবর্গ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসা দেবীর পূজার প্রচলন আছে। এই অঞ্চলে সর্বত্র বিষধর সাপ, স্থানীয় ভাষায় 'জাইত হাপ'-এর আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। মনসা দেবীর রোষানল থেকে বাঁচার জন্য অনেকে রয়ানি গানের আয়োজন করে থাকে। আবার বৈশাখ মাসে মনসা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মনসা পূজার আয়োজন করে। কোথাও কোথাও মনসা দেবীর স্থায়ী মন্দির আছে। বরগুনা শহরে দুটি মনসা মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলোর মনসা দেবীর মাটির প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছে।

৩৭. লক্ষ্মীপূজা

দুর্গা পূজার পরেই অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপূজা। লক্ষ্মীপূজা সর্বজনীন নয়। যারা একটু অবস্থা সম্পন্ন, বিশেষ করে হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রতিমা স্থাপন করে এই পূজার আয়োজন করে। সাধারণ মানুষ বাড়িতে যে যেভাবে পারে আয়োজন করে। লক্ষ্মীপূজার বিশেষ আকর্ষণ হলো নারকেলের নাড়ু ও নারকেলের পুর দেয়া চালের গুঁড়োর কুলি পিঠা। বাড়িতে চালের গুঁড়ো দিয়ে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, সারারাত বাতি জ্বেলে রাখা আকাশ প্রদীপ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

৩৮. কালীপূজা

লক্ষ্মীপূজার পরে হয় কালীপূজা। কালীপূজাও সর্বজনীন ও বারোয়ারি নয়। কোনো কোনো বাজারে কালীর মন্দির আছে। আবার যে বারোয়ারি মন্দির আছে তাতে কালী মূর্তি স্থাপন করা হয়। ফুলঝুরি বাজারে ও বরগুনা শহরে প্রতি বছর কালীপূজা হয়। আগে কালীপূজার দিনে হাউইবাজি পোড়ানো হতো। বদরখালীর মুকুন্দ দক্ষ বাজির কারিগর ছিল। সে নানা রকম বাজি বানাতে ওস্তাদ কারিকর ছিল।

৩৯. কলাবউ

দুর্গাপূজার আর একটি অনুষঙ্গ হলো কলাবউ। প্রায় প্রতি বাড়িতে লাল শাড়ি পরিয়ে কলাবউ তৈরি করে নানা আচার পালন করা হতো। কলাবউ হলো কচি কলা গাছ এনে তাতে লাল শাড়ি পরানো কিশোরীপ্রতিম দুর্গা।

www.pathagar.com

৪০. সরস্বতীপূজা

কালীপূজার পরে আসে সরস্বতীপূজা। এই অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি স্কুলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বিদ্যার দেবী সরস্বতীর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করে থাকে। পূজা শেষে প্রসাদ ও মিষ্টি ব্যবস্থা থাকে।

৪১. নীলগাজন

গ্রামের কিছু যুবক একত্র হয়ে নীলের দল গঠন করে। এই দলে থাকে রাধা, কৃষ্ণ ও একজন বৈরাগী সঙ। রাধা, কৃষ্ণ তাদের চরিত্রানুযায়ী পোশাক পড়ে। রাধার মাথায় থাকে শোলার বানানো চূড়া আর কৃষ্ণ খানিটা রাজার পোশাক পরা, মাথায় মুকুট, মুখে নীলচে প্রসাধন, ঠোঁটে বাঁশের আড়বাঁশি। রাধা কৃষ্ণের দুজনের পায়েই ঘুঙুর পরা থাকে। আর বৈরাগী সঙের সাজ থাকে অদ্ভুত। মুখে পাটের কালো কালিমাখা দাড়ি, হাতে বাঁকা লাঠি। আর থাকে তিন চারজনের বাদক দল–ঢোল, কারতাল আর হারমোনিয়াম। একজন অধিকারী বা সরকার থাকে–যে দলটি পরিচালনা করে। এরা সারা চৈত্রমাস গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষা করে, চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলপূজা করে। নীলের এই দল এক বাড়ির উঠোনে নিয়ে ঢোল-করতাল বাজিয়ে নাচ-গান শুরু করে। বাড়ির মহিলা-পুরুষ, ছেলেপুলেরা গোল হয়ে এদের ঘিরে থাকে। এরা ভক্তিমূলক নানা গান করে। এসব গানে রাধা কৃষ্ণের গান যেমন থাকে অন্যান্য গানও থাকে। যেমন নিমাই দাঁড়াবে দাঁড়া, আসলো ভারতী গোসাঁই কইয়া বইয়া লইয়া গেল সোনার চান নিমাই কিংবা রামায়ণের কোনো অংশ 'ওঠ ওঠ ভাইরে লক্ষ্মণ ধুলা কেশে লগে' কিংবা নদের চাদের কোনো একটা অংশ।

এই নীল দলে পরিভ্রমণ শেষ ছয় চৈত্র সংক্রান্তির থৌল বা মেলার দিন। থৌলের দিন তারা মেলায় ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করে। পসারিদের কাছ থেকে ভিক্ষা নেয়। বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার গোলককাশী ও উত্তর কাকচিড়া গ্রামের সুধাংশু বিশ্বাস, সুখরঞ্জন হাওলাদার, হিরামন কবিরাজ, সূর্যকান্ত রায়–এদের দলটি ছিল পুরানো। এখন এই দলটি ভেঙে গেছে। তবে মঠবাড়িয়া অঞ্চল থেকে এখনো নীলের দল আসে। অষ্টক গান নীল উৎসবের অন্য একটি রূপ। বৈরাগী নানা রকম কৌতুক ও গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। তার গান হলো 'সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী'।

৪২. নীল গাজনের সঙ

চৈত্র মাসে এই অঞ্চলে নিম্নবর্গের হিন্দু চাষিরা নীল গাজনের সঙ বের করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে। এও এক ব্রত। চৈত্র সংক্রান্তি তাদের পরিক্রম শেষ হয়। নীল গাজনের সঙের দলটি বেশ বড়। এই দলে আছে জটাধারী শিব, তার স্ত্রী গৌরী, তাদের ছেলেমেয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ। দলে আরো আছে নন্দী-ভৃঙ্গি, নারদ, পার্বতী।

এদের সাজ হয় দুর্গামণ্ডপের মূর্তিদের মতো প্রায়। শিবের মাথায় জটা, উদোম গা, হাতে মোষের শিঙা। কোনো বাড়ির উঠোনে টুকেই শিব মোষের শিঙায় পোঁ পোঁ ফুঁ

দেয়। সঙ্গীরা ঢোল-করতাল বাজিয়ে খানকিটা নাচে। বাড়ির নারী-পুরুষ ছেলেপুলেরা জড়ো হলে তাদের পরিবেশনা শুরু করে।

নারদের হাতে থাকে জলন্ত মাটির পাজাল। পাজালে নারকেলের ছোবড়ার আগুন। তাতে এক মুঠো ধূপ-ধুনো দিলেই বেশ ধোয়া হয়। তখন নারদ বিশেষ ভঙ্গি করে আবৃত্তি করে–

ধূপ ধরন ধুপতি ধরন
ঘোর অন্ধকার
যতদূর ওঠে ধোঁয়া
গগন মণ্ডলে
তথা হইতে মহাদেব
লামেন ক্ষিতি তলে।
মায়েরা, বাপরা, সগলে আসইয়া হাজির হয়েন।
ঘরের দরজায় বুড়া শিব গুষ্টি গোত্তোর লইয়া।
দেইখ্যা শুনইয়া দেবেন দান হরষিত হইয়া ॥
তিরভুবনের স্বামী আইছেন ভিক্ষুতের রাজা।
গেরোস্তের কইল্যানে বাজুক ডম্বরুর বাজা ॥

সাথে সাথে শুরু হয় মহাদেবের গালবাদ্য ববম ববম এবং ডম্বরুর ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি। মহাদেব একটি বিশেষ ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে ঘিরে তার গোটা পরিবার লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও গৌরি ও অন্যরা নাচ-গান শুরু করে। নারদ নানা ভঙ্গি করে সবাইকে আনন্দ দেয়। তারা নেচে নেচে গায়–

ক্ষিতিতলে মহাদেবের
অবতরণ হইল।
এবার মহাদেবের নামে সবে
হরিহরি বলো।
ভাঙ ধুতুরা গাজা মাজা
থাহে যদি ঘরে
সাজাইয়া গুজাইয়া দেও
মহাদেবের তরে।
নারদের ঝুলিতে দেবেন
মুডা মুডা চাইল।
ত্যাল দেবেন ঘেরতো দেবেন
মুসুরির ডাইল।
ত্যাল ঘেরতো দিয়া মোরা
কী ব্যাঞ্জন বানামু।
কান পাতইয়া হোনেন গীত
হক কতাই কম।

www.pathagar.com

উইস্থা ভাজা খাইতে মজা
ঘেরতেরি সোম্বার।
আরে গরম গরম ভাজা খাইতে
লাগে চোমোৎকার।
বলো ভাই, গেরস্তের কইল্যানে হরি হরি বলো। শিবো শিবো বলো। মা জননী অন্ন দেও।

খ্যাতে ফসল নাই, গোলায় চাউল নাই। অকালে হে কারণে জেরবার পরান। বাবা ভোলা মহেশ্বর কয়, অন্নপুন্না ফ্যান চায়। এ আকালে করো মাগো গরিবের তেরাণ। এইসব কথা-ছন্দের মধ্যে কখনও ঢাক ঢোল কাঁসি বাজে, কখনও নাচ গান হয়। গানের মধ্যে প্রধান থাকে শিব গৌরীর বিয়ের কথা, শিবের বার্ধক্য, গৌরীর দুর্ভাগ্য, তাদের সংসারে অনটনের কোন্দল। অঙ্গনে যারা শিবের 'গুষ্টি' সেজে এসেছে সবাই বহুরূপী। বিগত পূজার সময়কাল দুর্গা ঠাকুরদের রঙ করা পাটের ফেসোর চুল, দাড়ি এইসব নিয়ে রঙচঙ যা জুটেছে, তাই দিয়ে বহুরূপী সেজে সবাই নাচ গান করে। দান চায়। ছাইভস্ম মাখা জটাধারী বাবা ভোলানাথ ভিক্ষে চায়। নারদ ঝোলায় ভরে। হঠাৎ পর্বত বেরিয়ে আসে দলের মধ্যে থেকে। নারদ তার মামা। মামা-ভাগ্নেতে জোর কাজইয়া লেগে যায়। পর্বত বলে, ঠাকুর তোমার সেবক নারদ মোর মামা। তমো কই, ও চুৎমারানির পোয় আসলেই ছ্যাচড়া। অর নেইয়ৎ সাইদ্যের পাপিষ্ট। যদি জিগাও ক্যান? তো কই–

মামার ঝুলির মইদ্যে ঝুলি।
গেরস্তানি অন্ন দে খায় বুলবুলি ॥

আসলে মামায় একছের চোর। 'বৌ নাই ঝি নাই, এলহা এট্টা প্যাট। তমো দ্যাহ যুইত্তো বোন্দে (গোপনে) করে ল্যাট ঘ্যাট।' মোরা প্যাডের জ্বালায় ভিক্ষা করতে বাইর অইছি আর হে লাংচুনির পোয়, হেই ভিক্ষার চাউল লইয়া এদার ওদার করে। মুই কই ঠাহুর তুমি এ্যার বিহিত করো।

নারদের ঝুলি তালাশ করে চুরির মাল বের করে। শিব বলে, তোরে আইজ থিহা ত্যাইজ্য করলাম। যেহানে পার হোগামারাইয়া খা। নারদ এ কথায় ভীষণ রেগে বলে, এ্যাতো বড় কতা? তয় মুই চললাম। কতায় কয়–

য্যার লইগ্যা করলাম চুরি
হেই কয় চোর?
তয়, আইজ থিহা দলাদলি
তোর লগে মোর ॥
থাকতা কৈলাসে,
খাইতা ভাঙ গাঁজা।
মোরইনা দৌলতে অইলা
ভিক্ষুতে রাজা ॥
তিরভুবন ভরমিয়া
আনি এডাওডা।

www.pathagar.com

কারণ অকারণে ঘডাও
নিত্য নতুন ল্যাডা ॥
আইজ থিহা পিথগান্ন
তোর লগে মুই ।
মায়রে লইয়া আলাগ অইলাম
হোগামারা তুই ॥

এরপর শিব ও গৌরীর নানা বিষয় নিয়ে ঝগড়া । গৌরী শেষ পর্যন্ত শিবের পক্ষ নেয় । তাই দেখো নারদ আবার গায়–

ও তোরা গৌরী দেখবি আয়
শিবের বাসি বিয়া আয়
আর বুড়া বররে দেখিয়া গৌরী
কান্দিয়া ভাসায় ।

নারদ বলে,

'তুমি যদি সতি সাদ্ধি এক মোন এক পেরাণ । তয় ক্যান বুড়া বরেরে দেইখ্যা ব্যাকুলি মন । এই বরের লইগ্যাতো তুমি তপেস্যা করিলা । এহন ক্যানও কর কোন্দোল বুড়া বুড়া বলইয়া ॥'

নারদের কথায় গৌরীর হয় সাংঘাতিক লাজ, সে গায়–

মোর মনে বেচাল নাই
বেচাল হের মন
গঙ্গারে দেইখ্যা ক্যান
ফাউকায় বদন?
কোন দেব হইয়া
মস্তকে ধরে গাঙ
কোন দেব হইয়া
নিত্য খোঁজে লাঙ?
একবার মরলাম মুই
তাহার অপবাদে ।
অবশেষে জপেতপে
ফ্যালাইলাম ফাঁদে ॥
তমো দ্যাহ তিলোছন
আড় দিকে চায় ।
ব্যালগাছ দেইখ্যা তার
কুভাব মনে আয় ॥
মুই যদি সব্ব জনের
আমি মাতা হই ।
মোর ঘরে নিত্যাদিন
ভিক্ষা মাগবি তুই ॥

www.pathagar.com

৪৩. সুন্দরবনের দেব-দেবী

সুন্দরবন এলাকার সমাজজীবন গ্রামপ্রধান। কৃষির জন্য, ফসল উৎপাদনের জন্য আর ইংরেজদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য এক সময় সুন্দরবন কেটে লোকালয় করা হয়েছে। সমুদ্র, নদী-খাল আর বাদাবন দিয়ে পরিবেষ্টিত এ অঞ্চলের কৃষিজীবী, বনজীবী এবং জলজীবী মানুষরা প্রতিনিয়ত ঝড়-বন্যা, মারী-মড়ক এবং শ্বাপদ-শঙ্কুল প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদই এখানকার মানুষের জীবনধারণের একমাত্র রসদ। তাই এখানকার শ্রমজীবী মানুষরা প্রকৃতিকে জয় করতে, প্রকৃতির দান গ্রহণ করার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে, জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেব-দেবী এবং পির-গাজীদের ওপর নির্ভর করে। দেবদেবী এবং পির-গাজিদের কাছ থেকে এই মানুষরা যে শক্তি পায়, তাই দিয়ে সে ভয়ঙ্কর বাঘ, হিংস্র কুমির-কামট, বিষাক্ত সরীসৃপ এবং ভয়াল জঙ্গলের সব ভয়কে উপেক্ষা করার সাহস পায়। এই সাহসকে আমরা এক ধরনের হাতিয়ার বলতে পারি। দেবতার ধ্যান, জ্ঞান, পূজা, শিরনি, উরস, মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে এই সাহস সুন্দরবনের মানুষেরা অর্জন করে থাকে। তাই এখানকার লোকধর্মে বিরল-বিচিত্র রূপ দেখা যায়। সুন্দরবনের দেবতারা একই সঙ্গে নানা ধর্মের লোকদের নৈবেদ্য পেয়ে থাকেন। এখানকার মানুষেরা নিজ নিজ ধর্মের বাইরেও কিছু লৌকিক দেব-দেবী এবং পির-গাজির আরাধনা করে থাকে। পালন করে বহু ব্রত বা নিয়ম-কানুন। প্রতিটি দেব-দেবীকে নিয়ে রয়েছে কিছু গল্প বা উপাখ্যান, যার ওপর ভিত্তি করে কাব্য, পুথি, গান ইত্যাদি রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

৪৪. বনবিবি

বনবিবি অরণ্যের দেবী রূপে পূজিতা। লোক বিশ্বাস অনুযায়ী কোথাও তিনি মুরগির রূপ ধারণ করেন, কোথাও বাঘের। বনবিবি অন্য কোনো দেব-দেবীর মতো উগ্র বা প্রতিহিংসাপরায়ণ নন। বরং সুশ্রী, লাবণ্যময়ী ভক্তবৎসলা দেবী। বনের সমস্ত সৃষ্টিতে রয়েছে তার মমতা। তিনি মানুষকে ভালোবাসেন। তেমনি ভালোবাসেন প্রকৃতিকে। বনবিবির মাহাত্ম্যের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে আছে সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিজীবী, ক্ষেতমজুর, বাওয়ালি, মৌয়াল, কাঠুরে, জেলে, আদিবাসী মুন্ডা, শিকারি প্রভৃতি গরিব মানুষ। এরা নিত্য স্মরণে রাখেন, মা বনবিবিকে।

৪৫. রাখাইনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে, জন্মে কাঁদো, মৃত্যুতে হাসো। গৌতম বুদ্ধের মতানুসারে, জীবন হলো দুঃখের অসীম সমুদ্র। জীবনের একমাত্র চাওয়া হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তি। আর এই নির্বাণ আসে মৃত্যুতে। তাই মৃত্যু আনন্দের ও অপার শান্তি ময়। সেই মতানুসারে রাখাইনেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত করে জীবনকে স্মরণীয় করে তোলেন। এটা তাদের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির অংশ বলা যায়। বিশেষ করে রাখাইন পুরোহিতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আয়োজন হয় বর্ণিল উৎসবের।

www.pathagar.com

পুরোহিত চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকেন অন্তিম শয্যায়। তার জন্য নির্মাণ করা হয় সুবিশাল গৃহ (কাকলা)। বাঁশ দিয়ে তৈরি সেই গৃহ সুসজ্জিত করা হয় রঙিন কাগজ আর বাহারি রঙ দিয়ে (বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে তৈরি)। এই ঘরে অন্তিম ঘুমে মগ্ন থাকেন পুরোহিত। চা-পাতা, তামাক ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মমি করে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর কফিনটি সংরক্ষণ করা হয় অনেক দিন। তারপর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় মহাআয়োজনে। ৩-৪ দিন ধরে চলে নানা উৎসব ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা। সর্বোচ্চ ধর্মীয় বিনয়, সম্মান জানিয়ে তাঁকে বিদায় জানানো হয়। এতে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিদের প্রধান পুরোহিত, ভক্তবৃন্দ। এ উপলক্ষে পুরোহিতের জীবন-দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত হয় বিশেষ স্মরণিকা।

বরগুরা জেলা রাখাইন বৌদ্ধ সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্য সচিব খে মংলা জানান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে পুরোহিতের মরদেহ স্থানান্তর করা হয় (কফিনটি সুসজ্জিত রথের বাইরে আনা হয়)। এরপর কফিনটি অন্য একটি রথে রেখে সেখানে রাখাইন তরুণীদের নৃত্যরথ (কাদলো) অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই কফিনটি রাতে চক্ররথে করে রাখা হয়।

পরের দিন কফিনটি রথের অভ্যন্তরে বানানো ড্রাগন আকৃতির দোলনায় তুলে রাখাইন তরুণীরা দোলান আর ধর্মীয় সংগীত (এয়েনচুয়ে) পরিবেশন করবেন। পুরোহিত যেদিন প্রথম পৃথিবীতে আসেন সেদিন যেমন নিষ্পাপ ছিলেন তেমন নিষ্পাপ হয়ে তিনি বিদায় নিলেন—এমন অবস্থা বোঝাতেই তাঁর কফিনটি দোলনায় দোলানো হয়। যেদিন পুরোহিতের মরদেহ প্রকৃতির মাঝে বিলীন করা হয় সেদিন সকালে সাজ-সজ্জিত আরেকটি রথে তাঁর কফিনটি তুলে রাখাইন নর-নারীরা দুদিকে রশি ধরে টানেন। সারাদিন এই রথ টানার শেষ হয় সন্ধ্যায় এবং রাতে ধর্মীয় গান, নৃত্য, ধ্যান শেষে আতশবাজি দিয়ে তাঁর কফিনটি প্রকৃতির মাঝে বিলিন করে দেন। এজন্য বাঁশ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করা হয় প্রায় ৬০০ আতস।

স্থানীয় রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সজ্ঞনায়েক উচেলাচা ২৪ বছর বয়সে ভিক্ষুত্ব (ওয়া) গ্রহণ করেন এবং ৬০ বছর তিনি ভিক্ষু হিসেবে জীবন-যাপন করেন। তিনি ছিলেন তালতলী জেয়ারামা শ্রী মঙ্গল বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ। এই বিহারে ৮৪ মন ওজনের দেশের (সর্ববৃহৎ) বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। ২০১০ সালের ২৮ মার্চ বরগুনার তালতলী থানার জেয়ারামা বৌদ্ধ বিহারের পুরোহিত সজ্ঞনায়েক উকেলাচার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এমন বর্ণিল আয়োজনে। এর আগে ১৯৯৯ সালে তালতলী বৌদ্ধ বিহারের সজ্ঞনায়েক উতারা মাহাথের পরলোক গমন করলে এমন উৎসবের মধ্য দিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

৪৬. সন্ন্যাস ব্রত

চড়কের অন্যতম কৃত্য হলো সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ। গ্রামের সাহসী পুরুষদের নিয়ে এই সন্ন্যাস দল গঠন করা হয়। এদের নেতৃত্ব দেন বয়স্করা। দলের কাণ্ডারি হিসেবে থাকেন মূল সন্ন্যাসী। আর তরুণ ও বালকদের নিয়ে একটি শিক্ষানবীশ দল তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

নবীনেরা ৩ দিন থেকে ৭ দিন আগে এবং প্রবীণেরা ১৫ দিন আগ থেকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে। মূল সন্ন্যাসী সকলকে মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে দীক্ষিত করেন। এই সময় কোনো সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করা হয় না। এই মন্ত্র বাংলা, একে বালার শ্লোক বলা হয়। সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে দিনাতি পাত করতে হয়। তারা মাছ মাংস খায় না। দিনের বেলা আহার গ্রহণ তাদের বর্জনীয়। সন্ধ্যার পর শিবের আরাধনা করে এবং ভোর বেলা খাবার গ্রহণ করে। এই সময় আতপ চাউল আর নীরামিষান্ন গ্রহণ করার রীতি। তিন দিন আগ থেকে বাড়ি বাড়ি এক একজন সন্ন্যাসী মাগুন করে। তার থাতে থাকে একটি লাঠি ও মাটির হাঁড়ি।

এই লাঠি কয়েকটি বেত এক সঙ্গে মুড়িয়ে তৈরি করা হয়। মাগুনের সময় সন্ন্যাসী গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেন। এ সময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। এমনকি কোনো গ্রাম বা পুজোর স্থান থেকে এসেছে সেটাও বলে না। গ্রামের মাগুনের চাল-সবজি দিয়ে অন্য সন্ন্যাসীদের খাওয়া খরচ চলে। সন্ন্যাসীরা তাদের অন্ন গ্রহণকে 'সেবাং' গ্রহণ নামে অভিহিত করে।

৪৭. পাট স্নান

চড়কের যে দেব প্রতিকৃতি থাকে তাকে পাট বলা হয়। এটি ৪ থেকে ৫ হাত লম্বা এক খণ্ডকাঠ দিয়ে তৈরি। আকারে নৌকাকৃতি। মাথা সুচালো করে নৌকার মাথার আদল তৈরি করা হয়। মধ্যে শিব-পার্বতী, শিবলিঙ্গের মূর্তি থাকে। সম্পূর্ণ পাটটি একটি লাল কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। দুই মাথায় ফুলের মালা-তেল-সিঁদুর-চন্দন লাগানো হয়। পুজো শেষে পাট গ্রামের বারোয়ারি মন্দিরে তুলে রাখা হয়। চড়কের সাত দিন আগে এটি বিশেষ আচার পালন করে নামিয়ে আনা হয়। এই আচারের একটি অন্যতম দিক হলো পাট স্নান। মূল সন্ন্যাসী মাথায় করে এই পাট মন্দির থেকে নামায়। এর পর এটি স্নানের উদ্দেশ্যে নদী বা পুকুরে নেওয়া হয়। পাট স্নান সাধারণত মধ্য বা ভোর রাতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পাট স্নানের অন্যতম দিক হলো সঙ নৃত্য।

মূল সন্ন্যাসী যখন পাট নিয়ে নদী-পুকুরের দিকে যেতে থাকে তখন তাকে বিভিন্ন অপ্রাকৃত শক্তি বাধা দেয়। অর্থাৎ অন্যেরা মুখোশ পরে ভূত-প্রেত-দেও-দৈত্য-পশু-পাখি সেজে পাট স্নানে বাধা দেয়। এ সময় মূল সন্ন্যাসীসহ বালা তাদের বিভিন্নভাবে মন্ত্রপূত করে বাধা দূর করে। এই অতিপ্রাকৃত শক্তিসহ পশু-পাখিদের বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট করা হয়। আবার যে সকল প্রতীকধর্মী শক্তি বশে আসে না তাদের বালা এবং সন্ন্যাসী মিলে বিভিন্ন যাদু-টোনা প্রয়োগ করে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। একই সঙ্গে চলে ঢাক-কাঁসির বাদ্য বাজনা ও উলুধ্বনি। এর পর স্নান শেষে নির্মাণ করা মণ্ডপে পাট নিয়ে আসা হয়।

৪৮. পাট নাচানি

৭ দিন আগ থেকে গ্রামে গ্রামে পাট নাচানি অনুষ্ঠান হয়। সন্ন্যাসীরা মাথায় পাট নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে। বাদ্যের তালে তালে নেচে নেচে তারা বাড়ি বাড়ি পাট নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

যে বাড়িতে পাট নিয়ে যাওয়া হয় সেই বাড়ির গৃহিনী একটি পরিষ্কার পিঁড়ি অথবা জলচৌকি পেতে দেন। তার উপর পাট নামানো হয়। এর পর পাটকে তেল-সিঁদুর-মালা-চন্দন দিয়ে বরণ করা হয়। এই সময় বালা গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় বালা গান পরিবেশন করেন।

সন্নাসীদের ডাব, কাঁচা আম, খেজুর, শসা, গোল, আলু, চাল, কলা উপঢৌকন দেওয়া হয়। গৃহস্থ শীষসহ কাঁচা আম এবং খেজুর দেয়। এগুলো বালা মন্ত্র এবং কল্যাণকামী গানের মাধ্যমে গৃহস্থকে প্রদান করে। গৃহস্থ সেগুলো নিজের গোলা-ঘর এবং গোহালে ঝুলিয়ে রাখে। বিশ্বাস এর মধ্য দিয়ে গৃহস্থের কল্যাণ হবে। যারা অল্প বয়সী সন্ন্যাসী থাকে গৃহস্থ তাদের দিয়ে ডাব পাড়িয়ে নেয়। বিশ্বাস স্থাপন করা হয় যে সন্ন্যাসীরা নারকেল গাছে উঠলে তাতে ফল ভালো হবে।

৪৯. উড়োভোগ

চড়ক বা নীল পূজার উদ্দেশ্যে যে ভোগ দেওয়া হয় তা অভিনব। একজন সন্ন্যাসী স্নান সেরে ভোগ তৈরি করে। ভোগ হিসেবে থাকে শোল এবং শিং মাছ পোড়া, আতপ চাউলের ভাত, কাঁঠাল, মিষ্টান্ন, ডাব ইত্যাদি। একটি ডালার উপর ভোগগুলো সাজিয়ে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর একজন সন্ন্যাসীর মাথায় তুলে ঢাক-কাঁসি বাজাতে বাজাতে দৌঁড়ায়। যার মাথায় ভোগ থাকে সে সামনে এবং তার পিছে পিছে অন্যরা দৌড়ায়। এই ভোগ কোথায় নিবেদন করা হবে তা গোপন রাখা হয়। কেবল মূল সন্ন্যাসী এবং ভোগ বহনকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্যরা এ বিষয়ে কিছু জানতে পারে না। যাওয়ার সময় সন্ন্যাসীরা, "বলে শিবল মহাদেব/জয় শিব" ধ্বনি তোলে। যেখানে ভোগ নিবেদন করা হয় সেখানে আগ থেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। সাধারণত কোনো শ্মশান, গ্রাম দেবতার থান বা শিব মন্দিরে এই ভোগ নিবেদন করা হয়। নিবেদনের স্থানে চারটি কঞ্চির তির কাঠি, মাথায় তাল পাতা, লাল সুতা, ঘট, আমের পল্লব, ডাব ইত্যাদি দেওয়া হয়। এর পর মূল সন্ন্যাসী পূজা শুরু করে।

৫০. কাঁটা সন্ন্যাসী

সংক্রান্তির আগের দিন সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন শারীরিক কসরত করতে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো কাঁটা সন্ন্যাসী। মাটির উপর খেজুর-বেল-শিয়ালকুল ইত্যাদি গাছের কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া হয়। এর পর এই কাঁটার উপর বয়স্ক সন্ন্যাসীরা গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। তারা এতোই অভিনব এবং সূক্ষ্ম কৌশলে কাঁটার উপর দিয়ে যায় যে তাদের গায়ে কাঁটা ফোঁটে না। গায়ে কাঁটা না ফোঁটার কায়দাই হলো এই খেলার বৈশিষ্ট্য। এই ক্রীড়ার মাধ্যমে সন্ন্যাসীরা বিভিন্নভাবে তাদের শরীরকে কষ্ট দেয় এবং নিজেদের ভক্তি প্রকাশ করে। প্রতি বছর কিছু নবীন সন্ন্যাসীকে কাঁটা সন্ন্যাসীতে দক্ষ হয়ে উঠতে তালিম দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

৫১. আগুন সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসীদের শারীরিক কসরতের আর একটি দিক হলো অগুন সন্ন্যাসী। সংক্রান্তির দিন আগের রাত্রে সন্ন্যাসীরা এই অনুষ্ঠানটি পালন করে। মাটিতে কয়লার জলন্ত আগুন বিছিয়ে দেওয়া হয়। এর পর সন্ন্যাসীরা শিবের প্রতি তাদের ভক্তি নিবেদনের উদ্দেশ্যে এই আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। আগুনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা উচ্চৈস্বরে 'শিবল মাহাদেব, জয় শিব' বলে ধ্বনি দেয়। তবে সবাই এভাবে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে না। কেবল যাদের দক্ষতা আছে তারাই আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। সাধারণত বয়স্ক সন্ন্যাসীরা আগুন সন্ন্যাসী হয়। এভাবে জলন্ত আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে সন্ন্যাসীরা তাদের ভক্তির প্রমাণ দেয়।

৫২. দশাবতার নৃত্য

সংক্রান্তির আগের দিন সন্ধ্যা বেলা পুজো মণ্ডপকে ঘিরে বালা গানের সঙ্গে নানা ধরনের নাচ করা হয়। এই নাচেন মধ্যে একটি অন্যতম নাচ হলো দশাবতার নাচ। মূল সন্ন্যাসী বা অন্য একজন গায়ক সন্ন্যাসী গান করে আর অন্যেরা সমবেতভাবে গানের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নাচতে থাকে। গানের কথা হিসেবে দশজন অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। কোনো সময় কোনো কোনো অবতার পৃথিবী এসেছেন তাদের রূপ কেমন ছিল, লীলা কেমন ছিল এই সকল কথাই গানের মধ্যে থাকে। আর সন্ন্যাসীরা সমবেতভাবে নাচের মধ্য দিয়ে সেই লীলাকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করে। দশাবতার নৃত্যের মূল কথাই হলো দশ অবতারের মহিমা বর্ণনা করা।

৫৩. চাষা নৃত্য

সংক্রান্তির আগের দিন চাষা নৃত্য পরিবেশিত হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন চাষি, দুজন গরু হয়ে চাষ দিয়ে ফসল বোনে। আর অন্যরা সেই ফসল ক্ষেতে বিভিন্ন উপদ্রব হয়ে হাজির হয়। কেউ ইঁদুর, কেউ পাখি আবার কেউ-বা গরু, ছাগল ইত্যাদি। মূলত শিবকে চাষিদের দেবতা জ্ঞান করে তার নিকট ফসল রক্ষার আর্তি জানানো হয়। একজন চাষার ফসলের উপর যে সকল উপদ্রব থাকে সেই সকল উপদ্রব থেকে মুক্তির জন্য শিবের নিকেট আহ্বান জানানো হয়।

এই নৃত্যের সঙ্গে খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার অর্তিও থাকে। সাধারণত একজন কৃষকের ফসল বোনা থেকে মাড়াই করে গোলায় তোলা পর্যন্ত যে সকল বিপদ-আপদ থাকে সেগুলো থেকে উত্তরণের আর্তি হিসেবে এই নৃত্যের বিষয় প্রকরণ উপস্থাপিত হয়।

৫৪. মুখা নৃত্য

সংক্রান্তির দিন মুখা নৃত্য বা মুখোশ নৃত্য নামে এক ধরনের নৃত্য করা হয়। মুখোশ পরে সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকে একজন কালী এবং একজন শিব সেজে নাচে। এই সকয়

www.pathagar.com

ঢাকের বাজনা চলে আর তারা উদ্দ-নৃত্য করে। বিশ্বাস স্থাপন করা হয় যে এই সময় মুখোশধারী দুজনের উপর কালী এবং শিব ভর করে। মুখা নুত্যের সময় মুখোশধারীদের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায় এবং তারা উন্মাদের মতো নৃত্য করতে থাকে। এক সময় দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেকেই অতিভক্তিতে পাগল প্রায় হয়ে যায়। এমনকি উপস্থিত ভক্তেরা তাদের ধরে বিভিন্ন মানত করতে শুরু করে। এ সময় অনেকেই তাদেরকে শিব-পর্বতী জ্ঞানে পূজা করে। মুখা নৃত্যের সময় বালা এবং অন্য শিল্পীরা শিব-পার্বতীকে কেন্দ্র করে অনেক মাহাত্ম্যসূচক গান গায়। এর সঙ্গে সমানে চলে ঢাক-কাঁসির বাদ্য বাদন।

৫৫. মশাল নৃত্য

সংক্রান্তির দিন রাত্রে মশাল নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বিকাল বেলা খেজুর ভাঙার পর এবং চড়ক ঘুরাবার পর মশাল নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। সন্ন্যাসীসহ গ্রামের নারী-পুরুষ মিলে মশাল হাতে এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। এ সময় অনেকের হাতে থাকে কেরোসিনের বোতল। সেই বোতল থেকে মাঝে মাঝে মশালে ফুৎকার দিয়ে তেল দেওয়া হয়। কারো কারো হাতে থাকে রাম দা। কয়েকজন মিলে একাধীক রাম দায়ের পিঠের উপর মরার মতো এক একজনকে শুইয়ে নৃত্য করে। মশাল নৃত্যের সঙ্গে সমান তালে ঢাক, কাঁসি, জয়ঢাক বাজতে থাকে।

৫৬. খেজুর ভাঙা

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের চড়কের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো খেজুর ভাঙা অনুষ্ঠান। সংক্রান্তির দিন এবং তার আগের দিন গাছে উঠে সন্ন্যাসীরা খেজুর ভাঙে। কোথাও কোথাওকেবল সংক্রান্তির দিন খেজুর ভাঙা হয়। গাছে ওঠার আগে সন্ন্যাসীরা গাছকে পূজা করে। ধূপ-ধুনা জালিয়ে আরতি করে। গাছের গোড়ায় তেল-সিঁদুর-জল দেয়। এই সময় বালা ঢাকের তালে তালে বালা গান পরিবেশন করে। সন্ন্যাসীরা এই গানের তালে তালে বিশেষ কায়দায় নেচে নেচে ধুনাতে ধূপ দেয়। অন্য সন্ন্যাসীরা চারিদিকে গাছকে ঘিরে বসে থাকে। পালা করে দুজন, চারজন করে নৃত্য করে। এই সময় মূল সন্ন্যাসী গাছের নিচে মুখ বন্ধ করে বসে থাকেন। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। পূজা শেষে সন্ন্যাসী যখন তার মুখের গামছা খুলে দেয় তখন অন্য সন্ন্যাসীরা দ্রুত গাছে উঠে খেঁজুরের ছড়া থেকে খেজুর ছিড়ে নিচেয় ফেলতে থাকে। একই সঙ্গে চলে ঢাকের বাজনা আর গাছের উপর সন্ন্যাসীদের মাতন। তখন উপস্থিত ভক্ত-দর্শনার্থীরা সেই খেজুর খায়। তাদের বিশ্বাস এই খেজুর খেলে তাদের মঙ্গল হবে।

৫৭. চড়ক ঘূর্ণি

সংক্রান্তির দিক বিকাল বেলা চড়ক ঘূর্ণি অনুষ্ঠান হয়। এক বা একাধিক সন্ন্যাসী চড়কে ঘোরে। যারা বা যে চড়কে ঘোরে তাকে বা তাদেরকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরানো

www.pathagar.com

হয়। বস্ত্র হিসেবে থাকে এক খণ্ড নতুন সাদা কাপড় বা ঘুতি। এটি কাছা দিয়ে তাকে লেংটির মতো করে পরানো হয়। কখনো কখনো মালকোচা দিয়ে পরতেও দেখা যায়। এর পর তাকে মূল সন্ন্যাসী মন্ত্রপূত করেন। তার পিঠের নিচের অংশের মেরুদণ্ডে একটি বড় লোহার আকড়ি বা হুক গেথে দেওয়া হয়। এর পর একটি গেড়ে রাখা বাঁশের উপর আর একটি আড়াআড়ি বাঁশ দেওয়া হয়। এই বাঁশের এক মাথায় ঘূর্ণি দেওয়া লোকটি এবং অন্য মাথায় একটি দড়ি বেধে ঘোরানো হয়। ঘূর্ণি দেওয়া লোকটির হাতে থাকে বিভিন্ন প্রকার ফল। সে ঘুরতে ঘুরতে তার হাতে এবং বুকে বেধে দেওয়া ফল ছুড়তে থাকে। ছুড়ে দেওয়া ফল উপস্থিত দর্শক-ভক্তগণ কুড়িয়ে নেয়। এই ফল খাওয়ার কারণ হিসেবেও তাদের মধ্যে কামনা পূরণের ইচ্ছা কাজ করে। ঢাকের বাজনা যতো দ্রুত বাজে চড়কে বাঁশও ততো ক্ষীপ্র গতিতে ঘুরতে থাকে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ ঘোরানোর পর বাঁশের মাথা থেকে লোকটিকে নামানো হয়।

৫৮. মেয়েদের ব্রত অনুষ্ঠান

হিন্দু মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের ব্রত করে যেমন–বারইল ব্রত, তারার ব্রত, সন্ধ্যমনির ব্রত, গুন ফাগুনের ব্রত, পুণ্যপুকুরের ব্রত, যুম বুড়ির ব্রত ইত্যাদি পালন করে। এরা শিবের মতো স্বামী, কার্তিক গণেশের মতো পুত্র, লক্ষী-সরস্বতীর মতো কন্যা এবং ধন জন পাওয়ার লক্ষ্যে এ ব্রত সমূহ পালন করে। মেয়েরা সাধারণত ঋতুবতী হবার আগে এ ধরনের ব্রত করে থাকে।

৫৯. বারইলের ব্রত

মাঘ মাসের সকালে সূর্য উদয় হবার আগে এক গোছা দূর্বা এবং ৮/৯ প্রকার ফুল নিয়ে খাল অথবা নদীর ঘাটে গিয়ে ফুল ও দূর্বার গোছা জলে ঘোরাতে ঘোরাতে উচ্চারণ করে–

যে জল ছোঁয়নায় কাকে আর বগে
সেই জল ছুঁইলাম মোরা সূর্য ওডার আগে
দূর্বা দূর্বা সরস্বতী লড়ে আর চড়ে
সাত সতীনের পায় গিয়া পড়ে
সাত সতীনের সাতগাছনা ঝুটা
তা দিয়া বানলাম মোরা
গৌরার মাথার জুটা

সূর্য ওঠার গান

উঠো সূর্য উদয় দিয়া
বাওনের ঘরের কোনা ছুঁইয়া
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান
পৈতা যোগায় বেয়ান বেয়ান।
ওঠো সূর্য উদয় দিয়া

www.pathagar.com

মালির ঘরের কোনা ছুঁইয়া
মালির মাইয়া বড় সেয়ান
ফুল দূর্বা যোগায় বেয়ান বেয়ান।
ওঠো সূর্য উদয় দিয়া
তেলীর মাইয়ার উঠান বাইয়া
তেলীর মাইয়া বড় সেয়ান
তেল যোগায় বেয়ান বেয়ান।
ওঠো সূর্য উদয় দিয়া
ধোপা বাড়ির কোনা ছুঁইয়া
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান
কাপড় কাচে বেয়ান বেয়ান।
পদ্ম ফুল গাছে কে?
ডাল নোয়াইয়া দে
সূর্য ঠাকুর চাইছেন ফুল
সাজি ভইরা দে।
যবা ফুল গাছে কে?
ডাল নোয়াইয়া দে
সূর্য ঠাকুর চাইছেন ফুল
সাজি ভইরা দে।

পুকুরে দূর্বা ফেলে গান

বাবার পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাতে না পাইলাম কিছু মাছ
কাকার পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাতে না পাইলাম কিছু মাছ
দাদার পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাতে না পাইলাম কিছু মাছ
মামার পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাতে পাইলাম বোয়াল মাছ
পাইলাম পাইলাম নিবে কে?
নিলাম নিলাম কুটবো কে?
ওরা আইছে নেওনি
সাজি হাতে কইরা
অগো দিলাম ধাক্কা ধোক্কা মাইরা
ওরা আইছে কুটুনি বটি হাতে লইয়া

www.pathagar.com

অগো দেলাম ধাক্কা ধোক্কা মাইরা
কোটলাম কোটলাম রাধবে কে?
ওরা আইছে রান্দুনি
করই হাতে লইয়া
ওদের দেলাম ধাক্কা ধোক্কা মাইরা
রানলাম রানলাম খাইবে কে?
ওরা আইছে খাওনি থালা আতে কইরা
ওগো দেলাম ধাক্কা ধোক্কা মাইরা।
খাইলাম খাইলাম শুইবো কে?
ওরা আইছে শোওনি বিছনা হাতে কইরা
ওগো দেলাম ধাক্কা ধোক্কা মাইরা
জলে কাঁঠালের মুচি ভাসিয়ে দিয়ে
আম কাডাইল্লা পিড়ি খানি
গঙ্গা জলে ভাসে
আমার ভাই (ভাইর নাম) সেই পিঁড়িতে বসে
(এভাবে যে কজন ভাই থাকে তাদের নাম
বলে বলে গান শেষ করে)

৬০. তারার ব্রত

মাঘ মাসের সন্ধ্যায় আকাশে তারা ওঠার পর এই ব্রত ও ঋতুবতী হবার আগে মেয়েরা ভালো স্বামী ও সংসার পাবার আশায় শিব ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে এই ব্রত করে। এ সময় চালের গুঁড়া দিয়ে মাটিতে চন্দ্র সূর্য ও ১৬টি তারার ছবি এঁকে এই ব্রত করে। এই ব্রতের কথা হলো–

১৬, ১৬ তারা
তোমারে করি সাক্ষী
(সাত্রিশ)
ঘৃত দিয়া করি মোরা
পঞ্চ গ্রাসি
শিব জিজ্ঞাসা করে
গৌরি তুমি কিসের ব্রত কর?
আমি তারার ব্রত করি
তারার ব্রত করে কি ফল পাও?
শিবং স্বামী পাই
কার্তিক গণেশ পুত্র পাই
জয় বিজয়া দাসী পাই

www.pathagar.com

হাত ভরা শাঁখা পাই
কপাল ভরা সিঁদুর পাই
মোড়া ভরা ধান পাই
মটকি ভরা চাউল পাই
জিরা তুষ ফেকে
চন্দন কাষ্টে রান্দে
১৬ ব্রতির হাতে
১৬ সরা দিয়া
আমরা যাই উলুধ্বনি দিয়া ।

৬১. সন্ধ্যামণির ব্রত

যারা এ ব্রত করে তারা সূর্য ডোবার পর রাতে আকাশে তারা ওঠার আগ পর্যন্ত কোনো কথা না বলে এই ব্রত করে থাকে । মাটিতে আলপনা একে এই ব্রত করে । ব্রতের সময় অন্যান্য দ্রব্যের সাথে ব্রাহ্মণকে সোয়া সের লবণ ও সোয়াসের গুড় দিতে হয় ।ব্রতের কথা–

সন্ধ্যামণি মাগেন বর
নিশা তারা পশাবর
নিশা তারা দিল পতি
ভাই বোন পুত্রবতী
খ্যান মাগিয়া আসর পাইলাম
কুল মাগিয়া সোহাগ পাইলাম ।

লম্বা লম্বা মালঞ্চ
থুলো থুলো ঘাস
না করি রাত্র বাস
শ্বশুর শাশুড়ি জিজ্ঞাস করে
এই ব্রত করিয়া
কি বর পাও
লবণ গুড় উচুগ্যা দিয়া
আতে আতে স্বর্গে যাই ।

৬২. গুণ ফাগুনের ব্রত

ফাল্গুন মাসের সকালে মাটিতে আলপনা এঁকে ব্রত কথা বলতে থাকে–

পুণ্য পুষ্কনির ব্রত –
গুন গুন ফাগুন
এক গুনে ন গুন

www.pathagar.com

গুন এলো দেশে
রূপ অইবে শেষে
গুনে রান্দে গুনে খায়
গুন লইয়া স্বর্গে যা

বৈশাখ মাসে এ ব্রত করে। পর পর চার বছর এ ব্রত করতে হয়। উঠানে একটি ছোট পুকুর কেটে সে পুকুরের মাঝখানে একটা বেলের কাঁটা দিতে হয়। সেখানে জল ঢেলে ফুল তুলসি নিয়ে এই ব্রত করে। তার আগে গরুর ৪ পা জল দিয়ে ধুয়ে ফুল তুলসি দিতে হয়। সব ব্রতের পরে শিবকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়—

পুন্ন পুকুর পুষ্প মালা
হরণ চরণ দুপুর বেলা
হরণ চরণে কি কি আছে
আনে আছে বানে আছে
সাত জনম আয়স্তি আছে
হবে পুত্র মরবে না
ভূমিতে জল পরবে না
থাকতে হবে খাট পাট
মরলে হবে গঙ্গার ঘাট
সর্ব মঙ্গলা মঙ্গিলে
শিবে সাধিকে মাঘি গৌরী
নারায়ণী নমস্তুতে।

৬৩. নইল্যা

নইল্যার আর এক নাম কুলই পূজা। মূলত বাস্তুদেবীর আরাধনা। কোনো কোনো এলাকায় নইল্যাকে মাগনের ছড়া গান বলা হয়। বহু যুগ থেকে মানুষ ধন সম্পদের জন্য আরাধনা করে আসছে। এ পূজা এ অঞ্চলে চালু হয় মূলত মানুষের বসতি স্থাপনের সাথে। এ এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপনকারিরাই সম্পদের জন্য আরাধনা শুরু করেছিল। নইল্লা হলো বাস্তপূজার জন্য শোভাযাত্রার মতো। ১৫ দিন আগে এ শোভা যাত্রার সূচনা হয়। যেহেতু এটি মাটি পূজা সেহেতু এ পূজার গ্রামেই প্রচলন বেশি।

পৌষ সংক্রান্তিতে এলাকায় বাস্তুপূজার আয়োজন করা হয়। এর আগে শুরু হয় নইল্যা ডাকা। সাধারণত ১৫ থেকে ৩০ জনের দল একত্রিত হয়ে নইল্যা ডাকা শুরু করে। পূর্বনির্ধারিত বাড়িতে থেকে সন্ধ্যায় নইল্লা ডাকা শুরু হয়।

ঠাঁই কুলাই বর
আইলামরে স্মরণে
লক্ষ্মী দেবীর বরণে
আইচেন দেবী দেবেন বর

www.pathagar.com

চাউল কড়ি বিস্তর
চাউল না দেলে দেবেন কড়ি
শিক দুয়ারে সোনার লড়ি
সোনার লড়ি রুপার মালা
মাঝ খাটালে টাকার ছালা
একটি টাকা পাইলে
বাইন্না বাড়ি যাইরে
বাইন্না বাড়ি ধূপের মোচা
টাকা ভাঙায় নুনো পয়সায়
নুনো পয়সায় নুনো পোন
একটি টাকা কুলায় ধন
আগাই গেছে বাগাই পুর।
ঘুইর‍্যা আইচে চম্পা পুর
চম্পা নারে মর্তবান
হাইস্যা গিরি করেন দান
ঐ শষ্যা নালের চাষ কলই
মানিক নালের বেড়া
লক্ষ্মীর আতে দেন ভিক
আইছি ভদ্রপাড়া
ভদ্রপাড়া যাইতেরে
গাঙে পড়লো থর ॥

ও সুবল সুবলরে
হুক্কার কানি কাররে
হুক্কার কানি
ছাইচের কোনে
লক্ষ্মী বইছে চাইরো কোনে
আইছেন লক্ষ্মী দেবেন বর
ধানে চাউলে ভরুক ঘর
ঐ শষ্যা নালের চাষ কলই
মানিক নালের বেড়া ॥

ও মাইয়া খাজুলি
কুলই পিঠা কি করলি?
কুলই পিঠা কুলায় খাইছে

www.pathagar.com

খাজুলিরে বাঘে খাইছে
খায় াার করমরায়
দুই চউক ফরফরায়
দুই চউখ দুই মূলা
ভিখ আনেন ৩২ কুলা
আনেন ভিখ লন বর
ধানে চাউলে ভরুক ঘর
ঐ শষ্যা নালের চাষ কলই
মানিক নালের বেড়া ॥

ফডাইস্যারে ফডাইস্যা
কালা বাইগুন ধলাইস্যা
ধলা বাইগুন স্বর্ণপাতে
ভিখ আনেন ৩২ হাতে
আনেন ভিখ লন বর
চাউল কড়ি বিস্তর
চাল না দেলে দেবেন বাড়ি
শিক দুয়ারে সোনার লরী
সোনার লড়ি রুপার মালা
মাঝ খাটালে টাকার ছালা
একটি টাকা পাইরে
বাইন্যা বাড়ি যাইরে
বাইন্যা বাড়ি ধূপের মোচা
টাকা ভাঙায় ননো পয়সা
ননো পয়সায় ননো পোন
কুলায় দেবেন কত ধন
হড়ি হড়ি সোনা বান্ধাইন্যা ঘড়ি
সোনা ভালো না রুপা ভাল
এই বাড়িখান দেখায় ভাল
এই বাড়ি খান ধানে চাউলে
লক্ষ্মী বইছে চাইরো কোনে
আইছেন লক্ষ্মী দিবেন বর
চাউল করি বিস্তর
চাউল না দিয়া দেবেন কড়ি
তাতে হবে সোনার লড়ি

www.pathagar.com

সোনার লড়ি রুপার বাটা
মাঝ খাটালে টাকার ছালা
একটি টাকা পাইলে
বাইন্না বাড়ি যাইরে
বাইন্না বাড়ি ধূপের মোচা
টাকা ভাঙায় নুনো পয়সা
নুনো পয়সায় নুনো পোন
কুলায় দেবেন কয় পোন
বুইঝা মিল্লা দেবেন ধন ॥

ঐ সরিষা নালের চাষ কলই
মানিক নারের বেড়া ঐ
আইলাম রে ভাই স্মরণে
লক্ষ্মী দেবীর চরণে
লক্ষ্মীদেবী দিল বর
ধান কড়ি বাইর কর
ধান না দিয়া দিলে কড়ি
তারে করমু লড়িধরি
লড়িধরি সামরে
সোনার মুকুট বান্ধরে
সোনা না রুপার ভাল
এই ঘরখান দেখতে ভাল
ছিক্কাই লড়ে ছিক্কাই লড়ে
ঝুমুর ঝুমুর কড়ি পড়ে
ওগলা কড়ি পাইলামরে
বাইন্যা বাড়ি গেলামরে।
বাইন্যা বাড়ি বাঘের ছাও
হুকুর হুক্কুর করে র‍্যাও
বড় বড় ঘরণী।
মশা বড় চাটনী
কেন গো মশা এত মন
আমাদের দিবা কত ধন?
ধান দেন তো বাড়ি যাই
শীতে বড় কষ্ট পাই
আমিতো মাগিয়া খাই

www.pathagar.com

লক্ষ্মীর চরণ পাই
লক্ষ্মী গেল বদরপুর।
কইন্যা আনলাম চাম্পা ফুল
মধ্যে একটা সমুদ্দুর।
আইতে যাইতে অনেকদূর
আইলাম রে ভাই উইর‍্যা ॥

আতির কান্দে চইর‍্যা
আতির কান্দ থুল থুল করে
লাফা বাইগুন গাছে ধরে
লাফা বাইগুনের চিরৎপাত
রাখালে খায় বাসি ভাত
করকরা ভাত খাইয়ারে

বাস্তুপূজার শুরু হয় পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন। এদিনের অনুষ্ঠানের নাম হয় অধিবাস। অধিবাসের দিন খোলা জায়গায় অস্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূজার শুরু হয়। কাফুলা গাছের ডাল কেটে এবং খোলা বা পৈঠা দিয়ে মন্দির উচুগ্যা করা হয়। এদিন ও খোলা জাগানো ডাক হয়–

ঠাই কুলাই বর
থান বন্দন থান বন্দন
থানের সাড়ি আয়
সেই থানেতে ভর করিয়া
বাস্তুদেবী আয়

এ ধরনের বোল তুলে ৩০ থেকে ৩৫ জন লোক মন্দিরের চারদিকে ঘুরতে থাকে। ৭ বার ঘোরার পর বাস্তু দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তুপূজার মন্দিরে কোনো দেব দেবীর প্রতিমা বা ছবি থাকে না। থাকে ঘট, কুলা ও পূজার অন্যান্য উপকরণ। মন্দিরের সামনে বা পাশে থাকে একটা বড় কুমির, অন্য পাশে বাঘ যা মাটি দিয়ে তৈরি হয়।

পূজার দিন ঠাকুরের নির্দেশ মোতাবেক উপকরণাদি সাজানো হয়। উপকরণের মধ্যে থাকে ধুতি, গামছা, ঘট, মালা ইত্যাদি। ঠাকুরের মন্ত্র চলতে থাকা কালে পূজারীরা ৭ বাড়িতে নৈল্লা ডাকতে যায়। নতুন করে ৭বাড়িতে পরিভ্রমণ করে পাওয়া চাল দিয়ে পূজা করা হয়। শেষ পর্যায় পূজায় নিয়োজিত ঠাকুরের নির্দেশনা মোতাবেক পূজারিরা পূজা মণ্ডপের কাছে নির্মিত বুড়ির ঘরে আগুন লাগায়। এর পর ঠাকুর পূজারীদের আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদের পর পূজারীরা মাটি দিয়ে তৈরি কুমির দা দিয়ে কোপ দেয়। এখানে আবার নৈল্লা ডাকা হয়। তারপর সেখানে ঘুরতে ঘুরতে ১২ বাঘার নাম উচ্চারণ করা হয়। কুলাই পূজাকে বাঘাই পূজাও বলে। বাস্তুপূজায় বর্তমানে কোথাও কোথাও বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে মহাধুমধামে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

www.pathagar.com

৬৪. রজদর্শন বা ঋতুবতী অনুষ্ঠান

শৈশব কাটিয়ে যখন মেয়ের কৈশোরে পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করার আগে তার শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে যোনিপথে রক্তস্রাব অন্যতম। যেদিন প্রথম একটি মেয়ের শরীর থেকে রক্ত বের হয় সেদিন থেকেই তার জীবনে পূর্ণাঙ্গ নারীর ছায়া পড়ে। এসময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে যদি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় এবং সে স্বামীর বাড়িতে থাকে তাহলে স্বামীর বাড়ির লোকজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাপের বাড়িতে থাকলে সে বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানকে রজদর্শন অনুষ্ঠান বলা হয়।

৩ ভাগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেদিন মেয়েটির শরীর থেকে প্রথম রক্ত ঝড়ে সেদিন,এর ৩ দিন পর এবং ১৬ দিনে। ১ম দিন মেয়েকে ঘর থেকে আলাদা করা হয়। ঠিক যেমন প্রথম সন্তান জন্ম নেয় সেভাবে। তিন দিনের দিন থাকে কামানী। একটা ছোট ডাব নারিকেল দিয়ে প্রতীকী সন্তান বানানো হয়। তাকে বলা হয় কোরা। ১ম দিন এই কোরা রাখা হয় একঠা নতুন মাটির ঘটের উপরে। মাঝখানে থাকে আম গাছের পাতা অর্থাৎ আমের সরাৎ।

মেয়ে যদি বাপের বাড়ি থাকে তাহলে শ্বশুরবাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি থাকলে বাপের বাড়ি নিমন্ত্রণ পাঠানো হয় অনুষ্ঠনের। ১৬ দিনে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তা বেশ মজার। সেদিন মেয়েরা মিলে মেয়েকে স্নান করায়, গিলা হলদি বাটা হয়। হয়লা গান হয়। আনন্দ ফুর্তি হয়। ১৬টি বিচি কলা এনে দূরে ছুড়ে মারা হয়। মেয়েকে ১৬টি কিল মারা হয়। তবে এই ১৬ দিনের মধ্যে মেয়ে স্বামীর সাথে দেখা করতে পারে না। ১৬ দিন পর আবার তাদের বিয়ে দেয়া হয়। চলে বিয়ের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন।

ঋতুবতীর গান

আমারে ছুঁইও নারে প্রাণোপতি এই বিধানে।
রাতি না দুপারের কালে জবা ফুল ফোটে ডালে,
ও মোরে ছুঁইও না প্রণোপতি।
শ্বশুরে শোনলে পরে তবেরে লজ্জায় ধরে
জালেরা জানলে পরে তবে কেন আনন্দ করে?
ও মোরে ছুঁইয়ো না প্রাণোপতি, এই বিধানে।
ভাশুরে শুনলে পরে তবে কেন লজ্জায় ধরে
জালেরা শুনলে পরে তারা কেন আনন্দ করে?
ও মোরে ছুঁইও না প্রাণোপতি এই বিধানে।
দেওরে শুনলে পরে তবে কেন আতুর বেড়ে
জালেরা জানলে পরে তে কেন আনন্দ করে?
ও মোরে ছুঁইও না প্রাণোপতি এই বিধানে।

স্নানের জন্য জল ভরার গান

যখন আমরা জল ভরিতে যাই

www.pathagar.com

অল্প জলে কলসি ভইরে
আমরা শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাই।
যখন আমরা জল ভইরে আসি
পাছে গোনে লইয়া গেল
ঐ যে মদন চাপরাশি। ঐ
যখন আমরা জল ভরিতে যাই
অল্প জলে কলসি ভইরে আসি
পাছে গোনে লইয়া জায়
মদন চাপরাসী। ঐ
যখন কৃষ্ণ অইতে মাতার চুল
ঝাইর‍্যা ঝুইর‍্যা বানতাম ঐগো খোঁপা
মজাইতাম গোকুল। ঐ

স্নানের গান
বন্ধুর মোনে এই বাসনা
আগে না জানি।
বন্ধু কি বাঁশি বাজাইল
ইচ্ছা হয় মুই প্রাণে মরি
ভুলি নাই তারে ॥

ও সে রাধা রানি কয়
এ রোগের ঔষধ আছে নি
আগে না জানি ॥

ও সে তোমরা সখি আই না দে
আমার মনো চোরা
যে জন্য হয় কলঙ্কিনী
আগে না জানি ॥

আমি গিয়েছিলাম একা
বন্ধুর সনে দেখা
ছিলাম আমি একাকিনী
আগে না জানি
বন্ধুর মনে এই বাসনা
আগে না জানি।

www.pathagar.com

৬৫. গৃহপ্রবেশ/ঘর হাচরানো/ঘর সঞ্চার

ঘর তৈরি হয়ে গেলে এবার গৃহপ্রবেশের পালা। মুসলিম সম্প্রদায় একে বলে ঘর হাচরানো, হিন্দু সম্প্রদায় বলে ঘর সঞ্চার। দুই সম্প্রদায়ের গৃহ প্রবেশে ভিন্ন ভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায় মৌলবি ডেকে মিলাদ পড়ায়। তারপর পায়েস খাওয়ায়, জিলাপি বিতরণ করে, কখনো কখনো ভাত মাংসের আয়োজন করে। হিন্দু সম্প্রদায় ঘর সঞ্চারের দিন পুরুত ঠাকুর ডেকে পুজোর আয়োজন করে। গৃহকর্ত্রী একটি ভরা কলস কাঁখে করে ঘরের চারপাশ সাত বার ঘুরে এস কলসটি ঘরে স্থাপন করে। তারপর পুরুত মন্ত্র পড়ে সংক্ষিপ্ত পুজো করে। শেষে উপস্থিত সবাইকে মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়।

৬৬. ঘরের চালে ধাইর বাঁধা

ঘরের উপর দিয়ে যাতে অশুভ কিছু না চলাচল করে তার জন্য ঘরের চালে ধাইর বাঁধা হয়। সাধারণত রাতের বেলা ঘরের উপর দিয়ে বাদুড় চলাচল করে। আর বাদুড় একই পথ দিয়ে চলাচল করে।

একে গেরস্ত অশুভ মনে করে। এই অশুভ শক্তি যাতে চলাচল না করে তাই ঘরের চালে গরু-মোষের মাথার কঙ্কাল স্থাপন করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতেও এই ধাইর বাঁধতে দেখা যায়।

৬৭. ইলিশ পুরাণ

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে জাল মেরামত ও ট্রলার-নৌকায় খোঁচ দিয়ে আলকাতরা ও সুতলি দিয়ে মেরামত দেয়। এরপর ১৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু হয় ইলিশ মৌসুম। জলের অনিশ্চিত জীবনে ভাসতে ভাসতে জেলেরা নদী-সমুদ্রের বিচিত্র খেয়ালের হদিস পায় না। হদিস না পেয়ে ভীত হয় আর তখন অপ্রাকৃত বিশ্বাসের কাছে মাথা নত করে। তখন তাদের বিশ্বাসের তালিকায় উঠে আসে জিনপরী, মেছোপেত্নী, বনবিবি, পিরবাবাদের অলৌকিক শক্তি। এই পথ ধরেই তাদের জীবনে এসেছেন মা-গঙ্গা, এসেছেন স্বার্থপর সর্পদেবী মনসা।

গাঙজননী ও সর্পদেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহ সম্পর্কিত গল্পগাথাগুলোতে আছে এ অঞ্চলের জেলে-বিশ্বাস ও জেলে-লোকাচারের ভিত্তিকথা। এছাড়াও প্রথাগত নানা লোকজ সংস্কারে আবদ্ধ জেলেজীবন। নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করার দিনক্ষণ পঞ্জিকা দেখে ঠিক করে তারা। নৌকা ছাড়ার সময় পাঁচপীর, বদরগাজীর ধ্বনি দেয়। আবার ইলিশ ধরা না পড়লে গঙ্গাদেবীর বা বিভিন্ন দরবেশ-পিরের নামে শিরনি দেয়, পিরের দরগায় মানত পূরণ করে।

নদীপাড়ের ঘাটগুলোতে দোয়া-দরুদ, মিলাদের আয়োজন করে। দিনের প্রথমে নৌকায় উঠেই তারা সোনা-রুপার জল দিয়ে নৌকা-ট্রলারের গলুই ধুয়ে দেয়। জেলেরা সর্বদা মা-গঙ্গার নাম স্মরণ করে।

www.pathagar.com

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলেরা ঘটা করে মা-গঙ্গার পুজো দেয়। এটা সর্বজনীন পূজা। ধর্ম নির্বিশেষে তারা এই পূজায় চাঁদা দেয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলেরা বামুন ঠাকুরকে দিয়ে পঞ্জিকার তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী পূজার দিনক্ষণ নির্ধারণ করেন। নির্ধারিত দিনেই সমুদ্র বা নদীর পাড়ে মা-গঙ্গার পূজার আয়োজন করা হয়। উত্তরমুখী করে মাটির একটি বেদি তৈরি করা হয়।

সেখানে বসানো হয় জলভর্তি মাটির একটি ঘট। তার ওপর থাকে ডাঁটাসুদ্ধ একটা ডাব নারকেল এবং আমপাতা। বেদির পেছনে পোঁতা হয় একটি কচি কলাগাছ। ঘটের সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয় নৈবেদ্য। গভীর শ্রদ্ধায় জ্বালানো হয় ধূপ-মোমবাতি। জেলেরা পূজায় অংশগ্রহণ করে। এই গঙ্গাপূজায় কখনো কখনো পাঁঠা বলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

এরপর আরেকটি শুভদিন দেখে জেলেরা জলে নৌকা ভাসায়। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে জেলেরা কখনও বাড়ি ফেরে, কখনও হারিয়ে যায় চিরতরে সমুদ্রের বিশালতায়। এইভাবে আষাঢ়ের ঝড়জলের দিনগুলো ফুরাতে থাকে। ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টিময় কালো রাত, উথাল-পাথাল সমুদ্রকে উপোস করে জেলেরা ইলিশ শিকার করে। মাছে মাছে ভরে ওঠে নৌকার খোল।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

১. কলা-কচু, মিডা আলু

এই অঞ্চলে দুধ-কলা খুবই লোকপ্রিয় খাবার। স্থানীয় বিভিন্ন জাতের কাঁঠালি কলা দুধের সাথে খাওয়া হয়। মদন মুরালি কলাও দুধের সাথে খায়। আইট্টা বা বিচি কলাও লোকজন খেয়ে থাকে। পিঠা বানাতে এই কলার ক্বাথ ব্যবহার করা হয়।

শবরি ও সাগর কলার চাষ হয়। তবে তা দুধের সাথে খায় না। লোকজন পাউরুটির সাথে খায়। আনাজি কলা যা কাঁচা কলা হিসেবে পরিচিত, তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কেউ পাকা আনাজি কলা খায় না।

এই অঞ্চলে মান-কচুর প্রচুর চাষ হয়। চিংড়ি মাছের সাথে মান-কচুর তরকারি বেশ উপাদেয়। আছে বাগতরকারি—এটি হলো ওল কচু। বাগতরকারিও চিংড়ি মাছের সাথে তরকারি হিসেবে খায়।

আর আছে মিডা আলু। নদীর চরে বেলে মাটিতে মিডা আলুর চাষ হয় প্রচুর। পুড়ে ও সেদ্ধ করে মিডা আলু খাওয়া হয়। লোকজন মরিচ মিশিয়ে ভর্তা করেও ভাতের সাথে খায়।

২. ফলফলাদি

এই অঞ্চলে যে সব ফলফলাদি হয় তার বেশি ভাগই তীব্র স্বাদের হয়, বেজায় টক নয় কষায়। আম আছে নানা জাতের। তবে বেশি ভাগ আমই টক। পাকলেও তেমন মিষ্টি নয়। দুধে আম নিলে ফেটে যায়। তাই বাণিজ্যকভাবে চাষ হয় না।

কাঁচা আম আমচুর ও আচার হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো বাড়িতে শখ করে কমলা গাছ লাগানো হয়। মিষ্টি স্বাদের হয় না। কমলার মতো দেখতে জামির হয় প্রচুর। বেজায় টক। তবে মাল্টা জাতীয় শরবতি লেবু হয়, কিছুটা পানসে স্বাদের, হালকা মিষ্টি।

কাউফল খানিকটা টক। বরই টক। কোথাও কোথাও মিষ্টি বরই হয়। স্থানীয় ভাষায় কুল বড়ই। লিচু হয়। স্বাদ টক।

আছে পেচি গাব, পাকলে মিষ্টি হয়। আছে গায়ে লোমঅলা বিলাতি গাব, খানিকটা গন্ধযুক্ত। কিন্তু ছেলেপুলেরা খায়। আছে কাঁটাওয়ালা গাছে বহই পাকলে টক মিষ্টি স্বাদের। সব চেয়ে বেশি হয় আমড়া। টক মিষ্টি স্বাদের। এমনি নানা জাতের স্থানীয় ফলফলাদি আছে এই অঞ্চলে।

www.pathagar.com

৩. মিডা

এ অঞ্চলের সব মিষ্টি দ্রব্যই মিডা নামে খ্যাত। সুন্দর অনেক কিছুই মিডা। সুন্দর কথা, মিডা কতা। এমনকি 'মিডা কতায় চিড়া ভেজে না' এমন প্রবচনও আছে। বরগুনা অঞ্চলে ৪ ধরনের মিডা বা গুড় উৎপন্ন হয়।

খাজরি মিডা

খেজুর গাছের রস থেকে তৈরি গুড়কে বলা হয় খাজরি মিডা। শীতের দিনে খেজুর গাছ কেটে রস সংগ্রহ করা হয়। সেই রস বড় পাতিল কিংবা বড় টিনের ডোঙ্গায় জাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। এ গুড় আবার ৩ ধরনের।

ঝোলা মিডা

ঘন কিন্তু একটু পাতলা, এ হলো ঝোলা মিডা।

রওয়া মিডা

ঘন এবং দানা পড়া গুড়কে রওয়া পড়া মিডা বলে।

বাডালি মিডা

পাটালি গুড় হলো বাডালি মিডা। শক্ত ও বিশেষ আকৃতির গুড় হলো বাডালি মিডা।

আউখের মিডা

আখ থেকে রস বের করে যে গুড় তৈরি করা হয় তা হলো আউখের মিডা। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ঘানির মতো গরু মোষের সাহায্যে আখ মাড়াই করে রস বের করা হয়। এই কারখানাকে বলা হয় 'গাছঘর'। এ মিডাও ৪ প্রকারের হয়ে থাকে।

ঝোলা মিডা

জ্বাল দেয়ার পর খানিকটা পাতলা অবস্থার গুড় হলো ঝোল মিডা।

রওয়া পড়া মিডা

ঘন ও দানা পড়া মিডা হলো রওয়া পড়া মিডা।

ভিড় মিডা

শক্ত বা কঠিন অবস্থার গুড় হলো ভিড় মিডা।

রওয়া পড়া মিডা

তালের রস জ্বাল দেয়ার পর দানা পড়ে যে মিঠা হয়, একে বলা হয় রওয়া পড়া মিডা।

www.pathagar.com

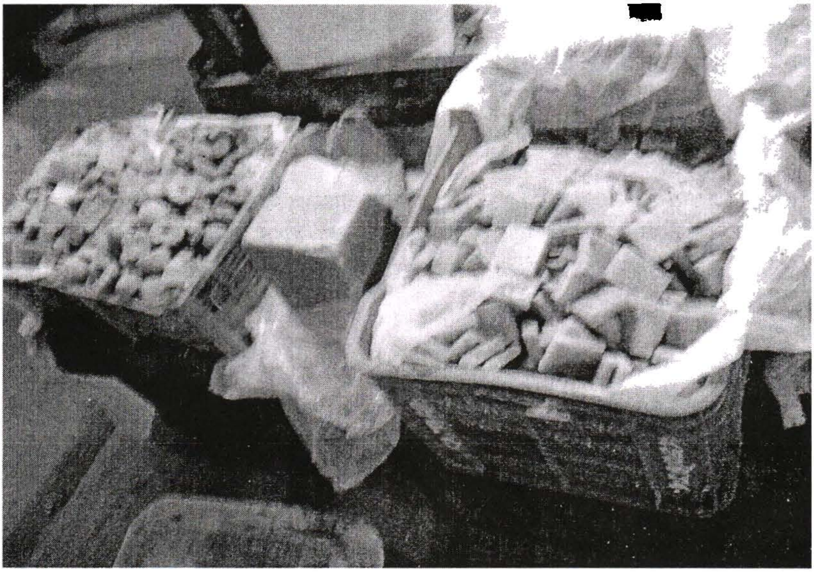

তাল, আখ ও খেজুরের গুড়

খেজুরের রওয়া মিডা

www.pathagar.com

তাল মিডা

তাল গাছের মোচা কেটে রস বের করে যে গুড় তৈরি করা হয় তাই হলো তাল মিডা। দুই ধরনের তাল মিডা সবার কাছে প্রিয়।

তালের বাডালি

জ্বাল দেয়া তালের রস শক্ত হলে তখন তালের বাডালি করা হয়। সাধারণত মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করে তালের বাডালি করা হয়। গাছিদের কথা আছে যে ১৬ ফোঁটা খেজুরের রস জ্বাল দিলে ১ ফোঁটা গুড় পাওয়া যায়। আর ৮ ফোঁটা তালের রস জ্বাল দিলে ১ ফোঁটা গুড় পাওয়া যায়।

গোলের মিডা

সুন্দরবন ও আশেপাশে প্রচুর গোল গাছ হয়। গোল গাছের মোচা তাল গাছের মোচার মতো কেটে রস বের করে জ্বাল দিয়ে যে গুড় তৈরি করা হয় স্থানীয়ভাবে তাকে বলে গোলের মিডা। এই গুড় খানিকটা নোনা স্বাদের।

এই অঞ্চলে গুড় দিয়ে খই, মুড়ি, চিড়া, দুধ, ভাত খাওয়া হয়। দই-ভাত খুবই প্রিয় খাবার। অতিথি আপ্যায়নে নানা রকম গুড় ব্যবহার করা হয়। গুড় দিয়ে তৈরি শিন্নি বা পায়েস খুবই প্রিয় খাবার। বিশেষ করে শীতকালে খেজুর রসের শিন্নি খাবার উৎসব লেগে যায়। শিন্নির উপকরণ হলো রস, নারকেল কোড়া কিংবা গরুর দুধ।

৪. পিডা/পিঠা

পিঠাকে এ অঞ্চলের উপভাষায় বলা হয় পিডা। পিডা সবার প্রিয় খাবার। বিশেষ করে অতিথি আপ্যায়নের জন্য প্রায় সকল পরিবারে পিঠা বানানো হয়। সারা বছরই কোনো না কোনো উপলক্ষে পিঠা তৈরি করা হয়।

রুটি পিডা ও নারকেলের হুরুয়্যা

বরগুনা অঞ্চলে চালের গুঁড়ার রুটি পিঠা সবার প্রিয় খাবার। আলো চাল গুঁড়া করে সেই গুঁড়া সিদ্ধ করে বেলে পাতলা করে গোল গোল রুটি তৈরি করে আগুনে সেকা হয়। এই রুটি পিঠা খাওয়া হয় নারকেলের সুরুয়্যা, উপভাষায় হুরুয়্যা দিয়ে। নারকেল কুড়িয়ে পাটায় বেটে মিহি করে চিংড়ি মাছ ও সামান্য হলুদের গুঁড়ো দিয়ে জ্বাল দিয়ে এই হুরুয়্যা তৈরি করা হয়। খুবই সুস্বাদু এই নারকেলের হুরুয়্যা।

চিতই পিডা

এ অঞ্চলে চিতই পিঠা সবার প্রিয়। চালের গুঁড়া গোলা করে সামান্য লবণ দিয়ে সাজে ভেজে এই পিঠা তৈরি করা হয়। ঝোলা খাজরি গুড় দিয়ে কিংবা আখের গুড় দিয়ে এই পিঠা খুবই উপাদেয়। দুধ চিতই পিঠা খুবই সুস্বাধু হয়। শীতকালে খেজুরের রস, দুধ এবং নারকেল কোড়া সিরা করে তাতে চিতই পিঠা ভিজিয়ে দুধ চিতই তৈরি করা হয়। কখনে কখনো হাঁসের মাংস দিয়েও এই পিঠা খাওয়া হয়।

www.pathagar.com

চড়া পিডা
চালের গুঁড়া ও নারকেল কোড়া গোলা করে মাটির চড়াট বা লোহার কড়াইতে চড়া পিঠা ভাজা হয়। খুবই উপাদেয় এই পিঠা।

চুই পিডা/চ্যাবা পিডা
চালের গুঁড়া সিদ্ধ করে কাই করা হয়। তারপর হাতের আঙুল দিয়ে প্রথম দড়ি দড়ি তারপর ছোট ছোট টুকরো করা হয়। এর পর খেজুরের গুড়, দুধ ও নারকেল কোড়া দিয়ে জ্বাল দিয়ে এই পিঠা তৈরি করা হয়। কিছুটা সরু ও গোল হলো চুই পিঠা। একটু বড় চ্যাপটা হলো চ্যাবা পিঠা।

বড়া পিডা/কুয়া পিডা
চালের গুঁড়া একটু ঘন গোলা করে তাতে একটু খেজুর বা আখের গুড় মিশিয়ে তেলে ভেজে এই পিঠা তৈরি করা হয়। আগে বাদাম বা তিল তেলে এই পিঠা ভাজা হত। আজকাল তিল তেলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সয়াবিন তেল ব্যবহার করা হয়। ছোট গোল পিঠা বড়া, একটু বড় আকৃতির পিঠা হলো কুয়া পিঠা।

মুইডা পিডা
চালের গুঁড়া বিচি কলার ক্বাথ দিয়ি মুঠো মুঠো করে ভাপে এই পিঠা তৈরি করা হয়। সাধারণত এই পিঠায় গুড় ব্যবহার করা হয় না। তবে গুড় দিয়ে খাওয়া হয়।

পুতা পিডা
চালের গুঁড়ায় সামান্য লবণ মিশিয়ে কলা পাতায় মুড়ে চুলোর কয়লার আগুনে পুড়ে এই পিঠা তৈরি করা হয়।

পাত পিডা
চালের গুঁড়ায় গুড় মিশিয়ে পুরু রুটির মতো করে কলা পাতায় মুড়ে মাটির খোলায় ভেজে এই পিঠা তৈরি করা হয়।

তালপিডা
ভাদ্র মাসে তাল পাকে। এই এলাকায় তালের পিঠা খুবই জনপ্রিয় খাবার। তালের ক্বাথের সাথে চালের গুঁড়া ও গুড় মিশিয়ে এই পিঠা তৈরি করা হয়। তেলে ভেজে তালের বড়াও তৈরি করা হয়। চাল ভাজা ও চুন মিশিয়ে তালের বরফিও বানানো হয়।

পাকান/পাক্কান পিডা
পাকান বা পাক্কান পিঠার প্রধান উপকরণ ময়দা। ময়দা সেদ্ধ করে পিটুলি তৈরি করা হয়। তারপর ভালো করে ছেনে ছোট ছোট আকৃতি করা হয়। এতে ছাঁচ কিংবা বাঁশের চটা দিয়ে গোল চৌকো বা তেকোনা নানা রকম আকৃতি ও নকশা করা হয়। কখনো

www.pathagar.com

কখনো নারকেল কোড়া পাটায় বেটে মিহি করে পিটুলির সাথে মেশানো হয়। প্রয়োজন মতো লবণও ব্যবহার করা হয়। তারপর তেলে ভেজে চিনির সিরায় ৭/৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে পরিবেশন করা হয়। আগে বাদাম তেলে এই পিঠা ভাজা হতো বর্তমানে সয়াবিন তেল ব্যবহার করা হয়। সিরায় ভেজা পাকান পিঠা খুব মোলায়েম ও সুস্বাধু।

শুকনো কুলি

ময়দা সেদ্ধ করে রুটি বানিয়ে তার মধ্যে পুর ভরে তাওয়ায় ভেজে শুকনো কুলি পিঠা তৈরি করা হয়। পুর তৈরি করা হয় নারকেল কোড়া, আখের গুড় ও সামান্য জিরা ভাজা গুঁড়ো করে। লক্ষ্মী পূজার সময় এই পিঠার প্রচলন খুব বেশি।

নারকেলের নাড়ু

নারকেল কোড়া, আখের গুড় ও ভাজা জিরার গুঁড়া মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে নারকেলের নাড়ু তৈরি করা হয়। লক্ষ্মী পূজার সময় নারকেলের নাড়ু খুব বেশি তৈরি করা হয়। চাল বা খুদ ভাজার নাড়ুও তৈরি করা হয়।

৫. লাতা ভাজা

চালের খুদের সাথে নারকেল কোড়া ও সামান্য লবণ মিশিয়ে লাতা ভাজা তৈরি করা হয়। খুবই উপাদেয় খুদের তৈরি এই লাতা ভাজা।

৬. বিচকি

প্রথমে আউশের লাল চাল ভেজে ভিজিয়ে খানিকটা নরম করা হয়। এই চাল ভাজার সাথে নারকেলের ছোট ছোট ফালা ও আখের গুড় দিয়ে বিচকি রান্না করা হয়। মজার এই বিচকি ভাদ্র মাসে ভূই রোয়ার শেষ দিকে হালিয়া-বদলাদের বিশেষ ভোজ হিসেবে খেতে দেয়া হয়।

৭. বউদ্দা

ভাজা চালের গুঁড়ো নারকেল কোড়া ও গুড় দিয়ে বউদ্দা পাক করা হয়। কখনো কখনো বউদ্দায় রোশন দেয়া হয়। ভাদ্র মাসের শেষের দিকে ভূই রোয়া শেষ হলে হালিয়াদের বউদ্দা খেতে দেয়া হয়।

৮. ফেনা ভাত

আউশ চাল দিয়ে ফেনা ভাত তৈরি করা হয়। ফেনা ভাতের সাথে নারকেল কোড়া ও স্বাদ মতো লবণ দেয়া হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আউশ ধান উঠলে ফেনা ভাত রান্না করা হয়। সকালের নাস্তা হিসেবে গরম গরম ফেনা ভাত খুবই উপাদেয়।

৯. মিডাই/মিঠাই

দুধের ছানা দিয়ে তৈরি সব রকম মিষ্টি দ্রব্য এ অঞ্চলে মিডাই। শিক্ষিতজনরা বলে মিঠাই।

www.pathagar.com

১০. রসগোল্লা

বরগুনা আঞ্চলে রসগোল্লা খুবই লোকপ্রিয়। রসগোল্লার উপাদান দুধ ও চিনি। দুধের ছানা করে তাতে সামান্য ময়দা মিশিয়ে হাত দিয়ে ছোট গোল গোল গোল্লা বানান হয়। এই গোল গোল্লা চিনির সিরায় জ্বাল দেয়া হয়। এই হলো রসগোল্লা। রসগোল্লা সিরায় ভিজিয়ে রাখা হয়। সিরা ঠান্ডা হলে পরিবেশন করা হয় স্বাদের রসগোল্লা। আজকাল স্পন্জ রসগোল্লা নামে এক প্রকার রসগোল্লা তৈরি হচ্ছে। ভালো মানের রসগোল্লা তৈরি করতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কারিগর দরকার। সিরা ছাড়াও এক ধরনের শুকনা মিষ্টি তৈরি করা হয়, নাম শুকনা মিষ্টি। বেতাগী উপজেলা শহরে দয়াল, পাথরঘাটার সাজি মহাশয়, বরগুনার গোবিন্দর রসগোল্লা খুবই জনপ্রিয়।

রসগোল্লাসহ অন্যান্য মিষ্টি

১১. দানাদার

ছানা গোল গোল করে চিনি দিয়ে জ্বাল দিয়ে শুকনো শুকনো করে তার উপর চিনি মেখে দানাদার তৈরি করা হয়। দানাদার খুবই প্রিয় মিঠাই।

১২. ছানার জিলিপি

ছানা দিয়ে তৈরি জিলিপি তেলে ভেজে সিরায় ভিজিয়ে ছানার জিলিপি তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

১৩. কালোজাম

ছানা দিয়ে গোল গোল করে বাদাম কিংবা সয়াবিন তেলে ভেজে চিনির সিরায় ভিজিয়ে কালোজাম তৈরি করা হয়। রং কালচে বলে নাম কালোজাম।

১৪. রসমালাই

ছানা দিয়ে তৈরি বড় আকারের একটি রসগোল্লা দুধের সরে মিশিয়ে রসমালাই তৈরি করা হয়। খুব লোকপ্রিয় এই রসমালাই। পাথরঘাটা উপজেলা শহরে সাজি মহাশয়ের রসমালাই খুবই জনপ্রিয়। সাজি মশায় এ অঞ্চলের দক্ষ কারিগর ছিলেন। তিনি লোকান্তরিত হলে তার ছেলেরা বর্তমানে রসমালাই তৈরি করছেন।

১৫. সন্দেশ

ছানা দিয়ে তৈরি সন্দেশ এ অঞ্চলের একটি প্রিয় খাবার। ছানা ও চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে পাটিতে বা কাঠের পিড়িতে পিটিয়ে এই সন্দেশ তৈরি করা হয়। আবার চিনি ও দুধ মিশিয়েও এক ধরনের সন্দেশ তৈরি করা হয়।

১৬. বাতাসা/ফেনি

চিনির সাথে খানিকটা দুধ মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে পাটি বা কাঠের পিড়িতে পিটিয়ে বাতাসা তৈরি করা হয়। বাতাসার ভিতরটা ফাঁপা থাকে। ফেনিও বাতাসার মতো তবে তার ভেতরটা অতটা ফাঁপা থাকে না।

১৭. মিছরি/তক্তি

চিনি জ্বাল দিয়ে মাটির পাত্রে বিশেষ আকার দিয়ে সাধারণত মিছরি তৈরি করা হয়। তক্তি তৈরির প্রক্রিয়া একই রকম। তক্তি পাটিতে পিটিয়ে নরম থাকতে চৌকো বা কোনাকুনি কেটে ফেলা হয়। জুরিয়ে গেলে ছোট আকার হয়। কোথাও কোথাও থালার আকৃতির মিছরি বানানো হয়।

১৮. কাঁচাগোল্লা

ছানার সাথে চিনি মিশিয়ে কাঁচাগোল্লা তৈরি করা হয়। ছানা ও চিনি জ্বাল দিয়ে একটি বিশেষ অবস্থায় নামিয়ে আনা হয় তারপর একটি বড় থালায় ছড়িয়ে দিয়ে নরম থাকতে থাকতে চৌকো আকার দেয়া হয়। এই হলো কাঁচাগোল্লা। আবার ছানা চিনি জ্বাল না দিয়েও পরিবেশন করা হয়।

১৯. জিলিপি

মাস কলাইয়ের ডাল ও চিনি হলো জিলিপির মূল উপাদান। মাসকলাই ভালোভাবে পাটায় পিষে জিলিপির খামিরা তৈরি করা হয়। তারপর একটা নারকেলের মালায় বা

www.pathagar.com

কাপড়ের পোটলায় রেখে গরম তেলের উপর কায়দা করে আড়াই প্যাঁচ দিতে দিতে এক সাথে কড়াই জুড়ে অনেকগুলো জিলিপি ভাজা হয়। ভাজা জিলিপি আবার চিনির সিরায় ভিজিয়ে রাখা হয়। ভিতরে রস ঢোকার পর তুলে পাত্রে রাখা হয়। জিলিপির আড়াই প্যাঁচ হলো দুটি গোল একটি মাঝখান দিয়ে। দক্ষ কারিগর ছাড়া জিলিপি তৈরি করা যায় না।

২০. আমিত্তি

জিলিপির মতোই আমিত্তির প্রধান উপাদান মাশকলাই। মাসকলাই পাটায় বেটে আমিত্তির খামিরা তৈরি করা হয়। তরপর নারকেলের মালা বা পুটলিতে বেঁধে একটি গোলাকার ও চারপাশে খাঁজকাটা করে তেলে ভেজে চিনির সিরায় ভেজানো হয়। রসে ভিজে গেলে আমিত্তি একটি পাত্রে সাজিয়ে রাখা হয়। খুবই স্বাদ আমিত্তির।

২১. ঘোল

বরগুনা অঞ্চলে ঘোল ও ঘোল-চিড়া একটি লোকপ্রিয় খাবার। বিশেষ করে গরমের দিনে একবাটি ঘোল, তার সাথে চিড়া–সাথে একটু মাখন ভাসানো–খেজুরের ঝোলা গুড় কিংবা চিনি সবাই তৃপ্তিসহকারে খায়। বরগুনা শহরসহ প্রায় সকল বড় বাজারে ঘোলের দোকান দেখা যায়। রাস্তার পাশে বসেও অনেকে শুধু ঘোল বিক্রি করে। বরগুনা শহরে এখন যা মিষ্টি পট্টি এক সময় এটি ঘোল পট্টি নামে খ্যাত ছিল। ঘোলকে বলা হয় দুগ্ধজাত খাদ্যের মধ্যে নিম্নমানের খাদ্য। 'মাথায় ঘোল ঢালা', কাউকে ঠকানো মর্মে 'ঘোল খাওয়ানো' ইত্যাদি লোকভাষা থেকেই খাদ্য হিসেবে ঘোলের অবস্থান বোঝা যায়। ঘোল তৈরি হয় গরুর দুধ থেকে। দুধ প্রথমে জ্বাল দিয়ে সামান্য গরম থাকতে তাতে একটু টক দই মেশানো হয়। তারপর মুখটা ভালো করে গামছা বা এক টুকরো কাপড় দিয়ে সারা রাত ঢেকে রাখা হয়। পরের দিন সকালে দুধ খানিকটা জমে গেলে তেলের জের বা টিনের কেনেস্তারায় ঢেলে বাঁশের দাড়ি দিয়ে মন্থন করা হয়। দাড়িকে অনেকে চরকাও বলে থাকে। দাড়ি ও দড়ি হলেই ঘোল তৈরি করা যায়। বেশ খানিকটা দাড়ি ঘোরালে উপড়ে মাখন উঠে আসে। নিচে দুধের অপজাত ঘোল পড়ে থাকে।

যারা ঘোল তৈরি করে তারা 'ঘোষ' নামে পরিচিত। একজন ঘোষ জানালেন, দাড়ি ও দড়ি হলেই ঘোল তৈরি করা যায়। যাদের ননী যুক্ত দুধ খেতে মানা তাদের জন্য ঘোল খুবই উপকারী।

২২. দই

এ অঞ্চলে দই খুবই লোকপ্রিয় খাবার। প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায়, বিবাহ অনুষ্ঠানে, অতিথি আপ্যায়ন, জিয়াফত ও শ্রাদ্ধে দই বাতাসা গুড় পরিবেশন করা হয়। ২০-৩০ বছর আগেও কোনো অনুষ্ঠানে দই না খাওয়ালে গেরস্তের খুব অখ্যাতি হতো।

www.pathagar.com

গ্রামে প্রায় প্রতিটি পরিবারে গরমের দিনে সকালে পান্তভাতে দই ও খেজুরে রওয়া মিডা খাবারের প্রচলন আছে। গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে পাতা ও বাজার-শহরের বাণিজ্যিক দইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাড়িতে যে দই পাতা হয় তাতে দুধ জ্বাল দেয়া হয় না। ফলে দই জমাট বেঁধে উপড়ে একটি স্তর পড়ে, পানিটুকু নিচে পড়ে থাকে। ভেতরটা বেশ মোলায়েম হয়।

দই

গরুর দুধের চেয়ে মোষের দুধের দইয়ের স্তর পুরু হয়। মাটির মালসা বা আউতায় দই পাতা হয়। এই দইয়ে দুধের সাথে কোনো চিনি বা মিষ্টি মেশানো হয় না। অনেকটা টক দইয়ের মতো। যত ভালো দই তত কম টক হবে। তাই একটা কথা চালু আছে 'আপনা দই কেউ টক কয় না'। মিষ্টির দোকানে যে দই পাতা হয়, জ্বাল দিয়ে তাতে মিষ্টি মেশানো হয়। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষের এই দই অত পছন্দ না। তারা মনে করে বাজারের এই মিষ্টি দইয়ে ভেজাল আছে। বরগুনা শহরে ও অন্যান্য কয়েকটি বাজারে দই-চিড়ার দোকান আছে।

২৩. উড়ুম

উড়ুমকে শীলিত ভাষায় মুড়ি বলা হয়। শীতকালে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ঝি-বউরা উড়ুম তৈরি করে থাকেন। ধান বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেদ্ধ করে শুকিয়ে চাল করা হয়। তারপর বালুতে ভেজে মুড়ি তৈরি করা হয়। সাধারণত মাটির খোলা ও ঝাঝড়ি লাগে মুড়ি তৈরি করতে। লবণ, সামান্য সোহাগার জলও দেয়া হয়। এ অঞ্চলে মুড়ি করার জন্য বিশেষ

www.pathagar.com

ধরনের ধান চাষ হয়। ধানের নাম বৌয়ারি, যামিনি মোটা ইত্যাদি। বৌয়ারি ধান বেশ লম্বাটে ও পুরুষ্ট। মুড়ি বড় ও মোলায়েম হয়। যামিনি মোটা ধান বা চাল লালচে, একটু ছোট কিন্তু মুড়ি খেতে মিষ্টি। আজকাল উচ্চ ফলনশীল নানা জাতের ধানের চাল দিয়ে মুড়ি তৈরি করা হয় বাণিজ্যিকভাবে। প্রবীণরা এসব মুড়ি খেতে চান না।

সকালে চা-মুড়ি খুব লোকপ্রিয় খাবার। মুড়ি ও পাটালি গুড় সবার পছন্দ। রোজার ইফতারিতে মুড়ি ও বুট না হলে চলে না। সরষের তেল, কয়েক কোয়া রসুন দিয়ে মুড়ি খেতে বেশ সুস্বাদু। ঝালমুড়ি খুবই জনপ্রিয়। বাণিজ্যিকভাবে মুড়ি তৈরি ও বিক্রির পেশাদার লোক আছে। অনেক বড় বড় কোম্পানি বাজারে মুড়ি প্যাকেটজাত করে বিক্রি করছে। এমনিকি ঝাল মুড়িও।

২৪. মোয়া

মোয়ার উপভাষা মোহা। মুড়ির সাথে গরম খেজুরের গুড় মেশালেই মোয়া তৈরি হয়ে যায়। গোল গোল গোল্লা মোয়া। আবার যারা বাণিজ্যিকভাবে মোয়া তৈরি করে তারা বড় ধামা বা বাঁশের তৈরি সাজিতে মোয়া তৈরি করে রাখে। ব্যাটালি দিয়ে কেটে কেটে মোয়া বিক্রি করে। শীত কালেই মোয়া বেশি চলে।

মোয়া

২৫. চিড়া

গরমের দিনে এ অঞ্চলে চিড়া ও দই খুবই প্রিয় খাবার। ধান দীর্ঘক্ষণ ভিজিয়ে খোলায় খানিকটা ভেজে ঢেঁকিতে চিড়া কোটা হয়। আউশ ধানের চিড়া খুবই উপাদেয়। আজকাল কলে চিড়া তৈরি হচ্ছে। অনেক বড় বড় কোম্পানি প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করছে।

www.pathagar.com

২৬. খই

বর্ষাকালে খই, নারকেল কোড়া ও খেজুরের ঝোলা গুড় খুবই উপাদেয় খাবার। খইয়ের ছাতু করে মোয়াও তৈরি করা হয়। দুধ গুড় দিয়ে খই খাওয়া হয়। রোগীদের পথ্য হিসেবে কবিরাজরা খই খেতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশেষ ধরনের চিকন ও লম্বাটে ধান দিয়ে খই ভালো হয়। গেরস্ত এজন্য ক্ষেতে বিশেষ যত্ন করে খইয়ের ধান রোপণ করে থাকেন। সাধারণত মাটির খোলায় খই ভাজা হয়। ভাজার পর ধানের খোসা ছাড়িয়ে খই খেতে হয়।

২৭. মলিদা

মলিদা এই অঞ্চলের একটি বিশেষ খাবার। আলো চালের মিহি গুঁড়া পানিতে গুলে তার সাথে প্রচুর আদার রস মিশিয়ে মলিদা তৈরি হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদুল ফেতরের পায়েস-শিন্নি খাওয়ার পর, আর হিন্দু সম্প্রদায় মহোৎসবরে ভোজের শেষে তৃপ্তিসহকারে মলিদা খেয়ে থাকে। লোকজনের ধারণা মলিদা খেলে হজম ভালো হয়।

২৮. মাছ-ভাত, পান্তাভাত

নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর আর সমুদ্র ঘেরা বরগুনা অঞ্চল। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এ এলাকায় বরাবর মাছের প্রাচুর্য বেশি। তবে কোলা বা মাঠে যে প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রচুর দেশীয় মাছ বর্ষাকালে ও শীতে পুকুরে পাওয়া যেত, এখন আর তা পাওয়া যায় না। ক্ষেতে কীটনাশক-রাসায়নিক সার ও ওয়াপদা বাঁধের কারণে খালগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় এখন আর তেমন মাছ পাওয়া যায় না।

এই অঞ্চলের লোকদের প্রিয় খাবার মাছ-ভাত খেসারি ও মুগ ডাল। সঙ্গে যে ঋতুতে যে সবজি পাওয়া যায় তাই। তবে বেশির ভাগ পরিবারের সকালের খাবার হল পান্তাভাত সঙ্গে মরিচ পোড়া ও পেঁয়াজ। সঙ্গে আখ কিংবা খেজুরের গুড়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে তালের গুড় হলে মন্দ হয় না। দুপুরে রাতে মাছ-ভাত, তরকারি। রান্নার ধরন ঝোল ও ঝাল। তরকারিতে প্রচুর মরিচ দেয় এই অঞ্চলের গিন্নিরা। নারকেলের প্রাচুর্যের কারণে এই এলাকায় এর ব্যবহার খুব বেশি। বিভিন্ন তরকারিতে নারকেল বাটা দেওয়া হয়। নারকেল বাটা চিংড়ি মাছ, নারকেলের চিংড়ি মালাই খুবই প্রিয় খাবার।

খাবার তালিকায় সাধ্যি হলে দুধ কলা ও গুড় থাকে। গরমের দিনে পান্তাভাতের সাথে ঘরে-পাতা কাঁচা দুধের গরু কিংবা মোষের দই। সঙ্গে গুড়।

গমের আটার রুটি ব্যাপক জনগোষ্ঠির মধ্যে এখনও তেমন প্রচলন হয়নি। হাটে বাজারে নিম্নবিত্ত ও মজুরেরা গুড় কিংবা ডাল-ভাজির সাথে খেয়ে থাকে। কিছু দিন আগেও সম্পন্ন পরিবারে গমের রুটি খাওয়াকে অসম্মান মনে করা হতো। এমনকি হাট থেকে চাল কিনে খাওয়াকেও। অবস্থাসম্পন্ন কৃষক নিজের খেতের ধান এক পৌষ থেকে আরেক পৌষ পর্যন্ত মজুত রাখে।

www.pathagar.com

লোকনাট্য

বেউলা লখিন্দরের পালা

বেউলা/বেহুলা লখিন্দরের জন্মকথা

চাঁদ সওদাগর এবং মনসার সাথে বিবাদ ছিল। চাঁদ সওদাগর ছিল শিবের শিষ্য, মনসা শিবের কন্যা, উষা, অনিরুদ্ধ ছিল শিবের নর্তকী। চাঁদ সওদাগরের মনসার ঝগড়া শুনে বলে, আমরা যদি মর্তে যাই তবে চাঁদ সওদাগর আর মনসার বিবাদ থামবে, না হয় এ থামবে না। এই কথা মনসা শুনছে। দেবকুলে অনিরুদ্ধ, উষা নামে পরিচিত। মর্ত্য ধাপে এসে বেউলা, লখিন্দর নামে পরিচিত।

চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সোনেকা। সোনেকা গোপনে গোপনে মনসার পূজা করত, চাঁদ তা জানত না। একদিন জেনে মনসার ঘট ভেঙে ফেলে, তারপর জালিয়া বাড়ির মণ্ডপে মনসা পূজা হয়, সেখানে সোনেকা বর মাগে, তাই মনসা তার কাকুতিতে পুত্র বর দেন। কি বলে বর দিলেন :

মনসা : দিলাম দিলাম পুত্র বর নাম থুইও লখিন্দর।

জন্মি বা মাত্র আনিব হরিয়া।

সোনেকা : এই বরে মোর কার্য নাই, এও বর নেও ত ফিরাইয়া।

মনসা : দিলাম দিলাম পুত্র বর, নাম থুইও লখিন্দর

সোনেকা : এও বর কার্য নাই, এও বর নেও ফিরাইয়া

মনসা : দিলাম দিলাম পুত্র বর, নাম থুইও লখিন্দর, বিয়ার রাতে আনিব হরিয়া।

সোনেকা : এই বর লইলাম মস্তকে বাধিয়া, হইলে পুত্র না করাব বিয়া।

মনসার ছয় পুত্র মরে। যমের সাথে যুদ্ধ করে তাদের প্রাণ রেখে দিলেন, রাখলেন গঙ্গার কাছে। বললেন, আমি যখন চাব তখন আমাকে ফিরাই দিবেন। গঙ্গা রেখে দিলেন। তারপর মনসা গেলে শিবের কাছে। বলেন, বাবা আমি ছেলে পাব কোথা। সোনেকারে তো পুত্র বর দিয়েছি। উষাকে দিলেন, উজানে নগর সাহে বানিয়ার স্ত্রী সুমিত্রার ঘরে। আর অনিরুদ্ধকে দিলেন চম্পক নগরের চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সোনেকার ঘরে। চাঁদ সওদাগর ছয় ছেলের শোকে মনে মনে ঠিক করলেন, আমি বাণিজ্যে যাব। এই বলে, মাঝিমাল্লা ডেকে বাণিজ্যে যাওয়ার জোগাড় হলেন। সোনেকাকে বলে, আমি বাণিজ্যে যাব মন করেছি। তা হলে আমরা একটু আলিঙ্গন দেই। সেই আলিঙ্গনে গর্ভের সঞ্চার হলো। বাণিজ্যে যাওয়ার সময় রানির সন্তান হবে, এর একখানা প্রমাণপত্র দিলেন।

www.pathagar.com

সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা

সওদাগর ১৪ খান ডিঙা, বিজ্ঞ বিজ্ঞ মাঝি, বড় বড় পণ্ডিত নিয়ে বণিজ্যে রওনা হলেন দক্ষিণ পাটন। যাওয়ার সময় মনসা বহু বিপদে ফেলেন। সেই বিপদগুলো কেটে দক্ষিণ পাটন গেলেন। ১৪ ডিঙায় ভরে নিলেন মাগর, ফুল, আকর, সুপারি, পাটের চট, পচা মুলা, ইত্যাদি। তা দিয়ে আনলেন মণি, মুক্তা, কাঞ্চন, শঙ্খ—এ সমস্ত মালামাল নিয়ে নিজ দেশে ফিরছিলেন। ফেরার পথে নদীর মধ্যে ১৪ ডিঙা মনসা ডুবাইয়া দিল।

মালামাল তো দূরের কথা মাঝি-মাল্লারাও বেঁচে নাই, শুধু বেঁচে আছেন চাঁদ সওদাগর। ভাসতে ভাসতে আর এক রাজ্যে উঠলেন। পেটে দারুণ খিদে কি করেন। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখেন এক জেলে মাছ ধরছে। তার কাছ থেকে একটি মাছ চেয়ে আনলেন। তার পরনে ছিল কলার বাকল। স্নান করে সে সন্ধ্যার পূজা না করে কিছু খেতেন না, তাই পোড়া মাছ নদীতে ধুয়ে কিনারে রাখলেন। তারপর বাকল থুয়ে স্নান করতে নামলেন। এমন সময়, মনসা গাভীরূপ ধারণ করে বাকল খেয়ে গেল আর চিল রূপ ধারণ করে মাছ নিয়ে গেল। কিনারে উঠে দেখে গাভীতে বাকল খেয়ে গেছে, আর চিলে মাছ নিয়ে গেছে।

সওদাগর খিদের জ্বালায় ছটফট করতে লাগলেন। অচিন রাজ্য কোথায় যাবে মনে মনে ভাবতে ভাবতে পথ চলতেছিলেন। দেখেন, কৃষাণীরা মাঠে ধান গাছের আগাছা বাচতেছে। সেখানে গিয়ে বলেন, আমাকে কাজে নিতে পার। সবাই বলে, কাজ কর। ধানের ক্ষেতে তিনি কাজ করতে আরম্ভ করলেন। মনসার চক্রান্ত—ধান গাছ কাটে তো আগাছা থেকে যায়। সাথের সবাই চেতে ওঠে, মারধর করে। কান ধরে ক্ষেত থেকে বের করে দেয়। সওদাগর না খেয়ে ওখান থেকে চলে যায়।

কিছু দূর হাঁটতে হাঁটতে দেখেন, পথে একজন নাপিত বসা। বলেন, আমার কাছে টাকা-পয়সা নাই, ভাই আমাকে চুল দাড়ি কেটে দিতে পার। নাপিত বলে, পারি। এই বলে তিনি চুল দাড়ি কাটতে বসে, নাপিত চুল অর্ধেক কাটে আর দাড়ি অর্ধেক কেটে বলে, জল আনতে যাই। নাপিত লাথি দিয়ে জল ফেলে দিয়েছিল তাই জলের ভান করে চলে গেল আর আসেনি। (নাপিত হলো মনসা) এমন করে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেল। আর চিন্তা করে, এখানে আমার এক বন্ধু ছিল, তাই লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে। তাঁরা বলে, হ্যাঁ এখানে ছিল। সওদাগর বন্ধুর বাড়িতে গেল। গিয়া বন্ধুর কাছে সব খুলে বলে।

বন্ধু তার সব খাবার জোগাড় করল। এখানে সে মনের আনন্দে খেতে লাগল। ২-৩ দিন থেকে সেই বাড়ি থেকে রওয়ানা হলো। রাজবেশ নাই, তাই লজ্জার কারণ। উঠল সোনেকার ফুল বাগানে। ঐ বাগানে ছিল সোনেকার দাসি। দাসি চোর চোর বলে সওদাগরকে খুব মারধর করল। মার খায় আর বলে আমি সওদাগর। যেই বলছে আমি সওদাগর, এমন কিল কেনু-বেশি করে দেয় আর বলে, রানি মার সম্মান গেল, শালায় বলে আপনি সওদাগর। শালারে ধরে হাতে পায় বেঁধে রানির কাছে নিয়ে গেল। বলে,

www.pathagar.com

রানি ফুল বাগানে চোর পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছি। রানি বলে, শালার নাক কান কেটে দে। সওদাগর বলে, রানি কাটবা একটু পরে কাট—আমার দুটা কথা শোন। আমি তোমার স্বামী আমার নাম চাঁদ সওদাগর। দেখ, তোমার বাম উরুতে এক গোটা তিল আছে। তখন সোনেকা মনে মনে অনুতাপ করতে লাগল। আমার স্বামী না হলে সে কেমনে জানল। তখন দাসিকে বলে দাসি আমি ভালো করে জিজ্ঞাসা করে দেখি। সোনেকা তার কাছে গেল, বলে, তুমি কেমন করে জানলে আমার গোপন অঙ্গে এক গোটা তিল আছে। সওদাগর তখন বিস্তারিত বিবরণ বলে। শেষে বলে, সব হারিয়ে আমি একা এসেছি। তাই শুনে রানির দু চোখ জলে ভাসতে লাগল।

সওদাগর বলে রানি তুমি আমাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও, আমি একটু বিশ্রাম করি। রাত ভোরে ঘর থেকে এক যুবক বের হতে দেখে সওদাগরের সন্দেহ হলো, রানিকে বলে রানি এই যুবক কে? এ যে তোমার ছেলে—নাম লখিন্দর। তুমি যখন পাটনে যাও তখন আমি পঞ্চম মাসের গর্ভবতী। তখন সেই প্রমাণপত্র বের করে দেখায়। সওদাগরের সন্দেহ দূর হয়, সে ছেলে দেখে বিয়ে দেবে, ঘোষণা দিলেন। বললেন, পাত্রী কোথায় আছে তোমরা দেখ। গণক এসে গণনা করে বলে, আছে কন্যা, উজানীনগর সাহেব বানিয়ার কন্যা নাম বেউলা, রূপে-গুণে রূপবতী, আর পারে এক কাম—পারে তিন মাসের মরা জিয়াইতে। সওদাগর বলে, এই কন্যা আমি চাই। তাই তিনি কন্যা দেখার জন্য উজানীতে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

লখিন্দরের বিবাহের জন্য উজানীতে চাঁদ সওদাগরের যাত্রা

শত শত লোক, হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত, হাজার হাজার ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ, শত শত পালুক, হাজার তুরক, হাজার হাজার ঘোড়া, শত শত হাতি—লোক চলছে গোনা বাছা নাই। এসমস্ত লোক নিয়ে বানিয়ার পুকুর পাড়ে উপস্থিত হলেন। রাত্রি গভীরে মনসা স্বপ্ন দেখান বেউলাকে। বলেন, ও বেউলা তোমার জন্য বর এসেছে, তোমার পুকুর পাড়ে তোমার স্নানের সময় তোমাকে দেখবে, তুমি স্নানে যাবে ভোরের সময়। রাত ভোর হলো, বেউলা ঘুম থেকে জাগল। মাকে বলল, মা আমি মুক্তাসরে স্নানে যাবো তুমি সখিদের কাছে বল। মা সতর্ক করে বলে, যাবে মা যাবে, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে চলে আসবে, কোনো দিকে তাকাবে না।

বেউলা সখিদের নিয়ে মুক্তাসরে স্নানে রওয়ানা হলো, দিঘিতে নামল, এমন সময় মনসা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে ঘাটলায় বসলেন। বেউলা স্নান করে ওঠার সময় বেউলার পায়ে লারা লাগল। তখন ব্রাহ্মণী অভিশাপ দিল, তোর স্বামী বিয়ার রাতে মরবে। বেউলা শুনে অনুতপ্ত হলো। স্নান করে বেউলা বাড়ি চলে গেল।

এদিকে চান্দ বেউলার স্নানের সময় তাকে দেখল। দেখে তার মনপুত হলো। যত লোক গেছে তারাও বলে, লখাইর জন্য এই মেয়ে দরকার। এবং স্বচক্ষে দেখল ৭ দিনের মরা শৌল মাছ জিয়াল। ৩ মাসের মরা সে জিয়াতে পারে তাই শুনে বিয়ের প্রস্তাব

www.pathagar.com

রেখে শাহের কাছে লোক পাঠালেন। তারপর বিয়ের দিন তারিখ ধার্য হলো। তাই শুনে চান্দ বলেন, লোহার কলাই পাক হবে। তা দিয়ে সওদাগর ভাত খাবে। তাই শুনে বেউলার মা রান্না করতে গেল, বহুপ্রকার মাছ মাংস ভালো ভালো তরকারি এবং মিষ্টি সামগ্রী রান্না হলো। শেষ প্রান্তে লোহার কলাই, কিন্তু কলাই জ্বাল দিতে দিতে রাজ কোষে যত যত কাঠ ছিল সব শেষ হয়ে গেল তবু কলাই গলে নাই।

মনসা দেববাণীতে বলে, বেউলা তুমি স্নান করে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আড়াইটা ইক্ষুর পাতা দিয়ে জ্বাল দিয়ে কলাই রাঁধ, তবে তো কলাই রান্না হবে। বেউলা তাই করল, লোহার কলাই রান্না হলো। প্রথমে তাই দিয়ে চান্দকে খেতে দিল, চাঁদ মনের খুশিতে ভাত খেল।

বেউলার লখাইর বিয়ের ধুম পড়ে গেল। বেউলা লখাইর বিয়েতে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল নিমন্ত্রণ করা হলো। এর মধ্যে মনসাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই।

সাহে বানিয়া বুদ্ধি করিতে বসল–
স্নান করি গঙ্গাজলে বিচিত্র মণ্ডপ তলে
বুদ্ধি করায়ে সাহে বানিয়া
উচ্চারিয়া বলে হরি স্তুতি বচন পরি।
ধান্য দূর্বা লয়ে হস্ত পর ॥
আনিয়া পটের পাত
সিঁদুর গুলিল তাত
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে
পারিজাত পুষ্পের মালা
ভরিয়া সকল গলা
সাক্ষাতে মদন হেন দেখি ॥

এদিকে চান্দ তারাপতি সাধুকে ডেকে বলছে আমাকে একখানা লোহার বাসর তৈরি করে দিতে হবে। তারাপতি সাধুকে একখানা বাসর করতে কি কি জিনিসের দরকার চান্দ সব এনে দিল। তারাপতি বাসর করতে লাগল। এক দিন এক রাতের মধ্যে ঘর শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে মনসা পথ আগলে দাঁড়াল। তারাপতিকে বলে, বাসরের ঈশান কোণে একটা ছিদ্র করে এস। তারা বলে আমি পারব না, যার নুন খাই তার গুণ গাইতে হয়। মনসা বলে, শুন তারা তুমি যদি ছিদ্র করে না আস তা হলে তোমার স্ববংশ বিনাশ করব। তারা ভাবনায় পড়লো কি করা যায়! সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল। চান্দ বলে, কী আবার? ওরা তো লোহা পাতগুলো বসাইছে আমি ভালো করে দেখি নাই, তাই তারা দেখতে আসছে। তখন তারাপতি ঈশান কোণে একটি ছিদ্র করে ছাই দিয়ে ছিদ্র ঢেকে রাখল। চান্দরে ডাকল, দেখেন বাসরে কোনো ফাঁকাটাক আছে কি না। চান্দ সব ঘুরে ঘুরে দেখল, কোনো যায়গায় ফাঁকা নেই। তারা চান্দের কাছ থেকে বিদায় নিল। বেউলা লখাইর বিবাহ শুরু হলো। বিবাহ আসরে দেবগণসহ সকল

www.pathagar.com

লোকজন আসল। সবার শেষ আসল মনসা। গিয়া লখাইর মাথার উপর সে ছত্র দণ্ড ধারণ করল। তাই দেখে লখাইর নাক মুখ দিয়ে ফেনা বের হলো। তখন বেউলা বিবাহ বাসর ছেড়ে মনসার কাছে ছুটে গেলেন। মনসা বাড়ি গিয়া দ্বারে দ্বারি রেখে শুইয়া রইল। দ্বারিগো কাছে বললেন, আমার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করলে বলবে অসুস্থ, মাথা ব্যথা– এই বলে শুইয়া রইলেন।

বেউলা তার বিবাহ বাসর ছেড়ে মনসার গৃহে চলে গেলেন, গিয়া দেখেন গৃহের দ্বারগুলো সব বন্ধ এবং দ্বারে দ্বারে প্রহরী। প্রহরীদের কাছে বলেন, দ্বার ছেড়ে দাও আমি মনসার কাছে যাব। তারা বলে, আমরা দ্বার ছাড়তে পারব না, কারণ আমাদের দ্বার ছাড়া মানা আছে। বেউলা খুব অনুরোধ করল, কেহই অনুরোধ শুনল না। তার পরে বেউলা অনুরাগ ধরে নিজে জীবন দিতে উদ্যত হলো। প্রথমে তার স্তন কাটল, তাই দেখে এক নাগ মনসাকে বলল, বেউলা তার জীবন দিতে উদ্যত হয়ে নিজের স্তন কেটেছে। তাই শুনে মনসা আতঙ্কিত হলো।

নাগের কাছে বলে, বেউলাকে আমার কাছে নিয়ে আস। নাগ বেউলাকে নিয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি চাও, কেন আসলে বল? বেউলা বলে, সবই তুমি জান, আবার তুমি কি জানবে? যাতে আমার স্বামী প্রাণ পায়, আমার অঙ্গ যা বিক্ষত হলো তা যেন সুন্দর সুঠাম হয়। তা না হলে আমার স্বামী গ্রহণ করবে না। তাই শুনে মনসা তার শরীর সুন্দর সুঠাম এবং স্তন দুটো ডালিমের মতো করে দিল। আর জিয়ানি পাত্র থেকে এক ঘড়া জল দিয়ে বলল, এই জল তার গায়ে ছিটিয়ে দিবে। লখাই প্রাণ পাবে। বেউলা তাই করল। লখাইর প্রাণ ফিরে পেল। সে বেউলাকে ধরে কাঁদতে লাগল। আর বলল, এমন বউ আমার দরকার।

চান্দ পুত্র এবং পুত্রবধূ নিয়ে আসেন এবং বাসর ঘরে রেখে দেন। বাহিরে শত শত প্রহরী, শত শত গারুলিয়া, শত শত যোদ্ধা আর সওদাগর নিজে থাকেন দরজায় হেতল বারি নিয়ে শুইয়া। এদিকে মনসা মনে মনে ভাবতেছে কি উপায় হবে? ভাবল কালনিদ্রা তোকে ছাড়া আমার কাজ সিদ্ধি হবে না। কালনিদ্রা বলে আমি তা পারব না। মনসা বলে, আমার কথা না শুনলে তোর বংশ ধ্বংস করব। তাই শুনে কাল নিদ্রা সকলের চোখে ঘুম বসিয়ে দিল। এই সময় বহু নাগ গেলো কিন্তু কোনো নাগ ফিরে আসে না। পরে কালি নাগকে পাঠাল। কালি নাগ ঈশান কোণের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করল। এর পূর্বে লখাই বেউলাকে বলে, আমার খিদে পেয়েছে আমাকে ভাত দাও। বেউলা মনে মনে ভাবে আমি ভাত পাব কোথায় এত রাতে। বানিয়াকে দিয়ে চাল-ডাল, হাঁড়ি-পাতিল আনিয়ে দাও। তার ঘড়ায় ছিল চাল, ঘটে ছিল জল, কুলায় ছিল দেয়াশলাই তাই তিন দিকে তিন নারিকের দিয়ে চুলা তৈরি করল।

তারপর চুলায় আগুন জ্বালিয়ে রাঁধতে আরম্ভ করল। ফেনা ফুটে উঠে তখন আঙুল দিয়ে ভাতে নাড়া দেয়। এর মধ্যে লখাই আবার নিদ্রা যায়। ভাত হলো এখন কেমন করে লখাইকে জাগাবে? একে তো নতুন, দ্বিতীয় শ্বশুর দ্বারে, লোকজন কত, তাই হাতের

www.pathagar.com

শঙ্খে নাড়া দিল তাতেও লখাই উঠল না। পরে বেউলাও ঘুমিয়ে পড়ল। তাই দেখে কালি নাগ বাসর ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর বেউলার চুল বেয়ে খাটের উপর উঠল। দেখে লখাইর দেহ অপরূপ সুন্দর। চন্দ্র, সূর্যের মইল আছে, কিন্তু লখাইর গায়ে নেই। এর আগে সাত নাগ ঢুকেছে তাদেরকে বন্দি করে রেখেছে লখাই, রূপ দেখে কালি নাগ ভাবে কোনখানে কামড় দেবো? তাই প্রদীপের তৈল লেজ দিয়ে লখাইর গায়ে মেখে দিল।

ডান দিক হতে নাগিনি বাম দিকে যায়
লখাইর চরণ পরে কাল নাগিনির গায়।
নাগ বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমরা হও সাক্ষী
চন্দ্র বানিয়ার পুত্র কেন মোরে মারে লাথি ॥
এবারও সহিলাম আমি ধর্মে উদ্দেশীয়া
আর বার করিলে লাথি যাইব দংশিয়া।
বিধির নিয়ম কভু খণ্ডানো না যায়
আর বার পরে চরণ নাগিনির গায় ॥
এবার এড়িলাম আমি সুন্দর দেখিয়া
তারপর করিলে চরণ যাইব দংশিয়া।
শিয়র হইতে নাগিনি পৈতানেতে যায়
আর বার পরে চরণ নাগিনির গায় ॥

তারপর নাগিনি গুস-গুসাইকে স্মরণ করে বলে, আমার কোনো দোষ নাই। পদুয়ার আদেশে লখাইরে কামড়াইয়া যাই। প্রদীপের তেল ললাটে মাখে আর লখাইর শরীর লক্ষ্মীছাড়া হয়। তারপর নাগিনি লখাইরে দংশন করে। লখাইর চিৎকারে বেউলা ঘুম থেকে জাগে, দেখে নাগিনি চলে যায়, তখন ৮ আঙুল লেজ কেটে রাখে।

লখিন্দরে বিলাপ

কত নিদ্রা যাওয়া গো সুন্দরী
আজু বিয়া হইল রাতি
না চিনিলা নিজ পতি
নাগিনি দংশিয়া গেল মোরে ॥
বিয়ার রাত্রে সাপে খাবে মোরে
এক দিবসের লাগি তোমার বধের ভাগী
এই পাপে নরকে বিভোর।
না জানিয়া হইল কি উঠ প্রিয়ে চন্দ্রমুখী ॥
বিয়ার রাতে সর্পঘাত যোগ
তুমি তো বর তোমাকে বলিব কি,
এ তোমার কেমন সাহস
যার পতি সাপে খায় সে কেমনে নিদ্রা যায় ॥

www.pathagar.com

নারীর রাখিলে অপযশ
হাতে নর সিংহ জাতি
মিছা সে জাগিল রাতি
কোন কার্যে এতেক প্রহরী ॥
জাগিয়া এতেক জন রাখিতে নারিল ধন
প্রভাতে নাগিনি করে চুরি ॥
তোমার আছে ছয় ভাই,
আমার মায়ের আর কেহ নাই । ঐ
কাল নাগিনি বিষে পোড়ে সর্ব গা,
অন্তকালে না দেখিলাম বাপ আর মা ॥

বেউলা হয় সাহের কুমারী
কারে সর্মপিয়া আমি যাব হেন নারী ॥
এই রূপে বেউলার জন্ম গেল ছারেখার ।
সংসারে সুখ ভোগ না করিল আর ॥
চান্দ হেন বাপ মার সোনা হেন মাই ।
তাহাকে ত্যাজিয়া আমি যমপুর যাই ॥
বাহিরে যাইতে লোহার ঘরে পথ থাকে ।
দ্বার দিয়ে বাহিরে যাই দেখুক সর্বলোক ॥

প্রাণাশক্তি বিপরীত ডাকি রাত্রি ভাগে ।
হেন বুঝি কোন জন নিদ্রে নাহি জাগে ॥
তবে সঙ্গে সঙ্গ নেল মনে রইল দুঃখ ।
মৃত্যুকালে না দেখিলাম জননীর মুখ ॥
নাগিনির বিষজালে করয়ে কাকুতি ।
আঙ্গুলী ছাইয়া বিষ ধরিলেক ছাতি ॥
কার প্রাণ স্থির রয় পদ্মার নারি কলা ।
কতক্ষণ পরেতে বিষেতে ছাইল গলা ॥

এরকম ভাবে লখাই বিলাপ করতে করতে তার বাকশক্তির রহিত হলো । তখন বেউলা স্বপন দেখে স্বামী খাটের উপর মৃত্যুশয্যায় পরে আছে । তারপর বেউলার বিলাপ...

আরে প্রভু কি হইল মোরে ।
বজ্র ভাঙ্গিয়া পেল অভাগিনীর শিরে ॥
বাও নাই বাতাস নাই লোহার ঘরে বাস ।
কোন নাগিনি আসিয়া প্রভুরে ঠুকল নাশ ॥

www.pathagar.com

এ নব যৌবন আমার গেল ছারখার।
কপাল চিরিয়া দেখি কিবা আছে আর ॥
ঢলিয়া পড়িল প্রভু চৈতন্য নাই।
বাসর জন্য আজুমোর করিলা গোসাঞ ॥

এই তো নগর মাঝে আছে কত জন।
কাহার কপালে বিধি লিখিল এমন ॥
কিবা ক্ষণে দিল গালি যতি ব্রাহ্মণী।
হাতে হাতে ফল মোর ঘটিল এক্ষনি ॥
বিয়ার রাতে প্রাণপতি মাগিল আলিঙ্গন।
লজ্জা করি অভাগিনী নাহি দিল মন ॥
প্রভু প্রভু বলি বেউলা হইল উতরোল।
লখাইয়ের সন্তাপে বেউলা বালিশে দিল কোল ॥
পাপিষ্ঠ তুলার বালিশ মুখে রাও নাই।
বুকে হস্ত দিয়া বলে কি করিল গোসা ॥
আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পরে ডাল।
নারী হইয়া এই যৌবন রাখিব কত কাল ॥
সোনা নহে রুপা নহে অঞ্চলে বাঁধব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাই পাব ॥

খণ্ড তপস্বিনী মুই করিলাম খণ্ডব্রত।
তে কারণে অভাগিনীর টুটিল আইসর।
কার লাগি করিলাম চুরি সোনার ভাণ্ডার।
সেই লাগি বিধবা যোগ হইল আমার।
ডান হাতে নর সিং পতি, বাম হাতে বাতি।
ঔষধ তালাশে যায় বেউলা যুবতী ॥
বেউলা বলে বাহিরেতে কোন ভাই জাগে।
অভাগিনীর স্বামী দংশিয়া গেল নাগে ॥
নাগিনি দংশিয়া গেল চম্পকের রাজা।
কোথায় গিয়া পাব আমি গারুরিয়া ওঝা।

এদিকে রাত ভোর হলো, সোনেকা মনে মনে বলে, রাতে ছেলে বৌ এল, না দেখিলাম নয়নে, তবে বাড়ির নারীদের নিয়ে বর কনে আনব। সোনেকা তাই নারীদের নিয়ে রওয়ানা হলো। কাছাকাছি গিয়া বেউলার কান্দন শুনে নারীরা বলে, ও সোনেকা তোর বধূ কেন কান্দে? তাই শুনে সোনেকা বরণ কুলা ফেলে দ্বারে গিয়া দেখে বেউলা স্বামী কোলে করিয়া কানতেছে।

www.pathagar.com

সোনেকার বিলাপ

আমার কপালে বিধি এমন লিখিয়াছিলি
কলমে না ছিল কালি
কাহার হরিলাম ধনজন
লখাই মরিল তে কারণ
পুত্রশোকি বলে মোরে কে দিবে গালি ॥
লখাইরে কোলে লইয়া
সোনেকার বিধরে হিয়া
কাল ছিলা মোর পাত
রূপে গুণে অদ্ভুত
যেন কামদেব সমান
অহ পুত্র লখিন্দর মোর প্রাণের দোসর
আজি কোথা কারে দিলাম ডালি
কাহার হরি ধন কেবা করিল এমন
পুত্রশোকি বলি দিল গালি
লখাইরে কোলে লইয়া
সোনেকার বিদরে হিয়া
ভূমিতে পড়িয়া মোহ যায়
সোনেকার করুণা শনি
সব লোক শোকাকুলি ॥

চান্দর বিলাপ

হেন তোর দিব্য জ্ঞান
বিষহরি পদ ধ্যান
তাহা না রাখিলা কি কারণ
কল্য আসিল পুত
রূপগুণে অদ্ভুত।
যেন কামদেবের সমান ॥
উজানি নগরে গিয়া
তোমারে করিল বিয়া
আজি কেন না করে বোলান।
না পূজিলা পদ্মাবতী
কানী বলে কর সম্বোধন ॥

www.pathagar.com

কুপিত যে পদ্মাবতী
তাই সে এমন গতি
কানী বলে ডাক সর্বদায় ।
তারে কি করিব রোষ
আপনার কর্মদোষ
এত বলি ভূমিতে লোটায় ॥
বিস্তর কঠিন
বড় লইয়া পদ্মসেবি
বিয়া হইলে হরিবে মনসা
শ্রীপুরুষোত্তম দাস
কর মোরে কর অভিলাষ
তে কারণে হইল হেন দশা ॥

ভাসান

চান্দ মনের রাগে বেউলাকে অনেক গালি দিতে লাগল। বেউলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিলেন আমি স্বামী নিয়ে দেবপুরে যাব আর দেবের দেব মহাদেবের কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাব ।

এদিকে চান্দ মৃত পুত্রের দেহ সৎকারের জন্য প্রস্তুতি নিতেছেন। তাই দেখে বেউলা শ্বশুরকে বলেন, সাপকাটা মানুষ সৎকার করতে নাই। একে ভেলায় করে নদীতে ভাসাতে হয়। যদি কোন গারুলিয়ার কাছে পড়ে তবে তারা বাঁচাতে পারে। তখন চান্দ বলে সাথে কে যাবে? বেউলা বলে, সাথে আমি যাব। চান্দ বলে, ভালো বলেছ, আমার ছেলেকে ফেলে তুমি পরপুরুষের সাথে চলে যাবে। বেউলা বলে, আমি যদি সতী নারী হই তবে ছয় মাসের মধ্যে স্বামী নিয়ে আসব। চান্দ একথা শুনে বেউলাকে অনেক পরীক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ।

বেউলা তাই শুনে বলে আমি ১টি নিদর্শন থুইলাম, শুকনো সিদ্ধ ধান, সিদ্ধ হারিদ্রা, ৭ দিনের ভাজা কলাই এক জায়গায় রাখিলাম, সিদ্ধ ধানেতে মেলি যদি অংকুর, তবে সে জানিও আমি গেলাম দেবপুর। সিদ্ধ হরিদ্রায় মেলিল যদি পাত তবে জানিও জিয়ালাম প্রাণনাথ। ভাজা কলাইতে যদি মেলিল অংকুর তবে জানিও জিয়ালাম ছয় ভাসুর। এই তিন দর্শন থুইলাম এক ঠাঁই। আর এক নিদর্শন আছে বাসরে। হাঁড়িতে চড়াইলাম চাউল নাহি জ্বাল, পরিপূর্ণ জ্বাল দিয়ে রাখ চিরকাল। বিনা আগুনে যদি ভাত তবে সে জানিও দেশে আগুরি। তাই শুনে সোনেকা চান্দ বেউলাকে কোলে নিয়ে কান্না আর কান্না। এর পরে চান্দ ভালো মালী এনে ভেলা তৈরি করতে আরম্ভ করল। ভেলায় উঠার সময় ছয় মাসের যা যা দরকার বেউলার সাথে দিল। বেউলা স্বামীর সাথে রওয়ানা হলো ।

www.pathagar.com

চান্দ সোনেকার বিলাপ

কোথায় যাওরে আমার নন্দ দুলাল
তোমারে বিদায় দিয়া খারা হইয়া চাই ।
মা বলিয়া কে ডাকিবে হেন লক্ষ্য নাই ।
ভূমিতে পড়িয়া চান্দ করে গড়াগড়ি ।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে সোনেকা সুন্দরী ।
শোকাকুলি হইয়া সবে রহিল ঘর ।
মধ্য সাগরে বেউলা ভাসে একেশ্বর ।
বেউলা বলে হরি হরি জগতের পতি ।
সৃজনে সৃজন তুমি পালনে পালন ।
প্রলয় সংহার তুমি দে নারায়ণ ।
প্রজার কারণে তুমি গুনে আলাম্বত ।
সংসারে পাপ পূর্ণ তোমার বিদিত ।
জন্মে জন্মে যদি মুই পূজিনু সংকর ।
শত জনমে পতি যেন হয় লখিন্দর ।
স্বপ্নেতে নাহি জানি অন্য পুরুষ ।
বিনা বায় চলুক কলার মাঞ্জুস ।
কি ক্ষণে দেখিলাম মুই মুক্তা সরবরে
ঘরে গিয়া অভাগিনী পাসরিতে নারে ।
এতেক বলে বেউলা হেট করে মাথা ।
অন্তরীক্ষ হইতে দেখে সকল দেবতা ।
বিষম তরঙ্গে পরি চারিদিকে চাই ।
এই সময় রক্ষা করে হেন বন্ধু নাই ।
গা তোল গা তোল প্রভু কত নিদ্রা যাও ।
নদীর হিল্লা বড় চক্ষু মেলে চাও ॥

এমতাবস্থায় মনসা বেউলা ভেলার কাণ্ডারি হলো । মনসা বলে, তুমি যথায় ইচ্ছা তথায় যাও, ভয় নাই আমি আছি । বেউলা এমনি করে নদীতে ভাসতে আছে । এমন সময় নাগ শ্বেত কাক হয়ে উড়তে লাগল এবং বেউলার মাঞ্জুসে উড়িয়া পড়ে । বেউলা কিছু বুঝিতে পারে না । তখন পদ্মা অন্তরীক্ষে থাকি বলে কাকের কাছে যাও । বেউলা ভাসতে ভাসতে অনেক দূর গেল । দেখে কেয়া পাতা তাতে লিখিল মা-বাপের কাছে কিছু বার্তা । প্রথমে জানাল মা-বাবার কাছে প্রণাম, তারপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিল । শ্বেত কাক উজানী নগর চিঠি নিয়ে চলে গেল । বেউলার মা সেনেকা দেখে একটা শ্বেত কাক উড়তেছে, তার মুখে একখানা পত্র, তাই দেখে বলে, যদি থাকে কোন আউল তবে পড়ি দক্ষিণের চাল । তাই শ্বেত কাক পত্রখানা রাখিল দক্ষিণের চালে । পত্রখানা এনে হরি সাধুর স্ত্রীর কাছে দিল ।

www.pathagar.com

হরি সাধুর স্ত্রী পত্রখানা পড়ল। তারপর শাশুড়িকে বেউলার সব সংবাদ শুনাল। পড়তে পড়তে অজ্ঞান হলো। মা হরি ঠাকুরকে ডেকে বলে ওরে হরি, বেউলা তার মরা স্বামী নিয়ে নদীতে নদীতে ভাসে, ও হরি বেউলাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়, ওরে হরি–এই বলে সুমিত্রা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। হরি সাধু অমনি নদীর তীরে চলে গেল। ডাকে, ও বেউলা, ও বেউলা। বেউলা বলে যাব না। আমি দেবপুরে যাই। আমাকে আর্শীবাদ কর। আমি স্বামী ভাসুর চৌদ্দ ডিঙা জিয়াতে যাই। এই বলে মাঞ্জুস অনেক দূরে চলে গেল। হরি সাধু আর দেখে না। সাধু নিরাশ বদনে চলে আসল। মাকে বলে, কত ডাকাডাকি করলাম বেউলা ফিরে চাইল না।

সুমিত্রার বিলাপ

(বেউলা ওগো প্রাণের বেউলা)
জীয়ন্তে শরীরে তুমি মরার সঙ্গে গেলা।
কোথা গেলে আরে সওদাগর
সংসার খুঁজিয়া তুমি না পাইলা বর
কোথা হতে আনিলা জামাই নাগের বাদুয়া
নাগের বাদুয়া ঠাঁই বেউলার দিলা বিয়া।
কোথা গেল আরে পুত্র হরি সওদাগর।
বেউলারে আনি মোর প্রাণ রক্ষা কর।

গোদার ঘাট

এক দুই দিনে গেল গোদার ঘাট। গোদা জাতিতে কৈবর্ত। মাথায় লম্বা চুল, গোদা নিরবদি বড়শি বায়, প্রত্যেটা বড়শি এখন উজানে। বেউলাকে বিয়া করতে শখ হলো। আর বলে, মনে কর গোদার কোনো ধন নাই। না আছে এক এক হবে চারিপণ করি আছে।

এই বলে বেউলাকে ধরতে নদীতে ঝাঁপ দিল। তখন বেউলা ভয়ে পদ্মার শরণ নিল। পদ্মার কোপে গোদার হাত পায় চারি বড়শি পুঁতে গেল। বেউলার চলে গেল, আর গোদা ওখানে ওখানে বাঁধা রইল।

আপু ডোমের ঘাট

আপুডোম বেউলাকে দেখে বিয়ে করতে মন চাইল। আর বলে, তুমি কোন বংশে জন্ম, কার দুহিতা। বেউলার কাছে পরিচয় জানতে চাইল। বেউলা পরিচয় দিল। ডোম পরিচয় পেয়ে বলল, তোমার মরা নদীতে ফালাও, আমাকে বিয়া কর, আমি তোমাকে ভালো ভালো শাড়ি দেবো, আর ভালোভাবে যত্ন করে রাখব। তাই শুনে বেউলা অভিশাপ দিল। ডোম ওই খানে পড়ে রইল। দুই দিবসের গেল ধোনা ধোপার ঘাটে।

www.pathagar.com

ধোনা ধোপার ঘাট

ধোনা ধোপা দুই ভাই। দুই ভাই নৌকা লইয়া গেল মাঞ্জুসের কাছে। দুই ভাইর সকল কথা খুলিয়া বলল। বেউলা তুমি স্বামী রাখিয়া লও, সতীনের ভয় নাই। বেউলা তাদেরকে কিছু আর্থিক সাহায্য করল। আর বলল, ফেরার পথে তোমাগো বিয়া করব? এই বলে গেল টেটনের ঘাটে।

টেটনের ঘাট

ধোনার ঘাট হয়ে টেটনের ঘাট যায় তখন দেখে টেটন গলায় দড়ি বেঁধে নদীতে মরতে উদ্যত। তখন বেউলা বলে, কী করছ, কেন মরতে যাচ্ছ। টেটন বলে, আমি জাতিতে মালাকার। জুয়া খেলতে সব ধন হারিয়েছি। তাই আমার নাম জুয়ার টেটন। এখন আমার ঘরে কিছুই নাই। জল তাও নাই। এই দুঃখে আমি মরতে এসেছি। এই কথা শুনে বেউলা কিছু ধন দিয়ে গেল আর বলল আমি ফেরার পথে তোমাকে আরও ধন দিব। আর বিয়া করায়ে যাব। তুমি এই দিয়ে কিছু কাল খাও। এই বলে টেটনের ঘাট ছেড়ে চলে যায়, তারপর এক অরণ্যে জলে ভুরাখানা ঠেকে।

নাগের বাঘ রূপ ধারণ

ওই বন থেকে এক ভয়ংকর বাঘ বের হয় এবং হাম হাম করে শব্দ করে। তখন বেউলার খুব ভয় হলো আর বলল, তুমি বনের প্রধান তাই তোমাকে নমস্কার করি। প্রণাম করে বলে, আমার বিয়ার রাতে স্বামীকে নিদারুণ সাপে খায়। তাই মরা স্বামী লয়ে দেবপুরে যাই স্বামীর প্রাণ ভিক্ষার জন্য। যদি আমার স্বামীকে খাও তার আগে আমাকে খাও। স্বামীরে খাইলে আমার বেঁচে থাকার কোনো ফল নাই। আর আমার হবে এই জগতে অপযশ। এই কথা শুনে বাঘ বলে, আমি পদ্মার অনুরোধে আসি। বাঘ বেউলাকে বলে, অষ্টনাগ ছেড়ে দাও, আর চার দিনের মধ্যে দেবপুর পাবা, ঐ যে মনসার ঘরের চরা দেখা যায়। আশীর্বাদ করে বাঘ চলে যায়।

নাগের চিল রূপ ধারণ

চিল হয়ে যায় নাগ। সমুদ্র মাঝে মানুষ দেখে চিল ঝাঁপাতে লাগিল। তাই দেখে বেউলা বলে তোমার জামাই, এই শুনে নাগ ঘরে চলে গেল। আর বেউলা অষ্টনাগ ছেড়ে দিল। বেউলা নাগের প্রতি অভিশাপ করল, মানুষ দংশিলে যেন লেজ খসে পড়ে। তারপর দু একদিনের মধ্যে যায় ধোপানির ঘাটে।

ধোপানির ঘাট

ধোপানির ঘাটে যাইয়া স্বামীর হাড়গুলো জলে ধুয়ে সোনার হাঁড়িতে ভরে মাটিতে পুঁতে রাখল। তারপর ধোপানির পুকুর ধারে গেল। গিয়ে দেখে নাগ দেবতাদের কাপড়

www.pathagar.com

ধোয় । তার পুত্র ধনপতি তা রৌদ্রে শুকায় । তারপর পুকুরে নামে নাগের পা ধরে, নাগ চিৎকার করে বলে, কুমির কুমির । বেউলা জল হতে জাগল । নাগ তখন হাত ধরে নিয়ে গেল । ধনপতি দেখে আনন্দিত হলো, মায়ের কাছে বলে, আমি করব বিয়া । নাগ ধনপতিকে বলে, এতো জলকন্যা নয়, এ যে আমার বোন ঝি । নাগ বেউলাকে বলে, তোমার কোনো চিন্তা নাই । তুমি এখানে কিছুদিন থাক, তারপর একটা ব্যবস্থা করব । বেউলা কিছুদিন থাকল । আর ধোপানির কাজ করতে লাগল । পদ্মার কাপড়ে শুধু পদ্ম ছাপ দিচ্ছে । একদিন পদ্মার সখিরা ঐ পুকুরের স্নানের জল নিতে আসে । প্রধান সখির কলসটা বন্ধ করে রেখেছে । কলস ধরে টানাটানি করছে কিন্তু কলস নড়ে না । আর বেউলার আঙুলি দিল কলসের মধ্যে ।

প্রধান সখি ও অন্য সখিরা চলে গেল । তারা পদ্মার কাছে বলে, আমরা সকলে আসিয়াছি, একজন আসে নাই । তার কলস নাড়াতে পারে না । তাই দেখে বেউলা কলস ছুঁয়ে দেয়, সখি কলস নিয়ে চলে গেল । নাগ বেউলার গুণ ও ক্ষমতা দেখে কী যেন ভাবে । ভাবতে ভাবতে পদ্মার নিকট গেল, বলে বেউলার স্বামী জিয়াইয়া দাও । পদ্মা শুনে মনে মনে খুব রাগ করল । নাগকে বলে, পদ্মাকে ঘর থেকে বের কর তারপর বেউলার স্বামীকে জিয়াই । নাগ বুঝতে পারল ও জিয়াইয়া দিবে না । নাগ বেউলাকে বলে, তুমি আমার ঘর থেকে যাও । এত দূরে এলে তবু পদ্মার দ্বারা উদ্ধার হবে না । তবে আমি বলি, তুমি শুন, তুমি শিবপুরে যাও, সেখানে গিয়ে নৃতগীতে শিবের মন জয় কর, আর বর চাও । এই রাত্রি শেষে চলে যাও । ধনপতির ২টা মৃদঙ্গ আছে তার একটা তোমাকে দিয়ে দেবো । ধনপতিকে যা বলার আমি বলব ।

এই কথা শুনে বেউলা শিবপুরে চলে গেলেন । গিয়া শিবের সামনে নৃত্যগীত আরম্ভ করলেন । বেউলার নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে বলেন, তুমি কার স্ত্রী, কার পুত্রবধূ? বেউলা বলেন আমি চান্দের পুত্রবধূ লখিন্দর আমার স্বামী, বিয়ার রাতে আমার স্বামীকে সর্পে দংশন করে । তাই আমার স্বামী জিয়াতে এসেছি । সম্বন্ধে তুমি আমার নাত বৌ, স্বামীতে দরকার কি, আমি তো আছি (রহস্য) । বেউলা আবার নৃত্যগীত শুরু করল, তাহাতে আনন্দ পাইয়া বলে এখনি তোমার স্বামী জিয়াইয়া দিতেছি । দেবতাদের পদ্মার কাছে পাঠালেন কিন্তু সে আসল না । তারপর গণেশকে পাঠালেন তাতেও আসল না । পরে কার্তিক গেলেন । বলেন, দিদি তুই যাবি কিনা বল, যদি না যাস তবে বাবায় জিয়াইয়া দিবে । তোর এ ধরায় পূজা হবে না । কার্তিকের কথা শুনে পদ্মা শিবের নিকট এলেন । শিব বলেন, মনসা বেউলার স্বামী জিয়াইয়া দাও । মনসা বলে, আমি পারব না । ওর স্বামী কিসে মরেছে আমি কি তার জানি? মনসার কথা শুনে বেউলা বলে, আমার স্বামী খাইছে এখন নাকি বলে আমি কি জানি? ও যখন এ কথা বলে তবে অষ্ট নাগকে সংবাদ দিয়ে আনুক ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন ওরা বলবে । তার প্রমাণ কাপড়ের আঁচল থেকে অষ্টনাগের লেজ বের করে শিবের সামনে দিলেন । শিব তাই দেখে মনসাকে বললেন, কিরে মাথা নিচু হয়ে রইলি কেন? মনসা বলে, আমি সব

www.pathagar.com

কল্যাণ করতে পারি। চান্দ যদি আমার পূজা করে তবে আমি জিয়াইয়া দিব। বেউলা স্বীকার করলেন আর বারো মাসের সংবাদ বলেন আর ছয় মাসের সংবাদ শিবেরে বলেন। তারপর পদ্মা বেউলাকে বলেন, তোমার স্বামীর হাড়গুলো আন। বেউলা স্বামীর হাড়গুলো পদ্মার সামনে এনে দিল। মনসা হাড়গুলো সাজালেন।

লখিন্দর জিয়ান

ও বিষ নাইরে।
লখাইর শরীরে নাইরে ॥
ধ্যানেতে বসিয়া পদ্মা তক্ষকের মাতা।
বাম পাশে বসিলেন ধোপাঝি নেতা ॥
ডাইনে বসল পদ্মা বামে গংগা দেবী
পদ্মাবতী মন্ত্র পরে শিবের পদ ভাবিয়া ॥
আর কালকুট তোর নাম নাই।
অমৃত মন্থনে তোরে সাজিল গোসাই ॥

কাজল বরণ বিষ চলে কোমল শরীর।
হের আস ডাকে তোরে গরুর মহাবীর ॥
ক্ষীর নদী সাগরে জলিয়া দিল খেত।
বিষ খাইয়া ঢলিয়া ছিল ঈশ্বর মহাদেব ॥
ধোপানির মন্ত্র বলে ধনন্তরি শিব।
পদ্মার শরণে বিষ ঘা মুখে আয় কালকুট বিষ ॥

বেউলার স্বামী জিয়াল। তারপর বেউলা আবার নৃত্যগীত আরাম্ভ করল। শিব বলে আবার কি চাও? বেউলা বলে, আমার ছয় ভাসুরসহ চৌদ্দ ডিঙ্গা, ডিঙ্গা না হইলে কেমন করে দেশে যাব। ভাইদের ছয় রাঁড়িকে কি বলব। আমি বা রাঁড়ি কেমন করে দেখব। তাই বেউলার অনুরোধে পদ্মাকে বলে, বেউলার সবগুলো হাড় উদ্ধার করে দাও। পদ্মা গঙ্গার নিকট হতে সব হাড় উদ্ধার করে দিল। আর শিবের আশীর্বাদ নিয়ে দেশে রওনা হলেন। দেশে ফেরার পথে যার যা দাবি ছিল পূরণ করলেন। গোদাকে কেটে তার রক্ত দিয়ে স্নান করাল। তারপরে হিরার ঘাটে ডিঙা লাগল। ওখান থেকে বাড়ি চলল।

স্বামী ভাসুরের কাছে বলে, আমি দেখে আসি কেমন আছে। শ্বশুর শাশুড়ি এবং ছয় রাঁড়ি সকলকে প্রণাম করে চলে গেলেন। কিন্তু ডোমনি বেশ ধরে বাড়িতে গেলেন ভিক্ষার ছলে। সোনেকা ডোমনিকে দেখে কাঁদতে লাগল। ডোমনি বলে আমাকে দেখে কেন কাঁদেন? বলেন, তোমাকে তো আমার বেউলার মতো দেখায়। এ কথা বলে জড়াইয়া ধরে আরো কাঁদে। বলে, যদি বেউলা হয়ে আমার পুতরে মেনে দিয়ে ডোমেনির ঘরে গৃহবাস কর তাই যদি মনে হয়। তবে তুমি বাহির বাড়িতে থাক। লখাইয়ের পরিবর্তে তুমি থাক। তোমাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়াই। এই তার মনের

www.pathagar.com

কল্পনা। ডেমনিকে মান পাতায় পান্তা ভাত দিলে ডোমনি খেলেন না। বাইরে এনে মাটিতে পুঁতে রাখলেন।

তারপর ফিরে আবার ডিঙ্গায় চলে গেলেন। ডিঙ্গায় বসে পুনরায় বাসি বিয়া হলো। কিন্তু ৭ ভাইয়ের মনে সন্দেহ জাগল। যে ছয় মাস একা একা নদীতে ভাসছে তবে কি সতীত্ব হারালো? তাই মন মানতে পারল না। বেউলা কিনারে উঠে নল দিয়ে এক এক আঙুল ফাঁক দিয়ে একটা খাড়ুই বুনে এক খাড়ুই জল ভরে নাড়াতে এবং নাচতে লাগলেন। কিন্তু জল পড়ছে না, এই দেখে তাদের সন্দেহ কাটলো। এদিকে স্বপন দেখেন সোনেকা, হিরার ঘাটে বেউলাসহ ৭ ছেলে সোনাই পণ্ডিতসহ ১৪ ডিঙা এসেছে। ভোরে দিকে সোনেকা বরণ কুলা নিয়ে হিরার ঘাটে গেলেন। সাথে চান্দ গেলেন। দেখেন মধ্য গাঙ্গে চৌদ্দ ডিঙা ময়ূর পঙ্খির নায় বেউলাসহ ৭ ভাই। অন্য ডিঙায় বাকি লোকজন। সোনেকা বিলাপ করে কান্দে আর বলে, লখাই আয় আয়রে কোলে তোর মায়ের প্রাণ জুড়ায়। বেউলা বলে, না ডিঙা তীরে ভীড়বে না। আমরা আবার দেবপুরে যাব ফিরে। আর যদি আমার শ্বশুরে পদ্মার পূজা করে তবে ডিঙা কিনারে ভীড়বে।

চাঁদ সওদাগর বলল, আমি পূজা করব বাম হাত দিয়ে। কারণ ডান হাত দিয়ে আমি শংকরের পূজা করি। আমি বাম হাত দিয়ে দেবো প্রণাম। এই যদি হয় তবে আমি পারব, না হয় তোমরা চলে যেতে পার। পদ্মা বলে তাতেও হবে। প্রয়োজনে আমি এবং ভবানী এক রূপ হয়ে আসব। মনসা সব মেনে নিলেন, তারপর চান্দ মনসার মন্দির সুন্দর মতো তৈরি করলেন। তারপর লক্ষ টাকা নিয়ে বাজারে গেলেন আর মনের আনন্দে পূজার বাজার করলেন। পূজা আরম্ভ করলেন। তখন পদ্মা .বলে চান্দকে, তোমার হাতের হেতাল কেটে পাতালে দিতে হবে। না হইলে তোমার পূজা হবে না। চান্দ তাই করল, চান্দ সোনেকা পূজায় বসিল।

নমস্তে আস্তিমাতা ভক্ষকের জননী
নমস্তে ব্রাহ্মণী দেবি জগৎ কারুর রমণী ॥
নমস্তে বিষহরি সর্বদুঃখনাশিনি।
নমস্তে জগৎমাতা ভব ভয় নাশিনি ॥
নমস্তে পাতাল রূপা পুষ্প বন বাসিনি।
নমস্তে অখিল রূপা বরিসুত তাপিনি।
নমঃ নমঃ ভগবতি হরগৌরি মোহিনি।
নমঃ নমঃ নাগরূপা নাগ বংশ রক্ষিণী।
নমস্তে মনসা দেবী সর্পশত্রু নাশিনি।
তুমি রক্ষ, তুমি মোক্ষ, তুমি বিশ্বজননী।
তুমি জল, তুমি স্থল চরাচর বন্দিনি।
সৃষ্টি স্থিতি তুমি, তুমি মূলধারিনি ॥

www.pathagar.com

চান্দর পূজা শেষ হলো। তারপর মনসা বলেন, তোমার বর চেয়ে নাও। চান্দ সোনেকা খুশিমতো বর চেয়ে নিল। বেউলা বর চাইল। আমরা দুইজন আর শ্বশুর শাশুড়ি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারি। মনসা সেই বর দিলেন। পরে লখাই বেউলাকে সোনেকা ঘরে তুলে নিলেন। কিন্তু এলাকার মানুষের সংশয় হলো যে বেউলা সতী নাই।

কারণ ছয় মাস পর্যন্ত একা একা জলে ভাসছেন। তার সতীত্ব থাকতে পারে না। বেউলার কঠোর পরীক্ষা না করে তাকে রানি করা যায় না। বেউলা বলেন, আপনারা যে পরীক্ষা করবেন তা আমি মাথা পেতে নেব। রাজসভায় সবাই মন্তব্য করলেন, সীতার মতো অগ্নি পরীক্ষা। বেউলা তাই স্বীকার করে নিলেন।

সবাই বলেন ঘৃত অনলে পুড়তে হবে।
হেন কালে বেউলা আসিয়া সবার বিদ্যমান।
বেউলা বলে তোমরা সবে বর চান।
অনিরুদ্ধ উষা এই আমরা দুই জন।

... ...

দোহে চলিয়া যাব মহাদেবের পুর।
চম্পক নগরে আমরা কহিব আর।
এইক্ষণে যাব মোরা স্বর্গের দ্বার।
সোনেকা কহে বধূ তুই বড় দারুণ।
চলিবারে চাই তুমি নির্ভয় থাকুন।
তোমার গুণে হইল মোর সকলই উদ্ধার।
তোমার কারণে হইলাম শোক সাগর পার।
বেউলা বলেন শাশুড়ি তুমি পরম দেবতা।
বার বৎসর সম্পূর্ণ হইল রহিতে পারি না হেতা।
স্বর্গ হইতে রথ আসিবে আমার দোহার।
মেলানি দেও ঠাকুরানি কাজ নাহি আর।
এতেকে শুনিয়া সবে হইল বিস্মিত।
কহিতে কহিতে রথ আসিল আচম্বিত।
গুরু ব্রাহ্মণ যত দিলাম চরণ।
রথে আহরণ করেন দুই জন।
অন্তরধ্যান হলে সবের বিদ্যমান।
হরি হরি বলিয়া বিস্মিত সর্বজন।
অনিরুদ্ধ ঊষা দেখি শিব আনন্দিত।
প্রণাম করিয়া দোহে করে নৃতগীত।
পুত্রবধূ শোকে চান্দ দুঃখ ভাবে মনে।
হাতে মনসার করায় স্তবন।

www.pathagar.com

তোমার প্রসাদে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ।
পুত্রবধূ শোকে মোর বিদুরিছে বুক।
আপনি দিয়াছ বর না যায় খণ্ডন।
সংসারে আমার আর নাহি প্রয়োজন।
নানাবিধ স্তব করে চম্পকে রহিয়া।
কাল পাই স্বর্গে গেল চান্দ বনিয়া।
... ...
দম্পতিকে কর কর কল্যাণ কুশল।
নানাবিধ সুখভোগ বঞ্চিবা চিরকাল।
অবশেষে গাইনে বইনে মাগিয়া লও বর।
ঘরে দিবা ধনজন গলায় দিবা স্বর।
জয় জয় হুলাহুলি করে দেবপুরী।
মনসা আমন্ত্রণে সবে বলে হরি হরি।

[সংগ্রাহক : পিযুষচন্দ্র রায়, পিতা : মৃত হরেকান্ত রায়, মাতা : সুশীলা রানি, গ্রাম : গুদিঘাটা, উপজেলা : বামনা, জেলা : বরগুনা।]

পিযুষচন্দ্র বলেছেন, তিনি তার মায়ের কাছ থেকে এই কাহিনি শুনেছেন। তাঁর মা সুশীলা রানি জানিয়েছেন, তার স্বামী হরেকান্ত রায় রয়ানির দলে ছিলেন। তাদের বাড়িতে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের ছিন্ন একটি পুথি দেখা গেছে। অনুমান করা যায় হরেকান্ত রায় এই কাহিনি ওই পুথি থেকে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো বরগুনা অঞ্চলেও অনেক লোকক্রীড়ার প্রচলন রয়েছে। লোকক্রীড়াগুলোতে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষই অংশগ্রহণ করে থাকে। বরগুনা অঞ্চলের বেশ কিছু নিজস্ব খেলা আছে। নিচে সেসব খেলার নাম উল্লেখ করা হলো।

১. হাডুডু/কাবাডি
২. সাত চাড়া
৩. পিঠ ফাটানি
৪. বউ ছি
৫. দাঁড়িয়াবান্ধা
৬. মোরগ লড়াই
৭. ষোল গুটি
৮. তিন গুটি
৯. কানামাছি
১০. গোল্লাছুট
১১. কুত কুত (বোবা কুতকুত, কেঁচি কুতকুত)
১২. চোর-পুলিশ
১৩. ছি বুড়ি
১৪. কোত্তাল-বাদশা
১৫. সাত পাতা/ পাতা পাতা
১৬. গদগুটি
১৭. পলাপলি/লুকোচুরি
১৮. রুমাল চুরি
১৯. মার্বেল
২০. ওপেন টু বাইস্কোপ
২১. নৌকা বাইচ
২২. লাঠি খেলা
২৩. ষাঁড়ের লড়াই
২৪. ঘোড়ার দৌড়
২৫. পুতুল খেলা
২৬. নুনতা খেলা

www.pathagar.com

২৭. রান্নাবান্না খেলা
২৮. কুমির কুমির খেলা
২৯. এলোনা বেলোনা খেলা
৩০. হাত পাঞ্জা খেলা
৩১. ইটকুড়ি মিটকুড়ি
৩২. ঘুঘুসই
৩৩. ইচিং বিচিং

নিম্নে কয়েকটি খেলার বিবরণ দেয়া হলো :

১. গোল্লাছুট

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত যতগুলো খেলা রয়েছে তার মধ্যে গোল্লাছুট অন্যতম। গ্রামের কিশোর-কিশোরীর স্কুলের টিফিনের ফাঁকে অথবা বিকেলের সময়টাতে খেলার জন্য একটি জনপ্রিয় খেলা এই গোল্লাছুট।

মূলত গোল্লাছুট খেলাটি খেলতে হয় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে। প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নির্বাচিত হয়ে থাকে। তারপর দুজন দুজন করে জোড়া বেঁধে তাদের ছদ্মনাম নিয়ে দলনেতার কাছে আসে। তারপর তারা বলে–

ডাক ডাক বে...লী
তারপর দলনেতা বলে–
আমরা সবাই খেলি
তারপর তারা বলে–
কে নেবে আম কে নেবে জাম?

এরপর দলনেতা যার নাম ধরে ডাকে সেই ছদ্মনামধারী তার দলে চলে যায়। গোল্লাছুট খেলায় খেলোয়াড়ের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। তবে অবশ্যই তা দুই দলে সমান হতে হয়।

খেলার নিয়ম

যেহেতু খেলাটির নাম গোল্লাছুট, তাই বোঝাই যাচ্ছে যে এই খেলায় প্রয়োজন একটি গোল্লার। তাই প্রথমে একটি গোল্লা তৈরি করা হয়। মাটিতে একটি গোল দাগ দিয়ে গোল্লা বানানো হয়। মাঠের যে প্রান্তে গোল্লা তৈরি হয় তার ঠিক অপর দিকে প্রায় ৬০-৭০ গজ দূরে তৈরি হয় সীমানা। গোল্লা থেকে সীমানার দিকে ছুটে যাওয়ার জন্যই এই খেলার নাম দেওয়া হয়েছে গোল্লাছুট।

যে দল প্রথমে খেলার জন্য ঠিক হয় সেই দলের দলনেতা গোল্লার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে। আর দলনেতার হাত ধরে একের পর এক হাত মিলিয়ে সবাই শেকল আকারে গোল্লার বাইরে থাকে। তবে হাত ছাড়া যাবে না। অন্য দিকে অপরপক্ষের খেলোয়াড়

www.pathagar.com

সীমানার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে শেকল থেকে প্রথম জন যখন সুযোগ বুঝে দৌড় দেয় সীমানার উদ্দেশ্য তখন অপরপক্ষের সবাই তাকে ছুঁতে চেষ্টা করে। শিকলে থাকা অবস্থায় যদি প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে ছোঁয়া যায় তবে সে মরা বলে গণ্য হবে এবং সে আর খেলতে পারবে না। সুযোগ বুঝে শেকল ভেঙে সীমানার দিকে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যদি প্রতিপক্ষের কেউ তাকে ছুঁয়ে ফেলে তবে সেও মরা বলে গণ্য হবে এবং আর খেলতে পারবে না। আর যদি সে সীমানা অতিক্রম করতে পারে তাহলে সে পেকে যায় (সীমানা অতিক্রমকারীকে পেকে যাওয়া বলে)। এরপর পেকে যাওয়া খেলোয়াড় গোল্লা থেকে জোড়া লাফ দিয়ে সীমানার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ফলে খেলা অনেক সহজ হয়ে যায়। যে গোল্লা পাহারা দেয় সে যদি সীমানা অতিক্রম করতে পারে তাহলে খেলায় চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হয়। যদি কোন কারণে গোল্লা পাহারাদার মারা যায় (প্রতিপক্ষের কারো দ্বারা স্পর্শিত হলে) তাহলে সেখানেই খেলা শেষ এবং প্রতিপক্ষ খেলার সুযোগ পায়। এর জন্য গোল্লা পাহারাদারকে সবসময় চোখে চোখে রাখা হয় যাতে সে সীমানা অতিক্রম করতে না পারে। এর জন্য সহখেলোয়াড়েরা সীমানা অতিক্রম করে পেকে গিয়ে জোড়া লাফের মাধ্যমে গোল্লাকে সীমানার কাছে নিয়ে আসে যাতে গোল্লা পাহারাদার সহজেই সীমানা অতিক্রম করে চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে পারে।

একসময় বরগুনার সর্বত্র কিশোর-কিশোরীর কাছে জনপ্রিয় খেলা ছিল এই গোল্লাছুট। দিন দিন এর জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করেছে। পর্যাপ্ত মাঠের অভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, স্যাটেলাইটের প্রভাব ইত্যাদি নানা কারণে আজকের কিশোর-কিশোরী আর সেই সীমানার দিকে ছুটে চলার আনন্দ উপভোগ করে না। আর তাই দিন দিন আমাদের লোকসমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজস্ব খেলা।

২. ওপেন টু বাইস্কোপ

মেয়েদের কাছে ওপেন টু বাইস্কোপ খেলাটি খুবই প্রিয় একটি খেলা। গ্রামের মেয়েরা এখনো নিয়মিত এই খেলাটা খেলে যাচ্ছে। এটি একটি সহায়ক খেলা। দল গঠন করার জন্য এই খেলাটি খেলা হয়। এই খেলাটির সাথে জড়িত ছড়া-গানটি ব্রিটিশ যুগের ইংরেজ সাহেবদের বিনোদনের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ওপেন টু বাইস্কোপ
নাইন টেন তেইশ কোপ
সুলতানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বলেছে যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের আগায় মরিচ বাটা

www.pathagar.com

স্প্রিংএর চাবি আঁটা
যার নাম মনিমালা
তাকে দেবো মুক্তার মালা ।

দুজন দলপতি ফুল অথবা ফলের নামে নিজেদের দলের নাম নির্বাচন করে। তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে একটি তোরণ নির্মাণ করে। খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে রেলগাড়ির মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছড়া বলতে বলতে এই তোরণের নিচ দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে। ছড়া শেষ হবার মুহূর্তে যে খেলোয়াড় তোরণের মধ্যে অবস্থান করে তাকে দলপতিরা হাতের মধ্যে বন্দি করে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কোন দলে যোগ দেবে। তখন সে তার পছন্দের দলে যোগ দেয়। এভাবে প্রতিটি খেলোয়াড় দুই দলে বিভক্ত হয়ে মূল খেলা শুরু করে।

কখনো কখনো মূল খেলা হিসেবেই ওপেন টু বাইস্কোপ খেলাটি খেলা হয়ে থাকে।

৩. হা-ডু-ডু বা কাবাডি

উৎপত্তিস্থল : ফরিদপুর, আবার কেউ কেউ বলেন বরিশাল। তবে বাংলাদেশের সর্বত্র এই খেলার প্রচলন আছে।

মাঠের আকার : ৪২ ফুট লম্বা ও ২৭ ফুট চওড়া। মাঠকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগকে কোর্ট বলা হয়।

মোট সময় : ৪৫ মিনিট (২০ মিনিট + ৫মিনিট + ২০ মিনিট)। মাঝের ৫ মিনিট বিরতি।

খেলার জন্য সহায়ক গুণাবলি : তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্ষিপ্রগতি, প্রবল শক্তি, সুচতুর কায়দা, দীর্ঘস্থায়ী দম, সৎসাহস এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। হা-ডু-ডু খেলার শুরুতে খেলোয়াড়দের দুটি দলে ভাগ করে নিতে হয়। প্রতিটি দল তাদের দলনেতা নির্বাচন করে। নেতার অধীনে দু দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। সাধারণত খেলোয়াড় থাকে ১২ জন। তবে প্রতিবার সাত জনের দল নিয়ে খেলতে হয়। দু পক্ষের দু দল মুখোমুখি অর্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। খেলা শুরু হলে একপক্ষ দম রেখে হা-ডু-ডু বা কাবাডি কাবাডি বলতে বলতে ডাক দিতে থাকে এবং মধ্যরেখা পার হয়ে বিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে দম থাকা অবস্থায় দ্রুত পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে। যদি কাউকে ছুঁয়ে আসতে পারে তবে সে মরা বলে গণ্য হয়।

আবার আক্রমণকারী যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ধরা পড়ে তবে সেও মরা বলে গণ্য হয়। একজন মরা আর খেলতে পারবে না, তাকে কোর্টের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। যদি মরা দলের কেউ প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে আসতে পারে তবে মরা পুনরায় বেঁচে যাবে। আক্রমণে পরাজিত হওয়াকে মরা এবং বিজয়ী হওয়াকে বাঁচা বলে।

এই খেলার মজার একটা নিয়ম আছে। সেটা হলো ৮০ কেজি বেশি ওজনের কাউকে এই খেলায় নেওয়া হয় না। এই খেলা পরিচালনা ও বিচারকার্য করে থাকেন

www.pathagar.com

একজন রেফারি, দুইজন আম্পায়ার, একজন স্কোরার। এই খেলার কিছু জনপ্রিয় দম বা বুলি নিম্নরূপ :

বরগুনা অঞ্চলের প্রচলিত দম

হা-ডুডু ...ডুডু
হায়, টুক..টুক..টুক...টুক
হায়, টাক..টাক...টাক..টাক
হায়, ডুগ...ডুগ...ডুগ...ডুগ

অনেক সময় দুই তিন গ্রামের মধ্যে হাডুডু খেলা হয়ে থাকে। এই খেলায় জয়লাভ করা গ্রামের জন্য মর্যাদাস্বরূপ। তাই অনেকে ভালো খেলোয়াড় ভাড়া করে আনে।

৪. ইটকুড়ি মিটকুড়ি খেলা

ইটকুড়ি মিটকুড়ি খেলার নিয়ম : একাধিক জন দুই হাত সামনে বিছিয়ে বসবে। একজনার এক হাত বিছানো থাকবে এবং অন্য হাত দিয়ে সে প্রত্যেকের একেকটা আঙুল গুনবে এবং ছড়া কাটবে। যে আঙুলে গিয়ে ছড়া শেষ হবে সেই আঙুলটা ভাঁজ করে দেবে (মুট্‌টুত্‌)। এভাবে যার হাতের সব আঙুলগুলো আগে শেষ হবে সে খেলায় প্রথম বিজয়ী হবে। এভাবে সবাই আঙুল ভাঁজ করে পর্যায়ক্রমে বিজয়ী হবে এবং এভাবে খেলা হবে।

ইটকুড়ি মিটকুড়ি চামের দারা
লঘু গ্যাছে পাইটপাড়া
পাইটপাড়াইদ্দা আইলো বুড়ি
কাডুরকুডুর মুট্‌টুত্‌।

৫. ঘুঘুসই

ছোট শিশুকে শুয়ে পায়ের উপর রেখে ছড়া কেটে কেটে এই খেলা। সাধারণত মা, বড় বোন শিশুকে নিয়ে এই খেলা খেলে।

১.
ঘুঘু সই
বানো কি?
ওদা ধান
খুত খাইতে মালই আন
মালই নেছে হোতে
বুইড়্যা ব্যাডা কোতে।

২.
দা খান কই?

www.pathagar.com

দা দিয়া কি করবি?
ফিরি বানামু।
ফিরি (পিঁড়ি) দিয়া কি করবি?
বউ বসামু।
বউ কোথায়?
ঘাটে গ্যাছে।
ঘাট কোথায়?
বাড়ির পাশে...

ছোট তালগাছটা লড়ে চড়ে...
বড় তালগাছটা ভাইঙ্গাআআআআ...পড়ে।
ধুপ্পাত।
[শিশুকে পা থেকে ফেলে দেয়।]

৩.
ঘুঘুলো সই,
গেলহি কই?
ধোপা বাড়ি।
ধোপা কই?
কাপুড় কাচে।
কাপুড় কই?
জলে গ্যাছে।
জল কই?
ডাউকে (ডাহুক) খাইছে।
ডাউক কই?
বনে গ্যাছে।
বন কই?
পুইড়্যা গ্যাছে।
ছাইমাডি কই?
হাডে (হাটে) গ্যাছে।
হাড কই?
মিইল্যা গ্যাছে।
ছোট তালগাছটা লড়ে চড়ে...
বড় তালগাছটা ভাইঙ্গাআআআআ...পড়ে।
ধুপ্পাত।

www.pathagar.com

৬. ইচিং-বিচিং খেলা

ইচিং বিচিং আরেকটি জনপ্রিয় গ্রামীণ খেলা। সাধারণত এই খেলার জন্য শিশু ও কিশোরীরা গ্রাম-সংলগ্ন সবুজ মাঠকে নির্বাচন করে। উচ্চতা অতিক্রম এই খেলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'ইচিং বিচিং চিচিং ছা
প্রজাপতি উড়ে যা'

দুজন খেলোয়াড় পাশাপাশি বসে খেলোয়াড়দের অতিক্রম করার জন্য উচ্চতা নির্মাণ করে দেয়। প্রথমে তারা দু-পায়ের গোড়ালি দিয়ে উচ্চতা নির্মাণ করে। খেলোয়াড়রা উচ্চতা অতিক্রম করার পর তারা পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিয়ে উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে পায়ের উপর প্রসারিত করতল স্থাপন করে উচ্চতা বাড়িয়ে তোলা হয়। উচ্চতা অতিক্রম করার পর বসে থাকা খেলোয়াড়রা দুই পা মুক্ত করে ত্রিকোণাকার একটি সীমানা তৈরি করে। এই পায়ে ঘেরা স্থানটি পা তুলে দম দিতে দিতে বা ছড়া আওড়াতে আওড়াতে তিনবার অতিক্রম করে লাফ দিয়ে পার হতে হয়। এই সীমানা অতিক্রম করার পর বসে থাকা খেলোয়াড়দের যুক্ত পাকে প্রতিটি খেলোয়াড় শূন্যে লাফিয়ে ইচিং বিচিং ছড়া বলতে বলতে দুইবার করে অতিক্রম করে নেয়। এটিই খেলার শেষ পর্ব।

৭. কুতকুত খেলা

উঠানে শস্য শুকাতে দেবার ফাঁকে কিংবা বিকালের নরম আলোয় গৃহের আঙিনায় কৈশোর পেরোনো তরুণীরা কুতকুত খেলায় মেতে ওঠে। বর্ষার পরের নরম মাটিতে মাটির ভাঙা হাঁড়ির (আঞ্চলিক ভাষায় চাড়া) অংশ দিয়ে দাগ কেটে কুতকুতের জন্য ঘর বানানো হয়। বাংলার গ্রামীণ মেয়েরা যে কোনো ঋতুতেই এই খেলা খেলে থাকে। কুতকুত খেলায় ঘর বেচাকেনার বিষয়টি বাণিজ্যের প্রতি গ্রামীণ নারীদের সচেতনতাকে তুলে ধরে।

লাইলি লুইলি বাঁশের চুঙা
বাঁশ কাইট্টা টাহা থো
এত টাহা নিমু না
লাইলির বিয়া দিমু না
লাইলির মায় কান্দে
গলায় দড়ি বান্দে।

আয়তক্ষেত্রাকার মোট ৭-৮টি ঘর আঁকা হয় এবং এই ঘরগুলোর শেষ মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতির আর একটি ঘর বানানো হয়। প্রথম ঘরে গুটি ফেলে এক পা শূন্যে রেখে এবং দম দিতে দিতে গুটিকে সবগুলো ঘর অতিক্রম করে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঘরে এনে পা নামিয়ে দম ফেলা যায়। তারপর এই ঘর থেকে গুটিকে পা দিয়ে আঘাত করে সব ঘর

www.pathagar.com

অতিক্রম করানোর চেষ্টা করা হয়। গুটিটি সব ঘর অতিক্রম না করলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঘর থেকে বের হয়ে শূন্যে পা তুলে দম নিতে নিতে তাকে আবার আগের নিয়মে ঘর থেকে বের করে আনতে হয়। খেলোয়াড়রা কপালে গুটি রেখে উপর দিকে তাকিয়ে ৮টা ঘরের দাগে পা না ফেলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ঘরে যেয়ে আবার প্রথম ঘরে ফেরত আসতে পারলে সে ঘর কেনার যোগ্যতা অর্জন করে। কুতকুত খেলায় যে ঘর কেনা হবে সেই ঘরে পা বা গুটি ফেলা যাবে না। ঘর কেনার প্রক্রিয়াকালীন খেলোয়াড়ের দাঁত দেখা গেলে ঐ খেলোয়াড়ের খেলা ঐ অবস্থায় মারা যায়। ক্রমান্বয়ে ঘর কিনে শেষ ঘরটি দখল করার মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি হয়।

৮. পুতুল খেলা

বিভিন্ন মেলা আর উৎসবে আকর্ষণ থাকে পুতুলের। মাটি, পাটকাঠি, কাপড় দিয়ে তৈরি পুতুল ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করে। মেয়েরা ঘরের কোণে অবসর সময় পুতুল খেলে। সে সময় তারা ছোট ছেলেদেরও নেয়। সেখানে তারা সাজায় সংসার। অভিনয় করে। ছেলে পুতুলের সাথে মেয়ে পুতুলের বিয়ে দেয়। বানিয়ে বানিয়ে বিয়ের গান গায়।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

১. জেলে

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিতে জীবিকার জন্য বঙ্গোপসাগরে প্রতিদিন শত শত ট্রলার উপকূল থেকে গভীর সমুদ্রে যায় মাছ ধরার জন্য। ২০০-৩০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি গভীরে। সেসব ট্রলারে থাকে জাল, জ্বালানি এবং ট্রলার মূল্যসহ ১০-১৫ লাখ টাকার মালামাল। আর থাকে তরতাজা ১২-১৪টি প্রাণ। যারা জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে গভীর সমুদ্রে যান তাদের জীবন কত না বিপদসংকুল! জলদস্যুদের তাণ্ডব প্রায়ই তাদের নিঃস্ব করে। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবে কখনো বিপন্ন করে জীবন। তার ওপরে আছে ভিনদেশে আটকা পড়ে মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর কারাগারে আটক থাকার দুঃসহ যন্ত্রণা।

এই হতভাগ্য জেলেদের স্ত্রী-বাচ্চা ও স্বজনেরা তখন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে সীমাহীন দুর্দশায় পড়ে। পরিবারের সদস্যরা উপোস থেকে অপেক্ষার প্রহর গোনে প্রিয় মানুষটির জন্য। এক অনিশ্চিত জীবনে ঘুরপাক খায় তাদের ভাগ্য। তবু উপকূলের এই পোড় খাওয়া জেলেরা আবার সাগরে যায় জীবিকার তাগিদে। কারণ, নিজেকে এবং স্বজনকে খেয়ে-পরে বাঁচতে ও বাঁচাতে হবে। বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে। দানবীয় শক্তিধর ঝড়-জলোচ্ছ্বাসকে মানবীয় শক্তি আর অমেয় সাহস দিয়ে পরাভূত করে তারা বেঁচে থাকে। জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিতে চলে তাদের জীবিকা। এর নামই হয়তো জীবন সংগ্রাম!

বঙ্গোপসাগরের কোলে শুয়ে আছে দেশের একেবারে দক্ষিণ উপকূলে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা। এখানে কান পাতলে শোনা যায় সাগরের শোঁ-শোঁ গর্জন। মনে হয় দূর থেকে কেউ কোরাস গাইছে। পাথরঘাটার অগণিত মানুষের প্রধান পেশা সাগরে মাছ ধরা। এখানে এমন কোনো জেলে নেই যাদের জীবন এমন দুর্যোগে বিপন্ন হয়নি। জল ও ঝড়ের জীবন তাদের। শুধু একবার নয় দু-চার বারও কেউ কেউ মৃত্যুকে জয় করেছেন। মৃত্যু জয় করে ফিরে আসা এমন একজনের নাম ইউনুস। ইউনুসের বয়স এখন ৩২। ছোট ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন একটা ছোট্ট দোচালা ঘরে। খড়ের চালা-বেড়া দেওয়া ঘরদোরের চারপাশে দারিদ্র্যের মলিন চেহারা। বছর দুয়েক আগের কথা। সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন পাথরঘাটার কালমেঘার গ্রামের জেলে ইউনুস ও তাঁর আরো কয়েক সহযোদ্ধা।

www.pathagar.com

সমুদ্র উপকূলের একটি খালে মাছ ধরার জাল মেরামতরত জেলেরা

২০০৮ সালের ২৫ মে'র প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আইলায় ট্রলার ডুবে দুদিন গভীর সাগরে হাবুডুবু খেয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনটা রক্ষা পায় ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ার সুবাদে। ভারতীয় নৌবাহিনী দুদিন পর উদ্ধার করায় প্রাণটা রক্ষা পেলেও তাঁকে দেড় বছর কাটাতে হয় ভিনদেশের কারাগারে বন্দি জীবন।

ইউনুসের সাগরে ডুবে যাওয়া, তারপর ভিনদেশের কারাগারে দেড় বছরের অসহনীয় বন্দি জীবন-যাপনের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে পড়লেই শিউরে ওঠে তার শরীর। সেই দুঃসহ দিনের গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে সে যেন আবার সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য।

মাছ ধরাডা মোগো ধারে একটা নেশার নাহান। ইলশা মাছের লগে ভূত থাহে, সাগরে গ্যালে মোগো হেই ভূতে পায়। ইলশার পিছে ছোটতে ছোটতে কতকুনে যে মোরা গভীর সাগরে চইল্লা যাই টেরও পাই না। হেইবার হেই রহমই ভূত মাতায় চাপছেলো মোগো।

দুই দিন আগে বাড়ি দিয়া সাগরে রওয়ানা দিয়া যাই। তহনই মনটার মধ্যে ক্যামন একটা মোচড় মারে। মনটা ভালো লাগে না। তবু উপায় নাই, বাঁচতে অইলে সাগরে যাওন লাগবে। পর দিন সুন্দরবনের পশ্চিম দিকে পক্ষীদিয়ায় সাগরে জাল ফালাই কিন্তু কোনো মাছ জালে ওড়ে না। সব কষ্ট জলে যাওনে মেজাজটা খুব খারাপ অয়। পর

www.pathagar.com

দিন সকালে ট্রলারডা খালি সামনে চালাই; আরো সামনে, আরো... । আকাশে বাইল্লা বাইল্লা ম্যাঘ । ফুরফুইর‍্যা বাতাস চাইর দিকে । যাইতে-যাইতে মোগো ট্রলার সাগরের ফেয়ারওয়ে বয়ার কাছে চইল্লা যায় । তহন প্রায় বিকাল, ট্রলারটা থামাইয়্যা হ্যারপর জাল ফেলা শুরু করি । জাল ফেলতে সন্ধ্যাটাও আজাইয়্যা আইছে । চাইর দিক কালি আন্ধার । বাতাসটাও বাড়তে থাহে । মোরা তহনও জানি না ঝড় আইতে আছে । জানমু ক্যামনে কন, মোগো ট্রলারে রেডিও থাকলেও সাগরে গ্যালে রেডিও চলে চলে না । খালি ভোঁ-ভোঁ শব্দ অয় । আকাশের বাও ভালো না দেইক্যা মাঝি আলমগীর মিয়ারে কই 'কিনারে লও মাঝি আকাশের ভাব ভালো না' । আলমগীর মাঝি কুড়ি বছর সাগরে বোট বায় (ট্রলার চালায়) । বোহে খুব সাহস হ্যার । মাঝি কয়, 'নারে ব্যাডা, কিছু অইবে না' । কিন্তু আমার মনটা ভালো লাগে না । আমার কথা হুইন্না সহিদ, হালিম, মিরাজ, আলামিন, মিলন, ইউনুস, মোস্তফা, কালাম মোল্লা, কাইউম, বাচ্চু অরাও মাঝিরে না করে । আলমগীর মাঝি সবাইর পিড়াপিড়িতে ট্রলার ঘুরায় । ঘণ্টা খানেক যাইতে না যাইতে ঢ্যাপার (ঢেউ) লগে বাতাস আরো বাড়ে । মাঝিও কিছুটা ঘাবড়ায় । সে ট্রলারের সুকান (হাল) ধইর‍্যা রাখতে পারে না । রাইত যত বাড়ে বাতাসের চোটও তত বাড়ে, ঢ্যাপার চোটটাও অনেক বাড়ছে তহন । মনে মনে আন্দাজ করি আবহাওয়া খুব একটা ভালো না । মনটাও তহন খুব খারাপ অইয়্যা যায় । ছোট্ট দুইটা পোলা আর বউয়ের মুখটা তহন চোক্ষের সামনে ভাসে । এই মানুষগুলা তো মোর পোতের দিকে চাইয়্যা রইছে ! কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে ঢ্যাপাগুলা কেমন সাপের মতোন ফণা তুইল্লা মোগো ট্রলারডারে একবার উপরে উডায় আবার নিচে নামায় । তহন মাঝিরে (ট্রলারের সুকানি) কই মাঝি কিনার আর কত্তো দূর ! আলমগীর মাঝি কোনো কথা কয় না । মনটা তহন আরো খারাপ অইয়্যা যায় । ট্রলারটা যেন আর সামনে আউগায় না । চাইর দিক ভাইঙা আন্ধার নামছে । বাতাসের শব্দ আর ঢ্যাপার চোটের পইর‍্যা মনে অয় ট্রলারডা এহনই ভাইঙা তুষ অইয়্যা যাইবে । তহন খালি দোয়া ইউনুস পড়ি । কিন্তু অবস্থা আরো খারাপ অয় । মনে অইলো কেয়ামত মোগো সামনে । চাইর দিক আন্ধার, কেউর মুখ কেউ দেহি না । আন্ধারে ট্রলারের ডেকে গড়াগড়ি খাই আর ভাবি এই বুঝি শ্যাষ । কিন্তু অগো (বউ-বাচ্চা) কি অইবে, অরা ক্যামনে বাঁচবে? কেডা অগো খাওয়াইবে? এই প্রশ্নগুলা তহনও মাথায় ঘুরপাক খায় । এর মধ্যেই পাহাড়ের চাইতেও উচা একটা ঢ্যাপা আইয়্যা আমাগো ট্রলারডা মোনে অয় আকাশে উডাইয়্যা আবার ছাইড়্যা দেছে । আলমগীর মাঝি জোড়ে একটা চিক (চিৎকার) দেয়—'তোরা কেডা কোমনে বাঁচনের চেষ্টা কর, মুই আর পারলাম না' । আন্ধারে হাতের ধারে একটা কি যেন ঠাহর পাই । আন্দাজ করি এইডা ফুলুড (জাল ভাসাতে প্লাস্টিকের বল) । হেইডা বুকে ঝাপটাইয়্যা ধরি । হ্যারপর কি অইছে কইতে পারমু না । কেয়ামত । আন্দাজ করি চাইর-পাঁচ ঘণ্টা পর ঢ্যাপাগুলা যহন একটু কমছে দেহি মুই সাগরে ভাসতে আছি ।

www.pathagar.com

অরা কই? কেইরে দেহি না। ঢ্যাপায় একবার ডুবায় আবার উডায়। এইভাবে দুই দিন যায়। আধা মরার নাহান সাগরে ভাসি। বাঁচমু না মরমু হেইডা ভাবারও শক্তি তহন আর নাই। হঠাৎ দেহি দূরে একটা জাহাজের নাহান। জাহাজটা মোর দিকে আয়। মনটার মধ্যে একটু আশার আলো দেহি।

এরই মধ্যে আবার মনে পড়ে ট্রলারে থাকা ১৭ জনের কথা। তাগো মধ্যে আমার আপন চাচা মোস্তফাও ছিলো। চাচায়ত ট্রলারেই ছিল, হে বা কই? এর মধ্যে জাহাজডা একেবারে মোর কাছাকাছি আইয়্যা পড়ে। জাহাজ দিয়া একটা রশি ফালায়। মুই জোরে রশিডা চাইপ্পা ধরি বুকের লগে। উপরের লোকেরা টাইন্না মোরে জাহাজে উডায়। জাহাজে উঠতেই দেহি মোস্তফা চাচাসহ ১৩ জন ওই জাহাজে। মোরা তহন বুঝতে পারি দেশের সীমানা ছাড়াইয়া ভাসতে ভাসতে ভারতে আইসা পড়েছি। ভারতীয় জাহাজে কয়েকটা রুটি খাইতে দেয়। দুই দিন পর এই খাওন। ডর, শরীরের যন্ত্রণা, ক্লান্তি আর খুদা সব তহন একাকার অইয়্যা গেছিলো। জাহাজটা মোগো লইয়্যা ইন্ডিয়ার দিকে যায় টের পাই, তহন মোরা সৈন্যগো পায়ে-হাতে ধরি মোগো দেশি একটা ট্রলারে উডাইয়্যা দেওনের জন্য। কিন্তু হ্যাগো মন গলে না। ৬-৭ ঘণ্টা জাহাজ চালিয়ে মোগো পশ্চিম বাংলার উরিশা থানায় সোপর্দ করে। এরপর শুরু অয় আরেক কষ্টের জীবন।

দেড় বছর জেলে সাজা কাটানোর পর মোরা দ্যাশে ফিরি। সেসব দিনের গল্প শোনাতে গিয়ে ইউনুসের চোখের কোণে জল জমে। উদাস হয়ে বিষখালি নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। নদীতে তখন ভাটির টান। আশ্বিনের সূর্যটা মাথার ওপরে ভীষণ তেজে তেতে উঠেছে। ইউনূসের দুর্দান্ত এই জীবনজয়ের গল্প শুনে বিষখালি নদী তীরের কালমেঘা থেকে পাথরঘাটায় ফেরার পথে স্থানীয় বিএফডিসি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ট্রলার ঘাটে কথা হলো আরেক জীবনজয়ী জেলে আ. সালামের সঙ্গে। বৃদ্ধ এই জেলে ট্রলার নিয়ে কেবল সাগর থেকে ফিরেছেন। লোনা জল, প্রখর রোদের মধ্যে সাত দিন নির্ঘুম কাটিয়েছেন সাগরে মাছের সন্ধানে। তাই তাঁর চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। ট্রলারের ব্রীজের (ইঞ্জিন রুম) ওপরে বসে সবাই মিলে খেয়ে নিচ্ছিলেন দুপুরের খাবার। কি খাচ্ছেন? প্রশ্ন করতেই হাসি মুখে বললেন, 'ভাত খাই, কুমাড় আর পোমা মাছ দিয়া। প্যাটটায় বড় খিদা'। খাওয়া শেষ হওয়ার পর সালাম মিয়া শোনালেন তাঁর চল্লিশ বছরের জেলে জীবনে বাঁচা-মরা আর যুদ্ধ করে জীবন চালানোর গল্প। কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধ সালাম জেলে বলেন, 'আমরা যহন সাগরে থাহি তহন দ্যাশ দুনিয়ার খবরই পাই না। সাগরের ভাও (অবস্থা) আহাশের (আকাশ) লক্ষণ বুইয়্যা মোগো চলতে অয়'।

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডরের ভয়াবহ রাতে বৃদ্ধ সালাম বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় ব্যস্ত ছিলেন। সালাম সেই ভয়াল দুঃস্বপ্নময় রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

www.pathagar.com

"বেয়ান অইতে একটু ফুরফুইর‍্যা বাতাস বইছিলো, দুফুর (দুপুর) বিয়াল (বিকাল) হওয়ার লগে লগে বাতাসটা বাড়তে থাহে। মোরা আলহাম ফেয়ার ওয়েবয়ার কাছাকাছি। সন্ধ্যা অওনের আগেই হার পাইলাম কেয়ামোতের আলামত। চারদিকটা আন্ধার হইয়া আইলো। তুবান আর বাতাসে হার পাইলাম সাগরের পানি ফুইস্যা উঠছে। গায়ে পানি লাগলে পুইড়্যা ওডে। তুবানে ট্রলারডা দুমড়াইয়া মুচরাইয়া ফালাইলো। হ্যারপর আর কিছুই কইতে পারি না।" সিডরের তাণ্ডবের তিন দিন পর ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বৃদ্ধ জেলে সালামকে সুন্দরবনের সুপতি এলাকা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল। আ. সালাম জানান, গভীর সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া অধিকাংশ ট্রলারেই রেডিও আছে। কিন্তু গভীর সাগরে যাওয়ার পর আর রেডিও সচল থাকে না। তাই বড় ধরনের কোনো ঝড়ের সংকেত থাকলেও তাঁদের কাছে পৌঁছায় না।

পাথরঘাটা জেলে সমিতির সভাপতি দুলাল মাস্টার বললেন, ১৫ নভেম্বরের ঝড়ে শুধু পাথরঘাটা উপজেলার ১৭৬ জন জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। দুলাল মাস্টার বলেন, ২০০৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ভয়াবহ এক সামুদ্রিক ঝড়ে প্রায় আড়াই হাজার জেলের প্রাণহানি ঘটে। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন, "জীবনে নয় বার আমি ঝড়ের কবলে পড়ছি। মরণের দুয়ার দিয়া আবার ফেরত আইছি। বাঁচনের কথা না। তবু বাঁচছি। মোগো জীবনটাই এমন। বাঁচা-মরার সংগ্রাম কইর‍্যাই মোগো খাওন জোডাইতে অয়। এহন যদি মইর‍্যা যাই তবু দুঃখ নাই।"

অন্য পেশায় যান না কেন? সালাম স্মিত হেসে বললেন, "এইডা আপনে বোঝবেন না। যারে যে নেশায় পায়। মরণ আছে জাইন্নাও মানুষ হেইডা করে। মোগো খাওন জোডায় সাগর, মোগো মরণও সাগর-এইডা কবুল কইর‍্যাই মোরা সাগরে যাই।" কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধ এই জেলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল উত্তেজনায়। এই উত্তেজনাই হয়তো তাদের অমিয় সাহসের রসদ।

২. ভাসান ব্যবসায়ী

ভাসান ব্যবসা দক্ষিণাঞ্চলের একটি অন্যতম পেশা। এই পেশার সঙ্গে বরগুনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের অনেক মানুষ জড়িয়ে আছে। মূলত ভাসান ব্যবসা বলতে ভ্রাম্যমাণ এক ধরনের ব্যবসায়ীদের বুঝায়।

সম্ভবত নদীবেষ্টিত দক্ষিণাঞ্চলে নৌকায় ভেসে ভেসে যেসব ব্যবসায়ীরা তাদের সওদা নিয়ে হাটের দিন বিভিন্ন হাটে গিয়ে হোগলা বিছিয়ে দোকানের পসরা সাজাতেন বলে এই ব্যবসায়ীদের ভাসান ব্যবসায়ী বলা হয়। বরগুনার তালতলী, শিববাড়িয়া, গুলিসাখালী, ফুলঝুরি, কালমেঘা, বৌঠারানি, কালিকাবাড়ি এসব গ্রামীণ বাজারে এখনো অনেক ভাসান ব্যবসায়ীকে দেখা যায়। এঁরা মুদি-মনিহারি, প্রসাধনী, শাড়ি-লুঙ্গি, কাঁচা ও ভুসা মাল নিয়ে এসব বাজারের সাপ্তাহিক হাটের দিন হাজির হন। আবার বাজার

www.pathagar.com

শেষে নৌকায় করে অন্য বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বরগুনার ভাসান ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন বলেন, নদ-নদীতে বাঁধ ও নাব্যতা হ্রাসের কারণে এখন আর নৌপথে হাট-বাজারে যাওয়া যাচ্ছে না।

তাছাড়া সড়ক যোগাযোগ উন্নত হওয়ায় এখন গ্রামীণ হাট-বাজারের ব্যবসায়ীরা সহজে বড় বড় বাজারে এসে মালামাল নিয়ে যেতে পারছে বলে এখন আর ভাসান ব্যবসায়ীদের তেমন কদর নেই।

ভাসান ব্যবসায়ী পান বিক্রেতা

৩. কামার

বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ কামার শিল্প। এই শিল্পের কাছে আধুনিক সভ্যতারও অনেক ঋণ রয়েছে। গৃহস্থালি কাজে এখনো কামারের তৈরি দা, বটি ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। বরগুনায় এক সময় প্রায় সাড়ে তিন হাজার কামার পেশাজীবী ছিলো। যারা লোহার মতো কঠিন ধাতু দগদগে আগুনে পুড়িয়ে তা দিয়ে চাহিদামতো যন্ত্র তৈরি করত। কিন্তু কালের আবর্তনে এই পেশাজীবীরা এখন অনেক কমে বিলুপ্তির পথে। তপন কর্মকার নামে বরগুনার এক কামার শিল্পী বলেন, এখন বরগুনায় ৪০-৫০টি পরিবার এই পেশায় টিকে আছে। লোহার মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক সংকটসহ নানা কারণে এই পেশায় এখন আর আগের মতো জীবিকা নির্বাহ সম্ভব নয় বলে অনেকেই পেশা গুটিয়ে অন্য পেশায় চলে গেছে।

www.pathagar.com

হাপর চালাচ্ছেন দেবু কামার

গরম লোহা পিটাচ্ছেন নিখিল কামার

www.pathagar.com

কামারের তৈরি বিভিন্ন গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি

৪. ঢোল বাদক

আগে প্রত্যেক গ্রামে দুই একটি পরিবার ছিলো যাদের পেশা ছিলো বিভিন্ন উৎসব, পূজা-পার্বণ, বিয়ে অনুষ্ঠান, গ্রামীণ মেলায় ঢাক-ঢোল, চাকতি, ঝুনঝুনি, বাঁশি, সানাই, সেতার, হারমনিয়াম, তবলা বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা। কিন্তু এখন সেসব পরিবার হাতেগোনার পর্যায়ে চলে গেছে। আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের দাপটে এসব পেশাজীবীরা এখন অন্য পেশায় ঝুঁকে পড়েছে।

বরগুনা শহরের ঢোলবাদক রনজিৎ কুমার জানান, আগে এই পেশার কদর ছিলো। বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের ডাক পড়তো। আয়ও ছিলো অনেক। কিন্তু এখন আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় তাদের কদর কমে গেছে। বিয়ে ও পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান ছাড়া তেমন কোথাও তাদের ডাক পড়ে না। বলতে গেলে বছরের বেশির ভাগ সময় তাদের বসে থাকতে হয়। এজন্য অনেকেই এই পেশা ছেড়ে বিকল্প পেশায় চলে গেছেন।

৫. করাতি

গাছ চেরাইয়ের জন্য বরগুনাসহ দক্ষিণাঞ্চলে করাতি নামে এক শ্রেণির পেশাজীবী ছিলেন। গাছ কাটার পর তা চেরাইয়ের জন্য গাছের গুঁড়িকে শক্ত মাচার ওপর তুলে

www.pathagar.com

লোহার করাত দিয়ে তা সুবিধা মতো চেরাই করতেন করাতিরা। মাচার নিচে দুজন এবং মাচার ওপরে দুজন করাতি থাকতেন এবং তারা করাত দিয়ে এসব গাছ চেরাই করতেন। গাছ মাচার ওপরে তোলার সময় ল িবেড়ি (মোটা রশি ও সুন্দরী কাঠের লাট তৈরি) দিয়ে ক্রেনের মতো তৈরি করে তা দিয়ে গাছ মাচার ওপরে তোলা হতো। গাছের গুঁড়ি মাচার ওপরে তোলার কিছু বোল ছিল।

যেমন বোলধারী বলতেন, আল্লার নাম–সহযোগীরা বলতেন, হেইলোচ, নবীর নাম...হেইলোচ। যখন গাছের গুঁড়ি সামনে নেওয়া হতো তখন বলা হতো কেউ বুড়া না, হেইয়ো, নওজোয়ানা, হেইয়ো...। আধুনিক প্রযুক্তির দাপটে এখন আর করাতি পেশাজীবীরা টিকে নেই। ঘাটে ঘাটে স'মিল হওয়ায় এই পেশাজীবীরা এখন অন্য পেশায় ভিড়ে গেছেন।

৬. দাই

গ্রামীণ সমাজে সন্তান প্রসবে দাইয়ের ভূমিকা অনন্য। প্রতি গ্রামে দু-একজন বয়স্ক মহিলা দাইয়ের ভূমিকা পালন করে থাকে। দাইয়েরা দাইমা নামেও পরিচিত। তারা তাদের কাজের জন্য কিছু নগদ টাকা, চাল ডাল সিদা হিসেবে পেয়ে থাকে। নতুন শাড়ি কিছু অর্থ পায়।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দাইদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আবার অনেকেই দাইয়ের ওপর ভরসা না করে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে সন্তান প্রসব করায় ফলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার বেশ কমে গেছে।

৭. বাওয়ালি ও মৌয়াল

প্রাচীনকালে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ-খলিফাবাদ, সেলিমাবাদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশালকেন্দ্রিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৫০৮ সালের দিকে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে। এ দু-জাতির মিশ্রণে 'বাঙ' জাতির উৎপত্তি। 'বাঙ' জাতি থেকে 'চন্ডাল' জাতি আর 'চন্ডাল' জাতিই বাকলা চন্দ্রদ্বীপের আদি জনগোষ্ঠী। বৃহত্তর বরিশালের বাকেরগঞ্জ জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম পরগণা ছিল সেলিমাবাদ (সম্রাট জাহাঙ্গীর)। ঝালকাঠি, রাজাপুর, ভান্ডারিয়া, তুষখালী, জিয়ানগর, বামনা, ইন্দুরকানি, মঠবাড়িয়া, স্বরূপকাঠি (নেছারাবাদ), নাজিরপুর, কাউখালী, বানরীপাড়া, বাগেরহাট, মোরেলগঞ্জ, বরগুনা, পাথরঘাটা ও খুলনার কচুয়াসহ প্রভৃতি এলাকা সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এসব এলাকার জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই চণ্ডাল জাতির বংশধর। আর এই জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই ছিল হাকিলী বা কাঠুরিয়া। এসব এলাকা তখনকার সময় সুন্দরবনের আওতাভুক্ত থাকায় অধিকাংশ এলাকা বন-জঙ্গলে সুন্দরীগাছ ও কেওড়াগাছে ভরপুর ছিল।

www.pathagar.com

১৫৬৮ সালের দিকে জনবসতির উপযোগী করতে এসব এলাকার গাছপালা নিধনকারীকে হাকিলীয় বা কাঠুরিয়া বলা শুরু হয় এবং এ সময় থেকেই এ নামটি প্রসিদ্ধ হয়। এসময় সেলিমাবাদ পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র বসুর শাসনাধীনে সেলিমাবাদ ছিল অন্য নামে। ১৫৬৪ থেকে ১৬১১ সাল পর্যন্ত রামচন্দ্রের শাসনাধীনে উল্লিখিত এলাকাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৫৮৭ সালে রাজা রামচন্দ্র বসুর শাসনামালই আঞ্চলিক শব্দ কাঠুরিয়া থেকেই বাওয়ালি শব্দটির উৎপত্তি, তবে বাওয়ালি কোনো সম্প্রদায় নয়, ইতিহাসে এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, এটি একটি কথিত পদবি। ১৬১১ সালের ১৪ জানুয়ারি চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র বসুকে সম্রাট জাহাঙ্গীর পরাজিত করে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ দখল করেন।

১৬১১ সালে চন্দ্রদ্বীপ মোগল শাসনাধীনে চলে যাওয়ার পর এ রাজ্যকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন সম্রাট সেলিম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্য নাম ছিল সেলিম। তিনি ১৬১৩ সালের প্রথম দিকে নিজ নামে সেলিমাবাদ পরগণার সৃষ্টি করেন আর সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্তই ছিল এসব এলাকা। ১৬১১ সাল থেকে ১৬৫৪ সাল পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট শাহজাহানের শাসনাধীনের শেষ দিকে মগ ও পর্তুগিজদের আক্রমণে এসব অঞ্চলে গড়ে ওঠা লোকালয় প্রায় শূন্য হয়ে আবার সুন্দরবনে পরিণত হয়। সেই সময় বন-জঙ্গল কেটে টিকে থাকা পূর্বপুরুষরা সেলিমাবাদের অনেক অঞ্চলে কৃষি আবাদ শুরু করে আর এসব এলাকায় কৃষি আবাদের প্রচলন সে থেকেই প্রথম শুরু হয়।

কৃষি আবাদের পাশাপাশি নিজ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে মূল সুন্দরবন এলাকা থেকে সুন্দরী গাছ কাটা শুরু করে এসব এলাকার মানুষ। বাংলাদেশের শেষ সীমানায় সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর। এ সাগর পাড়েই সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রধান সৌন্দর্য সুন্দরী গাছ। বন থেকে এসব গাছ কেটে আনা লোকদেরকেই মূলত বলা হতো বাওয়ালি। ব্যবসায়ীকভাবে সুন্দরবনের গাছ কাটা শুরু হয়। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামাল শেষে অর্থাৎ জয়নারায়ণ বাকৈকরণের যুদ্ধে ১৭৫৩ সালে আগা বাকের খান নিহত হলে রাজবল্লব সেলিমাবাদের সাড়ে এগারো আনা দখল করায় সুন্দরবনের কিছুটা অংশ রাজবল্লবের আয়ত্তে আসায় তার আমলেই সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ বাজারজাত করতে ব্যবসায়ীভাবে গাছ কাটা শুরু হয়। সেই থেকেই পেশাদারী বাওয়ালির সূত্রপাত ঘটে। তবে সুন্দরবনের বড় আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও হরিণ। বনের কোল ঘেঁষে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আরেকটি উপাদান হচ্ছে গোলপাতা। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের ও সেলিমাবাদের আওতাভুক্ত এক শ্রেণীর মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবসা করে আসছে শত শত বছর ধরে। গাছ কাটা, হরিণ ও বাঘ শিকার এবং এসব পশুর চামড়া সংগ্রহ, মাছ ধরা, মৌমাছির মৌ সংগ্রহ, পাখি শিকার, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ও গোলগাছের রস এবং পায়েস তৈরির গোলগাছের সুস্বাদু গুড় সংগ্রহসহ নানানবিধ উপাদান সংগ্রহ করে বাজারজাত করায় এদের পেশায় বাওয়ালি বলা হতো। বাওয়ালি একটি পেশা তবে কোনো সম্প্রদায় নয়।

www.pathagar.com

বরগুনা সদরের খাজুরতলা গ্রামের বাওয়ালি মফেজ উদ্দিন (৭৫) একসময় সুন্দরবন থেকে গোলপাতা, হেতাল সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাত করে সংসার চালাতেন। এখন তিনি বয়সের ভারে নুয়ে পড়ায় ছেলে কামাল হোসেন এ পেশায় আছেন। কিন্তু আগের মতো গোলপাতা ও হেতালের চাহিদা না থাকায় তেমন আয় করতে পারছেন না। বরগুনাসহ উপকূলীয় এলাকার কয়েক হাজার বাওয়ালির পরিবারই এখন এমন আর্থিক দুর্দশায় আছেন। তারপরেও জীবিকার তাগিদে এখনও অনেক বাওয়ালি পরিবার সুন্দরবনের গাছ ও গোলপাতা, মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। যারা মধু সংগ্রহ করে তাদের মৌয়াল বলা হয়। জীবন আর মৃত্যুর সঙ্গে এসব পেশাজীবী মানুষ সুন্দরবনের হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকতে হয়। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও বাপ-দাদার পেশা ধরেই আছেন এখনও উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক বাওয়ালি পরিবার।

৮. স্বর্ণকার

এই অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বাজারে স্বর্ণকার বা স্যাকারা রয়েছে। তারা সোনা ও রুপার গয়না তৈরি করে থাকে। বর্তমানে রুপার মাদুলি ছাড়া খুব কমই গয়না তৈরি হয়। আগে রূপা দিয়ে গলার হাঁসুলি, কোমরের বিছা বা গোট, হাতের কঙ্কন, বাজু, পায়ের মল ইত্যাদি তৈরি হতো। বর্তমান প্রায় সবাই সাধ্যমতো সোনার গয়না পরে। গলার হার, হাতের চুড়ি, বালা, ব্রেসলেট, নাকের ফুল, নোলক, পায়ের নূপুর ইত্যাদি তৈরি করায়।

স্বর্ণকার

www.pathagar.com

৯. ঋষি/মুচি

বরগুনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কয়েকটি ঋষি বা মুচি পরিবার আছে। তারা সারা বছর পুরানো জুতো মেরামত ও কালি করে থাকে। মৃত গরু মোষের চামড়া সংগ্রহ করে নিজেরাই ট্যান করে। এদের ভাষা উড়িয়া-মৈথিলির মিশেল। ধর্মাচরণ ও পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত রীতিনীতি ভিন্ন। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়ে-থার প্রচলন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও ভিন্ন।

১০. মেথর

এ অঞ্চলে কখনোই মেথর সম্প্রদায় ছিল না। জমিদার বাড়ি ঝাট দেয়া, হাট বাজার কুড়ানো ইত্যাদি যারা করত তাদের বলা হতো ভূইমালি। বিগত এক-দেড় দশকে স্যানিটারি পায়খানা প্রচলনের পর পায়খানার রিং স্লাপ পরিষ্কারের জন্য মেথর পেশায় কিছু লোক নিয়োজিত হয়েছে। এরা বিভিন্ন বাড়ির স্যানিটারি পায়খানার রিং স্লাব পরিষ্কার করে থাকে।

১১. ধোনকার/ধুনারি

বাংলাদেশে প্রত্যেক অঞ্চলেই ঐতিহ্যবাহী লোকপেশাজীবী ধোনকার বা ধুনারির বাস। বরগুনার বিভিন্ন অঞ্চলে ধুনারিরা এখনো তাদের পেশাকে আঁকড়ে ধরে আছেন। লেপ, তোশক, জাজিম, বালিশ প্রভৃতি ধুনারিরা তৈরি করেন। এই পেশার অন্যতম উপকরণ কাপড়, তুলা, নাকেলের ছোবড়া, সুই-সুতা ও ধুনারি যন্ত্র।

১২. ঘরামি

যারা ঘর নারা, ছন ও গোলপাতা দিয়ে ঘরের চাল ছাইয়ে দেয় তারা হলেন ঘরামি। কোনো কোনো দক্ষ ঘরামি নৌকাও তৈরি করে থাকেন। আজকাল এ পেশায় খুব কম লোক টিকে আছে। তবে বংশ-পদবি হিসেবে অনেকেই ঘরামি পদবি ব্যবহার করে থাকেন। প্রবাদ আছে–

ঘরামির ঘর নাই।
নাইয়ার নাও নাই।

১৩. মিস্ত্রি

লোক পেশাজীবীদের মধ্যে মিস্ত্রি বা ছুতারের এখনো অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়নি এই অঞ্চলে। কাঠ দিয়ে যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করেন তারাই মিস্ত্রি বা ছুতার। তাদেরকে সূত্রধরও বলা হয়। কাঠের বসতঘর তৈরি করেন। কারুকার্যময় আসবাবপত্র তৈরি করেন। আর তৈরি করেন চাষের জন্য লাঙল, মই প্রভৃতি।

www.pathagar.com

মিস্ত্রি বা ছুতার

মিস্ত্রিদের তৈরি নকশি খাট

www.pathagar.com

১৪. রাজমিস্ত্রি

রাজবাড়ির রাজপ্রাসাদ বানাত বলে নাম দেয়া হয়েছে রাজমিস্ত্রি। আসলে যারা ইট দিয়ে দালান বানায় তারা হলো রাজমিস্ত্রি। এলাকায় ভালো কাঠের দুষ্প্রাপ্যতা ও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য আজকাল পাকা বাড়ি বা দালান কোঠা বানান হচ্ছে। সাথে সাথে এই পেশায় দক্ষ কারিগর-রাজমিস্ত্রি তৈরি হচ্ছে। যারা রাজমিস্ত্রির কাজে যোগাল দেয় তাদের বলে যোগালিয়া। পাইলিংএর সময় এক ধরনের গান গায় পাইলিংয়ে অংশ নেয়া শ্রমিকরা। ছাদ পেটানোর সময়ও সমবেত গান পরিবেশিত হয়।

১৫. গুনরাজ

যারা মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করেন তারা হলেন গুনরাজ। এরা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী আর কালী মূর্তি তৈরি করে পূজা করার উপযোগী করে তোলেন।

১৬. কাঁসারি

বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের আজাইপুর ও জামালপুরের ইসলামপুরে কাঁসার সুনাম রয়েছে। তবে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই কাঁসা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কাঁসারিরা। বরগুনাতেও কাঁসারি পেশাজীবী এখনো বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করছেন।

১৭. সাপুড়ে

অ-তে অজগর। অজগর ওই আসছে তেড়ে। অক্ষর পরিচিতির প্রথম পাঠে এভাবেই সাপের সাথে এদেশের শিশুদের প্রথম পরিচয় ঘটে। আর বাস্তব জীবনে এ দেশের প্রায় অধিকাংশ মানুষেরই সাপের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে সাপুড়ের ঝুড়ি থেকে বের করা সাপের খেলার আসরে।

বরগুনার অধিকাংশ গ্রামে একসময় কোনো-না-কোনোভাবে এক ঘর সাপুড়ের বসবাস থাকলেও সাপ খেলা দেখানোর প্রধান শিল্পীরা ছিলেন এদেশের ক্ষুদ্র যাযাবর জাতিসত্তা বা বেদেরা। জানা যায়, বেদেদের মধ্যে সাপুড়ে, সওদাগর ও লোকচিকিৎসক নামে তিন ধরনের পেশাজীবী রয়েছেন। যার মধ্যে প্রধানতম পেশাজীবী হচ্ছেন সাপুড়ে, যাদের কেউ কেউ শুধু সাপ ধরে সাপ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কেউ-বা আবার আকর্ষণীয় সাপগুলোকে বিভিন্ন কৌশলে বশ করে খেলার উপযোগী করে তোলেন এবং সেই সাপগুলোকে ঝুড়িতে ঢুকিয়ে বাঁকে ঝুলিয়ে বা মাথায় করে গ্রামে-গ্রামে, হাটে-বাজারে ফেরি করে বেড়ান। আর সুবিধামতো স্থানে সাপ খেলার আসর জমিয়ে দেন। সেই আসরে তারা একই সঙ্গে সাপ খেলা দেখিয়ে এবং কিছু

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসার গাছ-গাছড়া ও কবিরাজি ঔষধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এ ধরনের সাপ খেলা দেখাবার জন্য সাপুড়েরা সাধারণত গ্রামের সাপ্তাহিক হাট-বাজারসহ লোকসংস্কারে বিশ্বাসী অভাবী বা নিম্নবিত্তের বাড়ি বা পাড়াকেই অধিক উপযোগী মনে করেন। সাপ খেলা দেখানোর জন্য সাপুড়েরা সচেতনভাবেই শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে বিত্তবান এলাকা পরিহার করে থাকেন। আসলে, যাদের কাছে এখনও আধুনিক শিক্ষার সচেতন জ্ঞানগত পরিচয় পৌঁছেনি তারাই সাপ খেলার ভোক্তা ও দর্শক।

সাপ খেলা দেখানোর উপাদান ও উপকরণ হিসেবে সাপুড়েরা সাধারণত লাঠি, বীণ বা বাঁশি, বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে থাকেন। সে সকল সাপ ফণা তুলতে পারে সে সকল সাপই খেলা দেখানোর প্রধান সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গোখরো সাপই সাপুড়েদের প্রধান অবলম্বন।

সাপ খেলা দেখানোর জন্য সাপুড়েরা কোনো পাড়া বা গ্রামে ঢোকার ক্ষেত্রে বীণ বাজাতে থাকেন। আবার কখনো কখনো এই সাপের খেলা 'কাল নাগিনীর খেলা' ...ইত্যাদি বলতে বলতে এগিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় তাদের বীণের ধ্বনি ও মুখের হাঁক-ডাক শুনে গ্রামের শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ সকল শ্রেণির দর্শক হাতের ছোট-খাটো কাজ ফেলে কখনো কখনো তাদেরকে অনুসরণ করে সাপ খেলার আসরে উপস্থিত হন।

সাপ খেলার আসরে লোক জমাতের জন্য সাপুড়েরা আরো কিছুক্ষণ সময় বীণ বা ডমরু বাজাতে থাকেন। তারপর হঠাৎ এক সময় তার ঝাঁপি থেকে একটা আকর্ষণীয় সাপ বের করে এক হাত দিয়ে সাপটির গলার কাছে এবং অন্য হাত দিয়ে লেজের কাছে ধরে মাথার উপর তুলে ধরে বলতে থাকেন—"এই যে দেখেন সেই সাপ যেই সাপে বাসর ঘরে লখিন্দরকে কামড়ায়েছিল...এ সেই সাপ... সেদিন সে বেহুলার বাসর ঘর থেকে পালায়ে গেলেও আমার হাত থেকে সে পালাতে পারে নাই। এই দেখেন আমার ওস্তাদে এটা সুন্দরবন থেকে ধইরা এনে আমার কাছে রাইখা গেছে। আজ দেখবেন এই সাপের খেলা।"

এমনই কথার মধ্যে হাতের সে সাপকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, এই যা খেলে দেখা তোর নাচের খেলা। এবং হাতের পাঁচ আঙুল ফাঁকা করে মাটিতে জোরে জোরে আঘাত করেন, সে আঘাতের শব্দ কম্পনে ও সংকেতে আগে থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত সাপটি ফণা তুলে সাপুড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। আর সাথে সাথে সাপুড়ে এবার গান শুরু করেন– "ও বিধির কি হইলো রে/তোমার আছে শতেক ভাই/আমার মায়ের কেউ নাইরে/আমার মাকে মা বলিবে কে/বেহুলা গা তোলো গা তোলোরে।" এই গানের মধ্যে সাপুড়ের এক সহযোগী খঞ্জনিতে তাল সঙ্গত করতে থাকেন।

আর সাপুড়ে তার গানের ভেতর সাপের ফণার সামনে হাতের বিভিন্ন ভঙ্গি করে সাপের ফণাটিকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। সাপ খেলা দেখানোর সময় সাপুড়ের হাতের ও

www.pathagar.com

শরীরের বিভিন্ন ভঙ্গি করার দুটি লক্ষ থাকে—এক. সাপকে নিয়ন্ত্রণ করা, দুই. দর্শককে আকৃষ্ট করে আসরে দাঁড় করিয়ে রাখা। সাপুড়েরা সাপ খেলা দেখানোর বিভিন্ন দেহ-ভঙ্গির মধ্যে হস্তমুষ্টির মুদ্রা, দুই হাতের আঙুলের বিচিত্র ব্যবহার, দুই হাঁটুতে কাঁপন তুলে সাপকে দাঁড় করিয়ে রাখার কৌশল এবং সাপের ছোবল থেকে রক্ষার জন্য হাতের কনুইকে ব্যবহার করে থাকেন। উল্লেখ্য, সাপ খেলা দেখানোর সময় অধিকাংশ সাপুড়ে হাতের কনুইয়ে এক ধরনের লাল রঙের গামছা বেঁধে রাখেন। যা খেলা দেখানোর সময় রাগী সাপদের রাগ নাশের ছোবল দানের সময় তারা অনেক সময় ইচ্ছে করেই সাপের সামনে এগিয়ে দেন। সাপ খেলার আসরের দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে সাপুড়েদের গাছ-গাছড়া ও কবিরাজি ঔষধ বিক্রির পর্ব।

এক্ষেত্রে সাধারণ খেটে খাওয়া লোকবিশ্বাসী মানুষের সারল্যের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাল-গল্প তৈরি করে দর্শককে মোহিত করে সাধারণত গাছড়া জাতীয় বস্তুই বেশি বিক্রি করে থাকেন। আসলে, সাপ-সংশ্লিষ্ট লোকবিশ্বাসকে আশ্রয় করেই সাপুড়েরা তাদের কর্ম সম্পাদন করেন। সাপ খেলায় পেশা নির্বাহ করতে গিয়ে বরগুনায় বেশ কয়েকজন পেশাজীবী সাপুড়ে সাপের দংশনে মারাও গেছেন। এর মধ্যে বরগুনা সদরে দুলাল মিয়া, পাথরঘাটা উপজেলার সেন্টু মিয়াসহ আরো বেশ কয়েকজনের নাম জানা যায়। পাথরঘাটা পৌর এলাকার ইমান আলী সড়কের সেন্টু মিয়া ১৫ বছর আগে সাপ খেলা দেখাতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিষধর সাপের ছোবলে দংশিত হন। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর তাঁর ছেলে আল-আমিন এখনো এই পেশা আঁকড়ে আছেন। আল-আমিন বলেন, জানি এই পেশাটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু বাবার কাছে শিখেছি বলে ঝুঁকি জেনেও এই পেশা আঁকড়ে আছি। আর কোনো কাজ জানি না বলে অন্য পেশায় যাওয়ারও সুযোগ নেই।

সাপুড়েরা তাদের গাছড়া বিক্রির জন্য সাধারণ মানুষের নৈমিত্তিক জীবনের নিখুঁত বর্ণনা করে লোকমানুষের ভেতর তাদের সঙ্গে দ্রব্যগুণের গুরুত্ব তুলে ধরেন, যেমন—সাপ খেলার আসরের মাঝখানে সাপুড়েরা প্রায়ই বলে থাকেন— "সাপ খুবই রাগী প্রাণী। তাকে কেউ আঘাত করলে সে কখনোই ক্ষমা করে না, যে দিনই হোক সে তার প্রতিশোধ নেই। এই তো আপনি ভাবছেন, আপনি তো কোনোদিন সাপকে আঘাত করেননি। কিন্তু না আপনি আঘাত করেছেন। আপনি জানেন না। আপনি সে দিন নিজের অজান্তে ঝাপ-গোসল করছিলেন, আপনার গোসলের জল সাপের গায়ে গিয়ে পড়েছে আপনি জানেন না, আপনি পথ দিয়ে হাঁটছিলেন ওই পথের পাশে একটা সাপ তার খাবার সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল, আপনার পায়ের শব্দ সাপটির খাবার মুখ থেকে ফসকে গেছে আপনি জানেন না। শুধু তাই না সেদিন বাঁশঝাড়ে বাঁশ কাটতে গিয়ে আপনি সাপের আস্তানা ভেঙে দিয়েছেন, আপনি জানেন না। কিন্তু ওই সাপ আপনাকে চিনে রেখেছে। সে আপনাকে অনুসরণ করছে, আপনি জানেন না। যে কোনো সময়

www.pathagar.com

সে আপনাকে কামড়ে দেবে। এর থেকে রক্ষার উপায় এই যে আমার হাতে। এই গাছটা যদি আপনি তাবিজ করে আপনার সঙ্গে রাখেন ওই সাপ কোনোদিন আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

এ ধরনের কথার মোহে পড়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ সাপুড়ের হাত থেকে গাছড়া ও তাবিজ-কবজ কিনে নেয়। সবশেষে তৃতীয় পর্বে আরেক বার গান বাদ্যের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ সাপ খেলা দেখিয়ে একটি আসর শেষ করা হয়। এরপর সাপুড়ে তার সাপের ঝাঁপি নিয়ে আরেকটি আসরের জন্য অন্য কোনো হাটে বা অন্য কোনো গ্রামে ও পাড়ার দিকে এগিয়ে যান। আর এভাবেই সাপ খেলার ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনা চলতে থাকে। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু সাপুড়ে তাঁদের সাপ খেলাতে নতুনত্ব আনতে সাপের সাথে সাপের চিরশত্রু বেজি নামের এক প্রকারের বন্য প্রাণী বহন করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে সাপ ও বেজির দ্বন্দ্ব নিয়ে অনেক লোককথা ও গল্প প্রচলিত রয়েছে। সাপুড়েরা লোকসমাজে প্রচলিত সেই গল্পের সূত্র ধরে সাপ খেলার এক পর্যায়ে সাপ ও বেজির চিরন্তন দ্বন্দ্ব দেখিয়ে থাকেন।

তবে, দর্শকবেষ্টিত আসরে সাপ ও বেজির খেলা দেখাতে গিয়ে কোনোভাবেই যেন কোনো প্রাণীর কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়টি সাপুড়েরা মাথায় রাখেন। এবং এই বোধ থেকে সচেতনা অবলম্বন করে সাপুড়েরা সাধারণত তাঁদের কাঠের বক্সের সঙ্গে বেজির গলায় রশি বা দড়ি বেঁধে রাখেন—যেন সে কখনো অধিক উত্তেজিত হয়ে সাপের উপর সশরীরে আক্রমণ করে সাপকে ক্ষতি না করতে পারে এবং সাপও যেন বেজির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেজিকে কোনো ক্ষতি না করতে পারে। সেই জন্য খেলা দেখানো সাপুড়ে তার সাপকে কৌশলে হাতে ধরে নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

এক সময় সারা বাংলাদেশে সাপ খেলার প্রচলন থাকলেও সাম্প্রতিককালে এই খেলার প্রচলন অনেকটাই কমে গেছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মানুষ এখন শিক্ষিত, যন্ত্র নির্ভর, আধুনিক ও বাজার অর্থনীতির আকর্ষণে লোকবিশ্বাসের ঐতিহ্য অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছেন, আর সেই সূত্রে ঐতিহ্যবাহী সাপ খেলার প্রতি একদিকে সাধারণ মানুষের আগ্রহ কমে এসেছে, অন্যদিকে সাপুড়ে পেশাজীবীরা তাদের ঐতিহ্যগত পেশা ত্যাগ করে নতুন পেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছেন। নগর সভ্যতায় সাপ খেলা তেমনভাবে দেখা না গেলেও সাপ প্রদর্শনের মাধ্যমে এক ধরনের নতুন পেশার উদ্ভব দেখা যাচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে। যেমন—বরগুনা শহরের অনেক বেদেনীকে সাপ নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে অর্থ তুলতে দেখা যায়।

বরগুনার লাকুরতলা, ক্রোক, পোটকাখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় সারা বছর এরকম বেদেদের খুপড়ি তুলে বাস করতে দেখা যায়। ক্রোক এলাকায় ১৬টি খুপড়িতে বসবাস করছে প্রায় ১০০ বেদে। জহির উদ্দিন নামে এক বেদে জানালেন, আগের মতো এখন আর এই পেশায় সুবিধা করতে পারছেন না তাঁরা। সারা দিন খেটেও ১০০-১৫০ টাকা

www.pathagar.com

আয় করা দুরূহ। কিন্তু অন্য কাজ জানেন না বলে বাবা-দাদার পেশাকে এখনো আঁকড়ে আছেন তারা। সুলেখা রানি নামে এক বেদেনি জানালেন, সারা দিন সুতানাগ (চিকন ও ছোট এক প্রজাতির সাপ) সাপ নিয়ে হাটে-বাজারে ঘুরে ১৫০-২০০ টাকা পাই। এ দিয়ে আট জনের সংসার চলে।

১৮. বানরওয়ালা

বরগুনা অঞ্চলের আরেক ভ্রাম্যমাণ পেশা বানর খেলা। যদিও বানর ও হনুমান হচ্ছে দেব-প্রাণী বা দেব-পশু। ত্রেতাযুগের অবতার প্রভু রামচন্দ্রের সঙ্গী বানরকে অতীতকাল থেকে গ্রামের মানুষ ভক্তি করে আসছে। বানরকে দুধ-কলা দেওয়ার চল বহু প্রাচীনকালের। এখনো অনেকে বানরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পছন্দ করে। অনেকে আবার পেশাগতভাবে গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন স্থানে বানর নাচিয়ে ফেরে। সাধারণত গ্রামের বিভিন্ন পাড়াতে বানর নাচানো হলেও শহরের রাস্তায় বা আবাসিক এলাকায় বানর নাচানো হয়ে থাকে। এই পেশাজীবীরা বানরের নাচ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে তার বিনিময়ে কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকেন।

বরগুনার শহর ও গ্রামে মাঝে মাঝেই বানর খেলা দেখা যায়। বাংলাদেশের বেদে বা যাযাবরসহ নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের মধ্যেও কেউ কেউ পেশাগতভাবে বানর পোষেন। তারা মাঝে মাঝে চাল বা অর্থ সংগ্রহের জন্য গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বাজারে বানর খেলা দেখিয়ে থাকেন। বানর খেলার সময়ে ক্ষেত্র বিশেষে বানর খেলোয়াড়রা বানরকে চমৎকার ব্লাউজ ও ঘাগরা পরিয়ে সাজিয়ে নিয়ে এই বানর খেলিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা বানরের গলায় চকচকে হার, কানে দুল, কপালে টিকলি, পায়ে তোড়া পরিয়ে দেন। কখনো কখনো বানরের হাতে দিয়ে রাখেন একটি রুমাল, যা তাকে বউ সাজবার সময় দরকার হয়। বানর খেলানোর জন্য বানরওয়ালা নিজের হাতে রাখেন ডুগডুগিও। সাধারণত পাড়ার কোনো জনবহুল স্থানে বানরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রথমে এই ডুগডুগি বা ছোটো ঢুলি বাজিয়ে বিশেষ ধরনের কিছু কথা বলে লোক জামানোর চেষ্টা করেন।

ঐতিহ্যগতভাবেই বানর খেলা দেখার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ রয়েছে বলে বানর নাচিয়ের ডুগডুগির বাজনা শুনে অধিকাংশ সময় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বয়স্ক লোকেরাও ছুটে আসে। তারা এসে বানর ও বানরওয়ালাকে ঘিরে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে থাকেন। ভিড় জমে উঠলে বানরওয়ালা লাঠি উঁচিয়ে গান ধরেন—কি কি গহনা লিবি সুন্দরী, মনের কথা বল। হার লিবি, টিকলি লিবি, লিবি পায়ে মল।

এই গানের সঙ্গে বানর তার ইচ্ছেমতো নাচতে থাকে। এক সময় বানরওয়ালা তার নাচ থামিয়ে দর্শকদেরকে দেখিয়ে বলেন, নে নে বাবু-ভাইদের কাছে চেয়ে নে। উপস্থিত দর্শকগণ তখন নানান ধরনের কথা এবং অঙ্গভঙ্গি করে বানর ও

www.pathagar.com

বানরওয়ালাকে ভড়কে দিতে চান। কিন্তু বানর সব কিছুকে উপেক্ষা করে উপস্থিত দর্শকদের দিকে হাত পাততে থাকে।

বানর নাচিয়ে তখন কিছু কৌশলী কথাবার্তা বলে দর্শকদের কাছ থেকে কিছু সম্মানী নিয়ে পরের পর্বে বানর খেলায় মেতে ওঠেন। এক্ষেত্রে বানরটি তার সরদার বা ওস্তাদের কথা ও নির্দেশমতো বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, লাফ-ঝাঁপ ও অভিনয় করে। যেমন–বানরওয়ালা তার হাতের লাঠি উঁচু করে নির্দেশ করেন–এই রে এবার পাহাড় ডিঙা তো দেখি। সঙ্গে সঙ্গে বানর লাফ দিয়ে লাঠির উপর দিয়ে পার হয়ে যায়। এইভাবে বানরটি একে একে সাগর ডিঙিয়ে, প্রণাম করে, বউ সাজে, আধুনিক বউ-এর রঙ্গরস দেখায়, শাশুড়ির প্রতি অত্যাচার দেখায়, স্বামীর সঙ্গে সোহাগ দেখায়, স্বামীর সঙ্গে রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়, গিয়ে অন্যের কাছে একটু লজ্জায় পড়ে। এসব দেখতে দেখতে দর্শকরা কৌতুকে মজে যায়। জীবনরসের গানগুলি হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে ঠুকে যখন গাইয়ে গেয়ে থাকেন, তখন বানরের অঙ্গভঙ্গি দেখলে মানুষ আর না হেসে পারেন না। বানর নাচের অনেক গান আছে। যেমন– "বউদি-দেওরের গানে– "আল ধানের মাড় রাঁধেছি কানা শাগের বেসাতি। /সাঁজের বেলা দেওর শালা লুচকাঁই খায় বেসতি।" বরগুনাসহ দক্ষিণাঞ্চলে এখনো কম-বেশি বানর নাচ ও বানর খেলার প্রচলন রয়েছে।

১৯. মাঝি, পাটনি

মাঝি

অসংখ্য ছোট-বড় নদী ও খালে পরিবৃত বরগুনা অঞ্চল। এক সময় নৌকাই ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কেয়ারা, একমাল্লাই, কাঠামি ইত্যাদি নৌকা লোক চলাচল ও পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হতো। এই নৌকা চালায় যারা তাদের বলা হয় মাঝি। মাঝিরা বেশ দক্ষ। নদীর উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে তারা নদীতে নৌকা চালায়। আজকাল নৌকার পরিবর্তে ইঞ্জিন চালিত ট্রলার ব্যবহৃত হচ্ছে। ট্রলার চালাতেও দক্ষ মাঝির প্রয়োজন হয়। নৌকা চালায় যে মাঝিরা তাদের অনেকেই মাঝি পদবি ব্যবহার করে থাকে। এখানো মাঝি পদবি ব্যবহার করছে অনেক পরিবার।

পাটনি

যারা খেয়া পারাপার করে তাদের পাটনি বলা হয়। পাথরঘাটা থানার কাকচিড়া খালে খেয়া পারাপার করত গৌরাঙ্গ পাটনি। খুবই দক্ষ ছিল সে। প্রায় ৫০ বছর সে এই পেশায় ছিল। কিন্তু সেই খালে এখন ব্রিজ হওয়ায় নৌকায় পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বিষখালি, পায়রা ও বলেশ্বর নদীতে এখনো ইঞ্জিনের নৌকা ও ট্রলারে দক্ষ মাঝি ও পাটনিরা লোক পারাপার করে থাকে।

www.pathagar.com

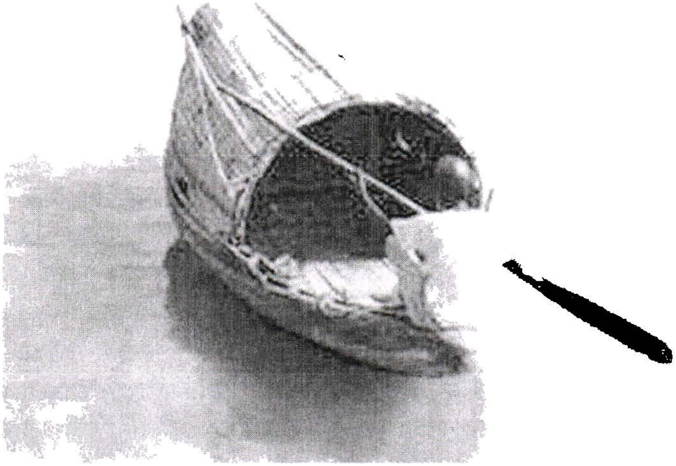

কেরায়া নৌকার মাঝি

২০ সানদার

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও সানদার পেশায় অনেকেই যুক্ত রয়েছেন। পৈতৃক পেশা না হলেও এরা ছুরি, কাঁচিতে সান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। নাপিতের কাঁচি-খুর ও গেরস্তের দা-বটিতে এরা সান দিয়ে থাকে।

সানদার

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

তাবিজ কবজ

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন গলায়, বাহুতে, কোমরে, মাথায় তাবিজ কবজ ধারণ করে থাকে। বিপদ আপদ, রোগ ও শোকে তারা তাবিজ কবজ পরে থাকে। মৌলবি, ওঝা ও পুরোহিতরা সাধারণত তাবিজ কবজ লিখে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায় দোয়া, কোরানের আয়াত খুব পাতলা রঙিন কাগজে লিখে টিন কিংবা সোনা রুপার কবজে ভরে তা ব্যবহার করতে দেয়। হিন্দুরা নানা দেবদেবী বা অবতারের নাম-চিহ্ন কবজে লিখে থাকে। তবে অনেকে স্বস্তিকা চিহ্নও ব্যবহার করে থাকে।

শিশুর গলায় ধুকধুকি, আটমোড়সহ মাদুলি

বাটি চালান

কোনো কিছু হারিয়ে গেলে কোনো কোনো ওঝা বাটি চালান দিয়ে থাকে। বাটি চালানে তুলারাশির লোককে ব্যবহার করা হয়। কাঁসার বাটি ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

থাল পাড়া

ভীমরুল, বল্লা, মৌমাছিতে হুল ফোটালে কাঁসার থাল পড়া পিঠে লাগিয়ে দেয়। অনেকের ধারণা তাতে বিষ ক্ষয় হয়।

পানি পড়া/মিষ্টি পড়া

মোল্লা পুরোহিতরা নানা রোগ নিবারণের জন্য পানি পড়া, মিষ্টি পড়া দিয়ে থাকে। সাধারণের বিশ্বাস এতে তাদের রোগের উপশম হয়।

টোটকা চিকিৎসা

এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রত্যন্ত গ্রামের লোকের পক্ষে অসুস্থ হলে কাউকে দ্রুত হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। মানুষের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। একে আমরা লোকচিকিৎসা বলছি। এখানে কয়েকটি লোকচিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হলো।

১. হাত-পা কেটে ছিঁড়ে গেলে সেখানে দূর্বাঘাস চিবিয়ে তার রস দেয়া, পানের রস দেয়া, স্থানীয় এক ধরনের লতা যা বন্যা লতা নামে পরিচিত তার রস দেয়া, কচুর ডগার রস দেয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।
২. পুড়ে গেলে সেখানে বাটা মরিচের প্রলেপ দেয়া হয়। তাতে জ্বালা পোড়া বন্ধ হয়। অনেক সময় কাঁচা ডিমের কুসুম লেপে দেয়া হয় তাতে ফোস্কা পড়ে না।
৩. ফোঁড়া পাকানো ও মুখ করানোর জন্য পুরনো ঘি, পুরনো তেঁতুল, পেঁয়াজ বাটা ব্যবহার করা হয়।
৪. সর্দি পাকানোর জন্য তেঁতুলের পাতায় খানিকটা হলুদ মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ক্বাথ তৈরি করে পান করার ব্যবস্থা করা হয়।
৫. কৃমি ফেলতে আনারসের পাতার কচি অংশ ও খেজুর গাছের পাতার রস একসাথে মিশিয়ে সেবন করতে দেয়া হয়।
৬. আমাশয়ের চিকিৎসা থানকুনি পাতার ভর্তা বা ভাজি এবং স্থানীয় ভাষায় বাইত পাতার রস খাওয়ানো হয়।
৭. সর্দি কাশি উপশমের জন্য বাসক পাতা, তুলসি পাতার রস ব্যবহার করা হয়।
৮. পাথর কুচি ও নিশিন্দা পাতার রস ব্যবহার করা হয় পেটে গোলমাল হলে।
৯. কারো রক্তচাপ বেড়ে গেলে তেঁতুলের শরবত খাওয়ানো হয়।
১০. পেটের ব্যথার জন্য আদার রস পান করানো হয়।
১১. ঠান্ডা লাগলে সরিষার তেল ও রসুন গরম করে হাত-পায়ে মালিশ করা হয়।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

বাঘ ও সাপের মন্ত্র

বরগুনা সদর উপজেলার গৌরীচন্না ইউনিয়নের খাজুরতলা গ্রামের মফেজ উদ্দীন হাওলাদার (৮৬) পেশায় একজন গোমস্তা ও ওঝা। প্রায় ৫৫ বছর ধরে তিনি সাপে

www.pathagar.com

কাটা ও অন্যান্য রোগীর চিকিৎসা, বাওয়ালিদের নিরাপত্তায় সুন্দরবনে বাঘের মুখ বন্ধের জন্য গোমস্তার পেশায় নিয়োজিত। প্রায় ২৪ বছর তিনি সুন্দরবনে গোমস্তার কাজ করেছেন। বাড়িতে বসে সাপে কাটা ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করেন। অবশ্য বাঘের মুখ বন্ধের জন্য তিনি প্রচলিত কোনো ন্ত্র ব্যহার করেন না। তবে সাপে কাটা রোগী ও অন্যান্য রোগের ঝাড়-ফুঁকে তিনি মন্ত্র ব্যবহার করেন।

লাকুরতলা গ্রামের আ. গণি মুন্সি তাঁর ওস্তাদ। ৬০ বছর আগে ওস্তাদের কাছ থেকেই বাঘের মুখ বন্ধ করার দোয়া-কালাম ও সাপে কাটা এবং অন্যান্য রোগ বালাইয়ের জন্য ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র শিক্ষা নিয়েছেন তিনি। তার ওস্তাদ আ. গণি মুন্সিও এক সময় সুন্দরবনে যেতেন গোমস্তা হিসেবে। পরে তিনি বিভিন্ন রোগের ঝাড়-ফুঁক দিতেন। এজন্য এলাকায় তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল ব্যাপক। আ. গণি মুন্সি মারা গেছেন ৭-৮ বছর আগে। এখন মফেজ উদ্দীনই তার শিষ্য হিসেবে এসব কাজ করছেন। মফেজ উদ্দীন এই গ্রামের আলিম উদ্দীন হাওলাদারের ছেলে। ছয় মেয়ে এবং তিন ছেলের বাবা মফেজ উদ্দীনের স্ত্রী ফকরুন্নেছা বেগম।

সুন্দরবনে দীর্ঘ ২৪ বছর গোমস্তার কাজ করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন মফেজ উদ্দীন। অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এসব ঘটনাই এখন কিংবদন্তি বা লোকজ সাহিত্যের অংশ।

বাড়ি থেকে ভোর রাতে বড় কাডামি নৌকায় কইর‍্যা পশ্চিম পাড় (সুন্দরবন) রওয়ানা দিতাম। আগের দিন আত্মীয়-স্বজন সবাইরে দাওয়াত কইর‍্যা বাড়িতে আনতাম। ভাল-মন্দ খাওয়াইতাম। তারপর সবাইর ধারে বইল্লা নৌকায় ওঠতাম। এক জোয়ারে পশ্চিম পাড় পোঁছাইতাম। পরদিন সকালে নৌকার বাওয়ালিরা সবাই ওজু কইর‍্যা ডাইন পাও দিয়া কিনারে নামতাম। আয়তাল কুরসি সুরা ও আলহামদু সুরা এবং আন্না তাইনা সুরার অর্ধেক পইড়্যা গলায় খাপড় দিতাম। যতদূর গলায় খাপড়ের আওয়াজ যাইত ততদূর পর্যন্ত বাঘ আইত না। বাঘ যদি কাছাকাছি আইত তার একটা নমুনা আমরা পাইতাম। কাছাকাছি বাঘ আইলে হেই সময় চাইর দিকে খুব কুয়া (কুয়াশা) পড়তো। আর কেউ কাউরে ডাক দেলে হোনা যাইতো না ও সবাইর মনে খুব ডর ডর ভাব অইতো। এই তিনটা আইলো বাঘ ধারে আওনের সংকেত। এই তিনটা নমুনা দেখলেই মোরা বোঝতাম কাছাকাছি বাঘ আছে। তহন মোরা সবাই এক জাগায় জড়ো আইয়্যা বইতাম।

উন্দুর ধরার লইগ্গা বিলই (বিড়াল) যেমন চাপটি মাইর‍্যা শুইয়্যা থাহে বাঘও হেই রহম গাছের গোড়ায় মাটির লগে চাপটি মাইর‍্যা থাহে মানুষ শিকার করনের লইগ্গা। তয় বাঘের চোহে মানুষের জউক পড়লে বাঘ আর শিকার করে না। এইটা বাঘের ধর্ম। মোর ২৪ বছরের জঙ্গল জীবনে দুই ফির বাঘ দেকছি।

একবার ডিএফও সাইবে একটা বাঘের চামড়া চাইলে ফরেস্ট অফিসার কালিপদ বাবু আমারে লইয়্যা বাঘ শিকারের লইগ্গা যায়। সুন্দইরবনের শাপলা খালের মধ্য দিয়া নৌকায় মোরা জঙ্গলে দিকে যাওনের সময় দেহি একটা বাঘ খালে গোনে পানি খাইয়্যা যাইতে আছে। অমনি কালিপদ বাবু গুল্লি দিয়া বাঘটারে ফাইনাল কইর‍্যা ফালায়। প্রায়

www.pathagar.com

আধঘণ্টা পর কিনারে নাইম্মা মোরা বাঘটারে টাইন্না নৌকায় উঠাইয়্যা শরণখোলা লইয়্যা আই। হেইহানে ফরেস্ট ক্যাম্পে চামড়া খুইল্লা বাঘটারে মাটিতে পুইত্যা রাহি। বাঘটার লেজ অইতে মাথা পর্যন্ত ১১ ফুট লম্বা আলহে। এইডা পেরথম পানি লইন্নার (বাংলা ১৩৬৫ সাল) বছরের কথা।

একবার সুন্দইরবনের বড় শৌলা খাল দিয়া একটা কুমুইরের ছাও (কুমিরের বাচ্চা) ধইর‍্যা আনছিলাম বাড়ি। কুমুইরের গোস্তের তাবিজ গরু, মইষ এমন কি মানুষের লগে থাকলে হ্যার গুডির ব্যারাম (গুটিবসন্ত) অয় না। ওস্তাদ গণি মুন্সি আমারে এই কথা শিখাইছে। ওস্তাদ গণি মুন্সি কইছে, কুমুইরের পিডে চইড়্যা দেবী শীতলা সাগর পার অইছে। তহন কুমুইর শীতলা দেবীরে কয়, মুই যেহানে যামু তুমি হেইহানে যাবা না। শীতলা দেবী কুমুইরের এই প্রস্তাব মাইন্না নেয় তহন। হেই অইতে কুমুইরের হারা গায় গুডি অয়। কুমুইরের গায় গুডি আছে বইল্লা এইর গোস্ত মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর লগে থাকলে আর তার গুডির ব্যারাম অয় না।

সাপের মন্ত্রগুলো মূলত দেবতা শিব ও দেবী পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করে রচিত। প্রত্যেকটি মন্ত্রেই শিবের শৌর্য-বীর্যের নমুনা আর পদ্মাবতীর স্তুতি লক্ষিত হয়। ওঝা মফেজ উদ্দীন বলেন, শিব বহুরূপী ছিল। সে আটটি রূপ ধারণ করে বিভিন্ন নারীর লগে সঙ্গম করত।

একদিন শিব তার পাল্লক মাইয়্যারে দেইখ্যা কাম বাসনা জাগে। শ্যাষে পাল্লক মাইয়্যার লগে সঙ্গ করে। সঙ্গের পর যেই বীর্য বাইরে পরে তা খাইয়্যা বল্লা, ভেউংরাল এইসব পোকারা বিষ ধারণ করে। সঙ্গর পর যে নদীতে গোসল করে তার পানিতে মিশে যাওয়া বীর্য পান করে কাওন, শিং, মাগুড়, পাঙ্গাস এইসব মাছ মুখে বিষ ধারণ করে। পাল্লক বাপের লগে সঙ্গ করায় পদ্মাবতী মা শিবের পাল্লক মেয়েকে বর দেয় যে, তোর পেটে শিবের অষ্টরূপের মতই আটটা সর্প জন্মাইবে। পদ্ম মায়ের বর অনুযায়ী শিবের পালিত মেয়ের গর্ভে আটটা সাপ জন্মায়। এই জন্য সাপের বিষ নামানোর সব মন্ত্রই শিব আর মা পদ্মকে লইয়্যা।

সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র হিসেবে যেসব শ্লোক পাওয়া যায় তাতে দেবী পদ্মর দিব্যি এবং মহিমা পাওয়া যায়। পাশাপাশি শিবের শৌর্য-বীর্যেরও বিবরণ পাওয়া যায়।

সাপে কামড় দিলে যে স্থানে কামড় দেয় সে স্থানে পাটের চিকন রশি দিয়ে বেঁধে সুচ দিয়ে ছিদ্র করেন। ওঝাদের ভাষায় এটাকে ডোর বলে। ডোর দেওয়ার সময় যেসব মন্ত্র পড়া হয় নিচে এমন কয়েকটি মন্ত্র উল্লেখ করা হলো–

১.

ডোর বান্দি ইন্নে, ডোর বান্দি বিন্নে
ডোর বান্দি কুক্কানাতের জোতে
মুই আমেশ্বা মহাদেব
রইজ্যা থাক বিষ ঘা মোক্ষে
পরিয়া যদি বিষ উপরে ধাও
তয় তোর অষ্টনাগের মাতা খাও।

www.pathagar.com

২.
আজ দুয়ারে ডালিম গাছটি
পাছ দুয়ারের আগে
তাতে বসি ডাকে দারুলি
কাগা কাগা বলে
কাগিনি দেখ আজ
অরা দুই বাপে-ঝি যায় শোর্দ্ধ আউ আউ
শোদর ঝির না ধরিও হাতে
ওরে কলঙ্কিনী বিষঅলা
তোরে না ধরিও হাতে
না ধরিও পাতে
বিষ যাইবে ফুতে-ফাতে।

৩.
সোনার নাঙ্গল রুপার ফাল
মা মুণ্ড ভাইগনা জোটছে হাল
হাইল্লা ভুইতে পরিপাটি
তাতে জন্মাইলো পাড়ের আটি
ডোর ডোর পাড়ের ডোর
শিবের মাতায় পাইয়্যা চোর
হাড় বাটে, মাংস কাটে
তবু না বিষ উপরে ওঠে
বিষ খেয়ে বিষ খেয়ে
মা পদ্মার স্মরণে বিষ খেতে।

৪.
সোনাতলা রুপাতলা
তারা দুইটি ভাই
সোনার পুতুলি বিষ কোথায়
যাইয়্যা পাই কালা কালা
নগন্নি কোমড়ে ঘাগর
গাই খিল ভাঙ্গিয়া বিষ

বাহিরে নেকল ওড়ে বিষ
রইছো তুই হারের মধ্যে
ঘোমটা মুড়া দিয়া লাম লাম

www.pathagar.com

শ্রী জগন্নাথের বিষ বিষ
ক্ষে পদ্যার শরণে
উনিকুড়ি বিষ ক্ষে ॥

বি.দ্র. এই মন্ত্র দিয়ে সাপের বিষ নামানোর সময় ওঝার হাতে সোনা অথবা রুপার আংটি থাকতে হবে।

৫.

বিষ বন্ধ করার মন্ত্র

ওপার ধোপার ঝি কাপুড় কাচে
পদ্মপত্রে বিষ ভাসে
মুই বোলে ধোপার ঝি
ওলো তুই মোর শিশ
আমার অঞ্চলে বান্দিয়া রাকলাম
ওনোকুড়ি নাগের বিষ ॥

সাপে কাটা রোগীর হুশ না ফিরলে যে মন্ত্র পড়ে রোগীর চোখে ফুঁ দিতে হয়–

৬.

আলীকে ছত্তার, হাতমে জুলফিকার
আমার বিষ বান্দিয়া যে রাক্ষিছে
কাটিয়া ডাইনে আর বায়
কতল কর দোহাই ভক্তমনির
খাও গিয়া মাথা বসিয়া
এ রাগা যাই আর ফিরত্তি নাই
হাতে রাক্ষ মুখে রাক্ষ
কাটিয়া হিরার ছুরতে
কাটিয়া কতল কর দোহাই পদ্মার ॥

৭.

বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

এই ছুড়ি ঋষির ঝি
পঞ্চ বিষ করলা কি
পঞ্চ বিষ নালে নালে ধায়
ডোরের মধ্যে আয় বিষ
ক্ষে ক্ষে পদ্মার স্মরণে
বিষ ডোরের মধ্যে ভাটি দে ॥

www.pathagar.com

৮.
বিষের নাম কালিয়া ও ধলিয়া
বাও হাত দিয়া নামাইলাম উলিয়া॥

৯.
পানিরে পানি
তোরে আমি ভোগদে জানি
এই পানি মহাদেবের ঘাম
নয়া হাঁড়িতে চড়াইলাম
বিষের মাইট ।

১০.
এউটিয়া, কেউটিয়া
জলে থাক, জলে কর বাস
যাহার কামড়ে গোস্বামী
নাহিক নিস্তার কাগা
বগা ছাড়ে পানি আলা
বিষ শুনিয়া আদ্যের বাণী
খাগামা বড় লোক শুনি
হেন আদ্যা কহ তোমার সাইধ্যের সাদতি অমৃতের
ঝরায় বিষ ক্ষেমা পদ্মার
স্মরণে বিষ ক্ষে ॥

১১.
শঙ্কুর, অঙ্কুর, ডঙ্কুর
রিনি মা. জানি বিষের আদ্যমূল
বিষ জন্মিয়াছে বাসু দেবীর ঘরে
পদ্মা মা পাইয়্যা তারে
গর্ভে মারে ওরে
জারুয়া বিষ ঝাড়ে তোর
মূল গাঙ্গের ঘাটে যাইয়্যা
দেবী খুলিয়া ঝারে চুল
আদ্যমূলে ঝাড়িয়া বিষ
খুয়ালাম তোর মূল
বাসু দেবী গিয়া ছিল, খাইবার সেই ভোগ
ভোগ সাজাইল কোন জনে

www.pathagar.com

শিবের লিঙ্গ পাইয়্যা দেবী তুষ্ট হইল
অতি বিষ ছাড়িয়া দিল
জ্বালাইয়া মোমের বাতি
বিষ চলিয়া যা ঘা মুক্ষে
যদি পাছে ফিরে চাও তবে শিবের লিঙ্গ লইয়্যা যাও।

১২.
নালীবাত, বিচি-ফোঁড়ার বিষ দূর করতে মন্ত্র–
মাডি, পানি মাগো
তোমার হাতে জন্ম
তোমার বাল্লগ দয়া কর
আপনে আল্লার নাম, আজিম নবীর নাম খির
দুন্নইর নাম ডবল ছত্র
খাগির নাম বিষ
আলীর নামে পানি ঝাড়া দিয়া
ফলনার বিষ করলাম নির্বিষ।

এই মন্ত্র তিনবার পড়ে মাটিতে ফুঁ দিয়ে সেই মাটি গুলিয়ে বিচি-ফোঁড়া ও যে কোনো ব্যথা-ফুলা স্থানে প্রলেপ দিলে তা উপশম হয়।

www.pathagar.com

ধাঁধা

১.
ককর উদ্দীন নাম তার
ককারে আকার
পাঁঠার পা কাটিয়া
তার সঙ্গে 'ল' মিশাইয়্যা
যে বস্তু হয় দিবেন পাঠাইয়্যা ।
উত্তর : কাঁঠাল

২.
এক হাত গাছটা
ফল অয় পাঁচটা ।
উত্তরঃ হাত

৩.
চাডে-চোডে
খায় না ।
উত্তরঃ হাতের আঙুল ।

৪.
কালা কালা ভুইত্তা কালা
লেঙ্গুর ধইর‍্যা খালে হালা ।
উত্তরঃ ঝাকি জাল ।

৫.
আমি থাকি ডালে
তুমি থাক খালে
তোমার আমার দ্যাহা
মরণের কালে ।
উত্তরঃ মরিচ ও মাছ ।

www.pathagar.com

৬.
আত নাই, পাও নাই
কাড়া বোর দিয়া দৌড়ায়।
উত্তরঃ জোয়ার।

৭.
ঠেইল্লা দেলে মেইল্লা যায়।
উত্তরঃ ছাতা।

৮.
এক থাল সুবারি
গোনতে পারে কোন বেপারি।
উত্তরঃ তারা।

৯.
ফান্দির উপরে ফান্দি
যে না কইতে পারবে
হে মোর বান্দি।
উত্তরঃ কলার কাঁদি।

১০.
অধের মইধ্যে গড় গড় হরে
টাইন্না ধইর্‌্যা পাছাড় মারে।
উত্তরঃ সর্দি।

১১.
চাইরও কূলে কাডাকোডা
মইধ্যে একটা সোনার বাডা।
উত্তরঃ আনারস।

১২.
আইচি কাজে
কইনা লাজে
হ্যা রইচে
দুই ঠ্যাংগের মাঝে।
উত্তরঃ গাভীর ওলানের দুধ।

www.pathagar.com

১৩.
দুই ঠ্যাং ছড়াইয়া
দেলাম ভইর‍্যা
উপড়ে চাপ
নিচে চাপ
হ্যারপর খাপে খাপ
যা ভাবচ হ্যা না বাপ।
উত্তরঃ যাঁতি বা সুপারি কাটার শরতা।

১৪.
আত্বর, বাডইল বাইশখান
কও তো দেহি কয়খান?
উত্তরঃ তিনখান।
কাঠমিস্ত্রিদের হাতিয়ার-হাতুড়ি, বাটালি, বাইশখান।

১৫.
ওই ছেমরি খাড়াইয়া
চৌদ্দ আত বাড়াইয়া
নিত্য নতুন কাফুর ছাড়ে
ক্যাৎকুলিদ্যা পোয়া বাইর হরে।
উত্তরঃ কলাগাছ।

১৬.
ফুডার মইদ্যে হান্দাইয়া
লড়ালড়ি হরে।
কহন বোজে কহন খোলে
থাহে বেয়াক গরে।
উত্তরঃ তালাচাবি।

১৭.
আকাশ থেকে পড়লো বুড়ি
খাতা বালিশ লইয়া
সেই বুড়ি কতা কয়
সবার মাঝে বইয়া।
উত্তরঃ হুক্কা।

www.pathagar.com

১৮.
একটি ডাবে ৭টি বাটা
যে না কইতে পারবে হের
নাকটি কাটা।
উত্তর: চালতা।

১৯.
নাকে বসে ধরে কান
পড়ে গেলে যায় জান
বলতো জিনিসটি কি?
উত্তর: চশমা।

২০.
আদিকালের কতা
কোন গাছের একটি মাত্র পাতা?
উত্তর: ব্যাঙের ছাতা।

২১.
এমন জিনিস যা সব লোকে খায়
গুরাগারায় খাইয়া মায়ের ধারে যায়।
উত্তর: আছাড়।

২২.
আটখানা পা ষোল খানা হাঁটু
জাল বুনছে মোক্তার নাটু।
উত্তর: মাকড়শা।

২৩.
আমার ভাই মীর
বড় লোকের সঙ্গে
বসে খায় ক্ষীর।
উত্তর: মাছি।

২৪.
তিন অক্ষরে নাম তার সর্ব ঘরে রয়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে খাবার জিনিস হয়

www.pathagar.com

মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে বাদ্যযন্ত্র হয়
শেষের অক্ষর বাদ দিলে ভয়ের কারণ হয়
উত্তরঃ বিছানা।

২৫.
আকাশ থেকে পড়লো ফল
ফল থেকে পড়লো জল।
উত্তরঃ শিলা।

২৬.
মাথার মুকুট গোলগাল
পেটের মধ্যে হাতপা
নড়ে কিন্তু চড়ে না
এটাকি বল না?
উত্তরঃ ঘড়ি।

২৭.
আমার ভাই মদন রায়
একশো আটটা জামা গায়
তবু আরো জামা চায়।
উত্তরঃ কলাগাছ।

২৮.
ছোট খাট গাছটি
লাল টুকটুক ফলটি।
উত্তরঃ মরিচ।

২৯.
আধা কলশি নব ঢং
পাতায় পাতায় ঢং
যদি পাতায় ফুল হয়
হাজার টাকা মূল্য হয়।
উত্তরঃ ওলকপি।

www.pathagar.com

৩০.
কোন পাতা
পাতা না?
উত্তরঃ বইয়ের পাতা।
৩১.
এক গাছে
তিন তরকারি।
উত্তরঃ কলাগাছ।

৩২.
কোন সাগর
সাগর না।
উত্তরঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৩৩.
জন্ম যখন পায়
তার নড়াচড়া নাই।
উত্তরঃ ডিম।

৩৪.
দুই চালের
এক বাতা।
উত্তরঃ কলাপাতা।

৩৫.
যা দেন তাই খামু
জল দিলেই মরইয়া যামু।
উত্তরঃ আগুন।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

১.
গোন বুইজ্যা নাও বায়
হ্যারে কয় নাইয়া
আসর বুইজ্যা গান গায়
হ্যারে কয় গাইয়া
আর মন বুইজ্যা কথা কয়
হ্যারে কয় মাইয়া।

ব্যাখ্যা: পরিস্থিতি ও পরিবেশ বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

২.
মাগির গরে পাতিল কাইত
লাংয়ের পিরিত হারা রাইত।

ব্যাখ্যা: লম্পট স্বামীর কথা বলা হয়েছে।

৩.
আগে আলহে উল্লা তুল্লা
হ্যাষে অইচে উদ্দিন
যেয়ারে অইচে সৈয়দ মিয়া
পয়সা আইতে যদ্দিন।

ব্যাখ্যা: টাকা হলে সাধারণ থেকে অভিজাতের দলে নাম লেখায়।

৪.
খানকি, বৈদ্য, মোক্তার, নাপতা
হয় রোজেরডা রোড
নাইলে হপ্তা হপ্তা।

ব্যাখ্যা: এ সব পেশার লোকদের নিয়মিত রোজগারের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

www.pathagar.com

৫.
আম খাবি আমসি
মাগি রাখপি ধুমসি ।
ব্যাখ্যা: রক্ষিতা রাখার ব্যাপারে আগের দিনের পুরুষদের নীচ মানসিকতা ।

৬.
সাত জম্মে নাই চাষ
ধান গাছেরে কয় তাল গাছ ।
ব্যাখ্যা: যে চাষি নয়, চাষবাস ফসল সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না ।

৭.
ডরাইলে তালগাছ
না ডরাইলে বালগাছ ।
অথবা
মানলে তালগাছ
না মানলে বালগাছ ।
ব্যাখ্যা: কাউকে সম্মান দেখালে তবে সে বড় হয় আর কাউকে হীন ভাবলে সে হীন হয়ে থাকে ।

৮.
গাঙের পাড়ে বাস
ভাবনা বারো মাস ।
ব্যাখ্যা: নিত্য দুর্ভাবনার কথা বলা হয়েছে । নদীর পাড়ে যারা বাস করে তাদের সব সময় দুর্ভাবনায় থাকতে হয়, কখন নদী ভাঙন শুরু হয় ।

৯.
গর নাই তো দুয়ার বান্দে
মাউগ নাই তো পোয়া কান্দে ।
ব্যাখ্যা: কল্পনাবিলাসীকে বোঝানো হয়েছে ।

১০.
কোতায় আগরতলা
কোতায় উগইরতলা ।
ব্যাখ্যা: যার স্থান-কাল ও দূরত্ব সর্ম্পকে ধারণা নেই, তার সর্ম্পকে বলা হয়েছে ।

www.pathagar.com

১১.
ভাত খাওয়নের নাই পাত
কাপুড় পেন্দে চৌদ্দ আত ।
ব্যাখ্যা: ঘরে খাবার নাই সে সব কেতাদুরস্তদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ।

১২.
মায় রান্দে যেমন তেমন
বুইনে রান্দে পানি
মাউগের আতের রান্দন
যেন চিনির পানাখানি ।
ব্যাখ্যা: স্ত্রীকে খুশি করার কথা বলা হয়েছে ।

১৩.
আস্তে রান্দে সুস্তে খায়
তয়গ্যা হেয়ার সোয়াদ পায় ।
ব্যাখ্যা: যত্ন করে খেলে তৃপ্তি পাওয়া যায় ।

১৪.
কর্তায় কইচে চুদির ভাই
আল্লাদের আর সীমা নাই ।
ব্যাখ্যা: মোসাহেবদের কাছে কর্তাব্যক্তির গালিও উপভোগ্য ।

১৫.
হাগের মইদ্যে পুই
মাছের মইদ্যে রুই
ডাইলের মইদ্যে মুসুরি
কুটমের মইদ্যে শাশুড়ি ।
ব্যাখ্যা: শাক, মাছ ও ডালের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে, আর আত্মীয়ের মধ্যে শাশুড়িই বড় আত্মীয় ।

১৬.
বাপ রাজা রাজার ঝি
ভাই রাজা আমার কি?
ব্যাখ্যা: রাজা বাপ হলে তাকে রাজের ঝি বলা হয়, কিন্তু ভাই রাজা হলে বোনের তেমন পরিচয় থাকে না ।

www.pathagar.com

১৭.
হালার হালা
দুরগইত্যা হালা।
ব্যাখ্যা: সম্পর্কে নীচতা সর্ম্পকে বলা হয়েছে।

১৮.
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
না পারলে কি খমাহার কাম।
ব্যাখ্যা: সামর্থ্যে না কুলালে ঈশ্বরের নাম নিলেও কোনো ফল পাওয়া যায় না।

১৯.
জানে না ডাইয়ার মোন্তর
হাপের গাড়ায় আত দেয়।
ব্যাখ্যা: অল্প বিদ্যার বোকামির কথা বলা হয়েছে।

২০.
বুড়া বয়সের পোয়া
খালি বায় ডোয়া।
ব্যাখ্যা: বুড়া বয়সে সন্তান হলে তাকে মানুষ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

২১.
ঘরামির ঘর নাই
নাইয়ার নাও নাই।
ব্যাখ্যা: যে ঘর তৈরি করে ও যে নৌকা গড়ে তাদের সর্ম্পকে বলা হয়েছে।

২২.
সময় যদি খারাপ অয়
ডাইনের দশা বাঁয়ে যায়।
ব্যাখ্যা: দুঃসময়ের কথা বলা হয়েছে।

২৩.
পয়সা থাকলে খালা হাউরিরও ছেরাদ্দ অয়।
ব্যাখ্যা: বিত্তবানদের অপচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

২৪.
যার নাক নাই হ্যার বেশরের সখ ।
ব্যাখ্যাঃ বিশেষ করে শখের কথা বলা হয়েছে

২৫.
খয়রাতির চাউল দুলফা বনে পড়ে ।
ব্যাখ্যাঃ গরিবের দুর্ভোগের কথা বলা হয়েছে ।

২৬.
ঘুঘু দ্যাকচো ফাদ দ্যাহো নাই
কুড়ির খালের চার দ্যাহো নাই ।
ব্যাখ্যাঃ সমূহ বিপদের ইঙ্গিতের কথা বলা হয়েছে ।

২৭.
আড়ু হোমান দাঁতে ছাতা
আয়তনির বুইন জয়তুনি
ও বৌ সালুনে মৌ দেচনি ।
ব্যাখ্যাঃ বৌয়ের গুণপনা সর্ম্পকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে ।

২৮.
দুক্ক দুক্ক অধিক দুক্ক যার গরদ্যা পড়ে পানি
হ্যার চাইয়া অধিক দুক্ক যার চোহে পড়ছে ছানি ।
ব্যাখ্যাঃ চরম দুর্ভোগের কথা বলা হয়েছে ।

২৯.
যাহা দেখি নাই নিজের নয়নে
তাহা বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে ।
ব্যাখ্যাঃ নিচের চোখে না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে নেই ।

৩০.
য্যার আতের রান্দন না খাইচি
হে বড় রান্দুনি
যারে চক্কে না দ্যাকচি
হে বড় সুন্দরী ।
ব্যাখ্যাঃ না দেখা বস্তু সর্ম্পকে এমন ধারণা কেউ দিতে পারে, বাস্তবে তেমন নাও হতে পারে ।

www.pathagar.com

৩১.
দোদেল বান্দা চোগোলখোর
না পায় বেস্ত না পায় গোর।
ব্যাখ্যাঃ যাদের অন্তরে এক বাইরে অন্য রূপ তাদের সর্ম্পকে সাবধান করা হয়েছে।

৩২.
বালেশ্ব বাল
হরিদাস পাল।
ব্যাখ্যাঃ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়।

৩৩.
মায় হরে ঝি ঝি
ঝি হরে লাং লাং।
ব্যাখ্যাঃ মা মেয়ের জন্য দুর্ভাবনায় থাকলেও মেয়ে তার প্রেমিকের জন্য উদগ্রীব থাকে।

৩৪.
গাঙ দারের ছেরি
নাইয়া দ্যাইক্যা কয় শরমে মরি।
ব্যাখ্যাঃ কপট লজ্জার কথা বলা হয়েছে।

৩৫.
খিরই বিডার ছেরিরে তুই
খিরই চিনলি না।
ব্যাখ্যাঃ চেনা জানা জিনিসকে যে না চেনার ভান করে।

৩৬.
আচরিত্ত মানের কুচরিত্ত কতা
হোগায় ত্যাল দেলে যায় মোহের ব্যাতা।
ব্যাখ্যাঃ দুষ্টু লোকের কুপরামর্শের অভাব হয় না।

৩৭.
ডরাইলে ডর
না ডরাইলে চ্যাড।
ব্যাখ্যাঃ ভয় পেলে ভয়, না পেলে কিছুই না।

www.pathagar.com

৩৮.
বাপেরে কয় বুড়ামেয়া
হৌরেরে কয় আব্বাজান।
মায়ের কয় বুড়ি মাগী
হাউরিরে আম্মাজান।
ব্যাখ্যাঃ বর্তমানে কালের ছেলেপুলে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৩৯.
ফাডাইশ ফুডাইশ
তিন কুড়ি আডাইশ।
ব্যাখ্যাঃ বাইর ফুটানি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪০.
বলদে চয় আল
ষাঁড়ে দেয় পাল।
ব্যাখ্যাঃ যে যেখানে যোগ্য তার সেখানে অবস্থান।

৪১.
সময় কালের রোয়া
আর বয়সের কালের পোয়া।
ব্যাখ্যাঃ সময় কালের চাষবাস ও ছেলে-সন্তান জন্মানোর কথা বলা হয়েছে।

৪২.
মোল্লা বাড়ির চাইল
লড়ায় মুরহা রান্দে ডাইল।
ব্যাখ্যাঃ প্রতারকদের কথা বলা হয়েছে।

৪৩.
বড় হরচে বড় পুতে
বাল হালাইবে ছোড পুতে।
ব্যাখ্যাঃ অযোগ্য সন্তানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪৪.
যে বা রোঙের বিয়া
হ্যাতে আবার চিৎবাদ্য।
ব্যাখ্যাঃ বিয়ের অব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪৫.
লেইক্যা দেলাম কলার পাতে
মারাও যাইয়া পোতে পোতে।
ব্যাখ্যা: কোনো রকমের বুঝ দিয়ে কাউকে প্রতারণা করা।

৪৬.
একে তো নাচইন্যা বুড়ি
আরো পাইচে ঢোলের বাড়ি।
ব্যাখ্যা: কারও স্বভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪৭.
নাচমু কি কোমরে ব্যাতা।
ব্যাখ্যা: কোনো কিছু না করার অজুহাত।

৪৮.
খাইলে হিং মাগুর
লাং করাইলে দ্যাশের ঠাহুর।
ব্যাখ্যা: যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

৪৯.
আউশ আমন ভুসি
যার যেমন খুশি।
ব্যাখ্যা: যার যেমন ইচ্ছা সে তেমন করবে সে কথা বলা হয়েছে।

৫০.
পাড়ার কপালে হিন্দুর লাগে না।
ব্যাখ্যা: পাষণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫১.
পাডার বুদ্ধি চ্যাডে
চ্যাড ফুডাইয়া চাডে।
ব্যাখ্যা: পাষণ্ড ও নির্বোধ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫২.
বুড়া বলদে কান্দি বাওয়ার যোম।
ব্যাখ্যা: দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বুড়ো হলেও স্বভাব যায় না।

www.pathagar.com

৫৩.
হতিনের গোপা গোপা তিন পোয়া
আর মোর লেরি লেরি সাতগ্যা।
ব্যাখ্যাঃ পরের কমও যে বেশি বেশি দেখে।

৫৪.
যে ইজার পেন্দে হে মুতুন্যা জাগা রাহে।
ব্যাখ্যাঃ যে যে ধরনের কাজ করে তার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সেই ভালো জানে।

৫৫.
লোয়া দিয়া লোহা পিডাও
লোয়ায় কয় যেই সেই।
ব্যাখ্যাঃ যে বস্তুর যে ধর্ম।

৫৬.
আম দুধ মিশ্যা যাইবে
বাড়া যাইবে ছিট্যা।
ব্যাখ্যাঃ নিকটজন ঝগড়া বিপদ করলেও তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলাতে নেই।

৫৭.
হারা দুন্নই লাং করাইয়া
এখন আইচে বৈষ্ণবী।
ব্যাখ্যাঃ দুশ্চরিত্রা মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫৮.
হারা খোপের মুরহা খাইয়া
এহন বৈষ্ণব হাজজো।
ব্যাখ্যাঃ ভণ্ড ধার্মিক সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫৯.
ত্যালের কাম ত্যালও গ্যালে
ছ্যান কইরাও ওডলে না।
ব্যাখ্যাঃ খরচের কাজ খরচও হলো কিন্তু সুফল পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

৬০.
হারা দিন যা কাম হরলাম
বেবাক গ্যালে গব্ব ছেরান্দে।
ব্যাখ্যা: পণ্ডশ্রম।

৬১.
বলদার নাহান কাম হরলাম।
পাঁচ স্যার মাডি খাইলাম।
ব্যাখ্যা: দুর্বুদ্ধিতায় আক্ষেপ করা।

৬২.
ক্যাতরা গাইয়ের হোতকা ছাও।
ব্যাখ্যা: রুগ্ণ গাইয়ের পুষ্ট বাচ্চা হয়।

৬৩.
আল্লায় খাওয়াইলে
দাঁত ভাইঙাও খাওয়ায়।
ব্যাখ্যা: নিয়তির কথা বলা হয়েছে।

৬৪.
ধরো তক্তা মারো পেরেক।
ব্যাখ্যা: দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৬৫.
ধরো মারো কাডো খাও।
ব্যাখ্যা: যা কর তাড়াতাড়ি করা।
৬৬.
এহে তো জোয়াইরা নাও
আরো দেচে বাদাম।
ব্যাখ্যা: সুযোগের সৎ ব্যবহার করা।

৬৭.
মুই কি কোন হালার মাহা তামাক খাই।
ব্যাখ্যা: কাউকে পরোয়া না করার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

৬৮.
মুই কি কোন হালার চাইয়া কম বুঝি ?
ব্যাখ্যা: নিজের বুদ্ধি ও যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৬৯.
খাইলে খাও না খাইলে খালপাড়ে যাইয়া হোগা মারাও ।
ব্যাখ্যা: কোনো বারোয়ারি অনুষ্ঠানের অভ্যাগতের বলা হয়েছে।

৭০.
ও হালার পাইন মারে কেডা?
ব্যাখ্যা: কাউকে তাচ্ছিল্য করা।

৭১.
আদার গিদারের পাইন মারে কেডা।
ব্যাখ্যা: কাউকে তাচ্ছিল্য করা।

৭২.
খাপে খাপ গ্যাদার বাপ ।
ব্যাখ্যা: কোনো কিছু ঠিকমতো মিলে যাওয়া।

৭৩.
চ্যাডের যোগ্য মানু না
গায়ে আত দিয়া কয় কতা।
ব্যাখ্যা: কাউকে হেয় করা।

৭৪.
বয়সের কালে ভাঙা কেডিরও
শরীলে চিকনাই ধরে।
ব্যাখ্যা: যৌবনে সকল প্রাণী সুন্দরী হয়।

৭৫.
মাইয়া লোকের বুক খাড়া
লাংয়ের পিরিত খাড়া খাড়া।
ব্যাখ্যা: যুবতী মেয়েদের সম্পর্কে লম্পট পুরুষদের কুৎসিত ইঙ্গিত।

www.pathagar.com

৭৬.
মনের কতা কমুনা ধোনেরডেও।
ব্যাখ্যা: কেউকে কোনো গোপন কথা না বলার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৭৭.
পুরুষ মানুষে ঠাপ আর কোমরে রাইখ্যা দ্যায় না।
ব্যাখ্যা: পুরুষদের নিষ্ঠুর যৌনতার কথা বলা হয়েছে।

৭৮.
না খাওয়ার উসিলা ভাজা মাছের হুরয়্যা।
ব্যাখ্যা: কোনো কিছুর সম্পর্কে অজুহাত খোঁজা।

৭৯.
যেই চাড়ি হেই থাবা।
তয় সে নাও বা'বা।
ব্যাখ্যা: নৌকার গতি ঠিক রাখা কিংবা কোনো কাজ করার কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৮০.
যদি অয় সুজন
এক নাইতে নয়জন।
ব্যাখ্যা: সুসময় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

৮১.
ব্যাঙের মুতে বইষ্যা আয় না।
ব্যাখ্যা: সামান্য ছুতায় কোনো কিছু পণ্ড হয় না।

৮২.
এমন আসনে বইও না
কেউ কয় ওডো
এমন কাম হইরো না
কেউ কয় ছোড।
ব্যাখ্যা: স্থান-কাল বিবেচনা করে কাজ করতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

৮৩.
বেশি বাড় বাইড়ো না
ঝড়ে ভাইঙা যাইবে
বেশি ছোড আইয়ো না
ছাগলে মুইর‌্যা যাইবে।
ব্যাখ্যা: খুব বাড়াবাড়ি ও হীনমন্যতা কোনোটাই ভালো না।

৮৪.
যদি অয় বেয়াই বাড়ি
খাদিম দেতে মানা হরে কেডা?
ব্যাখ্যা: আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে আতিথেয়তা করতে বাধা নেই।

৮৫.
আগে তিতা পরে টক
হ্যাষে মিষ্টান্ন নাইকো ঠক।
ব্যাখ্যা: খাদ্যে টক তিতা ও মিষ্টি সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে।

৮৬.
যত পাদে অত আগে না।
ব্যাখ্যা: যত আস্ফালন করে তা প্রয়োগ করে না।

৮৭.
বাফের নাম নাই
মামা হৌরের নাম ছমিরদ্দি তালুকার।
ব্যাখ্যা: নিজের পিতার চেয়ে শ্বশুরকুলের পরিচয় পরিচিতির চেষ্টা।

৮৮.
বেশি ফাউকান ভালো না।
ব্যাখ্যা: আস্ফালন করা ভালো না।

৮৯.
চ্যাডের দুদু রুস্তম খাঁ।
ব্যাখ্যা: কাউকে তাচ্ছিল্য করা।

www.pathagar.com

৯০.

ল্যাংরার মাউনা

হগলডির ভাউজ।

ব্যাখ্যা: গরিব মানুষের স্ত্রী সবার ভাবি।

৯১.

কুত্তার ল্যাজে ঘি মাকলেও সোজা অয় না।

ব্যাখ্যা: যার যা স্বভাব তার পরিবর্তন করা যায় না।

৯২.

হাঁসের জীবন যায় পানতে পানতে

মাইয়া লোকের জীবন যায় কানতে কানতে।

ব্যাখ্যা: মেয়েদের সারা জীবনের দুঃখের কথা বলা হয়েছে।

৯৩.

যারে নেন্দে

হ্যাষে হ্যারে পেন্দে।

ব্যাখ্যা: যাকে অবজ্ঞা করা হয় তাকে প্রয়োজন হতে পারে।

৯৪.

বইতে দিলে হুইতে চায়।

ব্যাখ্যা: সুযোগ সন্ধানী।

৯৫.

ধরি মাছ নাই ছুঁই পানি

হ্যারে বুদ্ধিমান জানি।

ব্যাখ্যা: চালাক মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৯৬.

কুত্তার প্যাডে ঘি সয় না।

ব্যাখ্যা: অসৎ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

৯৭.
ঘরের উন্দুরে বান কাডে।
ব্যাখ্যা: ঘরের শত্রু সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৯৮.
পরের কাম পরে হরে
খোঁজদারাদ্যা পোয়া ধরে।
ব্যাখ্যা: অন্যের কাজে অবহেলা করে করা।

৯৯.
যার গরু হ্যার ল্যাজের ধার।
ব্যাখ্যা: বিপদে পড়লে প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হয়।

১০০.
নতুন নতুন ফুলফুলানি
কয় দিন গেলে গোপাল গাদানি।
ব্যাখ্যা: সতীন সম্পর্কে বরা হয়েছে।

১০২.
মাসির গায়ে মায়ের গন্ধ।
ব্যাখ্যা: মা ও মাসির রক্তের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

১০২.
ঘরে উন্দুর পরে আর মরে।
ব্যাখ্যা: কারো দারিদ্র্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১০৩.
আন্ধার রাইতে সব মাইয়া মানুষই সুন্দরী।
ব্যাখ্যা: মেয়েদের যৌনতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১০৪.
ওড ছেরি তোর বিয়া।
ব্যাখ্যা: হঠাৎ সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

১০৫.

টালটি বালটি এক খন্দ ।

ব্যাখ্যা: দায়সারাভাবে কাজ করলে একবারই ফল পাওয়া যায় ।

১০৬.

হয় চরের ধান

নয় পরের ধন ।

ব্যাখ্যা: দুর্বৃত্তদের সম্পদ সংগ্রহের কৌশলের ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

www.pathagar.com

লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস

ক. লোকসংস্কার

শিশুদের কপালে কাজলের ফোঁটা

এই অঞ্চলে গ্রাম এলাকায় প্রায় প্রতিটি শিশুর কপালে একদিকে কালো ফোঁটা দেওয়া হয়। এই ফোঁটা দেওয়া হয় এজন্য যে কোন অশুভ শক্তির অশুভ দৃষ্টি শিশুর ওপর না পড়ে। এই কাজল তৈরি করা হয় কোরোসিনে কুপি বা ল্যামের শিখার উপর কলাপাতায় সর্ষের তেল মেখে ধরে যে কালো স্তর পড়ে তা দিয়ে।

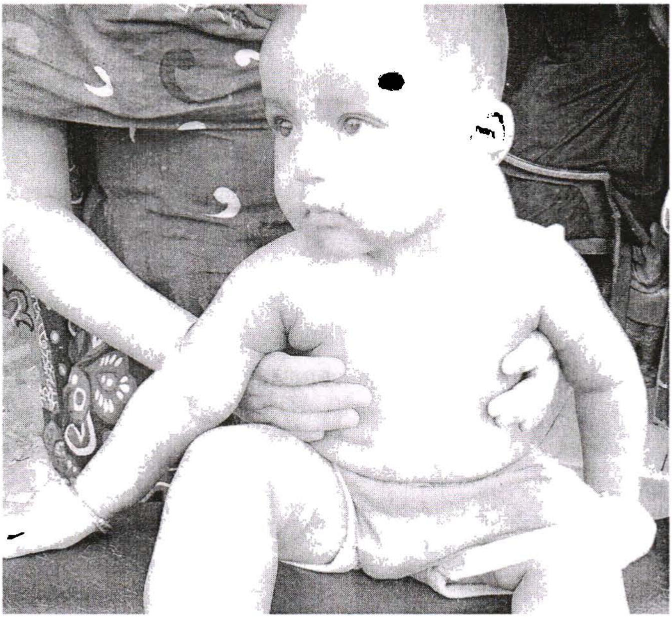

শিশুর কপালে কাজলের ফোঁটা

শিশুর গলায় তবিজ, আটমোড়/ধুকধুকি

শিশুর যাতে রোগ বালাই না হয় সে জন্য নানা রকম তাবিজ, রুপা ও টিনের কবজে ভরে গলায় পরানো হয়। এক ধরনের ফলের বিচি রুপা দিয়ে বাঁধাই করে গলায়

www.pathagar.com

পরানো হয়। এই বিচিকে বলে উরদুইকার আঁটি। শিশু যাতে কম মোড়ামুড়ি করে এজন্য বেনে দোকান থেকে পেঁচানো এক ধরনের ফল শিশুর গলায় তাগায় ঝুলিয়ে পরানো হয়। একে বলে আটমোড়। এছাড়া তামার পয়সা, ধুকধুকি ইত্যাদি পরানো হয়।

শিশুর কোমড়ে তাগা

শিশুর কোমড়ে কালো সুতার তাগা পরানো হয়। বিশ্বাস এতে শিশুর ওপর কোনো অশুভ দৃষ্টির প্রভাব পড়বে না। একে কইতোর ও বাইট্টা বলা হয়। এই অঞ্চলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কোমরে কালো তাগা পরে থাকে।

রাতে পেঁচার ডাক

পাখির ডাক বা কুজন কার ভালো না লাগে। সকাল বেলায় গ্রাম-বাংলায় ঘুমই তো ভাঙে পাখির কলরবে। কিন্তু রাতে পেঁচার ডাক এ অঞ্চলে খারাপ অর্থে ধরা হয়। তাই পেঁচার ডাক শুনলে বাড়ির আঙিনা থেকে ঢিল ছুড়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

যাত্রামঙ্গল

বরিশাল ও ময়নসিংহ অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও এই রীতিকে সংস্কার হিসেবে মানা হয়। এই সংস্কারের অন্যতম পালনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, নতুন বরকে আনবার সময় কনের বাড়ি থেকে লোকজন যেতে হয়। আর একে বলা হয় যাত্রামঙ্গল। যাত্রামঙ্গলের সঙ্গে পাঠাতে হয় বরের মায়ের জন্য নতুন শাড়ি, মাছ, মিষ্টি ও মাঙ্গলিক উপকরণ পান- সুপারি।

গ্রহণকালে মানতে হয়

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন কোনো আহার গ্রহণ করে না। এতে অমঙ্গল হয়। বিশ্বাস পেটে অজীর্ণ হয়, যা কখনো সারে না। এ সময় শরতা দিয়ে কোন মহিলা সুপারি কাটে না, বিশ্বাস, তাহলে গর্ভে থাকা ছেলে মেয়ের ঠোঁট কাটা হতে পারে।

আজান দেওয়া

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও মুসলমান পরিবারে ছেলে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর আজান দেওয়ার রীতি রয়েছে।

খ. লোকবিশ্বাস

১. খাওয়ার পর পরনের কাপড়ে হাত মুছে না। কারণ, মানুষ গরিব হয়ে যায়।
২. মামা ভাগ্নে-ভাগিনীকে মারধোর করে না। কারণ, হাত-পা কাঁপা রোগ হয়।
৩. বিনা কারণে কাগজ ছোট ছোট করে কাটতে হয় না। কারণ, শত্রুতা বাড়ে। মতান্তরে দেনা হয়।

www.pathagar.com

৪. রাতে বাঁশি বাজাতে হয় না। কারণ, তাতে অমঙ্গল হয়।
৫. নতুন খরিদ করা গরু-ছাগলের গায়ে সোনা রুপার পানি ছিটাতে হয়। কারণ, তাতে গরুর ভালো হয়।
৬. যমজ কলা খেতে হয় না। খেলে যমজ সন্তান হয়।
৭. ভাঙা বাসনে ভাত খেতে হয় না। তাহলে আয়ু কমে যায়।
৮. অবিবাহিত মেয়ের সন্ধ্যাকালে খোলা চুলে বাইরে বের হওয়া বা পুকুর ঘাটে বসে থাকা মানা – কারণ, তাতে মেয়ের অমঙ্গল হয়।
৯. গাছে লাউ ঝুলে থাকে চোরে নেয় না – নিজ ফল (সন্তান) আল্লায় নিয়ে যাবে
১০. ঘরের বাইরে কাঠ পড়ে থাকে কেউ চুরি করে না – মরার পর সৎকারের জন্য কাঠ পাওয়া যাবে না।
১১. মাছ চুরি করে না – মরার পর শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ হবার ভয়।
১২. মিথ্যা বলে না – মরণে পর জিহ্বা কাটা যাবে।
১৩. আত্মহত্যা করে না – মহাপাপ।
১৪. দুধ বিক্রি করে অন্ন কেনে না – দুধে পুষ্টি বেশি।
১৫. রাতে ছেলে পেলেদের পায়খানা চাপলে চুলার কাছে গিয়ে চুলাকে প্রণাম করতে বলা হয় – চুলা ভাই চুলা ভাই রাইত্তা আগা নাই।
১৬. রাতে আয়না দেখে না – কারণ, জলে পড়ে যাবে।
১৭. জলে পায়খানা প্রস্রাব করে না – কারণ, গঙ্গা মা অখুশি হবে।
১৮. জোরে চিৎকার দিয়ে কথা বলে না – কারণ, আয়ু খাট হয়।
১৯. দুধের পর আনারস খায় না – খেলে মৃত্যু হয়।
২১. বৃষ্টির সময় ব্যাঙ ডাকলে – বৃষ্টি বাড়তে থাকে।
২২. প্রচণ্ড ঝড়ের সময় আজান দিলে – ঝড় থেমে যায়।
২৩. প্রচণ্ড ঝড়ের সময় হিন্দু মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে পিড়ি ঘরের বাইরে ছুড়ে মারলে – ঝড় থেমে যায়।
২৪. শনি মঙ্গলবার বাঁশ কাটা উচিত নয় – অমঙ্গল।
২৫. দুর্গা পূজার পর ইলিশ মাছ খাওয়া বারণ – অমঙ্গল।
২৭. দুধে লবণ খাওয়া বারণ – গরুর দুধ কমে যায়।
২৮. জন্মদিনে চুল কাটা বারণ – অমঙ্গল।
২৯. সরস্বতি পূজার দিন লেখাপড়া করা বারণ – বিদ্যা হ্রাস পায়।
৩০. রাতে কেউ কাউকে চুন দেয়া বারণ – অমঙ্গল হয়।
৩১. রাতে কেউ কাউকে হলুদ দেয়া বারণ – অমঙ্গল হয়।
৩২. রাতে কেউ কাউকে সুই দেয়া বা বিক্রি করা বারণ।
৩৩. কোন মেয়ে জোড়া বা জমজ কলা খায় না – বিশ্বাস জোড়া কলা খেলে ছেলে মেয়ের জোড়া আঙুল হতে পারে।

www.pathagar.com

৩৪. হাঁস মুরগির ছানা কাক কিংবা চিলে নিয়ে গেলে শিলপাটা মাটিতে ফেলে দিতে হয় – তাহলে কাক চিল হাঁস মুরগির ছানা ফেলে দিয়ে যাবে।

৩৫. পুরুষের আগে স্ত্রী মারা গেলে স্ত্রীকে ভাগ্যবতী বলা হয়ে থাকে।

দান বাক্স

এই এলাকায় অনেক পির-ফকিরের মাজার আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মির্জাগঞ্জের ইয়ার উদ্দিন খলিফা ও বরগুনার মহব্বত ফকির। লোকজন নানা বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে এদের মাজারে টাকা-পয়সা মানত করে থাকে। এই মানতের টাকা বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত বিশেষ করে হাটে-বাজারে, খেয়া ঘাটে দান বাক্সে লোকজন টাকা পয়সা ফেলে। তাদের বিশ্বাস এতে তাদের বিপদ ও রোগবালাই থেকে মুক্তি হবে।

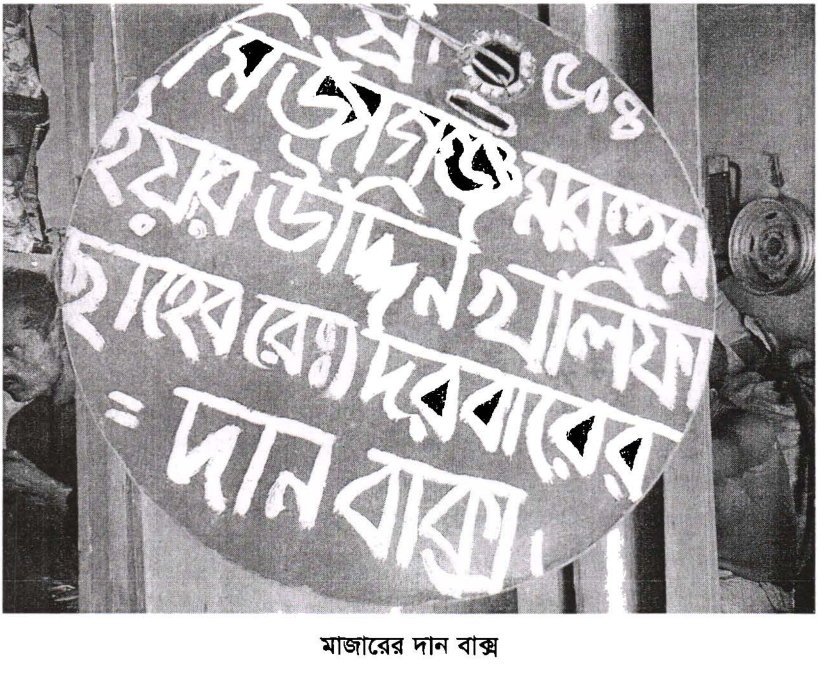

মাজারের দান বাক্স

লোকপ্রযুক্তি

১. কুটারকুর

বরগুনা জেলায় প্রচুর ধান জন্মে। ধান মাড়াইয়ের পর ধানের ছড়ার যে অংশ পড়ে থাকে তাই হলো কুটা। এই কুটা সংরক্ষণ করে যে গাদা তৈরি হয় তা হলো কুটারকুর।

কুটারকুর তৈরির জন্য স্থানীয় প্রযুক্তি আছে। প্রথমে মাটি দিয়ে একটি বেদি বা উঁচু ভিটি তৈরি করা হয় যাতে পানি না ওঠে। বেদির মাঝখানে একটি বড় খুঁটি বসানো হয়। সাধারণত ফাফুলা জাতীয় গাছ বসানো হয় যাতে খুঁটিটি মরে পচে না যায়। তারপর এই খুঁটিকে কেন্দ্র করে স্তরে স্তরে কুটা জড়ো করা হয়। কুটারকুরে নিচটা থাকে অপেক্ষাকৃত সরু, মাঝখান বা পেটটা থাকে ভারি, আবার মাথাটা থাকে সরু। মাথার উপরে একটা হাঁড়ি স্থাপন করা হয়। যাতে বৃষ্টির পানি ভেতরে ঢুকে কুটা পচে না যায়। পুরনো জাল দিয়ে পুরো কুটারকুর ঢেকে দেয়া হয়, যাতে ঝড় বাদলে কুটা উড়ে বিনষ্ট না হয়। কুটার কুর ১০-১৫ হাত পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। দূর থেকে কুটার-কুর গম্বুজের মতো মনে হয়।

কুটারকুর

www.pathagar.com

২. ইঁদুর মারার কল

গেরস্ত মানেই ধান-চাল থাকবে। আর ধান-চাল থাকলেই ইঁদুর থাকবে। ইঁদুরে ধান চাল নষ্ট করে। ধান-চালের বাঁশের ডোলা কাটে। তাই গেরস্তরা ইঁদুর কল ব্যবহার করে। সাধারণত কাঠমিস্ত্রিরা ইঁদুর মারার কল তৈরি করে। চারটি কাঠ কেটে চৌকা মতো করে ভেতরের ফাঁক তৈরি করা হয়। মুখটা খোলা থাকে।

ইঁদুর পছন্দ করে সে ধরনের খাবার টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ নারকেলের সাথে কলা, চাল ভাজার নাড়ু টোপ হিসেবে দেয়া হয়। ইঁদুর এসব টোপ খেতে ফাঁদে ঢুকলে, সামনের কপাট পড়ে যায়। তারপর গেরস্ত টের পেয়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলে। আজকাল বাজারে ইঁদুর মারার বিষ টোপ পাওয়া যায়। অনেকে এই বিষটোপ ব্যবহার করে থাকে।

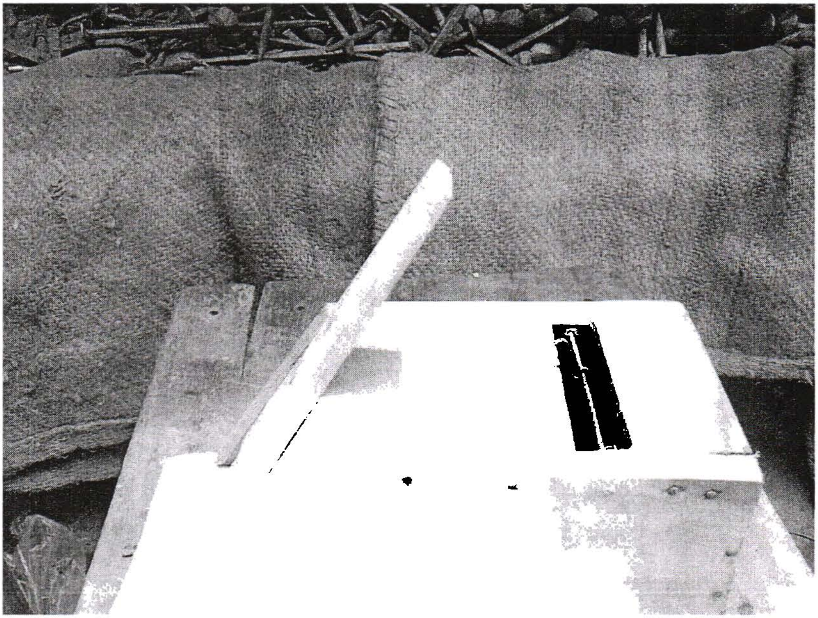

ইঁদুর মারার কল

৩ কামড়ি কল

কামড়ি কল হলো এক ধরনের লোহার ফাঁদ। খাঁজ কাটা দুটো লোহার পাত দিয়ে ফাঁদ তৈরি করা হয়। এই ফাঁদ মূলত বক শিকারের জন্য পাতা হয়। কামড়ি কলের ফাঁদে পুঁটি মাছ টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

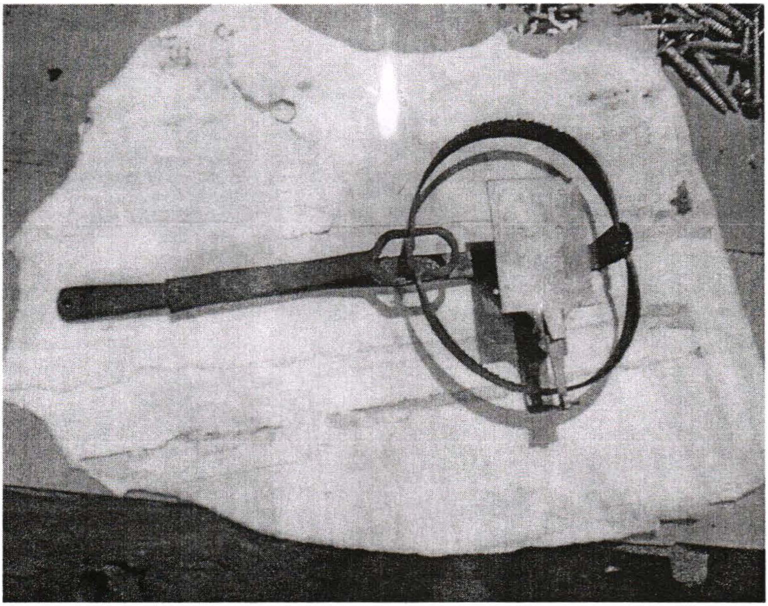

বক ধরার ফাঁদ কামড়ি কল

এই ফাঁদ জলাভূমিতে পেতে রাখা হয়। যেখানে বক পুঁটি মাছ খেতে আসে। বক যখন পুঁটি মাছ খেতে ঠোকর মারে অমনি কামড়ি কলের দুটি পাত এসে বকের গলা আটকে ধরে। ভারি লোহার ফাঁদ থেকে বক আর উড়ে যেতে পারে না। শিকারিরা এসে বক ধরে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সেই বিখ্যাত লোকগানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে'।

৪. নৌকা

নদীমাতৃক এই বাংলাদেশের বুক চিরে বয়ে গেছে ছোট-বড় অসংখ্য নদী। বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের রয়েছে নদীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এক সময় বরগুনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের মালামাল ও যাত্রী পরিবহনের সহজ মাধ্যম ছিল বিভিন্ন রকমের নৌকা। উত্তাল নদীবক্ষে গান গেয়ে পালতোলা নৌকা বেয়ে যেত মাঝিরা।

আজও এই বাংলার এমনও অনেক এলাকা আছে যেখানে নৌকায় যাতায়াত করতে হয়। যুগ যুগ ধরে বাংলার মানুষ ও অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল বিভিন্ন রকমের নানা নামের নৌকা। যেমন যাত্রীবাহী কেরায় নৌকা, টাপুরে নাও, কাডামি নৌকা, বাছারি নৌকা, বজরা, ডিঙ্গি নৌকা, জাইল্লা নৌকা, গয়না, সাপুড়িয়া নাও, কোষা, পানসী, ডোঙা নৌকা, বাইচের নৌকা প্রভৃতি।

www.pathagar.com

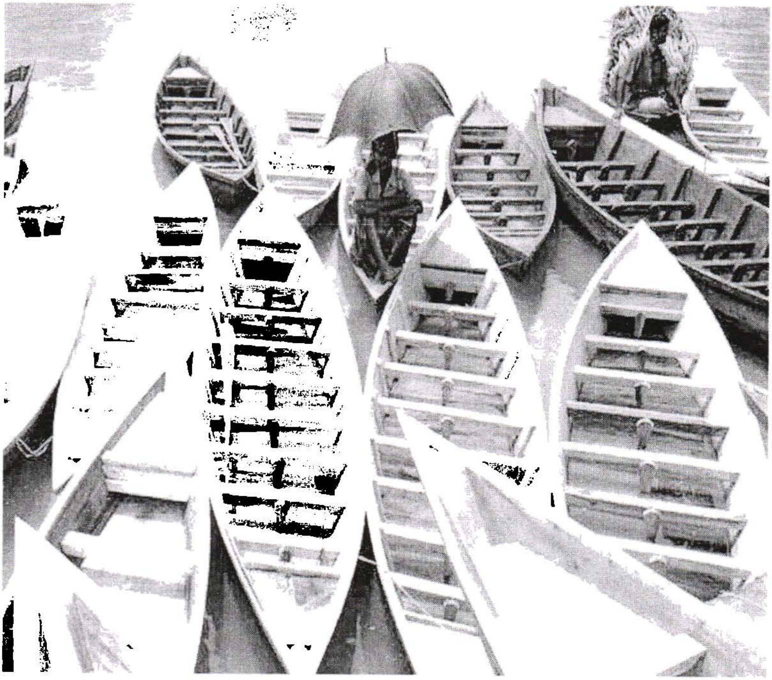

ডোঙা নৌকা

ডিঙি নৌকা

www.pathagar.com

এগুলো এক সময় ছিল আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের কাঠের তৈরি এসব নৌকা ছিল ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম শিল্প।

বরগুনার বামনা, আমতলী, তালতলী উপজেলায় এখনো কিছু টাপুরে, একমাল্লাই নৌকা দেখা যায়। এছাড়া মালামাল পরিবহনের জন্য কিছু কাডামি নৌকা, মাছ ধরা ও ফসল খেতে বীজ আনা নেওয়ার জন্য কোষা ও ডোঙা নৌকা দেখা যায়।

টাপুরে নৌকায় একজন মাঝি বৈঠা ও উজানের সময় দাঁড় দিয়ে নৌকা চালনা করেন। এছাড়া মাল পরিবহনের কাডামি নৌকায় একজন পেছন থেকে বড় হাল ধরেন, দুইজন দুপাশ থেকে দাঁড় টেনে নৌকা চালনা করেন। এছাড়া জোয়ারের সময় বড় বড় কাপড়ের তৈরি বাদাম (পাল) তুলে দেওয়া হয়। বিপরীত স্রোতের সময় গুন টেনেও এই নৌকা চালনা করা হয়। বরগুনার আমতলী উপজেলার পচাকোড়ালিয়া গ্রামের পায়রা নদীর ষাটোর্ধ মাঝি জলিল বয়াতি পায়রা নদীতে প্রায় ৩০ বছর নৌকায় যাত্রী পারাপার করেছেন। তিনি এই নদীর নৌকার পুরানো মাঝি। তিনি জানান, আগে টাপুরে নৌকায় চড়ে বরযাত্রী যেত বিয়ে বাড়িতে। আবার নতুন বৌ নিয়ে ওই টাপুরে নৌকায় ফিরে আসতো।

৫. ঢেঁকি

বরগুনা অঞ্চলে ধান চালের প্রাচুর্য থাকায় গেরস্তের বাড়িতে ঢেঁকি একটি আবশ্যিক যন্ত্র। ঢেঁকি না হলে গেরস্ত-বৌর ধান থেকে চাল, আর চাল গুঁড়ো করে পিঠা বানানো চলে না। তবে আজকাল যন্ত্রচালিত ধানভানার কল ঢেঁকির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিয়েছে। তারপরও ভালো পিঠা তেরি করেন যে গৃহিণী তার চালের গুঁড়া করার জন্য ঢেঁকি প্রয়োজন। প্রয়োজন চিঁড়া কোটার জন্য। সাধারণ গাবগাছ দিয়ে মূল ঢেঁকি গাছটি তৈরি করা হয়।

ঢেঁকি যে দুটো মোটা কাঠের গুঁড়ির ওপর স্থাপন করা হয় তাকে বলে কাৎলা। ঢেঁকির মাথার যে অংশ দিকে ধান চাল কোটা হয় তাকে বলে মুশাল। মুশালের মাথায় লোহার যে বেড় দেয়া থাকে তাকে বলে বেড়ুয়া। আর যে গর্তমতো জায়গায় ধান বা চাল রাখা হয় কোটার জন্য তাকে বলা হয় কাইওল। ঢেঁকির পেছনে একজন বা দুজন মহিলা তালে তালে ধুপুড় ধুপুড় করে পা দিয়ে পাড় দিতে থাকেন। আর একজন কাউওলে ধান বা চাল হাত দিয়ে নেড়ে দেন। এই পাড় দেয়া ও ধান নাড়ার মধ্যে একটা ছন্দ আছে।

ব্যতিক্রম হলেই দুর্ঘটনা ঘটে। যিনি কাইওলে ধান নাড়েন তার হাত মুশলের নিচে পড়ে ছেচে যেতে পারে। ঢেঁকির পাড়েরও লোকগীতি আছে। যেমন—ও ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া/আমি নাচি বুবু নাচে হেলিয়া দুলিয়া। আবার ঢেঁকি নিয়ে প্রবচন আছে, অপদার্থ বা নির্বোধ ব্যক্তিকে বলা হয় "আমড়া কাঠের ঢেঁকি"।

www.pathagar.com

৬. কাকতাড়ুয়া

এই অঞ্চলে ফসল রক্ষার জন্য খেতে কাকতাড়ুয়া স্থাপন করা হয়। একটি মাটির হাঁড়ি বা পাতিলে কালো রং বা আলকাতরা মেখে, তাতে চুন দিয়ে চোখ মুখ এঁকে জামা পরিয়ে বাঁশের দণ্ডের উপর স্থাপন করা হয়।

তারপর খেতের মধ্যিখানে সেটিকে পুঁতে রাখা হয়। মরিচ ক্ষেতেই বেশি কাকতাড়ুয়া স্থাপন করা হয়। কারণ কাঁচা পাকা মরিচ কাক আর টিয়া পাখি বেশি নষ্ট করে। কিম্ভূত কাকতাড়ুয়া দেখলে কাক ও টিয়া পাখি ভয়ে আর খেতে আসে না। আজকাল পুকুরে মাছ চাষ করা হয় ব্যাপকভাবে, মাছের পোনা বা মাছ কাক চিলে না নিতে পারে সেজন্য পুকুরের মধ্যিখানেও কাকতাড়ুয়া স্থাপন করা হয়।

৭. মাটির চুলা

এই অঞ্চলে রান্নাঘর ও চুলাহালে চুলা না হলে গেরস্ত গিন্নির চলে না। আর চুলা যদি জুতসই কিংবা ঠিকঠাক মতো না তৈরি করা হয় তাহলে দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না। গ্রামের সব মহিলা চুলা পাততে বা বানাতে পারে না। এজন্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

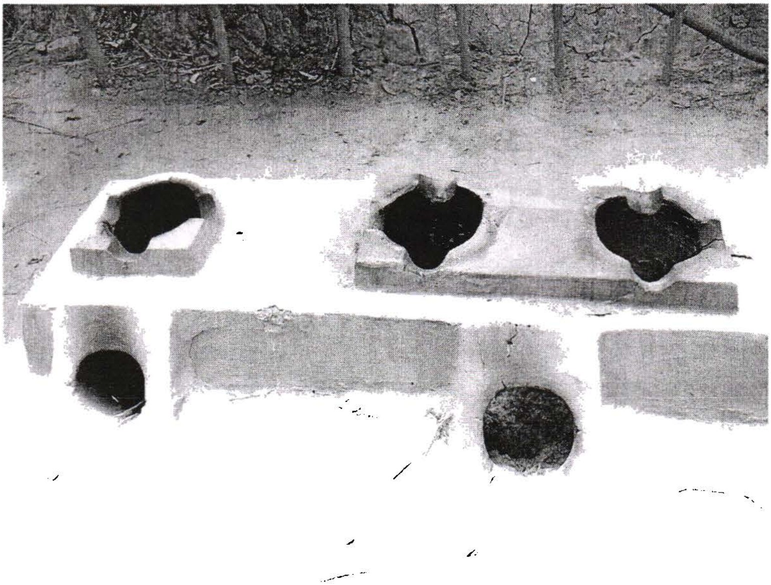

মাটির একমুখো ও দুমুখো চুলা

www.pathagar.com

এই দক্ষতা অর্জন করে দাদী ও মায়ের কাছ থেকে। গ্রামে চুলা বানাতে অনেক দক্ষ মহিলা আছেন। মূলত তারাই চুলা তৈরি করেন। চুলা দু ধরনের–স্থায়ী ও আলগা চুলা। স্থায়ী চুলা রান্নাঘরে থাকে। যুগযুগ ধরে চলে ও জ্বলে। আর আলগা চুলা বহনযেগ্য। যে কোন জায়গা বসিয়ে রান্না করা যায়। বিশেষ করে কেরায়া নৌকা, জেলে ও বড় বড় কাঠামি নৌকায় আলগা চুলা ব্যবহার করা হয়।

স্থায়ী চুলা আবার দু ধরনের–একমুখো ও দুমুখো। আলগা চুলা একমুখো হয়। স্থানীয় উপভাষায় একমুখো চুলাকে একপাইক্যা, দুমুখো চুলাকে দোপাইক্যা চুলা বলা হয়। একমুখো চুলায় একটা হাঁড়ি বা পাতিল চাপানো যায়। দুমুখো চুলায় একসাথে দুটো হাঁড়ি চাপানো যায়।

চুলা বানাতে প্রথমে একটি গর্ত করা হয়, যেটি চুলার গর্ভ। যেখানে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয়। গর্ত করার পর স্তরে স্তরে মাটি দিয়ে খানিকটা উঁচু করে হাঁড়ি রাখার জন্য তিনটি চূড়ামতো করা হয়। এই চূড়াগুলোকে ঝিকা বলে। একপাইক্যা চুলায় তিনটি ও দোপাইক্যা চুলায় ছয়টি ঝিকা থাকে। আবার একপাইক্যা চুলায় কাঠ ঢুকানোর একটি মুখ থাকে, দুপাইক্যা চুলায়ও কাঠ ঢুকানোর একটি মুখ থাকে।

৮. আলডা

চুলার কাছাকাছি থাকে মাটির আলডা। আলডা হল হাঁড়ি-পাতিল রাখার জায়গা। এটেল মাটি দিয়ে আলডা বানাতে হয়। মহিলারাই আলডা তৈরি করে থাকে। এজন্য দক্ষতার প্রয়োজন হয়। আলডার এক দিকে থাকে ভাতের ফেন গালার ব্যবস্থা। দু তিন স্তরেরও আলডা হয়ে থাকে। এই স্তরকে থর বলে। এ থেকে হয়ত বলা হয় থরে থরে সাজান।

৯. হাজাল

হাঁস-মুরগির ডিম যে পাত্রে তা বা ওম দেয়া হয়ে থাকে তাকে হাজাল বলে। ডিমের তা দেওয়াকে বলে উমইন দেওয়া। হাঁস-মুরগি ডিম পাড়লে এই পাত্রে জমা করা হয়। হাঁস-মুরগির ডিম পাড়া শেষ হলে খড় কুটা বিছিয়ে তা দেওয়ার জন্য ওই পাত্রে বসিয়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরয়।

হাজাল গোলাকার, কিছুটা গামলার মতো। এটেল মাটি দিয়ে হাজাল তৈরি করা হয়। রোদে শুকিয়ে পাত্রটি ব্যবহার উপযোগী করা হয়। মহিলারাই হাজাল তৈরি করে থাকে।

১০. ল্যাম

এই অঞ্চলে বেশিরভাগ গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। আর গেরস্তের বাড়িতে সন্ধ্যা হলে তো বাতি দিতেই হবে। যাকে বলা হয় সন্ধ্যাবাতি। সন্ধ্যায় বাতি না জ্বালানো অমঙ্গল

www.pathagar.com

হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারো বাড়িতে সন্ধ্যায় বাতি দেয়ার কেউ বেঁচে না থাকলে বলা হয় বংশে বাতি দেওয়ার কেউ নেই। সন্ধ্যাবাতি দেওয়া কাজটি মহিলারাই করে থাকে। বাতি জ্বালানো হয় যে পাত্রে তাকে বলা হয় ল্যাম। শীলিত ভাষায় কুপি। ল্যাম তৈরি হয় পেতল ও টিন দিয়ে। ভেতরে কেরোসিন তেল ভরা থাকে। পুরনো কাপড়ের ন্যাকড়া দিয়ে সলতে বানানো হয়। দোকানে তৈরি করা ল্যাম কিনতে পাওয়া যায়। কাসারু ও ঝালাইকর ল্যাম তৈরি করে থাকে। কুমারের দোকানে মাটির তৈরি ল্যাম কিনতে পাওয়া যায়।

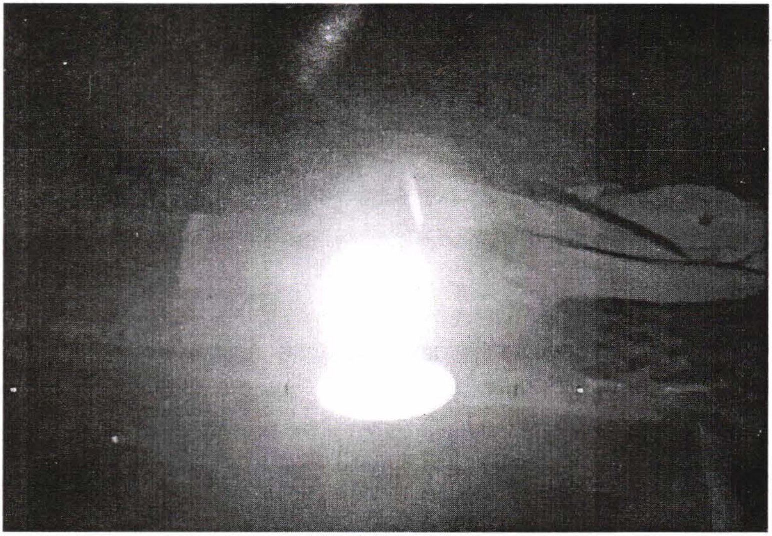

ল্যাম

১১. লুফা/ব্যানা

মশালের আঞ্চলিক উপভাষা হলো লুফা/ব্যানা। এক খণ্ড বাঁশের মাথায় ন্যাকড়া পেঁচিয়ে লুফা তৈরি করা হয়। জ্বালানি হিসাবে কোরোসিন তেল ব্যবহার করা হয়। লুফার মাথায় আগুন জ্বেলে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। অন্ধকারে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেতে অনেক সময় লুফা ব্যবহার করা হয়। বৈশাখ মাসে মাঠে-কোলায় মাছ মারার সময় লুফা ব্যবহৃত হয়। ধান গাছের কুটা ও নাড়া দিয়েও লুফা বানানো হয়। খড়কুটার লুফায় জ্বালানি হিসেবে কেরোসিন তেল লাগে না।

ধান গাছের কুটা বেনির মতো পেঁচিয়ে ব্যানা তৈরি করা হয়। যারা মাঠে কাজ করে, বিড়ি-তামাক খায়, তারাই ব্যানা ব্যবহার করে থাকে। প্রবাদ আছে পাগলের হাতে লুফা দিলে ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

১২. লণ্ঠন

ঝালাইকারেরা লণ্ঠন তৈরি করে থাকে। এক ফুটের মতো চারটা কাচ আর টিন দিয়ে লণ্ঠন তৈরি করা হয়। এক পাশ সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায়। লণ্ঠনের মাঝখানে একটি ল্যাম বা কুপি বসিয়ে দেয়া হয়। হারিকানের মতো আলো হয়। বৈশাখ মাসে মাঠে-কোলায় মাছ ধরার জন্য লণ্ঠন বেশি ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ দোকানেও ব্যবহার করে থাকে।

১৩. তাওয়া

মাটির মালসায় তুষের আগুন জ্বালিয়ে রাখার পাত্রকে এই অঞ্চলে তাওয়া বলে। সন্ধ্যায় তাওয়া জ্বালালে পরদিন সকাল পর্যন্ত জ্বলে। তাওয়ার তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে।

১৪. কালো পাতিল

লাউ, কুমরা, শসা, চিচিংগা বা রেহার মাচায় মাটির পাতিলে ছাই বা আলকাতরা মেখে তাতে চুন দিয়ে চোখ মুখ এঁকে মাচার ওপর রাখা হয়। ফলে ছোট ছোট পাখি ভয় পেয়ে লাউ-কুমড়ার কড়া নষ্ট করতে আসে না।

১৫. দেশীয় অস্ত্র

এই অঞ্চলে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চিরকালের। এজন্য সারা বছর কোনো না কোনো পরিবারে সাথে কাজিয়া ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য স্থানীয়ভাবে কামারকে দিয়ে তৈরি লোহা নির্মিত নানা অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ধারালো অস্ত্র চিকন বাঁশের মাথায় ব্যবহার করে নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ল্যাজা, বল্লম, তিন কাঁটাওয়ালা চল, রামদা, টেটা ইত্যাদি। শুকনো মাটির গুলতি, মারবেল ইত্যাদি ছোড়ার জন্য গুল্লিবাঁশ ব্যবহার করা হয়। টিন ও বেতের ঢাল ব্যবহার করা হয় আত্মরক্ষার জন্য।

১৬. কৃষি যন্ত্র

বরগুনা অঞ্চলে ধান চাষ ও রবিশস্যের আবাদের জন্য গরু মোষের হাল প্রধান অবলম্বন। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ এলাকায় যান্ত্রিক ট্রাক্টর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গরু মোষ দিয়ে হাল চাষ করতে তিনটি প্রধান যন্ত্রের প্রয়োজন। লাঙল, জোয়াল, মই। প্রধানত লাঙল ও ঈশ, জোয়াল, মই তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। কখনো বাঁশের মই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। লাঙলের মাথায় লোহার ফলা ব্যবহার করা হয়। লাঙল-জোয়াল তৈরি করার মিস্ত্রি আলাদা। একজন দক্ষ মিস্ত্রিই কেবল পারে একটি ভালো লাঙল ও ঈশ তৈরি করতে। লোহার তৈরি কোদাল এবং কুড়াল এক ধরনের লোকপ্রযুক্তি। এগুলো কোনো-না কোনোভাবে কৃষি কাজ থেকে শুরু করে গার্হস্থ্যজীবনের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। গার্হস্থ্যজীবনে দা, বটি উল্লেখযোগ্য লোকপ্রযুক্তি।

www.pathagar.com

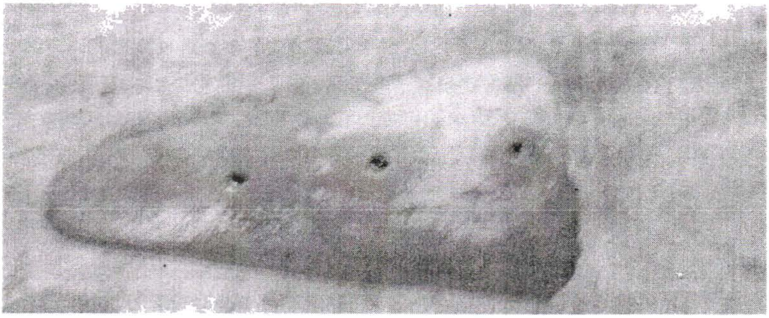

লাঙলের ফলা

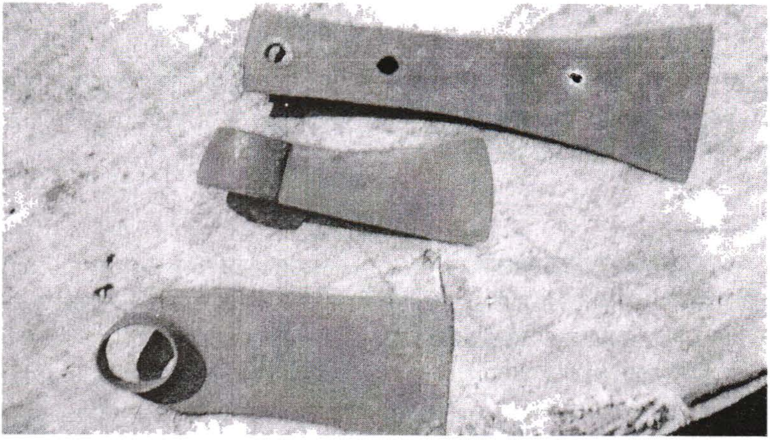

কোদাল, কুড়াল ও খন্তার ফলা

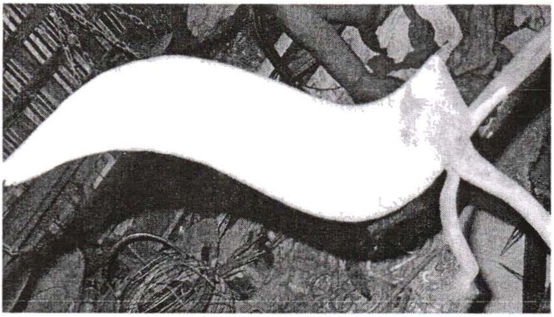

বটি

www.pathagar.com

১৭. মাছ ধরার যন্ত্র

বরগুনা অঞ্চলের লোকজনের প্রধান খাদ্যই হলো মাছ ভাত। খালে নদীতে পুকুরে বিলে কোলায় সব জায়গায়ই মাছ পাওয়ায় যায়। বর্ষা, হেমন্ত ও শীত কালে বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। এজন্য ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের জাল ও যন্ত্রের।

বাঁশের তৈরি পলো, ওচা, চাঁই উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সুতার তৈরি ধম্মজাল, ঝাকি জাল, বেন্দি জাল, খুচনি জাল, মইয়া জাল, ভেসাল জাল, কৈয়াজাল, কোরালিয়া জাল, ইলিশ ধরার জন্য সাইন জাল ও খোট জাল অন্যতম।

মাছ ধরার পলো

ঝাকি জাল

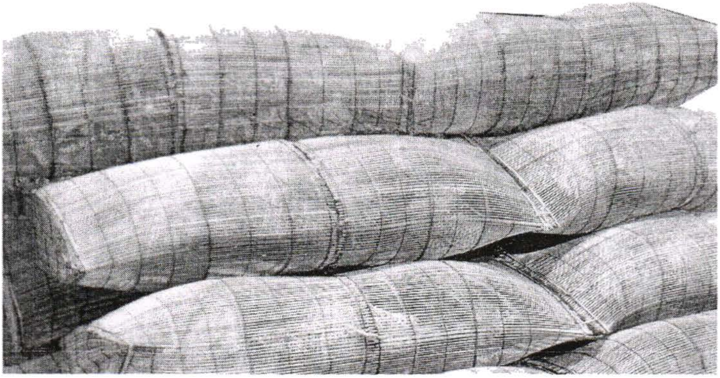

মাছ ধরার চাঁই

www.pathagar.com

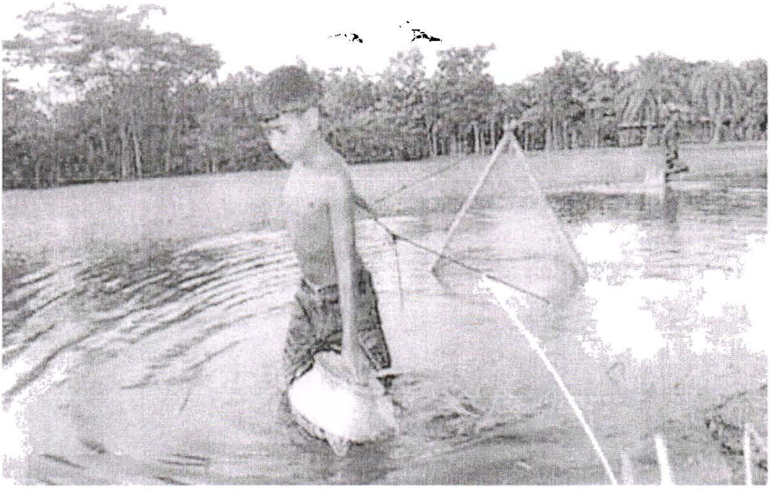

খুচনি জালে মাছ ধরা

ধম্ম জালে মাছ ধরা

www.pathagar.com

১৮. কোচ দিয়ে মাছ ধরা

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও নিম্নভূমি রয়েছে। বর্ষা এলেই নিম্ন অঞ্চল এবং খাল-বিল পানিতে ভরে যায়। এ সময় পানিতে বিভিন্ন ধরনের মাছ ছুটাছুটি করে। তখন বিশেষ করে রাতে কোচ নিয়ে মাছ শিকারে বেরিয়ে যায় মাছ শিকারিরা।

কোচ দিয়ে মাছ ধরা

১৯. বড়শি দিয়ে মাছ ধরা

বর্ষাকালে নিম্নাঞ্চল পানিতে পরিপূর্ণ থাকে। আর এ সময় বিভিন্ন উপায়ে মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যায়। নৌকায় বসে বড়শিতে মাছ ধরার লোকপ্রযুক্তি ঐতিহ্য বহন করছে।

বড়শি দিয়ে মাছ ধরা

www.pathagar.com

২০. ইলিশের জাল

গভীর বঙ্গোপসাগরে যেসব জেলেরা দীর্ঘদিন মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত তাঁদের ধারণা থাকে সাগরের কোন স্থানে গভীরতা কত হতে পারে। ইলিশ মাছ শিকার করতে করতে যে অভিজ্ঞতার জন্ম হয় এটা তারই ফসল। তারপরেও প্রাচীনকাল থেকেই সাগরের গভীরতা মাপার জন্য একটি চমকপ্রদ পদ্ধতি ব্যবহার করেন জেলেরা। এক ধরনের চিকন রশির মাথায় ভারি লৌহখণ্ড বেঁধে জলে ফেলে দেন। মাছ শিকারিরা একে বলেন টোয়া। এটা অনেকটা রাজমিস্ত্রিদের টেঁড়া ব্যাঁকা মাপার ওল বা ওলং দড়ির মতো। জেলেদের কথিত মত অনুযায়ী একজন ব্যক্তি দু হাত প্রসারিত (১ বাম সমান তিন হাত) করলে যে দৈর্ঘ্য হয় তাকে এক বাম বলে। বাম-এর এই মাপ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন ৩ হাতে ১ বাম, কেউ বলেছেন সাড়ে তিন হাতে ১ বাম, আমার কেউ কেউ ৪ হাতে এক বামও বলেছেন। এর মধ্যে দুই একজন মৎস্য শিকারি সোজা দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড়া করে দিয়ে বলেছেন, মেপে দেখুন এর দূরত্ব ঠিক-ঠিক সাড়ে তিন হাত হবে না, হবে একটু বেশি, এজন্য আমরা ৪ হাতে ১ বাম ধরি। এই বাম পরিমাপ করার পর জেলেরা ইলিশ ধরার জন্য সাগরে জাল ফেলেন।

সাগরের গভীরতা অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে ইলিশ ধরার জন্য তিন ধরনের জাল ব্যবহার হয়। এর মধ্যে রয়েছে চিকন, নাকুরা ও লাশ জাল।

ইলিশের জাল-সাইন জাল

www.pathagar.com

ইলিশের জালে ধরা পড়া ইলিশ

চিকন জাল : চিকন সাদা সুতা দিয়ে বোনা এই জালের ফাঁসের ব্যাস পৌনে চার থেকে চার ইঞ্চি। আর প্রস্থে ১৫ তেকে ৩০ হাত পর্যন্ত হয়। এই জাল মূলত সাগর উপকূলে, মোহনায় ও নদ-নদীতে ব্যবহৃত হয়।

নাকুরা জাল : চার থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি ব্যাসের এই জাল লাল মোটা সুতায় বোনা। এই জাল প্রস্থে ৩০-৩৫ হাত। মূলত মধ্যম গভীর বঙ্গোপসাগরের এলাকায় এই জাল ব্যবহার হয়।

লাশ জাল : লাশ জাল মূলত গভীর সাগরের জাল। প্রস্থে ৯০ হাত এই জালের ব্যাস পৌনে চার থেকে চার ইঞ্চি। নাই বাম (যেখানে পানির গভীরতা পরিমাপ করা যায় না) এলাকায় এই জাল ব্যবহার হয়।

সাইন জাল : জেলেরা নদীতে যে জাল দিয়ে ইলিশ ধরে তাকে বলে সাইন জাল।

খোট জাল : গেরস্তরা যে জাল দিয়ে ইলিশ মাছ ধরে তাকে বলে খোট জাল।

২১. গড়া

সুপুরিগাছ ও বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে গড়া তৈরি করা হয়। জাল দিয়ে গড়া তৈরি হয়। বিশেষ করে শীতকালে গোড়ার যেখানে খাল নদীতে মিশেছে কিংবা নদীল চড়ায়, খাল

www.pathagar.com

ও নদীর বিশেষ স্থানে গড়া দিয়ে একটা অঞ্চল জোয়ারের সময় ঘিরে রাখা হয়। ভাটার সময় পানি কমে গেলে খালে পলো দিয়ে দল বেধে মাছ ধরে। শীতের দিনে বোয়াল মাছই বেশি ধরা পড়ে।

নদীতে ভাটার সময় পানি শুকিয়ে গেলে গড়ার ভেতরে নানা ধরনের মাছ পড়ে থাকে। তখন মেয়েরা মাছগুলো কুড়িয়ে নেয়।

২২. লেতরা

মোটা দড়ি দিয়ে লেতরা তৈরি করা হয়। বড় খাল ও নদীর চরে একটা অংশে এই দড়ি পানিতে ফেলা হয়। তারপর একমাথা আস্তে আস্তে গুটিয়ে এনে একটা ঝাকি জালের বৃত্ত দিয়ে যতটুকু হয় ততটুকু আন্দাজ বৃত্ত হলে ঝাকি জালের খেও দিয়ে মাছ তুলে আনা হয়। বিশেষ করে আইড়মাছ লেতরার সাথে সাথে নাগালের মধ্যে চলে আসে।

২৩. নলের চল

চিকন বাঁশের মাথায় তিন কাটার চল স্থাপন করা হয়। তারপর নলের পেছনে নল গেঁথে বিশ ত্রিশ হাত চল লম্বা করে খালে ও নদীতে ভাটা মাছ মারা হয়। কারণ ভাটা মাছের চোখ মাথার ওপর এবং সব সময় সাঁতার কাটে। খুব কাছ থেকে ধরা মুশকিল। তাই এই নলের চল ব্যবহার করা হয়।

২৪. পাখি ধরার জালের ফাঁদ

বাগানের এক দিকে লম্বা জালের ফাঁদ পেতে রাখা হয়। ফাঁদের পেছনে থাকে পোষা পাখি। পোষা পাখি ক্রমাগত ডাকতে থাকে। তার সাথে মিলিত হবার জন্য বুনো পাখিরা এসে ফাঁদে ধরা পড়ে।

২৫. পোষা পাখির ফাঁদ

খাঁচাটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এক দিকে পোষা পাখিটি থাকে অন্য দিকে ফাঁদ। পোষা পাখি সাধারণত ঘুঘু, ডাহুক ও কোড়া জাতীয়। ঘুঘু ধরার জন্য গাছের উঁচু ডালে, ডাহুক কোড়া ধরার জন্য জলমগ্ন মাঠে এই ফাঁদ পেতে রাখা হয়। পোষা পাখিটি ক্রমাগত ডাকতে থাকে। বুনো পাখিটি তার সাথে মিলিত হতে খাঁচার ফাঁদের অংশে এসে বসলেই ফাঁদ আটকে যায়। তখন শিকারি গিয়ে পাখিটি ধরে ফেলে।

২৬. আঠার আঁকশি

সরু লম্বা বাঁশের আগায় এক ধরনের আঠা লাগিয়ে আঁকশি তৈরি করা হয়। গাছের ডালে বসা পাখির পালকে আঠা জড়িয়ে পাখি নিচে নামিয়ে আনা হয়।

www.pathagar.com

২৭. রাসকা

সরু লোহার শিকে খাঁজকাটা এক ধরনের শলকা। সরু বাঁশের মাথায় এই শলকা লাগানো থাকে। উঁচু ডালে পাখি বসে থাকলে একটা বাঁশের পেছনে আরেকটা বাঁশ জুড়ে যন্ত্রটি লম্বা করা হয়। উঁচু ডালে যখন পাখিটি বসে থাকে তখন রাসকা তার পেটে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

তারপর শিকার করা পাখিটি নিচে নামিয়ে আনা হয়। রাসকা খাঁজ কাটার বৈশিষ্ট্য হলো এমন—কোনো দিক দিয়ে কোনো শিকার বের হয়ে যেতে পারবে না। রাসকা দিয়ে সাধারণত ঘুঘু ও বক শিকার করা হয়।

২৮. আকাশি

একটি মোটা লম্বা বাঁশের উপরে বাঁশের পাটাতন করা হয়। সাধারণত বাড়ির উঠোনের কোন অংশে আকাশি পাতা হয়। আকাশির পাটাতন খাঁচায় পোষা পাখি কপিকল দিয়ে তুলে রাখা হয়। পোষা পাখি ক্রমাগত ডাকতে থাকলে তীব্র আলোর টর্চ লাইটের আলো ফেলা হয়। তখন চোখ ধাঁধিয়ে পাখি নিচে পড়ে গেলে শিকারিরা ধরে ফেল।

২৯. কলাগাছের ভেলা

বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খাল-বিল-নদী-নালা পানিতে ভরে যায়। তখন মনের আনন্দে গ্রামের শিশু-কিশোররা কলাগাছের ভেলা বানিয়ে পানিতে ভেসে বেড়ায়।

৩০. বাঁশ-বেতের কাজ

গার্হস্থ্যজীবনের শুরু থেকেই লোক-সমাজে বাঁশ-বেত দ্বারা তৈরি এমন কিছু পাত্র তৈরি হয়েছে যা লোকপ্রযুক্তি হিসেবে পরিচিত। চাল মাপার বেতের পুরা, ধান-চাল ও অন্য যে কোনো জিনিস মাপার জন্যে বেতের পাল্লা, বাতাসে ধান থেকে ধানের চিটা এবং ধুলোবালি আলাদা করার জন্য কুলা, চাল রাখার ডোলা, ফসলি জমির পাশ দিয়ে গরু নেয়ার সময় যাতে ফসলি জমিতে মুখ না দিতে পারে সে জন্যে গরুর মুখে পরানো ঠুই, মাটি কাটার কাজে ব্যবহারের জন্য ঝুড়ি, ধান, পেঁয়াজ-রসুন, ধান-চাল ও তরিতরকারি রাখার জন্য সাজি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩১. বাঁশের লাঠি

এক সময় এই অঞ্চলে মাতবরের হাতের বাঁশের লাঠি তার ক্ষমতার প্রতীক বোঝাত। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি কোনো জিয়াফত বা শ্রাদ্ধে না যেতে পারলে তার লাঠিটি পাঠিয়ে দিত।

www.pathagar.com

এই লাঠির হাতল রুপো বা পিতল দিয়ে বাঁধানো থাকে। একটি বাঁশ ও বেতের লাঠি বহু যত্নে পাকা করা হতো। দিনের পর পর দিন সরষের তেল খাওয়ানো হয়। তারপর একটা পাকা লাঠি তৈরি হয়।

অনেক ওঝা ফকির ও গাদিনিশিন পির তার ওস্তাদ বা পিরের কাছ থেকে তার প্রতিনিধি হিসেবে লাঠি বা আশা পেয়ে থাকে।

৩২. গৈ, ঘুঁটে

বরগুনা অঞ্চলে চুলায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ, ডালপালা ও শুকনো পাতা ব্যবহৃত হয়। আগে সুন্দরবন থেকে জ্বালানির কাঠ পাওয়া যেত। এখন জ্বালানি কাঠের বেশ অভাব। কাঠিতে গোবর জড়িয়ে গৈ বা ঘুঁটে তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতি অনেক পুরনো। মহিলারাই এ কাজটি দক্ষতার সাথে করে থাকে।

জ্বালানি ব্যবহারের জন্য গৈ বা ঘুঁটে

৩৩. সিকা

গেরস্তের ঘরে সিকা থাকবে না এ হয় না। আচারের বৈয়াম, দই ও পিঁপড়ায় খায় এমন মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য নিরুদ্রুবে রাখার জন্য সিকা ব্যবহার করে। সিকা পাট দিয়ে তৈরি করা হয়। পাটের দড়িতে নানা রঙ দিয়ে নানান নকশার সিকা তৈরি করা হয়। মহিলারাই সিকা তৈরি করে থাকে।

www.pathagar.com

সিকায় ঝুলানো পাত্র

৩৪. পুরা

ধান-চাল মাপার জন্য গেরস্তবৌ যে পাত্র ব্যবহার করে থাকে বরগুনা অঞ্চলে একে পুরা বলে। পুরা সাধারণত এক কেজি বা এক সের চাল মাপার জন্য পুরা ব্যবহার করা হয়। বাঁশ ও বেত দিয়ে পুরা তৈরি হয়। বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র যারা তৈরি করে তারাই পুরা তৈরি করে।

চাল মাপার বেতের পুরা

www.pathagar.com

৩৫. চার/হাক্কা/সাঁকো

অসংখ্য নদী-খাল-সোঁতা পরিবৃত বরগুনা জেলা। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে খাল বা সোঁতা পার হতে হবেই। নৌকা বা সাঁকো ছাড়া নদী-খাল পার হবার উপায় নেই। স্থানীয় লোকজন নিজেদের উদ্যোগে সাঁকো তৈরি করে নেয়। সাঁকোকে স্থানীয় উপভাষায় 'চার' বলে। বাঁশ ও সুপারি গাছ দিয়ে এই 'চার' তৈরি করা হয়। ছোট সোঁতা বা নালা-বেড়-এ যে সাঁকো দেয়া হয় তাকে 'হাক্কা' বলে। এ নিয়ে লোকগান আছে—"তোমার বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে নলের বেড়া/কলা গাছের হাক্কা দিয়ে বানাইছে জঞ্জাল।"

৩৬. ওগলা/হোগলা পাটি

এই অঞ্চলে খাল ও নদীর তীরে দু-ধরনের তৃণ জন্মে। হোগলা পাতা—তরবারির মতো চ্যাপ্টা। হেউলি পাতা—তিন কোনঅলা চিকন পাতা। এ অঞ্চলের মেয়েরা এই পাতা দিয়ে দু-ধরনের পাটি তৈরি করে। একে ওগলা, হোগলা বলে। ধান-চাল শুকাতে হোগলা পাতা ও চৌকিতে পাততে হেউলি পাতার হোগলা ব্যবহার করা হয়।

৩৭. চুইন্যা

বেশি পরিমাণ ধান-চাল মাপার জন্য চুইন্যা ব্যবহার করা হয়। ২০ কেজি বা সের ধান-চাল মাপার জন্য চুইন্যা ব্যবহার করা হয়। বাঁশ ও বেত দিয়ে চুইন্যা তৈরি হয়।

৩৮. সাজি

ধান, চাল, আলু, মরিচ ইত্যাদি রাখার জন্য বাঁশের তৈরি সাজি ব্যবহার করে থাকেন। নিত্য দিনের ব্যবহারিক কাজে যেমন সাজির প্রয়োজন হয়, তেমনি বাজারে জিনিসপত্র নেয়া-আনার জন্য সাজি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত ২০ কেজি বা সের ধান, চাল একটা সাজিতে ধরে। বাঁশ ও বেত শিল্পীরা সাজি তৈরি করে থাকেন।

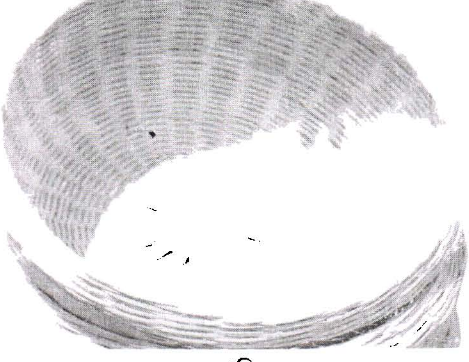

সাজি

www.pathagar.com

লোকভাষা

ভাষারীতি

বরগুনার উপভাষা বৃহত্তর বরিশাল জেলা, বর্তমান বিভাগের অংশ। এ অঞ্চলের উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বাক্‌ভঙ্গি রয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই 'শ ষ স' হ-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন–শালা-হালা, শ্বশুর-হৌর, শাশুড়ি-হাউরি ইত্যাদি। আর হ-ধ্বনি অ-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন–হাত-আত, হাঁটু-আড়ু, হাট-আড। আবার ক, খ, হ হয়ে যায়। যেমন–কর কি–হর কি, পটুয়াখালী-পট্টুয়াহালি ইত্যাদি। এ অঞ্চলে মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ খুবই কম। যেমন–ঘ হয়ে যায় গ, ঝ হয়ে যায় জ, ভ হয়ে ড় হয়ে যায় র, ছ হয়ে যায় চ। যেমন–করছে-হরচে, ভাই-বাই, ভাত-বাত, বড়-বর, ইত্যাদি। অনাবশ্যক ু-কারের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–করব-হরমু। ম-ধ্বনিরও প্রয়োগ প্রচুর। যেমন–যাব-যামু, খাব-খামু।

ভৌগোলিক কারণে শব্দগুলোর উচ্চারণ একটু প্রলম্বিত ও টেনে উচ্চারিত হয়। যেমন–ও ও ব্যাডা যা ও ও কই? এই টেনে উচ্চারণের কারণ হলো নদীনালা, খালবিল, বিস্তৃত মাঠ ও বাতাস। ফলে একে অপরের সাথে ডাকাডাকিতে শব্দগুলো টেনে ও উচ্চস্বরে করতে হয়। মাঠের কিংবা খালের ওপার থেকে কাউকে ডাকলে এভাবে উচ্চারিত হয়–ও ও ও কা দে র এ ম্নে আ ও। কাদের জবাব দেয়–মু ই এ এ ম্নে এ এ এ ম্নে। এ অঞ্চলের উচ্চারণ আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সবাই একটু জোরে কথা বলে। তার কারণ শীতকাল ছাড়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্ম ও বর্ষকালে বৃষ্টি-বাতাসের জোর বেশি থাকে। সে কারণে খোলা জায়গায় একে অপরের সাথে যোগাযোগের জন্য একটু জোরে কথা বলতে হয়। তা না হলে শব্দগুলো স্পষ্ট শোনা ও বোঝা যায় না।

দুজন যখন কথা বলে তখন অনুজ্ঞা বা নির্দেশনামূলক মনে হয়। কখনও মনে হয় পরস্পর রাগান্বিত হয়ে কথা বলছে, যেমন–"খাও মেয়া খাও! বরতন মোর খাওয়নও মোর, যদ্দুর পাড় খাও! ছানা বাত লাগে কুত্তা বিলইতে খাইবে।" আবার হয়তো হাটে একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছে, "কি মেয়া বালো অচনি?" প্রতিউত্তরে বলে, "খারাপ থাকলে কি তোমার বালো হয়?" ইত্যাদি।

বাক্‌ভঙ্গিতেও আছে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য। শুনে মনে হবে আত্মঅহংকারের সীমা নেই এই অঞ্চলের মানুষের। যেমন, "মুই কি কোন হালার মাহা তামাক খাই? মুই কোন হালার চাইয়া কোম বুঝি কিতে। তোরে মুই বালদ্যাও জিগাই না। তুই অইচো একটা বলদা, তোর লগে কতা কয় কোন পাড়ায়?" ইত্যাদি।

এ অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

www.pathagar.com

গাইল/খামার

প্রাকৃতিক কারণেই হয়তো বরগুনা অঞ্চলের লোকজন একটু বেশি রাগি। খুন-খারাবি, মারামারি সারা বছর লেগেই থাকে বলে একটা প্রচারণা আছে। রাগের বহিঃপ্রকাশ যে গালি তা আমরা সকলেই জানি। বরগুনা অঞ্চলের গালাগালিকে গাইল ও খামার বলা হয়। এই খামার এ অঞ্চলের মানুষের বিশেষত্ব বলে খ্যাত। গাইল-খামারে পুরুষরাই এগিয়ে। নারীরাও কম যায় না।

গাল মানেই তাতে কিছুটা শ্রীলতার অভাব রয়েছে। কোন কোন গ্রামে খামার দিতে ওস্তাদ কিছু লোকের খ্যাতি রয়েছে। সাধারণে এমনও ধারণা আছে যে কেউ কেউ নাকি ৩৬০ জোড়া বা ৭২০টির মতো খামার জানে। অনেক নারী-পুরুষ আবার ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে খামার দিতে পারে। খামারগুলোর বেশিরভাগই যৌনসম্বন্ধীয় হয়ে থাকে। এখানে কিছু খামারের নমুনা দেয়া হলো–হালা, হালারপো হালা, চুদির ভাই, চুতমারানি, চুতমারানির পো, মাউগার পো, হালার বাই হালা, তোর হোগা মারি, তোর হোগা মারে কেডা, তুই আমার বাল হালাবি, তোর মায়েরে চুদি, তোর বুইনেরে চুদি, তোর চৌদ্দগুষ্টি চুদি, তোর পাইন মারি, তোরে পাইন মারে কেডা, তোরে ফলনাতা হরে কেডা, সাউমারানি, সাউমারানির পো, হালার উমাইন্যা, তুই মোর বাল হালাবি। খামারের মধ্যে অভিশাপও আছে। অভিশাপের কয়েকটি–তোরে জোলায় ধরবে (জোলা এখানে কলেরা), তোর মাতায় দুফাইরা ঠাডা পড়বে, তোর বউ দুফাইরা রাঁড়ি অইবে। খান্নি মাগি, বেশ্যা মাগি, বারো ভাতাইরা মাগি, আড়ুইরা মাগি ইত্যাদি।

মহিলারা যে সব গালি দেয়–লাংকরানি, খানকি মাগি, কাচা খাউগ্যা মাগি, তোর কাচা যাইবে, গোল্লাসুগি ইত্যাদি। গাইল খামারের কি আর শেষ আছে!

কেনুমারা

কনুই ভাঁজ করে কারো পিঠের ওপর আঘাত করা এই অঞ্চলে মারধরের একটি লোকপ্রিয় বিষয়। কারো উপর প্রচণ্ড রাগ হলে লোকজন বলে, 'হালারে কাম অইলে কেনুর' 'তুই কোলম কেনুর কাম হরচ' ইত্যাদি।

বাক্‌ভঙ্গির ভিন্নতা

হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করলেও দুই সম্প্রদায়ের বাকভঙ্গি ও উচ্চারণে খানিকটা ভিন্নতা রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মনে করে তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের চাইতে খানিকটা মান-বাংলা বা শুদ্ধ বাংলা বলে। যদিও উভয়ই বরিশাল কিংবা বরগুনায় প্রচলিত একই বাক্‌ভঙ্গিতে কথা বলে। তবে এ কথা সত্য গত ৫০ বছরে উভয় সম্প্রদায়ের বাক্‌ভঙ্গিতে দৃশত পার্থক্য অনেক কমে গেছে। তবু কিছু কিছু শব্দের বেলায় ভিন্নতা আছে। যেমন মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণত বলে, 'বাবা তুই গ্যালহি কোম্মে'। হিন্দু সম্প্রদায় একজন হয়তো এ কথাটি এভাবে বলবে, 'বাবা তুমি গেছিলা কই'। এখানে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত কিছু বাক্‌ভঙ্গির উদাহরণ দেওয়া গেল।

www.pathagar.com

মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়
গ্যালহি কই	গেছিলি কই
খাইলহি কি	খাইছিলি কি
যাও কোম্মে	যাও কোতায়
নিলহি কি	নিছিলি কি
ক্যালা	কলা
ন্যালা	নলা
সালুন	বেনুন, তরকারি
হুরয়্যা	রসা, ঝোল
নুন	লবণ
পানি	জল
বরক	কলাপাতা
বেইন্না হালে	ব্যান কালে
ওশ্‌শা	পাকের ঘর
ওক্ত (খাবারের সময়)	সন্ধ্যা/বেলা
হাজ	সন্ধ্যা
বেস্ত (বেহেস্ত)	স্বর্গ
দোজখ	নরক
সালাম	পেন্নাম
দাওয়াত	নেমতন্ন
মেহমান	অতিথ
কদমবুচি	সেবা, হেবা
হাজের হালে	সন্ধ্যাকালে
চুলা	আহাল
চুলাহাল	আহালধার
কুত্তার ছাও	কুহুরের ছাও
থেকে যাও	গোন কর
গোসল	চান, সেনান
আল্লাহ	ভগবান, ভগমান
খেয়ে যাও	সেবা করে যাও
মোল্লা	পুরুত
গোর দেওয়া	দাহ করা
গোরস্তান	সমাধিস্থল

www.pathagar.com

এছাড়া এ আঞ্চলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বেনে বা বেনিয়া, সাউদ, কামার, স্বর্ণকার–যারা বিভিন্ন হাটে বাজারে ব্যবসা করে তাদের বাক্‌ভঙ্গিও ভিন্ন। কারণ এরা বেশির ভাগ এসেছে ফরিদপুর ও বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে। তাই তাদের বাক্‌ভঙ্গিতে ওইসব অঞ্চলের টান ও ভঙ্গি থাকে। যেমন–অইবো কি, খাইবো কি, ইত্যাদি।

বরগুনা জেলার উপভাষা

এখানে বরগুনা জেলার বহুল প্রচলিত কিছু উপভাষা সংকলিত করা হলো।

উপভাষা	মান-বাংলা
অইচে-	হয়েছে
অইলে-	হলে
অক্অক্-	ফুটফুটে
অকঅক্ বাইত-	মুখ ভরে বমি করা
অকুলান-	অসহ্য
অজাগা-	খারাপ জায়গা
অত্কুন-	অতক্ষণ
অত্তোর-	অতবড়
অতিত-	মেহমান
অদ-	গর্ত
অয়-	হয়, সে
অয় না-	হয় না
অর-	ওর
অরা-	তারা
অরে-	তাকে
অশ্শোর-	অবসর
অশুইক্কা-	রোগা
আইক্কা-	বাঁশের গিঁট
আইচ্লা-	আঁচিল
আইজগো-	আজ
আইট্টা ক্যালা-	বিচি কলা
আইয়ো না-	এসো না
আইল-	জমির সীমানা
আইল্লা-	লবণহীন
আইল্লা-	কৃষি শ্রমিক

www.pathagar.com

আইশ্‌টা-	আঁশটে গন্ধ
কাইস্টা-	কৃপণ
আউন্দা-	ঝুল
আউমম্‌া-	তৃপ্তি
আউল ঝাউল-	এলোমেলো
আউস-	শখ
আওনে-	আসায়
আওয়াল-	আড়াল
আওলি-	পর্দার জন্য বাড়ির সীমানার সুপুরির খোল, কলার ফাতরা ইত্যাদি দিয়ে বেড়া।
আজাইয়া-	ঘিরে আসা
আকাড়া-	কাটা নয়, আস্ত
আকাউড্ডা-	অভদ্র
আকাম-	খারাপ কাজ
আগা-	পায়খানা করা
আগতে-	পায়খানা করতে
আগোনা-	গণনাবিহীন
আঙ্গার-	কয়লা
আচুক্কা-	হঠাৎ
আচোর-	আঁচড়, খামচি
আজাইর্‌রা-	অহেতুক
আড-	হাট
আডা-	হাঁটা, আটা, আঠা
আডু-	হাঁটু
আডুইরা-	হাটুরে
আত-	হাত
আদাওয়াতি-	বিনা নিমন্ত্রণে
আদার-	অপরিচ্ছন্ন, মাছের খাদ্য
আনমু-	আনব
আনাড়া-	বেয়াড়া
আনাকেস্ত-	প্রকৃত (আনাকেস্ত শয়তান)
আপুর-	হামাগুড়ি
আবছা-	ছায়াযুক্ত, সামান্য

www.pathagar.com

আবডাল-	আড়াল
আবোনা-	বুনো
আমাবইশশা-	অমাবস্যা
আরি-	হাঁড়ি, প্রতিজ্ঞা
আল-	মৌমাছি, বোলতা ইত্যাদির হুল ফোটানো
আল-	হাল চাষ
আল্লা-	আতপ
আলি-	হালি, চারটে
আলিশ্‌শা-	আলস্য ভাব
আসা-	পুরুষ হাঁস
আসি-	হাঁসি
উইন্‌না-	গলে যাওয়া
উগইরতলা-	উঁচু চৌকি, যেখানে গৃহস্থরা মালামাল রাখে
উচিলা-	উপলক্ষ
উজাগার-	রাত জাগা
উন্দুর-	ইঁদুর
বাইত্যা উন্দুর-	ছোট ইঁদুর
উমাইন্না-	আশ্রিত
উমান দ্যাওয়া-	ডিমে তা দেওয়া
উরচুংগা-	পোকা বিশেষ
উলডা-	বিপরীত দিক
একছের-	অনেক, প্রচুর
এ্যাম্নে-	এমনি
এ্যাকগইররা-	একঘরে
এ্যাতকুন-	এতক্ষণ
এম্নো-	এখানে
এ্যামমিদ্দা-	এখান দিয়ে
এ্যাল্‌হা-	একা
এ্যাহোন-	এখন
এ্যাহাইন্দা-	এখান দিয়ে
ওগলা-	হোগলের পাটি
ওগলানো-	বমি করা
ওছা-	ভাজা

www.pathagar.com

ওট-	ঠোঁট
ওড-	ওঠ
ওডা-	কচুরিপানা
ওত কইররা ওডা-	রাগ হওয়া
ওতকুন-	অতক্ষণ
ওম্মিদ্দা-	ঐ দিক থেকে
ওম্মে-	ঐ দিকে
ওশ্শা-	পাকের ঘর
ওশুদ-	ঔষধ
ওস্তা-	হাজাম, যে মুসলমানি করায়
কতা-	কথা
কাইট্টা-	কেটে
করচা-	পাটের মোটা দড়ি
কাউটটা-	কাছিম, কচ্ছপ
কাউয়া-	কাক
কান্দা-	হাঁড়ির কাদা, গ্রামের কোনো পাড়া
কাজি-	আমানি, গাঁজানো পান্তা ভাতের পানি
কিরপিন-	কৃপণ
কুদরুঙ্গ	দুষ্টামি
কেডা-	কে
কৈল্জা-	কলিজা
কুম্মিদ্দা-	কোথা থেকে
কোম-	কম
কোম্মে-	কোথায়
কোরচা-	ট্যাঁক
ক্যা-	কেন
ক্যাতে-	কাঁখে
ক্যার-	কার
ক্যারে-	কাকে
ক্যাচাল-	তর্ক/বিবাদ
ক্যাত্কুত-	কাতুকুতু
ক্যাৎকুলি-	বগল
খাইট্টা-	খাটো, মুগুর

www.pathagar.com

খাইট্টা-	কাজ করা বা পরিশ্রম করা
খাউজ-	কামভাব
খাউজানি-	চুলকানি, কামভাব
খামার-	গালি
খাম্বা-	থাম, খুঁটি
খুতি-	থলে
গইপ্পা-	গল্পবাজ
গাছা-	গাছের মতো শক্ত, শক্তিশালী
গপ্‌গপাইয়া-	দ্রুত, গবগব করে
গপ্‌পো-	গল্প
গর দ্যাওয়া-	ভাতের মাড় গালা
গাইওল-	গাভী
গাইররা-	গর্ত করে, গর্তের মধ্যে রাখা, পুঁতে রাখা
গাইট-	গাঁট
গাইল-	গালি
গাবলা-	গামলা
গাবুইর্‌রা-	নোংরা
গালা-	ফেলে দেয়া, বের করা (ফোঁড়া গালা)
গু-	বিষ্টা, মল
গুইজ্জা রাহা-	লুকিয়ে রাখা
গুরমুইররা-	পায়ের গোড়ালি
গুরাগারা-	ছোট ছেলেমেয়ে
গেদা-	ছোট শিশু
গেদু-	শিশু, কিশোর
গেদি-	কিশোরী
গৈচ্ছা-	কোনো কিছু রাখা
গোঙ্গা-	বোকা
গোছা-	ধানের গুছি
গোন-	অনুকূল হাওয়া
গোনা শুশ্‌টি-	একই বংশের লোকজন
গোন্দ-	গন্ধ
ঘপ্পাত-	হঠাৎ
ঘাইট-	অপরাধ

www.pathagar.com

ঘাই দ্যাওয়া-	দংশন করা, আঘাত করা
ঘাউর্রা-	অবাধ্য
ঘাগু-	অত্যন্ত চালাক
ঘুইট্টাচালি-	ষড়যন্ত্র
ঘেডি-	মাথা, ঘাড়
ঘেরতো-	ঘৃত, ঘি
ঘোংরান-	গোঁ গোঁ শব্দ করা
ঘোডোন-	নাড়া দেওয়া
চক্কে-	চক্ষে
চক্কোর-	কুহক, চক্র
চট্টাত কইর্রা-	অতিশীঘ্র
চদু-	বোকা
চং-	লাশ বহনকারী খাট
চরাডি-	নৌকার উপর বিছানো পাটাতন
চাইল-	চরিত্র
চাড়ি-	গতি ও দিক ঠিক রাখার জন্য জলে নৌকায় বেগ দিয়ে বৈঠার চাপ, মাটির পাত্র
চাম-	চামড়া
চার-	সাঁকো
চৌক-	চোখ
চিংগোইর-	চিংড়ি মাছ
চিনা জোঁক-	এক প্রকার জোঁক
চিত্তারাইয়া-	চিৎ হয়ে
চুংগা-	তেল মাপার পাত্র, জোরে আওয়াজ করার টিনের চোঙা
চুংগি-	খেঁজুর গাছের রস বের করার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের কঞ্চি, যা দিয়ে রস হাঁড়িতে পড়ে, মেয়েদের গয়না (আংডি-চুংগি)
চেন্নোক-	চিকন
চ্যাড-	শিশ্ন
চোদা-	সঙ্গম করা
চোপাড়-	থাপড়, চড় দেওয়া
চুদুর বুদুর-	ছল-চাতুরি

www.pathagar.com

চ্যাংগা-	না খেয়ে থাকা
চাংগোর-	দুষ্টু
চ্যাংরা-	ছেলে
চ্যাংরামি-	ছেলেমি
চ্যাতা-	উত্তেজিত হওয়া
ছই-	নৌকার ছাউনি
ছয়ছাইল-	প্রতারণা
ছল্লিবল্লি-	প্রতারণা
ছাতা-	ময়লা
ছামা-	যোনি
ছাবি-	কাপড় দিয়ে তৈরি মাছ ধরার জাল
ছালুন-	রান্না করা তরকারি
ছিট্টা-	ছিটে যাওয়া
ছিডানো-	ছিটানো
ছিদা-	ছিদ্র
ছিবোইত-	চুন
ছিয়া-	শিকা
ছিরি-	চেহারা
ছেরাদ্দ-	শ্রাদ্ধ
ছোড-	ছোট
ছেনি-	লোহার দা
ছেমরা-	ছেলে
ছেমরি-	মেয়ে
ছেরি-	বালিকা
ছোরানি-	চাবি
ছ্যাচা-	মারধোর করা
জাইল্‌লা-	জেলে
জাউররা-	জারজ
জাগ-	ধোঁয়া দিয়ে ফল পাকানো
জান-	পুকুরের জল নিষ্কাশনের নালা, জীবন
জিগান-	জিজ্ঞাসা কর
জিরান-	বিশ্রাম
জুরান-	ঠান্ডা করা

www.pathagar.com

জের-	রেশ, টিনের পাত্র
জোড়া-	পাওয়া
জোড়ে না-	জোটে না
জোমা দেওয়া-	পরোয়া করা, জমা দেওয়া
ঝট কোইর্‌রা-	তাড়াতাড়ি
ঝনঝনি-	রুপোর বা ধাতুর মুদ্রার শব্দ
ঝবঝেব্‌রা-	জব জব করে কথা বলে যে
ঝরা-	দ্বিতীয় দিনের খেজুর রস, ঝরে পড়া
ঝাউ-	মাছ ধরার ফাঁদের সঙ্গে দেওয়া ডালপালা
ঝাহা দ্যাওয়া-	লতা জাতীয় সবজি গাছের জন্য মাচা দেওয়া
ঝাজৈর-	মুড়ি ভাজার ছিদ্রযুক্ত পাতিল
ঝারা-	জোরে নাড়া
ঝারা-	রোগ মুক্তির জন্য মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেওয়া
ঢুন্ডা-	লেজ কাটা
ট্যাংরি-	গাছের নতুন গজানো শাখা
ট্যাংগা-	তেঁতুল
ট্যাডানি-	যন্ত্রণা
ট্যাপপোনা-	পানা
টেপরানি-	টিপ টিপ করে বৃষ্টির পানি পড়া
ট্যার-	টের
ট্যারা কথা-	ঘুরিয়ে কথা বলা
ট্যারহা-	বাঁকা চোখ
ঠাইশ্‌শা-	চেপে রাখা
ঠাওর-	টের
ঠাডা-	বজ্র
ঠাপ-	ধমক, সঙ্গম
ঠালা-	নিচু জায়গা
ঠাহুর-	ঠাকুর
ঠিলা-	কলস
ডরাইন্‌না-	ভীতু
ডাইনা-	শস্যাদি মাড়াইরত ডান দিকের গরু
ডাইয়া-	লাল রঙের বড় পিঁপড়া
ডাউঙ্গা-	ডাঁটা

www.pathagar.com

ডাঙ্গর-	বড়
ডেউগ্গা-	তাল, নারিকেল, খেজুর গাছের শাখা
ড্যাংগাইয়া-	অতিক্রম করে
ড্যানাপিডান-	অল্প আয়ে সংসার চালনা
ডকমতো-	ঠিকমত
ঢগ-	ফুটানি, ফ্যাশন
ঢন্‌ঢইন্‌না-	খালি
ঢল্‌মইল্‌লা-	ঢিলা
ঢিলা-	আলগা, মাটির শুকনা টুকরা
ঢোং-	কৃত্রিম অভিমান
ঢ্যাঙ্গা-	ধাড়ি
ঢ্যাবটেইব্‌বা-	নরম
তরতরি-	তাড়াতাড়ি
তলাইন্‌না-	পানি-তেল ইত্যাদির নিচে জমা ময়লা
তলাইয়া যাওয়া-	ঋণগ্রস্ত হওয়া, ডুবে যাওয়া
তলে তলে-	লুকিয়ে লুকিয়ে
তশ্‌শু-	গত পরশুর আগের দিন এবং আগামী পরশুর পরের দিন।
তহোন-	তখন
তাইরে নাইরে-	আবোল তাবোল
তাইত্‌তা-	হঠাৎ রেগে ওঠা, গরম হওয়া
তাউল্‌লা-	তালু
বেরাগা-	বদমেজাজি
উমা-	হঠাৎ রাগাম্বিত হয় যে
তয়গ্যা-	তবেই
তাও দেওয়া-	গরম দেওয়া
তাইথ্যা-	তবে
তাকোববারি-	বাহাদুরি
তাগো-	তাদের
তাগোরে-	তাদেরকে
তামাইত-	পর্যন্ত
তালই-	বোন ও ভাইয়ের শ্বশুর
তোইততো তালাপি-	খোঁজ খবর

www.pathagar.com

তোজোক-	তেজ
তোলানো-	খাশিকরণ
ত্যাল-	তেল
থাইক্কা-	থেকে
থাইম্মা-	থেমে
থাউব্বা-	গোলাকার
থাউল্লা-	বড়, গোলাকার
থাপর-	চড়
থুইর্রা-	জাল বোনার কাঠি
থুক্কি-	সাময়িক বিরতিসূচক ধ্বনি
থুক্থুইক্কা-	থুরথুরে বুড়ো
থুবানো-	স্তূপীকৃত করা
থুরথুরইরা-	অতিশয় বুড়ো
থোক্কা-	গুচ্ছ গুচ্ছ
থোর-	কলা গাছের কাণ্ড
থৌল-	অস্থায়ী মেলা
দগ্দৈগ্যা-	দগদগে, তেজি আগুন
দরজাল-	ঝগড়াটে
দলা হওয়া-	সমবেত হওয়া
দাইত্তা-	যার বড় বড় দাঁত, ব্যাঙ্গোক্তিকারী
দাউর-	লাকড়ি
দামরা-	এঁড়ে, বলদ
দামরি-	বকনা বাছুর
দাহান-	দা
দিগলা-	লম্বালম্বি
দুদু-	চাচা, কাকা সম্বোধন
দুনা-	দ্বিগুণ
দুন্নই-	দুনিয়া
দুপইররা হাল-	দুপুরের সময়
দুমুইক্কা-	দুমুখো, দুদিকে মুখ যার
দুমুইর্রা-	না জোয়ার না ভাটা, ভাটার পূর্বাস্থা
দেওই-	বৃষ্টি
দোনোমনো-	সিদ্ধান্তহীনতা

www.pathagar.com

দোয়াইল-	ফিতা
দোয়ানো-	গরুর দুধ দোহন করা
দ্যাওর-	দেবর
দ্যারা-	দেড়গুণ
দ্যাহা-	সাক্ষাৎ
ধপ্‌পোর-	পতিত হওয়ার শব্দ
ধাপ্ লাগা-	গরম গালা
ধোন-	শিশ্ন
ধুরি-	ছোট চিংড়ি মাছ
ধুলাট-	রবিশস্য চাষ
ধেত্-	বিরক্তিসূচক উক্তি
ধ্যাত্‌তোর-	বিরক্তিসূচক উক্তি
ধ্যাত্‌রা-	ছেঁড়া (ধ্যাত্‌রা কাঁথা)
ধ্যারধ্যারা-	ঢিলা
নচোল্‌লা-	অজুহাত
নজোর লাগা-	কুদৃষ্টি লাগা
নাইর্‌রা-	নেড়ে
নাউক্কা-	নাকি সুরে কথা বলা
নাউয়া-	মাঝি
না অইলে-	না হলে
নাকশি-	নাক, ব্যাঙ্গোক্তি
লাঙ্‌গোল-	লাঙল
নাহেমোহে-	নাকে মুখে
নাহোইল-	নারিকেল
নিচ্‌চুম-	চুপ
নিটান্ডা-	নিশ্চিত
নিরমুলি-	বিনাশিনী
নিশ্‌টা-	খারাপ
নেন্দে-	নিন্দা করে
পচলা-	পচন ধরা
পটপডাইয়া-	পটপট করে
পডানো-	বশীভূত করা
পত্‌তোন-	আবাদ করা

www.pathagar.com

পাইক্কা-	জন্য
পাইক্কা-	পেকে যাওয়া
পাইন-	পশ্চাৎদেশ দিয়ে যৌন কর্ম
পাইন মারা-	ক্ষতি করা
পাইলা-	পাতিল
পাছার-	আছাড়
পাডা-	পাঁঠা
পাদ-	বায়ু ত্যাগ
পানতে-	পানিতে
পুটকি-	পায়ু
পেরথম-	প্রথম
পেরন-	জামা
পেন্দন-	পরা
পেন্দে-	পরে, পরিধান করে
পোত-	পথ
পোতে পোতে-	পথে পথে
পেস্যাদ-	প্রসাদ
পেরান-	প্রাণ
পেরায়-	প্রায়
পোয়া-	ছেলে
পোলাপান-	ছেলেমেয়ে
পিছা-	ঝাটা
প্যাচোর-	ধূর্ত
প্যাট কামরি-	পেটে ব্যথা
ফই্র্রা-	ব্যাপারি
ফক্ফেক্রা-	ফরসা
ফচকাইয়া-	ফচকিয়ে
ফহির-	ফকির
ফাউকানো-	উচ্ছল হওয়া
ফলনাতা-	সঙ্গম করা
ফাইর্রা-	ছিঁড়ে
ফাইল-	মাটির শুকনো টুকরা
ফাইলফারা-	নারকেলের শাস ধরা অবস্থা

www.pathagar.com

ফাক্কা-	শূন্য
ফাট্‌কি-	ফাঁকি
ফাডা-	চির ধরা
ফাডাফাডি-	রাগারাগি
ফাত্‌রা-	শুকনো কলাপাতা
ফাফর-	বিপদ
ফায়েশা-	অশ্লীল কথা
ফিক্কা-	ছুঁড়ে মারা
ফিররা-	ফেরত আসা
ফিহির-	চিকিৎসা
ফুইললা-	ফুলে
ফুটফুইট্টা-	ফুটফুটে
ফুডা-	ছিদ্র
ফুডানি-	বাবুগিরি
ফুপাইয়া-	ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
ফুরফুরাইয়া-	ফুর ফুর করে
ফুলাফুলি-	অভিমান
ফেচ্‌কি-	পা ফচকিয়ে পানি ছিটে ওঠা
ফ্যাকাইশ্‌শা-	ফ্যাকাশে
ফ্যার-	বিপদ
বখাইট্টা-	বখাটে
বইষ্যা-	বর্ষা
বররা বাঁশ-	মোটা গিঁটঅলা বাঁশ
বাইট্টা-	কোমরের কালো তাগা, বেটে, খাটো
বাফ-	বাপ
বাও-	আবহাওয়া
বাদাম-	পাল
বাইল-	ঠিক দিক, নারকেল, সুপারি ও খেজুর গাছের শুকনো ডগা
বাল-	যৌনাঙ্গের কেশ
বাহি-	বাকি
বিশ্‌শোইদ্‌বার-	বৃহস্পতিবার
বেইন্‌না হাল-	সকাল বেলা

www.pathagar.com

বোইশ্‌শা হাল-	বর্ষাকাল
বোচা-	শিংবিহীন চতুষ্পদ জন্তু, চেপ্টা নাক
বোদা-	যোনি
বোলান-	ডাকা
বিডা-	ভিটা
বেবাক-	সমস্ত
বেস্ত-	বেহেশ্‌ত
বিলই-	বিড়াল
বেয়ান-	সকাল
বেহাংরা-	একরোখা
বুইন-	বোন
ভংচং-	তালবাহানা
ভং ধরা-	ভান করা
ভরতুক-	ক্ষতিপূরণ
ভাইগ্না যাওয়া-	পালিয়ে যাওয়া
ভাউজ-	বড় ভাইয়ের স্ত্রী
ভেচ্‌কি-	ধমক দেওয়া, ভয় দেখানো
ভেট্‌কি-	এক প্রকার মাছ বিশেষ
ভ্যাদর-	কাদা
ভ্যাঙ্গানো-	মুখ ভেঙচানো
ভ্যারভ্যারাইয়া-	গড়গড় করে
মঘা-	অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি
মচ্‌মইচ্চা-	টাটকা
মযগুনি-	এজমালি
মাইন্দার-	মাইনে করা কাজের লোক
মাডি-	মাটি
মাহন-	মাখন
মাহা-	মাখা
মুই-	আমি
মুরহা-	মুরগি
মিডা-	মিঠা, মিষ্ট
মাউগ-	স্ত্রী
মাগি-	স্ত্রীলোক

www.pathagar.com

মেচ্মার-	চূর্ণবিচূর্ণ
মুত-	মূত্র
মুহি-	ঘুষি মারা
মাতারি-	সম্মানিতা মহিলা
মোনগুবুইত্তা-	যে মনের কথা প্রকাশ করে না
মোনতোর-	মন্ত্র
মোনমুনি-	ইচ্ছা
মোর-	আমার
মোহের-	মুখের
মৌ-	মধু, তরকারিতে দেয়া পানি
ম্যাও-	মধু
ম্যাগ-	মেঘ
ম্যাযবান-	ভোজন উৎসব
ম্যালা-	অনেক, প্রচুর, খোলা
ম্যালা দেওয়া-	রওয়ানা দেওয়া
যুইত-	জোতসই
যুইন্না-	পোকা বিশেষ
যুইররা-	জুড়ে
যোংরা-	হোগল ও তালপাতার তৈরি মাথাল
য্যাতুড়ি-	যতগুলি
য্যার-	যার
য্যায়ারে-	শেষে
রগ-	শিরা
রোইববার-	রবিবার
রইয়া সোইয়া-	রয়ে সয়ে
রাইক্খা-	রেখে
রাইজ্যের-	প্রচুর
রাহা-	রাখা
রুইত-	রুই মাছ
রুডি-	রুটি
রোয়া-	ধানের গাছ
র‍্যাযালা-	দুষ্টু
লগে-	সঙ্গে

www.pathagar.com

লচমি-	ঘর মোছার নেকরা
লগইত-	দেহসৌষ্ঠব
লাইগগা-	জন্য
লাহান-	মতন
লালোচ-	লালসা
লাং-	গোপন প্রেমিক
লাংকরানি-	গোপনে যে নারী অভিসার করে
লোউগ্গা-	সঙ্গী
লোগি-	নৌকা বাঁধার বাঁশ, যা দ্বারা নৌকা ঠেলা দেওয়া হয়
লোচ্চা-	লম্পট
লোয়া-	লোহা
ল্যাওয়া-	নারকেলের নরম শাস
ল্যাওরা-	পুরুষাঙ্গ
ল্যাংডা-	উলঙ্গ
ল্যাংরা-	খোড়া
ল্যাডা-	আপদ
ল্যাডান-	ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়ানো
ল্যাদা-	ছোট শিশু
ল্যানদা-	খুব ছোট
ল্যার-	মেয়েদের মাসিকের রক্ত
ল্যাহা-	লেখা
শ্যাষ-	শেষ
শ্যাষম্যাষ-	শেষ পর্যন্ত
হপ্পন-	স্বপ্ন
হর-	দুধের সর, সরতে বলা
হগুন-	শকুন
হগোলডি-	সকলে
হাউজ্জা হাল-	সন্ধ্যার সময়
হাউরি-	শাশুড়ি
হাগা-	মলত্যাগ করা
হাচ্চইও-	সত্যিই
হাদা-	মান ভাঙানো

www.pathagar.com

হান্দান-	ঢুকানো, প্রচুর খাওয়া
হাবডাইয়া-	জড়িয়ে ধরা
হাবাইত্‌তা-	হাভাতে
হার-	ষাঁড়, গাভীকে পাল দেওয়া
হালা-	শ্যালক
হালান-	ফেলে দেওয়া
হালি -	শ্যালিকা
হির্‌রা-	ছিঁড়ে
হুদা-	খালি
হুমোইন-	সাড়া দেওয়া
হুয়ার-	শুয়োর
হুরয়্যা-	ঝোল
হারপাই-	মনে হয়
হেইয়া-	তাই
হেডা-	সেটা
হেন্না-	সেদিন
হোংগা-	ঘ্রাণ নেওয়া
হোইররো-	করিও
হোগা-	পাছা
হোম্মে-	সামনে
হোয়া-	শোয়া, শসা
হোয়াস-	শ্বাস
হ্যা কা-	তা কেন
হ্যাবদে-	যে পর্যন্ত
হ্যামনে-	সে রকম
হ্যামোন-	তেমন
হ্যারে-	তাকে
হ্যা বলইল্লা-	তার জন্য
হ্যার লগে-	তার সঙ্গে

সংযোজন

বিচরানো-	খোঁজা
হোনা-	শোনা

www.pathagar.com

ছ্যাক দেওয়া-	খান্ত দেওয়া
কই বোলে-	বলি কি
ছিদ্দাৎ-	ভোগান্তি
হুগনা-	শুকানো
আটকুরা-	নিঃসন্তান
খামি-	ছু পা আটকে দাঁড়ানো
লাগর-	নাগাল
কুহইল-	হাউমাউ করে কান্না
অইল-	হলো
গইর-	গড়িয়ে যাওয়া
কোলা-	মাঠ, ক্ষেত
গেরাফি-	নোঙর
এউক্কা-	একটা
উড়ুম-	মুড়ি
আচুক্কা সুন্দরী-	হঠাৎ দেখে সুন্দরী মনে হওয়া, হঠাৎ সুন্দরী
খ্যানে-	সময় অসময়
কাউর-	গোলমাল, ঝামেলা
বাইত-	বমি
উহাল-	বমি
আওই-	চিৎকার
মানতি-	মানত
জোমাত-	জিয়াফত
ফইত্যা-	জিয়াফত
ল্যাবরি-ছ্যাবরি	মাখামাখি
চিক্কইর-	চিৎকার
উদলা-	উদোম
বোচন-	বুঝি (কও বোচন)
ব্যাবার-	উপহার সামগ্রী

সম্বোধন

মুসলিম সম্প্রদায়

পিতা-	বাবা, বাবো, বাজান, আব্বা, আব্বো ।
মাতা-	মা, আম্মা, আম্মো

www.pathagar.com

ভাই-	নেবাই (বড় ভাই), মাজাই (মেজো ভাই), হাজাই (সেজো ভাই), নয়া বাই (চতুর্থ ভাই) হোড বাই, ভাইজান
বোন-	বুইন, বু, বুবু, বুজি, বুয়া
ছেলে-	গেদা, গেদু, মনু
মেয়ে-	মাইয়া, ছেড়ি, মাতারি
চাচা-	চাচাজান, দুদু
চাচি-	চাচি, চাচি আম্মা,
ফুপু-	ফুফু, ফুবু
ফুপা-	ফুবা, ফুবাজান
খালা-	খালা, কাগা, খালাম্মা
খালু-	খালু, খালুজান
দাদা-	দাদা, দাদাজান
নানা-	নানা, নানাজান
দাদি-	দাদি, দাদিজান
শালা-	হালা, হুমুন্দি (বড় শালা)
শালি-	হালি, জেউঠ্যান (বড় শালি)
ছেলে ও মেয়ের শ্বশুর-	বেয়াই
ছেলে ও মেয়ের শাশুড়ি-	বেয়াইন
বোনের দেবর-ভাসুর-	বেয়াই
বোনের ননদ-	বেয়াইন
দেবর-	দেওর
ভাসুর-	বড় বাই, বাইজান
শ্বশুর-	হৌর, আব্বাজন
শাশুড়ি-	হাউরি, আম্মাজান
ননদ-	নোনন
দেবর ও ভাসুরের স্ত্রী-	জাল
বোনের ছেলে-	ভাইগনা
বোনের মেয়ে-	ভাগনি
ভাই ও বোনের শ্বশুর-	তালই
ভাই ও বোনের শাশুড়ি-	মাঐ

হিন্দু সম্প্রদায়

পিতা-	বাবা
মাতা-	মা

www.pathagar.com

ভাই-	বড় বাই, মাইজ্যা বাই, নয়া বাই, চোড বাই, বড়জন, মাইজ্যাজন, ছোডজন, বড়দা ইত্যাদি
বোন-	বোন, বুইন, বুইনডি
পিতার ভাই-	জ্যাডা, খুরা, কাকা-কাকু
পিতার বোন-	পিসি
পিসির স্বামী-	পিসা
পিতার ভাইয়ের স্ত্রী-	জেডিমা
পিতার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী-	কাকিমা
মাতার বোন-	মাসি
মাসির স্বামী-	মৌসা
পিতার বাবা-	দাদা, ঠাকুরদা
পিতার মা-	ঠাকুর মা
মাতার বাবা-	দাদু, ঠাকুরদা
মাতার মা-	দিদা
শালা-	হালা
শালি-	হালি, জেঠাইস (বড় শালি)
ননদ-	নোনন, ঠাকুরঝি
ননদের স্বামী-	ননদাই, দাদা
মামা-	মামা
মামার স্ত্রী-	মামি
দেবর-	ঠাকুর পো, ছোডদা, দেওর
ভাসুর-	বড়দা
দেবর-ভাসুরের স্ত্রী-	জাল
শ্বশুর-	হৌর
শাশুড়ি-	হাউরি
ছেলে-মেয়ের শ্বশুর-	বেয়াই
ছেলে-মেয়ের শাশুড়ি-	বেয়াইন
বোনের দেবর-ভাসুর	বেয়াই
বোনের ননদ-	বেয়াইন
বোনের স্বামী-	ভগ্নিপতি, বোনাই, দাদা
বোনের ছেলে-	ভাইগনা
বোনের মেয়ে-	ভাগনি
ভাই ও বোনের শ্বশুর-	তালই
ভাই ও বোনের শাশুড়ি-	মাঐ

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. বরগুনা জেলার ইতিহাস
প্রকাশক : বরগুনা জেলা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রকাশকাল : ২০১০

২. চন্দ্রদ্বীপি শোলক, শাস্তর, পল্কি কথা, মিহির সেনগুপ্ত। প্রকাশক : কারুকথা, এই সময় (পত্রিকা), কোলকাতা, প্রকাশকাল : ২০০৪

৩. বিষাদবৃক্ষ, মিহির সেনগুপ্ত। প্রকাশক : সুবর্ণ রেখা, কোলকাতা, প্রকাশকাল : ১৪১২ বঙ্গাব্দ

৪. সিদ্ধিরগঞ্জের মোকাম, মিহির সেনগুপ্ত, প্রকাশক : নয়া উদ্যোগ, কোলকাতা, প্রকাশকাল : ১৯৯৬

৫. বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ময়মনসিংহ, প্রধান সমন্বয়কারী, আমিনুর রহমান সুলতান, প্রকাশক : বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল : ২০১৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি